অর্চ্চনা

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চদশ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২৪—মাঘ ১৩২৫
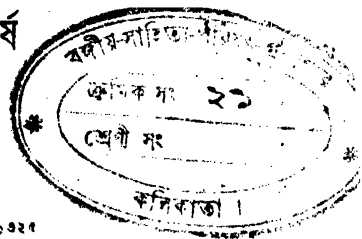
সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়,

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট—কলিকাতা হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা ৩এ রাধাপ্রসাদ লেন, (সুকিয়া ষ্ট্রীট) মণিকা প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা মাত্র।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

১[illegible]শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৪ [১ম সংখ্যা

শাক্ত দর্শন।

[লেখক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।]

শাক্ত সম্প্রদায় বাঙ্গালার উচ্চ জাতির মধ্যে বহুকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেবল বাঙ্গালা নহে, মিথিলা এবং দক্ষিণ ভারতেও শাক্ত মত অপ্রবল নহে। মিথিলার ব্রাহ্মণ সমাজ শাক্তপ্রধান। পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে শাক্তমতের যথেষ্ট প্রচার। অথচ শাক্তমতের দর্শন প্রস্থান পরিস্ফুট নাই। সাধক 'দর্শনে'র বিচার অপেক্ষা সাধনায় সময়ক্ষেপ অধিকতর কর্ত্তব্য মনে করেন, সেই কারণে সাধনা-প্রধান শাক্ত ধর্ম্মমার্গের পথিকগণ, দর্শনের বিচার বিতর্ক না তুলিয়া নীরবে সিদ্ধির অভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। এখন সে সময় নাই; কথার, বিচারের, বিতর্কের বাহুল্য আসিয়াছে, সেজন্য শাক্ত মতকে কেহ অবৈদিক, কেহ অনার্য্য-জুষ্ট বলিতেও এক্ষণে সঙ্কুচিত হ'ন না। বৈষ্ণব সৌর শৈব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ভিতর দিয়া যেরূপ স্বমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শাক্তের মত প্রতিষ্ঠার জন্য সেরূপ কোন গ্রন্থাদি নাই—ইহাও শাক্ত সম্প্রদায়ের আধুনিকতা বা অপকর্ষের সূচক এমন কথাও কখন কখন উঠিয়া থাকে। কথিত আছে, কোন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের সহিত শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত পরম পণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বিচার প্রস্তাব হইলে, অদ্বৈতবাদী বলিয়াছিলেন,—বেদান্ত প্রস্থান শূন্য মতবাদীর সহিত বিচার করিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি আমরা করিব না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য

রচনা করিয়া নিজ মতের বেদান্ত প্রস্থান বা বেদান্ত দর্শনের অনুগামিতা দেখাইলে, অদ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার বিচার হয়।

শাক্ত মতে যখন বেদান্ত প্রস্থান নাই, তখন তাহার অনাদরণীয়তা সেই অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের ন্যায় দু' একজন যে করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

ফলতঃ পূর্ব্বতন শাক্তাচার্য্যগণ ঐরূপ প্রস্থান বা বিচার বিতর্ক করা অপেক্ষা সাধনাকেই অধিকতর কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, এই জন্যই ঐরূপ ভাবের গ্রন্থ নাই—বা তাহার প্রচার নাই—ইহাই হইল, প্রকৃত কথা; পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছি।

বিচার গ্রন্থ না থাকিলেও শাক্তমতের উপদেশ গ্রন্থ প্রচুর আছে। সেই সকল গ্রন্থে বিচার-বীজ নিহিত, দর্শনের প্রস্থান অবস্থিত। ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা বেদান্ত—সকল দর্শনেই শাক্তমতের সমন্বয় আছে। সপ্তশতীর দেবীভাষ্যে সেই সমন্বয় আমি প্রদর্শন করিয়াছি। সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয়েই শাক্তমতের অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠা। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, কঠোপনিষদের 'হংসবতী' ঋক্ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বহু মন্ত্র এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সত্যম্' নামক নিরুক্তি প্রভৃতি বেদে শাক্তমতের মূলতত্ত্ব নিহিত। 'দুর্গা' নামের আংশিক বিবৃতি বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। এ সকল বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থাকারে ও পত্রান্তরে করিয়াছি। সেই সকল বেদাংশ হইতে যে শাক্ত দর্শনের ভিত্তি পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতেছি। স্মৃতিতে আছে,—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ—ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদের পুষ্টিসাধন করিবে। এ সকল বিষয় যাহার জ্ঞান নাই—সেই অল্পজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে বেদ-দেবতা প্রহারের ভয় করিয়া থাকেন।

বেদমন্ত্র বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত। বেদ-গুরু পরম্পরা ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ ভাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অধিকারি-ভেদে বিভিন্নাকারে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সেইরূপ পঠন পাঠনার হ্রাস ও ধারণা শক্তির হ্রাস হইলে ঋষিগণ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা সেই সকল ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। ইতিহাস ও পুরাণ না জানিলে বেদার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না; অস্পষ্টার্থ বা সংক্ষিপ্ত-উপদেশ বেদের অর্থ প্রকাশ ও বিস্তারই প্রকৃত পক্ষে পুষ্টিসাধন—যিনি

তাহা করিতে অক্ষম—তাঁহার নিকট বেদের ভাব পরিস্ফুট হয় না, তিনি বেদের উপদেশ বলিয়া যাহা বলেন, তাহাতে ভ্রম থাকে, বৈদিক কার্য্যে অঙ্গহানি হয়—ইহাই বেদের প্রতি আঘাত।

ইতিহাস ও পুরাণে যেমন বেদের ব্যাখ্যা আছে, সেইরূপ, দর্শনের অঙ্কুরও ইতিহাস পুরাণে দেখা গিয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস বিভিন্ন অধিকারীর জন্য যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ পুরাণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত ভগবদ্গীতা পর্ব্বান্তর্গত দুর্গাস্তোত্র এবং ভগবদ্গীতায় যে শাক্ত মত উপদিষ্ট হইয়াছে—শাক্ত দর্শনের যে অঙ্কুর দেখা গিয়াছে,—সেই ইতিহাসের মর্ম্ম, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতীতে স্পষ্ট বিবৃত। ব্রহ্মসূত্রে তাহার বিচার আছে। সেই শাক্ত দর্শনের মূল কথা অদ্য আলোচনা করিব।

সপ্তশতী বলেন,—

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা।"

তুমি ত্রিগুণা, মোহবশে হরিহর প্রভৃতিও তোমার তত্ত্ব জানিতে অসমর্থ। তুমি সমস্ত জগতের হেতু, অখিল জগৎ তোমার অংশ, তুমি সর্ব্বাশ্রয়া এবং অব্যাকৃতা আদ্যা পরমা প্রকৃতি।

এই মন্ত্রে শক্তিকে 'আদ্যা প্রকৃতি', 'ত্রিগুণা' এবং 'পরমা' বলা হইয়াছে, তাঁহাকে 'জগতের হেতু' 'জগৎ তাঁহার অংশ' তিনি 'সর্ব্বাশ্রয়া' ও 'হরিহর প্রভৃতিরও অবিদিতা'—ইনি কে ?

সাংখ্যের মূল প্রকৃতি কি ? দেখা যাউক,—

অন্যত্র আছে—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত। মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিশক্তি,—সাংখ্যের মূল প্রকৃতি হইলে বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা লাগে বটে। কিন্তু—

পরেই আছে—

'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।'

যিনি চিতিরূপে অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত।

আদ্যা প্রকৃতি ত্রিগুণা, জড়া, তিনি চিৎস্বরূপা নহেন; ইহাই সাংখ্য মত—শক্তি সাংখ্য মতের মূল প্রকৃতি হইলে তিঁনি চিচ্ছক্তি হইতে পারিতেন না।

তবে কি?—অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মই শক্তি; তিনিই আদ্যা প্রকৃতি। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩ ব্রহ্মসূত্র) কিন্তু তিনি ত্রিগুণা নহেন। সগুণ ব্রহ্মরূপে তিনি ত্রিগুণা নামে আখ্যাত হইলেও তিনি হরিহর প্রভৃতির অবিদিত নহেন, হরিহর যে সগুণ ব্রহ্ম; জগৎ ব্রহ্মের অংশও নহে; অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ তাঁহাতে অধ্যাস্ত মাত্র, মিথ্যা জগৎ সত্য ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না।

সপ্তশতীর অন্যত্র লিখিত আছে—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

তিনি জগন্মূর্ত্তি—তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিষ্ণুর তিনি যোগনিদ্রা ও তামসী, ব্রহ্মের মূর্ত্তি জগৎ নহে, নিদ্রা ব্রহ্মস্বরূপ নহে। যদি বল, সগুণ ব্রহ্মের মায়ামূর্ত্তি জগৎ, মায়ার অংশ নিদ্রা, আর চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ, তাহা হইলে 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ' ঐরূপ অবধারণ করা সঙ্গত নহে, যিনি জগন্মূর্ত্তি তাঁহার সেই মায়িক ভাব নশ্বর হইলেও—তাঁহার মায়া বা মায়াময় জগৎ অসত্য হইলেও—'নিত্যৈব' বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ কি সুসঙ্গত? অন্যত্র আছে—

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ"

ইহাতে বুঝা যায়, 'তিনিই মায়া,—' কিন্তু মায়া হইলে 'চিৎ' শক্তি তিনি হন না,—তাহা না হইলে, 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নম্' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রও অসঙ্গত হয়।

প্রাঞ্জল পৌরাণিক ভাষায় সরল মার্গ অবলম্বন করিলে বুঝা যায়, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্ম—এতদুভয়ের সম্মেলনই পরমা আদ্যা প্রকৃতি, কেবল আদ্যা প্রকৃতি নহেন, পরমা আদ্যা প্রকৃতি। প্রকৃতি ও ব্রহ্ম উভয়ই নিত্য—নীরক্ষীরের ন্যায় এ উভয়ের সম্বন্ধ—সম্বন্ধও নিত্য। দু'এ এক। এই মিলনেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ইহাই শাক্তের শক্তি। শাক্ত মতে ইনিই ব্রহ্ম। কেবল—চিৎ বা অদ্বৈতবাদীর আত্মা, শাক্তের "একমেবাদ্বিতীয়ং" নহেন। সম্মিলিত বস্তুই নির্গুণ। সম্মিলিতের বাহিরে যে আর কিছুই নাই। গুণও ইহার অন্তর্নিহিত। সগুণ বলিলে,—গুণ একটা পৃথক, তাহার সহিত যিনি আছেন—তিনি অপর বস্তু বুঝা যায়, সপুত্র পিতা বলিলে—পুত্র এক ব্যক্তি পিতা অপর ব্যক্তি ইহাই বুঝায়। গুণ যদি সেই সম্মিলনের মধ্যেই পড়িয়া যায়

তাহা হইলে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না,—পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে সগুণ বলা যায় না—সুতরাং উহাই প্রকৃত নির্গুণ। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম নির্গুণ হইতে পারেন না, কেন না, সেই ব্রহ্মই সগুণ রূপে জীব এবং ঈশ্বর; যাঁহাকে সগুণ বলিয়া অভিহিত করিতেছ তাঁহাকে নির্গুণ বলা অনুচিত। আরোপিত গুণে সগুণ এবং বাস্তবভাবে নির্গুণ ইহা বলিলে আরোপের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। সেই কারণ অনাদি অবিদ্যা বা মায়া। অথচ ইহার নাশ আছে। অনাদি ভাব পদার্থের নাশ—কোন আচার্য্যের নূতন কল্পনা। এমন নূতন কল্পনা না করিয়া প্রকৃতি ও আত্মার সম্মেলন বা পরস্পর সম্বন্ধ বশে একীভূত উভয়ের প্রকৃত্যংশে পরিণাম ও আত্মাংশে অপরিণাম—এইরূপ নিশ্চয় করা কি অধিকতর শাস্ত্রসঙ্গত নহে? এইরূপ ব্রহ্ম ভাবই—"হেতুঃ সমস্ত জগতাং" ইত্যাদি সপ্তশতী মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার অংশ, অথচ তিনি অব্যাকৃতা প্রকৃতি। দু'এর মিলনে ঐক্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—বাহ্যজগতে সজল দুগ্ধ প্রভৃতিতে আছে। শ্রুতিতে এই উভয় মিলনের কথা স্পষ্ট আছে—

'যৎসৎ তদমৃতনাম যৎতি তন্মর্ত্ত্যমথবদ্যং তেনোভে যচ্ছতি (ছান্দোগ্য ৮ম প্রঃ) অমৃত অপরিণামী নিত্য, মর্ত্ত্য পরিণামী, এতদুভয়ের সম্মেলনই 'সত্যম্'—'ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি' (ছান্দোগ্য ৮ম প্রঃ) এই সম্মেলনই যে ব্রহ্ম ইহা ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এবং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই দুইটী শ্রুতির একবাক্যতাদ্বারাও নির্ণীত। 'সদেব' ইহার দ্বারা 'ন অসৎ' এবং 'অসদ্ বৈ'—অসদেব দ্বারা 'ন সৎ' হইয়াছে। 'যিনি অসৎ নহেন, এবং সৎ নহেন তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন', দুইটী শ্রুতির সম্মিলিত অর্থে বা একবাক্যতায় এইরূপ ভাব হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাতে ইহাই বিবৃত হইয়াছে—"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম—ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" (১৩শ অঃ) সৎ অপরিণামী, অসৎ পরিণামী, আত্মা অপরিণামী নির্ব্বিকার, প্রকৃতি পরিণামী সবিকার। সম্মিলিত উভয়কে পরিণামীও বলা যায় না অপরিণামীও বলা যায় না; উভয়ের পরিণাম বা বিকার হয় না, উভয়েই যে বিকারশূন্য তাহাও নহেন—মনে কর, রাম নামে দুই বন্ধু—একজন পাদচারণ করিতেছেন এবং একজন উপবেশন করিয়া আছেন—এ ক্ষেত্রে উভয়ে পাদচারণ করিতেছেন এ কথা বলা যায় না, উভয়ে উপবেশন করিয়া আছেন ইহাও বলা যায় না। পরন্তু সেই সৎ-অসৎ উভয়ের নিত্য সম্মিলনেই ঐক্য। ইহাই ব্রহ্ম, জগতের যে পরিচ্ছিন্ন ভাব খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ—'অহং' 'অহং' করিয়া জীবের যে ক্ষুদ্র

সঙ্কীর্ণ জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাতৃভাবে পূর্ণ দেখিলে, অহং জ্ঞান তাহাতে নিমগ্ন হইলে খণ্ড গ্রহণ বা সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বিনষ্ট হয়। সেই অবস্থাই মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ। ইহা জীবন্মুক্তি। দেহপাতে পরম মুক্তি—"ইহৈব সমবলীয়ন্তে"। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতা পর্ব্বে যে শক্তিতত্ত্ব অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দুর্গা স্তব করিতে উপদেশ করেন, অর্জ্জুন সে তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাই বিবৃত করেন। তাহা সেই সদসতের নিত্য সম্মিলন—আত্মা শক্তি; সেই শক্তি ব্রহ্ম, শাক্তের পরম উপাস্য। সেই শক্তির—পূর্ণ, অর্দ্ধ, পাদ, অংশ, কলা ইত্যাদি বিকাশাবস্থাও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাস্য। সে উপাসনা তত্ত্ব বিবৃতির স্থান ইহা নহে। কেবল শাক্ত দর্শনের স্বরূপাদ্বৈতবাদ তত্ত্ব এস্থানে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

হিন্দুদিগের অর্থসাধন।

[লেখক—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ।]

বর্ত্তমান যুগ অর্থসাধনেরই যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কিরূপে অর্থাগম হইতে পারে? কিরূপে অর্থ বৃদ্ধি হইতে পারে? ইহাই বর্ত্তমানে একমাত্র জপ, একমাত্র তপঃ হইয়াছে। অর্থই একমাত্র পরমার্থ জ্ঞানে সকলে অর্থেরই সেবা করিতেছে; অর্থই সকলের পরমারাধ্য দেবতা হইয়াছে; অর্থের কাছে অন্য কোন দেবতারই পূজা লাগে না। অর্থের প্রসঙ্গ লাভ করিয়া কাহারও কিন্তু তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতেছে না; প্রত্যুত, অর্থ-পিপাসা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে অর্থের মহারাজসূয়যজ্ঞ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য গ্রাস করিয়াও এই যজ্ঞ শেষ হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের মহা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীর অভাব পূরণ না হইয়া বরঞ্চ নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টিই হইতেছে। অর্থ সমাগমের দ্বারা পৃথিবীর প্রকৃত সুখ শান্তি যতদূর না বাড়িয়াছে—বিলাস ব্যসন, উদ্বেগ উপদ্রব, তদপেক্ষা অনেক অধিক বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য অর্থসাধন প্রণালীতে সমগ্র পৃথিবী দোহন করিয়া মানবজাতির অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি সাধিত হইলেও, সাধকগণ কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ

করিতে পারিতেছেন না। পাশ্চাত্য কবিবর গোল্ডস্মিথ্, পাশ্চাত্য সাধকদিগের এই অতৃপ্তি অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"But the long pomp, the midnight masquerade,
With all the freaks of wanton wealth arrayed—
In these, ere the trifles half their wish obtain,
The toiling pleasure sickens into pain ;
And e'en while fashion's brightest arts decoy,
The heart distrusting asks if this be joy."

Deserted Village.

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বাহ্য আড়ম্বর ও অসার আমোদ-প্রমোদই পাশ্চাত্য অর্থসাধনের আয়ত্ত; বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ ইহার আয়ত্ত নহে। ইহাতে পাশ্চাত্য অর্থসাধন-প্রণালী যে অর্থসাধনের প্রকৃষ্ট প্রণালী নহে, তাহারই প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই। আমাদিগের হিন্দুদের প্রাচীন অর্থসাধন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিলে পাশ্চাত্য নব্য অর্থসাধন-প্রণালীর কোথায় দোষ রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইব। আমাদিগের সমস্ত বিষয়-সাধনই শাস্ত্রে "ত্রিবর্গ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই 'ত্রিবর্গে'র অন্তর্গত—"ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থৈঃ॥" ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিতয়ের একটী মিলন কল্পনার বিশেষ অর্থই আছে। ইহার অর্থ এই, সংসারীর পক্ষে এই ত্রিতয়ের সাধনই এক সঙ্গে আবশ্যক হয়। কিন্তু ধর্ম্মকে মূলে রাখিয়াই অন্য দুইটীর সাধন করিতে হইবে। তাহাতেই ধর্ম্ম ত্রিবর্গের প্রথমেই স্থান পাইয়াছে। রঘুবংশে দিলীপের ত্রিবর্গ সাধনের বর্ণনায় আমরা ইহা বিশেষ-রূপেই স্ফুটীকৃত দেখিতে পাই, যথা—

" অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্মএব মনীষিণঃ ॥"

পুরাণে ত্রিবর্গ সাধনের যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে ধর্ম্মার্থ কামের পরস্পর সাপেক্ষত্ব যেমন বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—অর্থ-সাধনের ধর্ম্মমূলকত্ব ও অর্থের যথোচিত ব্যবহার আরও বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা :—

"ত্রিবর্গ সাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎ সংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ॥
পাদেনাপ্যস্য পারত্র্যং কুর্য্যাচ্ছ্রেয়ঃ স্বমাত্মবান্।
অর্দ্ধেনচাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকানিচ॥

পাদেনৈব তথাপ্যস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতো বিপ্রা অর্থসাফল্যমৃচ্ছতি॥
তদ্বৎপাপ নিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যোবিপশ্চিতা।
পরত্রার্থস্তথেবাস্তঃ কার্য্যোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কামস্তথাস্তশ্চাবিরোধনান্।
দ্বিধাকামোঽপি রচিতস্ত্রি বর্গায়া বিরোধকৃৎ॥
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ বুধ্যধ্বং তান্ দ্বিজোত্তমাঃ॥
ধর্ম্মোধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মোনাত্মার্থপীড়কঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধাকামং তেনতৌচদ্বিধা পুনঃ॥"

ব্রহ্মপুরাণ—১২১ ম অধ্যায়।

"গৃহস্থ ব্যক্তি ত্রিবর্গসাধনে যত্নপরায়ণ হইবে; উহা সিদ্ধ হইলেই গৃহস্থের ইহকালে ও পরকালে সিদ্ধিলাভ হয়। উপার্জ্জিত অর্থের চতুর্থ ভাগ দ্বারা স্বীয় পারলৌকিক হিত-সাধন কর্ত্তব্য। অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্যনৈমিত্তিক সমাধান বিধেয়। আর যে চতুর্থাংশ থাকিবে তাহাকে মূলধন রূপে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিবে। হে বিপ্রগণ! এই প্রকারে ব্যবহার করিলেই অর্থের সফলতা হয়। এইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পাপ নিবারণার্থ ধর্ম্মাচরণও করিবেন। উহা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখসাধনরূপেই অনুষ্ঠেয়। বিপদের ভয়ে কাম এবং অর্থও, ধর্ম্মের অবিরোধে উপার্জ্জন করিবে। ত্রিবর্গের অবিরোধে সেই কামও ঐহিক পারত্রিক এই দ্বিবিধ রূপেই অর্জ্জনীয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইহারা সকলেই পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পীড়ক নহে, পরন্তু উহাদের সাধক; অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম এতদুভয়ের সাধক, এবং কামও ধর্ম্মার্থ সম্পাদক।"

এখানে আমরা প্রথমেই উপার্জ্জনের এক চতুর্থাংশ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ব্যয়িত হওয়ার উল্লেখ প্রাপ্ত হইতেছি। অর্থের কেবল ব্যয়ই ধর্ম্মার্থক বলিয়া নির্দ্দেশিত হয় নাই; উপার্জ্জনও ধর্ম্মের অবিরোধী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এইরূপে আয় ও ব্যয় উভয়ের মূলেই ধর্ম্মই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ব্যয়ের যেরূপ প্রকার ও অনুপাত নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ইহাতে যেরূপ সদ্বিবেচনা, সংযম ও মিতাচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা এমন কি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদেরও অসম্মত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

হিন্দুদিগের প্রাগুক্ত অর্থসাধনের পর্য্যালোচনা হইতে পাশ্চাত্য অর্থসাধন প্রণালীর গলদ্ যে কোথায় তাহা আমরা পরিষ্কারই ধরিতে পারি। হিন্দুদিগের অর্থসাধনে মূলে যে ধর্ম্মের যোগ আমরা দেখিতে পাইয়াছি—পাশ্চাত্য অর্থ-সাধনে সেই ধর্ম্মের সহিত যোগ ছিন্ন হওয়াতেই যত উচ্ছৃঙ্খলতার উৎপত্তি

হইয়াছে। পাশ্চাত্য অর্থসাধনে ধর্ম্মের সেই যোগ সঙ্ঘটিত হইলে পৃথিবী হইতে দুঃখদৈন্য অন্তর্হিত হইয়া পৃথিবী অপূর্ব্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির রাজ্যে পরিণত হইবে।

অর্থসাধনের এই পবিত্র শাস্ত্রপ্রভাবে আমাদের ঐহিক পরমশ্রেয়ঃ যেরূপ সাধিত হইবে, পারত্রিক পরমশ্রেয়ঃও তুল্যরূপেই সাধিত হইবে।

পাগ্‌লা মাষ্টার।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

প্রভাতে উঠিয়া "ঢক্কা-নিনাদ" সংবাদপত্রে পড়িলাম—

"ট্রেণে দস্যুতা।—গত কল্য বেঙ্গল নাগপুর রেলের বোম্বাই মেল প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বে হাওড়ায় পৌঁছিয়াছে। আমাদের 'বিশেষ সংবাদদাতা' বিলম্বের কারণ জানিতে গিয়া যে লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ অবগত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে মনে হয়, রেল-লাইনের অরাজকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সকল ভীষণ দস্যুতার কবে শেষ হইবে? ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য তিমির-গর্ভে দৃষ্টি না চলিলে সে কথার উত্তর দেওয়া যায় না।"

আমি গৌর-চন্দ্রিকা শুনাইয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে চাহি না। তবে এই প্রকার "ভীষণ দস্যুতা" প্রভৃতি ঘটনার বাস্তবিক শেষ হইলে, ঢক্কা-নিনাদ-প্রমুখ সংবাদপত্র পরিচালকদের যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, সে দুঃখের ছায়াটুকু আমার মনে সে সময় পড়িয়াছিল। তাহার পর 'বিশেষ সংবাদদাতা' মহাশয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্বায়ত্ত-শাসন ও হোম-রুলের পূর্ণ অধিকার না পাইলে ভারতবাসীর নিস্তার নাই। যত দিন শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব থাকিবে, তত দিন ট্রেণে চুরি হইবেই। আমি আপাততঃ সে উৎকট যুক্তি-তর্কের কবল হইতেও আপনাদিগকে রক্ষা করিলাম। শেষে অকর্ম্মণ্য পুলিসের কর্ত্তব্যহীনতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক সরস মন্তব্য প্রকাশ করিয়া "ঢক্কা-নিনাদ" লিখিয়াছিল—

"চুঁচুড়ার ধনবান পোদ্দার শ্রীযুত দিগ্বিজয় পাইন আরও পাঁচ সাত জন স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অর্থ লইয়া বোম্বাই সহরে সুবর্ণ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন।

সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন—শ্রীযুক্ত মনুলাল বড়াল। ইহাঁরা ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে বোম্বাই গিয়াছিলেন—চল্লিশ হাজার টাকার স্বর্ণ ক্রয় করিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলে ফিরিতেছিলেন। প্রায় রাত্রি বারোটার পর বামড়া হইতে গাড়ি ছাড়িবার সময়ও তাঁহারা উভয়ে জাগ্রত ছিলেন। ইঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ছিলেন—সহযাত্রী ছিলেন অপর একজন। ইনি উঠিয়াছিলেন পেণ্ড্রায়।

"সহযাত্রী যখন গাড়িতে উঠিয়াছিলেন, তখন ব্যবসায়িগণ তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর ফিরিঙ্গি বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন—পরে কিন্তু প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি কলিকাতার বিখ্যাত প্রফেসার—মিঃ প্রফুল্ল সেন।"

প্রফেসার সেন! পড়িয়াই আমি বিস্মিত হইলাম। প্রফুল্ল নাকি! প্রফুল্ল পূজার ছুটিতে সপরিবারে ঘাটশিলায় বাস করিতেছিল—সম্ভবতঃ সে কি একটা উৎকট খামখেয়ালী বাসনায় প্রবৃদ্ধ হইয়া পেণ্ড্রায় গিয়াছিল। তাহার সম্মুখে দস্যুতা! খুব হাসির কথা! সে আমাকে চিরদিন উপহাস করিত, বলিত—পুলিস বিভাগে কোথাও একটু বুদ্ধি থাকিলে দেশের পাপ অর্দ্ধেক কমিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমস্ত খুনী মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহার এক একটা থিওরি ছিল। এবারে একেবারে তাহার চক্ষের উপর চুরি হইয়াছে—দেখি, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, মিঃ প্রফুল্ল সেন এই "ভীষণ দস্যুতা" সম্বন্ধে কি বলেন।

"পোদ্দার মহাশয়গণের এজেহার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বোম্বাই মেল পুসিটা ও গোয়েলকাড়ার মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ পার হইবার পরেই দস্যুতা হইয়াছিল। এই পার্ব্বত্যময় প্রদেশটি ভীষণ অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। পথের তিন দিকে শৈল—উপত্যকার মধ্যে রেল-বর্ত্ম। যেখানে তিনটি পাহাড় একত্র মিলিয়াছে ঠিক সেইস্থলে সম্মুখের গিরি ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ। দস্যুতা ঠিক সুড়ঙ্গের ভিতর হইয়াছিল কি সুড়ঙ্গের বাহিরে হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু দস্যুতার অব্যবহিত পরেই প্রফেসার সেন এলারাম সিগ্‌নাল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়াছিলেন। ট্রেণ সুড়ঙ্গের মুখ হইতে প্রায় একশত ফুট বাহিরে থামিয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, দস্যু টানেলের ভিতরকার সূচীভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে কার্য্য সমাধা করিয়াছে। গাড়ীর তাড়িত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়াই সেই প্রকোষ্ঠের আরোহীগণ নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন। হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং দিগ্বিজয় পোদ্দার অনুভব করিলেন যে, কে তাঁহার পা ধরিয়া টানিতেছে।"

বুঝিলাম, তাহা হইলে তাড়িতালোকেই চুরি হইয়াছে। সংবাদ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতার টানেলের সূচিভেদ্য অন্ধকারের গবেষণাটুকু ব্যর্থ হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কথাটুকু বলিতেছি, ঐ শ্রেণীর জীবের পুলিসের উপর তীব্র মন্তব্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্দেশ করাইবার জন্য। যাঁহারা এই বিদ্যা বুদ্ধির মূলধন লইয়া মসীজীবি, তাঁহাদেরই যত প্রকোপ গরীব বেচারা পুলিসের উপর— যাক্ সে কথা।

"বলা বাহুল্য, শ্রীযুত দিগ্বিজয় বিস্মিত হইয়া বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল। আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া তাহার হৃদ্‌কম্প হইল। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক সশস্ত্র কাফ্রি। রক্তবর্ণ চক্ষু, হস্তে পিস্তল। সে মাত্র একটি কথা বলিয়াছিল—'দো'। শ্যামা পূজার রাত্রে হাঁড়ি চাপা দিয়া একদমা পটকা পুড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই 'দো' শব্দ সেইরূপ গভীর—গম্ভীর। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত দিগ্বিজয় সেই আট খানি বহুমূল্য সুবর্ণ ইষ্টকে বস্ত্র জড়াইয়া একটি উপাধান নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই বালিসে মাথা দিয়া তিনি নিদ্রিত ছিলেন। সেই ভীম-স্বরে ভীত হইয়া সাহস পাইবার জন্য তিনি বাঙ্কের নীচে চাহিয়া দেখেন, বসুদাম পোদ্দারও সন্ত্রস্ত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতেছেন। তখন লোকটা আর একবার "দো" বলিল। তাহাতে অধ্যাপকের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি দাঁড়াইয়া উঠেন এবং 'কোন্ হায়', বলিয়া চীৎকার করেন। তাহাতে দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়।"

এবার আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বর্ণনাটা পড়িলাম।

"কথায় বলে, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' গুলিটা প্রফেসারের গায়ে লাগে নাই। তিনি কিন্তু অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন দুর্ব্বৃত্ত কাফ্রি-কুল-গ্লানি তস্করপ্রবর গম্ভীর ভাবে গিয়া পোদ্দারের সুবর্ণ গর্ভ উপাদানটি তুলিয়া লইল। ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে পারে নাই, বর্ব্বরের অবৈধ কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই। বেশ দৃঢ় পাদবিক্ষেপে তস্কর প্রকোষ্ঠের দ্বারের নিকট গিয়া প্রথমে আলোক নির্ব্বাপিত করিল, তাহার পর ধীর ভাবে দরজা খুলিল। দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দ অবধি উঁহারা শুনিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত বাহিরে গিয়া বোধ হয় গতিশীল ট্রেণ হইতে লম্ফ দিয়া নামিয়া পড়িয়াছিল।

"লোকটা প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেলে আরোহীদের আশঙ্কা তিরোহিত হইল। অধ্যাপক মহাশয় আপনার শয্যায় বসিয়া সাহসে ভর করিয়া

গাড়ী থামাইবার শিকল ধরিয়া টানিয়া দিয়াছিলেন। গাড়ী থামিলে তবে তাঁহারা ভরসা করিয়া উঠিয়া আলো জালিতে সক্ষম হন।

"গাড়ীর কণ্ডাক্টার, গার্ড, ড্রাইভার, ইংরাজ আরোহী প্রভৃতি আসিয়া নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিলেন বটে, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক সমাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। এস্থলে গাড়ী কাটিঙ্গের ভিতর দিয়া যায়, দুই পার্শ্বের লম্বমান কোন একটি বৃক্ষশাখা ধরিয়া দুর্ব্বৃত্ত বেগবান গাড়ী হইতে পলাইয়াছে, অধ্যাপক সেন প্রভৃতির এইরূপ ধারণা।

"আমরা এই বর্ণনা শুনিয়া যুগপৎ স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কতদিন এই প্রকারে নিরীহ ভারতবাসী রেলযাত্রী দস্যু তস্করের নির্য্যাতন ভোগ করিবে"— ইত্যাদি। শেষে আর একবার পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা ও হোমরুলের উপকারিতা সম্বন্ধে হুঙ্কার ছাড়িয়া ঢক্কা-নিনাদ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছে।

কিন্তু সেই ঢাকের বাদ্য শেষ হইতে না হইতেই তারে সংবাদ আসিল যে, আমাকে স্বয়ং এই তদন্ত করিতে হইবে।

(২)

ঘাটশিলার সুবর্ণরেখা নদীর মাঝখানে একখানা কচ্ছপের মত পাথরের উপর পাগলা প্রফেসার বসিয়াছিল। পাথরে একখানা ডিঙ্গি বাঁধা। সুবর্ণ-রেখা সেই বড় পাথরখানার তলায় গর্জ্জন করিতে করিতে একটানা বহিয়া যাইতেছিল। নৌকার দড়িতে যে বিধিমতে টান পড়িতেছিল, ডিঙ্গির নাচন-কোঁদন দেখিয়া তাহা বেশ বোধগম্য হইতেছিল।

আমাকে দেখিয়া প্রফেসার মহাসমারোহে 'হ্যালো, হ্যালো' করিয়া পাথরের উপর দাঁড়াইয়া উঠিল। আমি তাহাকে তীরে ডাকিলাম, সে নৌকা খুলিয়া চলিয়া আসিল।

নদীর পাড় বহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তাহাকে বলিলাম—কৈ, এত যে সমালোচনা কর, চোখের উপর এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, চোর ধরতে পারলে না। পিস্তলের গুলি বড়—

সে বলিল—বাঃ! ইচ্ছা করলে ধরতে পারতাম না?

আমি হাসিয়া বলিলাম—কেন ইচ্ছাটা হ'ল না? আর খবরের কাগজের কথাটা যদি সত্য হয়—

সে আমাকে বাধা দিয়া বলিল—হ্যাঁ, কথাটা সত্য। একবার ইচ্ছা হ'য়েছিল, সেটা অসময়ের ইচ্ছা—অকালপক্ব ইচ্ছা।

আমি বলিলাম—ডাঁশা বা গাছপাকা ইচ্ছার সময় কোনটা?

সে বলিল—একটা সুবিধার সময় ছিল, যে সময়টা বালিস বগলে করে লোকটা আলো নিভিয়ে দিলে। ঠিক্ সেই সময়, সাহস ক'রে ছুটে, তাকে জড়িয়ে ধরতে পারলে, তার হাতের পিস্তল হাতে থেকে যেত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে অমন সুবিধা পরিত্যাগ করিল কেন? বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই বলিয়া।

অধ্যাপক একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—সাহসের কথা নয়। কারণ লোকটার নরহত্যা করবার ইচ্ছা মোটে ছিল না। সে আমার দিকে যে গুলিটা ছুঁড়েছিল, সেটা ইচ্ছা ক'রে জানালার বাহিরে টিপ্ করেছিল।

আমি বলিলাম—তবে ধরলে না কেন?

সে বলিল—কারণটা খুব সোজা। যাদের টাকা গেল, তারা কিছু করলে না। আর আমার চেয়ে সুবিধা ছিল বসুদাম বাবুর। তাঁর পক্ষেই উচিত ছিল—

আমি বলিলাম—যাক, বোঝা গেছে। আর সুবিধা কখন ছিল?

সে বলিল—যখন আমি দড়ি টেনে গাড়ী থামালাম। লোকটা বসুদামের দিক দিয়ে নেমেছিল। সে যদি সে সময় একবার জানালা দিয়ে তাকাত, তা' হলেই বুঝতে পারত লোকটা কোন্ গাড়িতে উঠ্‌ল।

আমি বলিলাম—সে কি? দড়ি টান্‌বার আগেই তো সে পালিয়েছিল।

সে বলিল—পাগল হয়েছ? এমন কে বাহাদুর আছে যে, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুট্‌ছে এমন ট্রেণ থেকে নেমে পড়ে?

আমি বলিলাম—কেন, নামবে কেন? সাহসে ভর করে কেবল একটা গাছের ডাল ধরলেই হ'ল। গাড়ির বেগে সে আপনিই গাছের ডালে ঝুলে থাক্‌বে।

সে বলিল—আর সোণার ইটগুলা?

আমি বলিলাম—ফেলে দেবে। তার পর কুড়িয়ে নেবে।

এ কথায় সে হাসিল। ঘন অন্ধকারের ভিতর প্রথমতঃ ঠিক্ বৃক্ষশাখা দেখিতে পাওয়া, তাহার পর তাহার দেহের ভর সহিতে পারিবে এমন উপযুক্ত বৃক্ষশাখা নির্ব্বাচন করা খুব সোজা কথা নয়। ও থিওরিটা স্থূলবুদ্ধি ফিরিঙ্গী গার্ড কল্পনা করিয়াছিল। আমার মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ও সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা অসমীচীন হইয়াছে—বিশেষ যখন আমি গ্রাজুয়েট ও বুদ্ধিমান—

ইত্যাদি। তবে পুলিসে কার্য্যে ধর-পাকড়ের আসুরী শক্তি পাইলে বুদ্ধি-শক্তি লোপ পায় বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি। যেরূপ গম্ভীরভাবে ন্যায়-শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক বন্ধু কথাগুলা বলিল, তাহাতে তাহার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত হইলাম না। সে পাগল, তাহার সহিত তর্ক করা বৃথা। উপসংহারে সে বলিল—'লোকটা নামবার আগে আলো নিভিয়েছিল মনে আছে? কেন? যদি সে অত বড় একটা জিমনাষ্টিক করিবার ক্ষমতা রাখত তা' হ'লে সেটা দেখাবার লোভ সে ছাড়তে পারত না। বিশেষ গাড়ির কামরায় আলো থাকলে তার ডাল ধরবার সুবিধা হ'ত। বিশেষ যখন তাকে কেহ তাড়া করেনি, তখন সে অমন অসম-সাহসিক কাজ করে নিজের স্ত্রীর বৈধব্যের সম্ভাবনা ডেকে আনবে কেন?

কথা কহিতে কহিতে আমরা তাহার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন রাঙা রবি পাহাড়ের পিছনে ডুবিয়াছিলেন, পশ্চিম গগনে পাহাড়ের মাথার উপর ছিল খুব খানিকটা টক্‌টকে লাল রঙ্‌। বন্ধু আমাকে বাহিরে একখানা আরাম-কেদারায় বসাইয়া বাড়ির মধ্যে নিজে চা আনিতে গেল। আমি তাহার কথাটা লইয়া মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক থিওরিটা সম্ভবপর। লোকটা আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া গাড়ির বাহিরে অপেক্ষা করিল—বেশ কথা। তাহার পর গাড়ি থামিলে ধীরে ধীরে নামিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়া গেল।

নানা প্রকার আহার্য্য লইয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম—আচ্ছা, যে জায়গায় চুরি হ'য়েছিল, সে স্থল থেকে কতক্ষণ ছুটে তবে গাড়ি দাঁড়ায়?

সে বলিল—অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক।

আমি বলিলাম—তবে।

সে বলিল—আবার পুলিসের বুদ্ধি! তবে কেন? লোকটা কত ঠাণ্ডা মাথায় কাজ হাসিল করছে দেখছ না? সে এটুকু ঠিক্ বুঝেছিল যে, আমাদের মধ্যে কেহ না কেহ গাড়ির দড়ি টানবে। পাছে চুরির আগে টেনে ফেলি—তাই সে গুলি ছুঁড়েছিল। পাছে না টানি তাই সে বাহিরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আর নেহাত যদি আমরা না টানতাম, সে নিজে দড়ি টেনে গাড়ি থামাত।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা হ'লে কাক্রিটা তোমার মত ন্যায়-শাস্ত্র পড়েছিল।

সে বিস্ময়ে বলিল—কে, কাফ্রি?

আমি বলিলাম—কেন, চোরটা!

সে বলিল—হরি! হরি! অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে থাকবে ব'লে বেচারা একটা ছদ্মবেশও পরবে না? আর অত বড় চুরিটা করলে কি মুখখানা দেখাবার জন্যে? বলি, এত তো মোকদ্দমা কর—পুলিস কোর্টের এত মামলার বিবরণ পড়—কাফ্রিতে মারপিট্ করেছে বা হৈাংকামি, গুণ্ডামি করে কেড়ে-বিগড়ে নিয়েছে, এ ছাড়া অন্য কথা কি শুনেছ?

আমি এবার দোষ স্বীকার করিলাম। তবু নিজের কথা বজায় রাখিবার জন্য একবার বলিলাম—কেন, কলকাতার ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কাফ্রিগুলা। যারা ইংরাজি কথা কয়—ফিরিঙ্গি মেম বিবাহ করে—

সে বলিল—তাদের জনসংখ্যা খুব কম। আর তাদের মধ্যে এমন সংযমী পুরুষ কেহ নাই যে, গুলি মারবার অমন প্রশস্ত সময়টা পেয়ে আমার মাথা বাঁচিয়ে অনিশ্চিত অন্ধকারের উপর গুলি মারে। আর ও সম্বন্ধে তার চেয়েও একটা বড় যুক্তি আছে—চাক্ষুস প্রমাণ।

আমি বলিলাম—যথা!

সে বলিল—গাড়ি থামিবার পর গার্ডের সঙ্গে আমরা সমস্ত গাড়ি খুঁজে-ছিলাম। গাড়িতে কোনও কাফ্রি ছিল না।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কেন গাড়িতে থাকিবে কেন?

প্রফেসার বলিল—এস এস, তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। আমি তোমাকে সুরেশ মিস্ত্রিরের বাঙ্‌লাটা ভাল করে দেখাই। চাল্লিশ টাকায় বাড়িখানা সস্তা পাই নি?

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্ব স্মৃতি।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "সংস্কৃত শাস্ত্রের যথোচিত অনুশীলন দিন দিন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। কোনও শাস্ত্রেরই আর পূর্ব্বের ন্যায় আলোচনা দেখিতে

পাই না। এখন অনেকেই না পড়িয়া পণ্ডিত। যে শাস্ত্র যে নিজে বুঝে না, সেই শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হয়। যে গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন, অল্প বয়সেই বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিলেন,—পাঠাবস্থা হইতেই যাঁহার প্রতিভার অসাধারণ্য লোকসমাজে প্রকটিত ছিল, তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিন বৎসরকাল নিপুণভাবে পঠিত গ্রন্থের আলোচনা করিবার পর অধ্যাপনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। এখন গুরু-শুশ্রূষাপূর্ব্বক তেমন অধ্যয়নের রীতি নাই, চিন্তার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রকৃত পাণ্ডিত্য একরূপ নির্ব্বাসিত হইতেই চলিল। আমি ভাটপাড়াতেই ৺যদুরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট পড়িতাম; সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অধ্যাপক, ঋষিকল্প ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি তখন অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীতে গিয়া শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার নিকটে ন্যায়শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় রহস্য শ্রবণ করিতাম। তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে যে সকল শাস্ত্রীয় বিষয় উপদেশ করিব, তুমি যদি চিন্তা করিয়া নিজে ইহার কোনও দোষ আবিষ্কার করিতে পার, তাহা হইলে বড় সন্তুষ্ট হইব।' আমি তখন নির্ভীক ভাবে সোৎসাহে তাঁহার উপদিষ্ট বিষয়ে দোষ দেখাইবার চেষ্টা করিতাম। অনেক সময়ে তাঁহার সহিত আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার হইত। সেই অবধি চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট আমি ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তার অভ্যাস শিখিলাম। চিন্তা না করিলে অধ্যয়নই ব্যর্থ।—"পাঠো বৃথা চিন্তন মন্তরেণ।" এই জন্যই রঘুনাথ শিরোমণি, অনুমানখণ্ডের 'দীধিতি'র প্রথমে লিখিয়াছেন,—"অধ্যয়ন ভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় নিখিলতন্ত্রাণাম্।" ভাবনা ব্যতীত শাস্ত্রের সার-নির্ণয় কোনও রূপেই হইতে পারে না। নব্যন্যায়ের আবিষ্কর্ত্তা গঙ্গেশোপাধ্যায়ও "তত্ত্বচিন্তামণি"র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতং চিন্তাদিব্য বিলোচনেন চ তয়োঃ সারং বিলোক্যাখিলম্।" কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র অধ্যাপক উভয় সম্প্রদায় হইতেই চিন্তার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ছাত্রেরাও এখন পড়িবার সময়ে কোনও শঙ্কার উত্থাপন করে না, অধ্যাপকেরাও পংক্তি লাগাইতে পারিলেই কৃতার্থ। নব্যন্যায়ের প্রত্যেক কথায় যে গভীর রহস্য নিহিত আছে, তাহা আর কাহারও চোখে পড়ে না। চিন্তার অভাবই যে এই অবনতির মূল, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রেরও অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে। আর

কি, কাশীনাথ, ভবশঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় স্মার্ত্তের উদ্ভব হইতেছে? ব্যাকরণ, বা সাহিত্য অলঙ্কারেরও ত ঘোর দুর্দ্দশা! আর কি, তারানাথ তর্কবাচস্পতির ন্যায় বৈয়াকরণ বা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ন্যায় আলঙ্কারিক দেখিতে পাওয়া যায়? সে কালে শাস্ত্র-চিন্তার কিরূপ উৎকর্ষ ছিল,—তাহার একটা উদাহরণ দেখাইব। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, লোকের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার জন্য একটা অশুদ্ধ পুঁথি রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোনও পণ্ডিত দেখা করিতে আসিলে তাহাকে সেই পুঁথি ব্যাখ্যা করিতে দিতেন। পুঁথির গ্রন্থসন্দর্ভ যে পরস্পর অসংলগ্ন, তাহা প্রথমতঃ দেখিলে বুঝা যাইত না। যাহারা তেমন ব্যুৎপন্ন নহে, তাহারা ধাঁধায় পড়িয়া কোনও রূপেই পুঁথি লাগাইতে পারিত না। প্রকৃত পণ্ডিতেরা কিছুক্ষণ দেখিয়াই বলিত পুঁথিটা অশুদ্ধ। কাশীর সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক প্রধান নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ, চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, 'দেখ, আমার কাছে এই পুঁথিটা আছে, তুমি ইহার ব্যাখ্যা করিতে পার?' চন্দ্রনারায়ণ পুঁথি চাহিয়া লইয়া তাহা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। জগন্নাথ, কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের পর স্নানাহ্নিক সারিয়া তিনি আসিয়া দেখেন, চন্দ্রনারায়ণ সেই ভাবে তন্ময় হইয়া পুঁথি লইয়া চিন্তা করিতেছেন। চন্দ্রনারায়ণের উপর জগন্নাথের অশ্রদ্ধা হইল। তিনি চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, 'এখন পুঁথি রাখিয়া স্নান করিতে যাও। একটা অশুদ্ধ পুঁথি লইয়া সেই প্রাতঃকাল হইতে এতক্ষণ বসিয়া আছ!' চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, 'পুঁথি অশুদ্ধ হইবে কেন?—আমি সমস্তই লাগাইয়াছি, আর এই কয়েক পংক্তি মাত্র বাকী আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি সমস্ত পুঁথিরই ব্যাখ্যা করিব।' কিছুকাল পরেই চন্দ্রনারায়ণ পুঁথির ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'দেখুন, পুঁথির এই অংশ মীমাংসক তুতাতভট্টের মতানুসারে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী এই বিচারটা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে অসংলগ্ন হয় বটে, কিন্তু উদয়নাচার্য্যের মত অবলম্বন করিলে ইহার এই ভাবে সঙ্গতি হইতে পারে। আর এই অংশটা ত অনায়াসেই সার্ব্বভৌমের মতে পরিষ্কার করা যায়।' এই ভাবে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, সমস্ত পুঁথিটার ভাব বর্ণন করিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত নির্ব্বাক্। তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বকই পুঁথিটা অসংলগ্ন ভাবে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রনারায়ণের গভীর চিন্তাশীলতা দেখিয়া তিনি

বিস্মিত হইলেন। জগন্নাথ তখন পুঁথি-সংক্রান্ত সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, 'তোমার যে পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহার শত গুণ পরিচয় পাইলাম।'

"জানি না, কাহার অভিশাপে বাঙ্গালায় সেই পাণ্ডিত্য, সেই চিন্তাশীলতা বিলুপ্ত হইতে চলিল।"

পূজ্যপাদ গুরুদেব মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ও স্বীয় অসাধারণ চিন্তাশীলতার প্রভাবে অশুদ্ধকেও শুদ্ধ করিতে পারিতেন। ন্যায় মহাশয়ের ছাত্র, জয়পুর সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়িক, ৺কালীকুমার তর্কতীর্থ, যখন ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দেন, তখন তিনি একটা প্রশ্নের অশুদ্ধ উত্তর লিখিয়া আসিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাহা শুনিয়া বলিলেন, 'কালীকুমার, তুমি ত ভুল লিখিয়াছ, কিন্তু ইহাকেই আমি শুদ্ধ করিব।' তিনি তখন কলিকাতায় গিয়া সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এমন ভাবে সেই গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন, যাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, কালীকুমারের লেখাই সদুত্তর হইয়াছে।

ইহাই ত নৈয়ায়িকের—প্রকৃত পণ্ডিতের প্রতিভা। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"বয়মিহ পদবিদ্যাং তন্ত্রমান্বীক্ষিকীং বা
যদি পথি বিপথে বা যোজয়ামঃ স পন্থাঃ।
উদয়তি দিশি যস্যাং ভানুমান্ সৈব পূর্ব্বা
ন হি তরণিরুদীতে দিক্‌পরাধীনবৃত্তিঃ॥"

"ব্যাকরণ, মীমাংসা বা ন্যায়শাস্ত্র আমরা সুপথে বা বিপথে যে দিকে সংযোজিত করিব, তাহাই প্রকৃত পন্থা। সূর্য্য যে দিকে উদিত হন, তাহাই পূর্ব্ব দিক্, তিনি কখনও দিকের অধীন হইয়া উদিত হন না।"

রঘুনাথ শিরোমণিও দম্ভ সহকারে লিখিয়াছেন,—

"বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যা
যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টম্।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে
রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥"

"সমস্ত পণ্ডিত ঐকমত্যানুসারে যাহা অদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কল্পনা-রাজ্যের অধীশ্বর রঘুনাথের বিচারে তাহা দুষ্ট প্রতিপন্ন হয়, আর

তাঁহাদের মতে যাহা দুষ্ট বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, আমার বিচার-প্রণালীতে তাহা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়।"

বড়ই খেদের বিষয়, ভারতের—বাঙ্গলার এই পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব অন্তর্হিত হইল। সে কালের এক একজন পণ্ডিত, কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এক মথুরানাথ "তত্ত্বচিন্তামণি"র টীকা, "দীধিতি"র টীকা, "গুণপ্রকাশে"র টীকা, "গুণপ্রকাশদীধিতি"র টীকা—কত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য-দিগের মধ্যে অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতির কত গ্রন্থ আছে। মৈথিল বর্দ্ধমানো-পাধ্যায়, কত দুরূহ গ্রন্থের বিশদ টীকা রচনা করিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলির টীকা, কিরণাবলীর টীকা, তত্ত্বচিন্তামণির টীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা, তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির টীকা, ন্যায়লীলাবতীর টীকা প্রভৃতি বহু ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বর্দ্ধমানের প্রণীত। এখন নূতন রচনা ত দূরের কথা, প্রচলিত গ্রন্থের আলো-চনাই ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পুরাতন পণ্ডিতগণের শাস্ত্রের প্রতি একটা মমত্ববুদ্ধি ছিল, তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রব্যসনী ছিলেন। গ্রন্থের কোনও পাঠ লাগাইতে না পারিলে তাঁহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। এখনকার মত গোঁজামিল দিয়া তখন পড়াইবার রীতি ছিল না। এই রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কেই দেখিয়াছি, প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তিনি শাস্ত্রচিন্তা করিতেন। এক গ্রন্থ যতবার পড়াইতেন, ততবারই নূতন রহস্য আবিষ্কার করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি মমত্ববুদ্ধির জন্যই তিনি ন্যায়মতে শ্রুতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" "মায়াবাদনিরাস" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই শাস্ত্রব্যসনের জন্যই তিনি দারুণ পুত্রশোকও ভুলিতে পারিয়াছিলেন। আবার কি উপায়ে সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ শাস্ত্রচর্চ্চার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকামিগণের ভাবিয়া দেখা উচিত।

চয়ন।

উপবাসের উপকারিতা।

[রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, এম্, বি, এফ্ সি-এস্ মহাশয়ের "খাদ্য" নামক গ্রন্থে 'উপবাসের উপকারিতা' সম্বন্ধে একটী জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ উপবাসের দ্বারা অনেক স্থলে স্বাস্থ্যের অপকারিতার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারিবেন বিশ্বাসে, আমরা প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম।—সম্পাদক।]

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যদেশসমূহে রোগবিশেষে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আমাদের দেশে উপবাস একটী নূতন জিনিস নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ সংযম ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য উপবাসের প্রয়োজন বুঝিয়া, উপবাস ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান সহায় বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ, বার, ব্রত, পূজা ও তিথি উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকেন। হিন্দুর বারমাসে তের পার্ব্বণ, সুতরাং প্রাচীন-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক নরনারীর মাসের মধ্যে ২।৪ দিন উপবাসে কাটিয়া যায়। এদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাগণ মাসের মধ্যে দুইদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন। হিন্দু রমণীগণ পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজনগণের মঙ্গলকামনায় 'মানত' করিয়া 'সোমবার', 'শুক্রবার' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বারে আহার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে কেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও 'রোজা' প্রচলিত আছে, এই পার্ব্বণ উপলক্ষে একমাসকাল তাঁহাদের দিবাহার নিষিদ্ধ। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহারা এই সময়ে রাত্রিকালেও স্বল্প ভোজন করিয়া থাকেন। তবে অনেক মুসলমান দিবাভাগে আহার না করিলেও রাত্রিতে এত অধিক আহার করেন যে, উপবাসের জন্য তাঁহাদিগকে কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি দিল্লী যাইতেছিলাম : কাণপুরে গাড়ী পঁহুছিলে আমার গাড়ীতে ৩।৪ জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান উঠিলেন এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য আসবাবের মধ্যে কয়েকটা মুখবাঁধা বড় ডেক্‌চি দেখিলাম। রাত্রিশেষে তাঁহাদের ভাষোপযোগী উচ্চ কথাবার্ত্তায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডেক্‌চির মধ্যস্থিত পোলাও, মাংসের কাবাব ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন। এত ভোরে লোকের এরূপ আহারে প্রবৃত্তি জন্মে, ইহা আমার ধারণা ছিল না। আহার শেষ করিয়া যখন তাঁহারা ধূমপানে মনোযোগ করিলেন, তখন আমি কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে এরূপ অসময়ে ভোজনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা হাসিয়া নিজ ভাষায় উত্তর দিলেন, 'বাবু সাহেব, আমাদের "রোজা" চলিতেছে। প্রভাত হইলে সমস্ত দিন ভোজন নিষিদ্ধ, তজ্জন্য ভোর থাকিতে আহার শেষ করিলাম।' আমি মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, এ মন্দ উপবাস নহে। একবার সন্ধ্যার পর 'রোজা' খোলা হইয়াছে, পুনরায় ভোরের সময় এইরূপ গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করা হইল, ইহাতে ১২ ঘণ্টা কেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও আহার করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ইহুদী ও প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবাসপ্রথা প্রচলিত আছে। ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু মোজেস্ (Moses) নিবিড় অরণ্যে চল্লিশ দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পর্ব্বাদি উপলক্ষে এখনও উপবাস করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধেরাও তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুমোদিত দিবসে নিরশনব্রত পালন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, উপবাস ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল কি না, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপবাসের উপযোগিতা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, মানুষ যদি আজীবন পরিমিতভোজী হয়, শরীরপোষণের জন্য যে পরিমাণ যে জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা যদি নিক্তির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার উপবাস করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ দেহ-পুষ্টির জন্য গৃহীত হয় না, উহা অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ (Toxins) উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, দৌর্ব্বল্য এবং ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃপীড়া, যকৃতের রোগ, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, পেট-বেদনা, বমন, উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগের একটী কারণ—অন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের বিকার। এরূপ অবস্থায় পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থসমূহ শরীরের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং পূর্ব্বকথিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অন্ত্রশূল, মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ ও তদুৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র উপায়—উপবাস। আমরা আহার বিষয়ে যত সাবধানই হই না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় যত অল্পপরিমাণ আহার গ্রহণ করি না কেন, আমরা অধিকাংশ সময়ে,প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। অনেক স্থলে মোটের উপর খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত না হইলেও বিভিন্নজাতীয় খাদ্যের মাত্রা আমরা ঠিক রাখিতে পারি

না। হয় ত ভাত, মিষ্টান্ন (শর্করাজাতীয় খাদ্য) অন্ন খাইয়া ঘি মাখন (মাখনজাতীয় খাদ্য) অধিক গ্রহণ করি, অথবা মাছ মাংস প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অনিয়মের বশবর্ত্তী হই। কোনও একজাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে তাহা পরিপাক না হওয়ায় উহা হইতে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়, এবং বাত রোগ (Rheumatism, gout), পাথরী রোগ (Gravel), বহুমূত্র রোগ (Diabetes) প্রভৃতি নানাবিধ অজীর্ণঘটিত রোগ জন্মিয়া থাকে।

উপবাস করিলে এই সকল দূষিত দ্রব্যের পরিমাণ দেহমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া, যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা নিঃশ্বাস-গৃহীত অক্সিজেন সংযোগে দেহমধ্যে সূক্ষ্মভাবে দগ্ধ হইয়া (slow combustion) ক্রমশঃ তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে। যদি উপবাস করা যায়, তাহা হইলে নূতন খাদ্যের অভাবে পূর্ব্বসঞ্চিত খাদ্যাংশ ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের অপকারিতা দূর হইয়া দেহ নির্ম্মল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। দীর্ঘ-উপবাসে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু দুই চারিদিনের উপবাসে শরীর ক্লেদশূন্য হইয়া যথোচিত স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কতদিন মানুষ উপবাস সহ্য করিতে পারে? এ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, মানুষ নিরম্বু উপবাস করিলে দশ বারদিন এবং জলপান করিয়া শুদ্ধ আহার ত্যাগ করিলে একমাস পর্য্যন্ত, কোনওরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘ উপবাসের পর তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে, খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও অনেক সময়ে সে দুই এক দিনের অধিক বাঁচে না। প্রবল দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ ঘটনার সমাবেশ বিরল নহে।

বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে অধিক বা অল্পদিন উপবাস সহ্য করিতে পারা যায়। বৃদ্ধ লোকেরা যুবা অপেক্ষা এবং যুবকগণ বালকদিগের অপেক্ষা অধিক দিন উপবাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারে। স্থূলকায় ব্যক্তিগণ কৃশ লোকের অপেক্ষা অধিক দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিতে পারে। টেলারের (Taylor) মেডিক্যাল্ জুরিস্প্রুডেন্সে (Medical Jurisprudence) উল্লেখ আছে যে, নিরম্বু উপবাসে মানুষ দশদিন পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। তিনি তাঁহার পুস্তকে

এক জন প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে মাঝে মাঝে এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইত যে, কিছুতেই তাহাকে জাগাইতে পারা যাইত না। একবার ঐ ব্যক্তি ৫ দিন ৫ রাত্রি উপর্য্যুপরি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহাকে ১ ফোঁটা জল বা ১ কণা আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করাইতে পারা যায় নাই। এই সময়ে তাহার শৌচ প্রস্রাব বন্ধ থাকিত। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিত, তখন সে সহজ মানুষের মত ব্যবহার করিত এবং নিদ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঘটনা তাহার মনে থাকিত। সচরাচর দুই বা তিন দিন ব্যাপিয়া এইরূপ গাঢ় নিদ্রা তাহাকে অভিভূত করিত।

ডাক্তার গাই (Guy) তাঁহার পুস্তকে একখানি জলমগ্ন জাহাজের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৮ জন আরোহীর মধ্যে ১ জন মাত্র বিনা জল ও আহারে ১৮ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। অবশ্য ইহাদিগকে ১৮ দিন সমুদ্রের উপর ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, বিষম শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাহা না হইলে হয় ত আরও কেহ কেহ এতদিন নিরম্বু উপবাস সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইত। ডাক্তার লায়ন্ (Lyon) তাঁহার মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্সে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক জন পাগল শুদ্ধ জল পান করিয়া ৪১ দিন বাঁচিয়াছিল এবং আর এক জন পাগল মাঝে মাঝে একটু নেবুর রস ও জল খাইয়া ৬৪ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

আমেরিকার ডাক্তার ট্যানার্ তাঁহার নিজ দেহে উপবাসের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে প্রচুর জল পান করিতেন। দীর্ঘ উপবাসের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয় নাই। উপবাসের সময় কতকগুলি ডাক্তার দিবারাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তিনি গোপনে আহার করেন কি না, তাহা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ট্যানারকে কোনরূপ খাদ্যগ্রহণ করিতে দেখেন নাই। তথাপি তাঁহারা, মানুষ যে এত দীর্ঘকাল উপবাস করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু ইহার পর এমন অনেক প্রামাণিক ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে ট্যানারের পরীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৪০ দিবস পর্য্যন্ত মাটির নীচে নিরম্বু উপবাস অবস্থায় আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহার জীবন নষ্ট হয় নাই।

'মেডিকেল্ গেজেট' নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

এক জন সুস্থকায় বৃদ্ধ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে ২৩ দিন একটী কয়লার খনির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই ২৩ দিন সে এককালীন অনাহারে ছিল। কেবল মাঝে মাঝে নিকটে যে কিয়ৎপরিমাণ পঙ্কিল জল ছিল, তাহাই পান করিয়াছিল। যখন তাহাকে উদ্ধার করা হইল, তখন তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। উদ্ধারকর্ত্তাদিগকে সে চিনিতে পারিয়াছিল ও তাঁহাদের নাম বলিয়াছিল। কিন্তু সে এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাত দিয়া মুখে খাবার তুলিবার শক্তি তাহার ছিল না। যথোচিত সেবা শুশ্রূষার পর সেই ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিয়াছিল যে, প্রথম দুই দিন সে ক্ষুধার জন্য বড় কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার পর তাহার ক্ষুধা মোটেই ছিল না, কিন্তু পিপাসার যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়াছিল। ২৩ দিনের মধ্যে ১ বার মাত্র তাহার দাস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে সহজ অবস্থার ন্যায় মূত্র ত্যাগ করিত।

চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক বাঁচে নাই। তাহার পেট এত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং চামড়া এত পাতলা হইয়াছিল যে, পেটে হাত দিলেই তাহার শিরদাঁড়ার হাড়গুলি একে একে গণা যাইত। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ শোচনীয় দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আলেক্জাণ্ডার জ্যাক্ নামক এক ব্যক্তি ৫০ দিন উপবাস করিয়াছিল। টেলারের মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্স্ নামক পুস্তকে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই উপবাসের সময় তাহার দেহের ভার ১৭ সের কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও তাহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ হইয়াছিল, তথাপি দৈর্ঘ্যে তাহার শরীর ১ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল। তাহার একটী গুঁড়া পেটেণ্ট ঔষধ ছিল। মধ্যে মধ্যে সে সেই ঔষধ খাইত ও জল পান করিত। ৫০ দিনে সে দুই ছটাক মাত্র ঔষধ গ্রহণ করিয়াছিল। সে বলিত যে, তাহার ঔষধের অপূর্ব্ব ক্ষমতায় সে উপবাস সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। পঞ্চাশ দিন উপবাসের পর ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টার সময়ে 'পারণা' করিয়াছিল। প্রথম দুই এক দিন লঘু আহার করিয়া পরে সে, পূর্ব্বে যেমন আহার করিত, সেইরূপ ভাবে আহার করিয়া সুস্থশরীরে ছিল।

১৮৯০ সালে শাক্সি (Succi) নামক ইটালীবাসী এক ব্যক্তি ৪০ দিন

উপবাস করিয়া সুস্থশরীরে ছিল। সে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিত, এবং মধ্যে মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন করিত।

রোগ-উপশমের জন্য আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লঙ্ঘন অর্থে যে কেবল উপবাস, তাহা নহে। চরকসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নিবেশের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুরু আত্রেয় উত্তর করিলেন যে, যাহা কিছু লঘুতাসম্পাদক, তাহাকেই লঙ্ঘন কহে। যথা—

তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ।
যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥

উপবাস লঙ্ঘনের অন্তর্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্॥

আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে জ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগের উপশমের জন্য লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লঙ্ঘন সকল স্থলে এককালীন আহার-বিরহিত উপবাস অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; রোগে লঘু খাদ্য গ্রহণ করিলেও উহা লঙ্ঘন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জ্বরবিশেষে প্রথম ৭ দিবস লঙ্ঘন করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু জ্বরের উপশম হইলেই শুশ্রুত লঘু আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নচেৎ জ্বর বৃদ্ধি হইবার, এমন কি, অতিশয় ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। চরক বলিয়াছেন যে, রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারেরা দীর্ঘ উপবাসের ব্যবস্থা কোথাও করিয়া যান নাই। কোন কোন জ্বরে ৭ দিন লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও খাদ্যগ্রহণ একেবারে নিষেধ করেন নাই। তাঁহারা অতিলঙ্ঘন দোষাবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচি তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণ মূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলনাশশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রোত্র ও নেত্রের দুর্ব্বলতা, মনের ব্যাকুলতা, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধবাত, হৃদয়ের মোহ এবং দেহ ও অগ্নির বলক্ষয়—এই সকল অতিলঙ্ঘনের ফল (চরক-সংহিতা—সূত্রস্থান)।

তাঁহাদের মতে লঙ্ঘনের উপকারিতা নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়ঃ—

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতোষু॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চৈব ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

বাতমূত্র পুরীষের ত্যাগ হইলে, শরীরের লঘুতা হইলে, হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি হইলে, তন্দ্রা ও ক্লম অপগত হইলে, ঘর্ম্ম হইলে, রুচি বোধ হইলে, ক্ষুৎপিপাসা হইলে এবং অন্তরাত্মা সম্যক্ প্রকারে ব্যথাহীন হইলে লঙ্ঘণ সম্যক্ হইয়াছে বলা হয় (চরক-সংহিতা—সূত্রস্থান)।

চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের বাহিরের লোক এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে তাঁহাদের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোনও কোনও চিকিৎসকও এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সমর্থন করিয়াছেন। সিন্‌ক্লেয়ার্ সাহেব তাঁহার "Fasting Cure" নামক পুস্তকে, তাঁহার নিজ দেহের উপর যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য লোকের এ বিষয়ের পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন নানা রোগ ভোগ করিয়া কোনও চিকিৎসার দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া দীর্ঘ উপবাস গ্রহণ করিয়া একেবারে রোগমুক্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা বিলাত ও আমেরিকার নানাবিধ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর অনেক রোগী তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার "Fasting Cure" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়।

আমি যে দীর্ঘ-উপবাসের বর্ণনা করিয়াছি, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর অবস্থিত। যেরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া দুঃসাধ্য রোগের প্রতীকারের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা মনে হয় না। তবে আমি স্বয়ং দীর্ঘ উপবাসের পক্ষপাতী নহি। আমার বিশ্বাস যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এককালীন তিন চারি দিনের অধিক উপবাস করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা অজীর্ণ ঘটিত নানাবিধ রোগ ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি উপলক্ষে কেবল প্রচুর জল

পান করিয়া আহার একেবারে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সে দিন ব্রিটিশ মেডিকেল্ জর্ণালে (British Medical Journal) উপবাসদ্বারা বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাঝে মাঝে ৩।৪ দিন উপবাস করিয়া, দীর্ঘকালব্যাপী বহুমূত্র রোগ সারিয়া গিয়াছে, এরূপ অনেক রোগীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এ দেশে বহুমূত্র রোগের যেরূপ প্রাবল্য, তাহাতে ইহার উপশমের জন্য নাতিদীর্ঘ উপবাস অবলম্বিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

দ্বারবঙ্গের মাননীয় বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর কিছু দিন পূর্ব্বে একবার ৫ দিন এবং তৎপরে ১৫ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। প্রথম বারে উপবাসের সময় তিনি কেবল জল পান করিতেন, কোনরূপ আহার্য্যদ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় বারে জল পানের সহিত মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধপান করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই দুই বারের উপবাসে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। কিছু দিন হইতে তাঁহার শ্রবণশক্তি একটু কমিয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় বার উপবাসের পর তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর বলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতায় উপবাস দ্বারা শরীরের জড়তানাশ ও শক্তির বৃদ্ধিসাধন হয় এবং দূষিত পদার্থসমূহ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। তবে যাহাতে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া উপবাস করা উচিত।

কলিকাতার আর্মেনিয়ান্ কলিজিয়েট্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক মিঃ উইটেন্‌বর্গ বহুদিন বাতরোগে কষ্ট পাইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তিনি দীর্ঘ উপবাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। দুই তিন সপ্তাহের উপবাস তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। তিনি অনেকবার এইরূপ দীর্ঘ উপবাস করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে এখনও করিয়া থাকেন। উপবাসের সময় তিনি কেবল উষ্ণ জল পান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকাতায় বাস করেন। ইচ্ছা করিলে যে কেহ তাঁহার নিকটে যাইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অবগত হইতে পারেন।

সিন্‌ক্লেয়ার্ বলেন যে, উপবাস করিলে প্রত্যহ প্রায় আধ সের করিয়া শরীরের ভারের লাঘব হয়। প্রথমতঃ চর্ব্বি ও পরে মাংস প্রভৃতি অন্যান্য

শারীরিক উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা নিতান্ত স্থূলদেহ, তাঁহাদিগের স্থূলতা কমাইবার একমাত্র উপায় উপবাস—ঔষধসেবনে স্থূলতার হ্রাস হয় না; স্থূল-দেহ ব্যক্তি অধিক দিন উপবাস করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না; দেহ-সঞ্চিত চর্ব্বি খাদ্যের পরিবর্ত্তে শরীররক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়।

কত দিন উপবাস করিয়া প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সিন্‌ক্লেয়ার বলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতায় ৩ মাস কাল পর্য্যন্ত মানুষ উপবাস সহ্য করিতে পারে। ৩০, ৪০ বা ৫০ দিনের উপবাস পালন করিয়া অনেক লোকেই নানা দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ৮, ১০, ১২ বা ১৫ দিনের উপবাস তাঁহার মতে সকলেই সহ্য করিতে পারে। তিনি নিজে ১২ দিন এবং তাঁহার স্ত্রী ১০ দিন একটানে উপবাস করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েরই বৃদ্ধ বয়স এবং উভয়েই অজীর্ণ ও অজীর্ণঘটিত নানা প্রকার ব্যাধিতে বহুকাল ব্যাপিয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার পরেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ৫।৬ দিবসব্যাপী উপবাস কয়েক বার পালন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী এই উপবাস-ব্রত সমাপ্তির পর এক্ষণে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা সারা জীবনে কখনও উপভোগ করেন নাই।

সিন্‌ক্লেয়ার বলেন যে, দীর্ঘ অনশন ব্রত গ্রহণ করিলে প্রথম ২।৩ দিন অভ্যাসবশতঃ প্রবল ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে উপবাসের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিরম্বু উপবাস নহে। তিনি এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শীতল জল অপেক্ষা উষ্ণ-জল-পান অধিক উপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জল পান দ্বারা দেহমধ্যে বহু-দিনসঞ্চিত ক্লেদ সমূহ নির্গত হইয়া যায়। তিনি এই সময়ে প্রত্যহ গরম জলের (অর্দ্ধসের হইতে ৩ পোয়া জল) দ্বারা নিম্ন অন্ত্র ধৌত করিবার ব্যবস্থা (Enema) করিয়াছেন। উপবাসের সময় অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে, প্রথম অবস্থায় ৪।৫ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ এবং অন্যান্য দৈনিক কার্য্য সহজেই করিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। উপবাস আরম্ভের ২।৩ দিন পরে ক্ষুধা একেবারেই থাকে না, শরীর স্বচ্ছন্দ ও লঘু বোধ হয়, এবং শরীরের ও মনের স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অবশ্য শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, এবং ১০।১২ দিনের উপবাসে ৬।৭ সের ওজন কমিয়া যায়। ইহাতে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই।

উপবাস ভঙ্গ করিয়া আহার গ্রহণের পর অতি শীঘ্র দেহের ভার পুনরায় বাড়িয়া যায়, অথচ শরীরে কোন রোগ বা গ্লানি থাকে না। উপবাসের সময় প্রত্যহ শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, যদি কাহারও উপবাস করিয়া কোনও অনিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা তাহার ভ্রান্ত পূর্ব্ব সংস্কার ও মানসিক ভীতিজনিত। উপবাসের সময় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতে পারে, শ্রমজনিত কর্ম্ম করিতে গেলে সহজেই ক্লান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা, নাড়ীর গতি ক্ষীণ, এমন কি, মিনিটে ৪০ বার (৮০ বার স্বাভাবিক) পর্য্যন্ত ইহার স্পন্দন হইতে পারে, কিন্তু এই সকল লক্ষণ দেখা গেলেও ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। তিনি বলেন যে, এই ভয়ের জন্য অনেকে ২।৩ দিন উপবাস করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা উপবাসের যথোচিত সুফল প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার মতে, যাঁহারা দীর্ঘ উপবাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক আছে, তাহা যেন পূর্ব্বে পাঠ করেন, এবং যাঁহারা দীর্ঘ উপবাস করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া এবং তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া যেন এই কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন।

উপবাস-ভঙ্গ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, উপবাসের প্রথম ২।৩ দিন ক্ষুধার জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার পরেই ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যায়। তৎপরে যখন ক্ষুধা পুনরায় অনুভূত হইবে, তখনই উপবাস ভঙ্গ করা উচিত। কাহারও কাহারও ১০।১২ দিন উপবাসের পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়, কাহারও তদপেক্ষা অধিক বা অল্পদিনের মধ্যে ক্ষুধাবোধ হয়। তিনি বলেন, ক্ষুধার পুনরুদ্রেকের পূর্ব্বে উপবাস ভঙ্গ করিলে উপবাসের সুফল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

যাঁহারা এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উপবাস সম্বন্ধে মত ও অভিজ্ঞতা জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাইবেন :—

1. The Fasting Cure ... Upton Sinclair.
2. Fasting, in the cure of Disease ... Dr. L. B. Hazzard.
3. Perfect Health ... C. C. Haskell.
4. Fasting Hydro-therapy and Exercise ... Bernarr Macfadden.
5. Fasting, Vitality & Nutrition ... Hereword Carington.

'পারণা'র সময় অর্থাৎ উপবাস শেষ হইলে যখন আহার পুনঃ গ্রহণ করিতে হইবে, তখন বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সিম্‌ক্লেয়ার বলেন যে,

অল্প অল্প গরম দুগ্ধ পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করা উচিত। প্রথম ২।৩ দিন শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে হইবে, পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য খাদ্য অল্প পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের দুগ্ধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ২।৩ দিন আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি ফলের রস প্রশস্ত। দীর্ঘ উপবাসের সময় পরিপাকযন্ত্রাদি একপ্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে; এই সময়ে আহারের মাত্রা অধিক হইলে বা দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, অন্ত্রশূল ও অন্যান্য ক্লেশপ্রদ রোগ হইবার সম্ভাবনা।

সিন্‌ক্লেয়ার্ বলেন যে, অজীর্ণঘটিত যে, কোনও রোগ, সর্দ্দিজ্বর, শিরঃপীড়া, নানাবিধ বাতরোগ, যকৃতের পীড়া, মূত্ররোগ, শ্বাসরোগ, চর্ম্মরোগ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, জ্বর, অপস্মার প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির উপবাস দ্বারা উপশম হইয়া থাকে এবং অনেক স্থলে উহাদিগের এককালীন আরোগ্য সাধনের জন্য দীর্ঘ উপবাসের প্রয়োজন। তাঁহার মতে, যে কোনও বয়সে উপবাস-ব্রত অবলম্বন করিতে পারা যায়, এবং শরীর যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, বুঝিয়া উপবাস করিলে কোনও অনিষ্ট হয় না। ক্ষয়রোগে তিনি উপবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে ২।৪ জন ক্ষয়রোগী উপবাস করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ ঘটনাও তিনি পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা রোগ-মুক্তির জন্য উপবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ১০৯ জন লোকের (স্ত্রী ও পুরুষ) নিকট হইতে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পত্র পাইয়াছিলেন। ইঁহারা গড় পড়তায় প্রত্যেকে ৬ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ১০০ জন উপবাস দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—বাকী ৯ জনের বিশেষ কোনও উপকার হয় নাই। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই ৩।৪ দিবসের অধিক উপবাস করিতে সমর্থ হন নাই।

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাগণের প্রতি মাসে দুই দিন করিয়া উপবাস-পালন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের যে বিধি আছে, তৎসম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে, ঐ বিধি তাঁহাদের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। কিন্তু উপবাসসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিলে মনে হয় যে, প্রতিবাদীগণের ঐ ধারণা সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য অনেক সময়ে উপবাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হিন্দু বিধবাগণ অনেক বিষয়ে সংযম অভ্যাস করেন বলিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যে বিধির পালনে সংযম-অভ্যাস ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহা কষ্টসাধ্য হইলেও তাহার ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দয়তার পরিচায়ক নহে।

আমাদের স্বাস্থ্যপালনের সকল বিধি শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মসাধনের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষগণের পক্ষেও শাস্ত্রে উপবাসের বিধি আছে। তবে যদি তাঁহারা তাহা পালন না করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থাকে শাস্ত্রকারদিগের পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক বলা সঙ্গত নহে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, অসমর্থের পক্ষে বলপূর্ব্বক কোনও নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করা সঙ্গত নহে, এবং উহা যে অনেক স্থলে অন্ধ কুসংস্কারানুবর্ত্তিতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংযমের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া যাঁহারা উপবাস করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেই উহা পালনীয়। প্রত্যেক বিধি দেশকালপাত্র বিবেচনায় প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বথা সুফল প্রসব করে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপবাসের সময় যে অন্ত্রধৌত করণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন নহে। যোগ-শাস্ত্রে দেহ, সাধনক্ষম ও শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য, অন্ত্রধৌত ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং এখনও কেহ কেহ উহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তবে যে উপায়ে উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রণালী অতিশয় সহজ-সাধ্য, সুতরাং সর্ব্বথা আচরণীয়।

সমালোচনা-বিভ্রাট।

[লেখক—জনৈক বীরভূমবাসী।]

গত ভাদ্র মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে 'ব্রজরাজ' উপনামে কোনও ব্যক্তি মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্পাদিত 'বীরভূম বিবরণে'র এক গালাগালি পূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। অগ্রহায়ণের 'অর্চ্চনা'য় সাহিত্য-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার বি, এ মহাশয় 'বীরভূম বিবরণে'র সমালোচনা ব্যপদেশে, প্রসঙ্গত তাহার কোনও কোনও অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করেন। আমরা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র গালাগালি এবং 'অর্চ্চনা'র প্রতিবাদ উভয় নিবন্ধই পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু কথা কহি নাই, অবশ্য তেমন কোনও প্রয়োজনও ছিল না। সম্প্রতি দেখিলাম, মাঘ সংখ্যা 'অর্চ্চনা'য় উক্ত বিষয় লইয়াই, 'ব্রজরাজে'র এক প্রতিবাদ (সুধীর বাবুর প্রতিবাদের) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার (সুধীর বাবুর প্রদত্ত)

প্রতি-উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। এই "প্রতিবাদ" এবং 'উত্তর' পড়িয়া মনে হইল ব্রজরাজ বাবুর সুর যেন অনেকটা 'কের্ত্তার' মুখে অগ্রসর হইয়াছে, সুধীর বাবুর প্রতিবাদের চাপে দায়ে পড়িয়াই হউক, অথবা সত্য প্রকাশ হইয়া পড়াতেই হউক, তিনি তাহার পূর্ব্ব উক্তির স্থল বিশেষে পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া অনেক নূতন কথা কহিয়াছেন; আর সুধীর বাবুও বীরভূমবাসী নহেন, এই জনাই হউক অথবা 'বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি' বা 'রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি'র তেমন বিশেষ কোনও সংবাদ না রাখার জনাই হউক, ব্রজবাবুর ঐ সমস্ত নূতন কথার অনেকগুলিরই ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিতে পারেন নাই। সুতরাং এখন কথা কহার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজন হইয়াছে, সাধারণ সমীপে সত্য-প্রকাশের জন্য এবং একজন নিরপেক্ষ ভদ্রলোকের অযথা কলঙ্ক-ক্ষালনজন্য। আর প্রয়োজন হইয়াছে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যাবশুক বিষয় 'সমালোচনা' কার্য্যের প্রকৃতিটী বুঝিবার জন্য। সংক্ষেপে আমাদের প্রয়োজন শেষ করিতেছি।

'ব্রজরাজ' বাবু প্রথমে শ্যামারূপা গড়ের কাহিনীকে 'বীরভূম বিবরণে'র পক্ষে 'অবান্তর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র সংখ্যা)। এখন বলিতেছেন "লাউসেন অজয়ের উত্তর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া চলে। কিন্তু যে শ্যামারূপার গড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত, তাহার ছবি দেওয়া চলে না।" (অর্চ্চনা, মাঘ) দুইটী উক্তির মর্ম্ম পাঠক কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন? একবার বলিলেন 'অবান্তর' আবার বলিলেন 'দেওয়া চলে'। আচ্ছা, অর্চ্চনায় উল্লিখিত ঐ 'তাঁহার' শব্দটী বোধ হয় লাউসেনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রজরাজ বাবু স্বীকার করিয়াছেন 'সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া চলে', কিন্তু এ 'সংক্ষিপ্ত' কিরূপ তিনি তাহার ওজন ঠিক করিয়া দেন নাই। 'বীরভূম বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে যে, লাউসেন ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন, সেই স্থান এখন 'লাউসেন তলাও' নামে বিখ্যাত। "এই 'লাউসেন তলাও' অজয়ের উত্তর তটে বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখন এই লাউসেন বা উক্ত 'তলাওয়ে'র পরিচয় দিতে হইলে প্রসঙ্গত শ্যামারূপা গড়ের পরিচয় দান কি 'অবান্তর'? যতই সংক্ষেপ করা যাউক, 'লাউসেন' কি জন্য এখানে শিবির সন্নিবেশ করিতে আসিলেন? তিনি কাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন? অভিযান করিবার কি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল?

অভিযানের শেষফল কি হইয়াছিল? লাউসেনের পরিচয় প্রসঙ্গে এসব আলোচনা কি অবান্তর? আবার বলিয়াছেন 'ছবি দেওয়া চলে না'। কারণ? কারণ পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ বা কৌতূহল নিবারণের জন্য যদিই বা ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না কি? চলে না কেন? ইতিহাস শাস্ত্রের নিষেধ আছে? ইতিহাসে উল্লেখ আছে গৌড়রাজ হত্যায় উত্তেজিত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ গৌড়িয় সৈন্যগণ কাশ্মীরে গিয়া রাম স্বামীর মূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ করেন। এখন কোনও ঐতিহাসিক গৌড়িয় বীরগণের চরিত-কাহিনীতে যদি সুদূর কাশ্মীরস্থিত উক্ত রামস্বামীর ভগ্ন মন্দিরটীর একটি চিত্র প্রদান করেন, ব্রজরাজ কি বলিবেন তাহা 'দেওয়া চলে না'? সেন পাহাড়ি ও সেনভূম পরগণা এখনও বীরভূমের কিয়দংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। (প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত শ্যামারূপার গড়ও বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল) এতদ্ভিন্ন বীরভূমের ইলাম বাজারের নিকটবর্ত্তী দেবীপুরে প্রাপ্ত 'মুখেশ্বরী'-মূর্ত্তির (যাহার পাদপীঠে "যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা" শ্লোকটী প্রাচীন বাঙ্গালায় ক্ষোদিত রহিয়াছে) পরিচয় দিতে হইলেও প্রসঙ্গত শ্যামারূপার গড়ের কথা আসিয়া পড়া স্বাভাবিক। ব্রজরাজ বাবু একটু অবহিত ভাবে 'বীরভূম বিবরণ' খানি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু না পড়িয়া সমালোচনা করাই না কি এখনকার প্রথা, সুতরাং ব্রজরাজ বাবু নির্দ্দোষ।

ব্রজরাজ বাবু লিখিয়াছেন, "এখন ভত্রপুর বীরভূমের স্বকীয় সম্পত্তি হইয়াছে, একথা আমি স্বীকার করিয়াছি, কোনও আপত্তি করি নাই" ('অর্চ্চনা' মাঘ) কিন্তু 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র লেখায় ঐ 'স্বকীয়' শব্দে ব্রজরাজ কি একটু বিশেষ রসিকতার চেষ্টা করেন নাই? তখন কি এতটাই খোলসাভাবে 'স্বীকার' করিয়াছিলেন? ব্রজরাজ বাবু কি বলেন? আমি পাঠকবর্গকে এ বিষয়ের বিচার জন্য অনুরোধ করিতেছি। "দৌহিত্রের বংশকে সাধারণতঃ কেহ বংশধর বলে না, অন্ততঃ হিন্দু বলেন না"। ব্রজরাজ বাবুর এ কথার উত্তরে তাঁহাকে একবার শব্দকল্পদ্রুম খানাই অনুসন্ধান করিতে বলি, (কারণ তিনি বার দুই এই গ্রন্থখানার নামোল্লেখ করিয়াছেন) "দৌহিত্রো বংশ রক্ষকঃ" এ পাঠ তিনি কোথাও দেখিতে পান কি না জানাইলে উপকৃত হইব।

'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থখানি ব্রজরাজ বাবু কোথায় হারাইলেন? একটু খুঁজিয়া দেখিতে হইবে! সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের নিকট প্রথম সংস্করণ

সম্বন্ধ-নির্ণয় খানি রহিয়াছে এবং তাহাতেও উক্ত শ্লোকটী ছাপার অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাইতেছি। এ সময় ব্রজরাজ বাবুর বইখানির একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। 'বীরভূম বিবরণে' না হয় পুস্তকের সংস্করণ উল্লিখিত ছিল না। কিন্তু সমালোচনা কালে তিনিও তো কই কোন সংস্করণের উল্লেখ করেন নাই। এখন বলিতেছেন, "তাহা সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণের, এবং তাহা আমার নিকটে এখন নাই।" ('অর্চ্চনা' মাঘ)। সমালোচকের এ কথা বলা কোনও ক্রমেই শোভনীয় বলিয়া মনে হইতেছে না। সত্য কথা বলিতে কি, আমরা তো বিশ্বাস করিতেই পারিতেছি না। তারপর 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' কুলপঞ্জিকা নয় কে বলিল? উহা তো কুলপঞ্জিকা হইতেই সঙ্কলিত, সংগৃহীত শ্লোকাদির নীচে তো উহাতে কুলপঞ্জিকার নাম পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। ব্রজরাজ বাবু দেখিতেছি, রাগের মাথায় এবার যা-তা বলিয়াছেন। আবার ব্রজরাজ বাবুর সংস্কৃত জ্ঞানও দেখিতেছি মন্দ নয়। "রুদ্রস্তু পৃথিবীপালো রাজলোক হিতে রতঃ" শ্লোকে তিনি রুদ্র অর্থে রাজা অনুসন্ধান করিতে গেলেন কেন? ঐ শ্লোকে কি এইরূপ বুঝাইতেছে যে—"রুদ্র"—কি না 'পৃথিবীপাল—লোকহিতে রত রাজা'? আচ্ছা, উহাতে কি এইরূপ বুঝায় না যে, রুদ্র নামা কোনও ব্যক্তি লোকহিতে রত পৃথিবীপাল রাজা ছিলেন? পৃথিবীপাল অবশ্য কুলপঞ্জিকার অতিশয়োক্তি, কিন্তু উহা এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ভূমিপাল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যনাটকেও একজন সামান্য রাজার 'চতুরুদধি মেখলয়া ভুভোভর্ত্তা' এইরূপ বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া শব্দকল্পদ্রুম অনুসন্ধান করিতে গেলেন কেন, বলিবেন কি?

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি, শ্যামারূপার গড়ের ছবি সংগ্রহের তিনি যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, যিনি ছবি তুলিতে আসিয়াছিলেন, তিনি পেশাদার ফটোগ্রাফার নহেন, সুতরাং কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই, এইজন্য আগে হইতে তাঁহাকে মসলার মূল্য পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি, এবং আরও শুনিয়াছি, তিনি প্রথমে হেতমপুরে আসিয়া কতকগুলি ফটো তুলিয়া দিয়া পরে কেন্দুবিল্বে যান। সেবার অনুসন্ধানের সমস্ত ব্যয়-ভার 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি'ই বহন করিয়াছিল, সংবাদপত্রে আমরা এ সংবাদও অবগত হইয়াছিলাম। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ, রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সিদ্ধেশ্বর সিংহ এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সহযাত্রী আনন্দবাজারের মৃণালকান্তি বাবু ও তাঁহার পুত্র (ফটোগ্রাফার)

সুনীলকান্তি বাবু এখনও বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে—ব্রজরাজ বাবু যেরূপ ভাবে এই ছবি সংগ্রহের ইতিহাস ও রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির 'কড়ারের' কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি সে সময় বর্দ্ধমানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অন্ততঃ রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির নন্দ গোকুলে তথাকথিত 'আঁতুড়ে' তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। আচ্ছা, ঐরূপ সমসময়ে যে একজন 'রাজ' হেতমপুরে হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইয়া আসিতে আসিতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম, এবং হর্ষ বিষাদিত হইয়াছিলাম, ব্রজরাজ বাবু কি তাঁহার সংবাদ কিছু দিতে পারেন? আমরা তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছি। অবশ্য কারণটা এখন কিছু খুলিয়া বলিবার আবশ্যকতা বুঝিতেছি না। প্রয়োজন হইলে সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শুকতারা—গল্প পুস্তক, মূল্য ।।০, সুলেখক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ প্রণীত। অন্নদা বুক্ ষ্টল্ এই গল্প গ্রন্থখানিকে 'আট আনা সংস্করণে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছে।

কয়েকটী গল্পের পরিচয় দিতেছি :—

রূপের নেশা—অভিনব মাতৃ-চরিত্র 'অমিনা' নব্যশিক্ষিত তন্ত্রের আদর্শে গঠিত। যে সমাজেই হোক্ 'রূপের নেশা' মাতৃস্নেহ সঙ্কুচিত করিতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 'উন্মাদিনী' নামকরণ হইলে সুপ্রযুক্ত হইত। পৃথিবীতে স্বপ্নের অগোচর বস্তুনিচয়ের মধ্যে এই মাতৃচরিত্রটী অন্যতম।

সবুজ চশ্মা—সোণার কণ্ঠী—অন্ধ, এই গল্পত্রয় 'অর্চ্চনা'য় ইতিপূর্ব্বে স্থান পাইয়াছে। এগুলির পরিচয় অনাবশ্যক।

বিবাহের যৌতুক—গল্পটী ভালই হইয়াছে। স্বামী যদি বিড়ালটীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে স্থান দিতে পারিতেন, তাহা হইলে পত্নীর প্রতি তাহার 'কর্ত্তব্য'টুকু পুরামাত্রাতেই সম্পাদিত হইত এবং 'সাইকলজির'ও মানরক্ষা হইত।

বাজির টাকা—গল্পটী এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিতে হয়।

যুগল বন্ধু—আদর্শ বন্ধু চরিত্রদ্বয় 'ড্যামন' ও 'পিথিয়সে'র মত বাঙ্গালা সাহিত্যে টিকিতে পারিত। সতীশ স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহার বন্ধুর বিবাহ দিতে যেরূপ প্রতারণা ও রোমান্সের অবতারণা করিয়াছিল তাহা একান্ত অস্বাভাবিক। অন্য ঘটনার আশ্রয় লইলে গল্পটী নির্দ্দোষ হইত।

কয়েকটী ভাল গল্পের সমষ্টিতে পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। উপন্যাস-পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা।

বিরহিনী।

[লেখিকা—শ্রীমতী অমিয়া দেবী।]

ওই দূরে কে বাজায় বাঁশী ?
অলস ঘুমের কোলে ধরণী পড়েছে ঢলে
নিভে গেছে জ্যোছনার হাসি,—
কাননে ফুটেছে ফুল, সুরভি আঁধার পথে
দিকে দিকে কোথা গেছে ভাসি,
এ সময়ে কে বাজায় বাঁশী ?

ওই দূরে কে বাজায় বাঁশী ?
বাতাস ঘুমায়ে গেছে, নীরব আকাশে জাগে
অনিমেষ তারকার রাশি ;—
এ কি সে বাঁশীর সুর ! করুণ-বেদনাতুর—
পরাণ যে করিল উদাসী,
অসময়ে কে বাজা'ল বাঁশী ?

কে গো ওই বাঁশরী বাজায় ?
নয়ন-সাগর কেন উছলি' উছলি' ওঠে
বুক ভ'রে ওঠে বেদনায় ;
তাহারি চরণ তলে সারাটী ব্যাকুল হিয়া
কেন আজি লুটাইতে চায় ?
বাঁশী তান ওই শোনা যায়।

কে গো ওই বাঁশরী বাজায় ?
নীরব নিশীথ কোলে মূরছনা লুঠি' লুঠি'
ছেয়ে গেল সারা নীলিমায় ;
থাম থাম নিরমম, বাজা'ও না বাঁশী আর
চেতনা যে স্বপনে মিলায়,
বাঁশী সুর তবু শোনা যায়।

অৰ্চ্চনা, ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

হিন্দু সাহিত্য।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

ধর্ম্মভেদে সমাজভেদে দেশভেদে সাহিত্যের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। একধর্ম্মাবলম্বীর সাহিত্য ভিন্নধর্ম্মীর নিকট সম্যক্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং সেইরূপ সাহিত্য পাঠে পাঠকের সম্পূর্ণ রসাস্বাদ একেবারেই অসম্ভব। ধর্ম্মমূলক সিদ্ধান্ত সমাজের সর্ব্বত্র বিরাজ করে; অতএব সময়োচিত সামাজিক রুচিকর সাহিত্যেও তাদৃশ সিদ্ধান্ত নিহিত হইয়া থাকে। যিনি যে ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত যতদূর অবগত থাকেন, তিনি তদ্ধর্ম্মীর সাহিত্য পাঠে ততটুকু রসাস্বাদে সমর্থ হইয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের মূলে জন্মান্তরবাদ নিবদ্ধ রহিয়াছে; অর্থাৎ একই আত্মা জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম অনুভব করিতেছে, অনাদি কালের সঞ্চিত পাপ পুণ্যের ফলে ভাল মন্দ বিভিন্ন যোনিতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, ঈদৃশ জন্মান্তরবাদ হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত। খৃষ্টান বা ইসলামের মত পুণ্য পাপের ফলে অনন্ত স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম্মে বিবেচিত হয় নাই; দেহ হইতে আত্মা বিচ্যুত হইলেই সংসারের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে বিদূরিত হয় না, জন্মান্তরে এবং লোকান্তরেও আত্মীয় স্বজনের সহিত পুনরায় সাক্ষাতের ও মিলনের আশা এবং সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম যেমন সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র, তাহার সাহিত্যও তেমনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই স্থলে আমি একটা কথা বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি যে সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, উহা কাব্য নামক সাহিত্য। পূর্ব্বতন রীতির অনুসারে এইরূপ কৈফিয়ৎ দিবার কোনও কারণ ছিল না, কারণ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কাব্য অর্থেই সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ করিতেন, এবং সাহিত্য বলিলে একমাত্র কাব্যকেই বুঝিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে শিক্ষিতমণ্ডলী সাহিত্য শব্দের অর্থ ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের পরিভাষিত বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, তান্ত্রিক সাহিত্য, প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, প্রত্যেক বিষয়ের

তাহাতেই সাহিত্য শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে। এমন কি, পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকে বুঝাইবার জন্য সাহিত্য শব্দের বিশেষণরূপে রস-শব্দ সংযুক্ত করা হইতেছে। ইহাতে অনন্বয় প্রভৃতি দোষদুষ্ট একটি অভিনব শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রসঙ্গত ইহাও বক্তব্য যে, জ্ঞাতসার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতির মুখে আমরা ইহাও শুনিতে পাই যেঁ, কাব্য লিখিয়া সময় নষ্ট করা একটা অকর্ম্মণ্যতার নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গের প্রসঙ্গে আমাদের দেশপ্রচলিত একটা মেয়েলী কথা মনে পড়িল। কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত আচরণ দর্শনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কথাটা নিতান্ত কটু হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন।

কথাটা এই—"বামুনের পাতে লবণ নাই ধোপার পাতে চিনি।" ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞাবশতঃ লবণটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া প্রিয়তম ধোপার পাতে চিনি দিবার ব্যবস্থা যেমন অসঙ্গত, তেমনই খাঁটী সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া অবান্তর বিষয়ের সমাদর ও তাহাতেই সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ আমাদের মনে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী ভাষার প্রভুত্ব বশতঃ অনেক শব্দেরই পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ অর্থের পরিবর্ত্তে অভিনব অদ্ভুত অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটী শব্দ দেখাইতেছি। "অধ্যাপক" এই শব্দটি অধ্যাপন-ক্রিয়ার কর্ত্তাতে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ। নিয়মপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসের নাম অধ্যয়ন, এই অধ্যয়ন যিনি করান তিনিই অধ্যাপক। ইহাও বলা আবশ্যক যে, নিয়ম বলিতে বেদাধ্যয়নের নিয়মই অভিপ্রেত, বর্ত্তমান স্কুল কলেজের নিয়ম নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতমণ্ডলী পূর্ব্বতন অধ্যাপকের পক্ষে এই সংজ্ঞা নাকচ করিয়া লম্বাবেতনধারী শিক্ষককেই অধ্যাপক নামের প্রতিপাদ্য করিয়াছেন, এবং খাঁটী অধ্যাপককে পণ্ডিতের তালিকায় নিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক।

হিন্দু সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুর সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইল, এখন সাহিত্যের কিছু বিবরণ প্রদর্শন আবশ্যক। সংহিত শব্দ বা সহিত শব্দের পর যন্‌প্রত্যয় যোগে "সাহিত্য" এইরূপ সিদ্ধ হইতে পারে। বিবিধ শাস্ত্রের সমন্বয়ে অর্থাৎ মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হয়, সুতরাং শাস্ত্রবিশেষের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং কবির মনোগত ভাব ইহাতে সংহিত অর্থাৎ মিলিত হয়; অতএব ইহার নাম সাহিত্য। সহিত্ অর্থাৎ মিলিত প্রতিপাদ্য বিষয়নিচয়

ইহাতে সম্বন্ধ হয়; অতএব ইহা সাহিত্য। সংহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি হইলে বর্ণনাশরীত্যনুসারে অনুস্বারের লোপ বুঝিতে হইবে।

উক্ত সাহিত্য সুকুমার বস্তু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইক্ষু প্রভৃতি কঠিন বস্তুকে মাড়াইয়া যেমন তাহা হইতে সুমধুর তরল রস বাহির করা হয়, তেমনি কঠিন শাস্ত্রীয় বিষয়নিচয় কৌশলক্রমে সাহিত্যাকারে অর্থাৎ কাব্যাকারে পরিণত করা হয়। কাব্যরচনোপযোগী শক্তি বড়ই দুর্লভ। ইহা সকলের ভাগ্যে হয় না। মানুষ ইচ্ছা করিলেই আজগবী অনুমানের বলে প্রত্নতত্ত্বের ঢেঁড্‌রা বাজাইতে পারে, কিন্তু কবিলভ্য যশঃপ্রাপ্তির অভিলাষ পূর্ণ করা বড়ই কঠিন।

ভাগ্যবলে পুণ্যফলে যাঁহারা কবিত্ব শক্তি লাভ করিতেন, পূর্ব্বকালে তাঁহারা সভ্য সমাজে অতীব সম্মানার্হ হইতেন। দর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে নিবন্ধ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াও প্রাচীন হিন্দু কবিগণ সর্ব্বশেষে কাব্য রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, এবং অতীব গৌরবানুভব করিতেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচয়িতা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাকবি শ্রীহর্ষ এবং বেদভাষ্য-প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা মাধবাচার্য্য এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীহর্ষ খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যরূপ অপূর্ব্ব দর্শন রচনা করিয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াও স্বকীয় নৈষধ কাব্যকে অধিকতর আদরের বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ পরাশর-মাধব প্রভৃতি গ্রন্থরচনার পর শেষ জীবনে সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থান কালে "শঙ্কর দিগ্বিজয়" রূপ মনোহর কাব্য লিখিয়া পণ্ডিত জীবনের কর্ত্তব্য যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য কত মধুর কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার ইয়ত্তা হয় নাই।

সে কালের হিন্দু কবিগণ অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের অপেক্ষা না করিয়া অপরিপক্কাবস্থায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তাহার কারণ এই যে, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার যেমন শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত, তাহাদের কাব্যরচনার পদ্ধতিও তেমনই শাস্ত্র-নিগড়ে সংযমিত। হিন্দু কবির কল্পনা স্বাধীন হইলেও ভাষা স্বৈরিণী হইতে পারিত না। তবে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ভাষার যে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আর্ষপ্রভাব বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। হিন্দু সাহিত্যে ছন্দের প্রভাব অতীব প্রবল। ছন্দের অনুরোধে অনেক স্থলে ব্যাকরণের প্রভুত্বও খর্ব্ব হইয়া যায়। খ্যাতিবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ,

আচারবিরুদ্ধ প্রভৃতি কথা কাব্যে সন্নিবেশিত হইলে কাব্যদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং কবিও সুধীবৃন্দের অবজ্ঞাভাজন হইয়া থাকেন। অন্যের ভাব সম্পূর্ণরূপে চুরি করিয়া কাব্য লিখিলে কবি বান্তাশী অর্থাৎ অন্যের বমিভোজী বলিয়া কথিত হন। তার পর কোন্ রসে কোন্ ছন্দ খাটিতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম হিন্দু সাহিত্যে পালনীয়রূপে বিবেচিত হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া কবিকে লেখনী সঞ্চালন করিতে হইত। বর্ত্তমান যুগের কবিদিগের মত সেকালের হিন্দু কবিগণ নিরঙ্কুশ লেখনী পরিচালনে সর্ব্বত্র সাহসী হইতেন না। মধ্যযুগে কাব্যের অধিকতর সমাদরের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ সময়ে কাব্যানুসঙ্গি অলঙ্কার শাস্ত্রেরও অধিক উন্নতি হইয়াছিল। অলঙ্কার প্রসঙ্গে আমরা এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব। কাব্যশাস্ত্রের অধঃপতনাবস্থা দেখিয়া কোনও একজন কবি ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন—

> "বাল্মীকেমু্নিসত্তমাৎ সমজনি ব্যাসাদিভিঃ পালিতা
> বৈদর্ভীকবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।
> সাসূতেঽমরসিংহ শঙ্খকনিকান্ সেয়ং জরা-নীরসা
> শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কংকং ন কিন্তো নাশ্রিতা।"

ইহার অর্থ—মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি হইতে বৈদর্ভী অর্থাৎ বিদর্ভদেশীয় রীতি সম্পন্ন কবিতা সঞ্জাত হইয়াছিল। অনন্তর উহা ব্যাস প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক পালিত হইয়া নিজেই স্বয়ম্বর রীতিতে কালিদাসরূপ বরকে বরণ করিয়াছিল। তৎপর সেই কবিতা অমর সিংহ, শঙ্খ ও কনিক, এই কয়টি প্রসিদ্ধ কবিকে প্রসব করিয়াছে। অধুনা জরাজীর্ণাবস্থায় নীরস অর্থাৎ শরীরপোষক রস ধাতু রহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইদানীন্তন কাব্যের আর পূর্ব্বের মত অলঙ্কার শাস্ত্র প্রসিদ্ধ রস অনুভূত হয় না। এখন উহার পদ মৃদু, তাহাও স্খলিত হইতেছে, এ অবস্থায় পড়িয়া যাইবার সময়ে পৃথিবীতে কাহাকে না আশ্রয় করিতেছে? পক্ষান্তরে এখন আর কাব্যের ওজস্বী অস্খলিত অর্থাৎ ব্যাকরণ দোষরহিত প্রয়োগ জুটিতেছে না, ধরণীমণ্ডলে এখন রামকান্ত শ্যামকান্ত সকলই কবি। বৃদ্ধাবস্থায় রমণীদিগের গাত্রে অলঙ্কার থাকে না। এখনকার কবিতাও শূন্যালঙ্কারা, অর্থাৎ রূপকানুপ্রাসাদি অলঙ্কার রহিত। কবির এই উক্তির সত্যতা আমরা এখন পদে পদেই অনুভব করিতেছি। অধিকন্তু অধুনা মামুলী বাঙ্গা কবিতা রচয়িতাদিগের বান্তাশণ পদ্ধতির অনুসরণ অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়।

মাতা অথবা পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ঐ নিমন্ত্রণ পত্র সংস্কৃত কবিতায় লিখিবার রীতি আছে। এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে, অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপর কবিতা রচনার ভার পড়ে, তখন অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয় পিতৃ-পিতামহাদির সঞ্চিত পুরাতন নিমন্ত্রণ পত্রের খাতা খুলিয়া কেবল বার তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বকীয় অনন্যসাধারণ কবিত্বের দৌড় জাহির করিতে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। সুতরাং শ্রাদ্ধীয় নিমন্ত্রণ পত্র মাত্রেই প্রায় গঙ্গোত্তুঙ্গ তরঙ্গেরও "ইষ্টপাদপদ্ম যুগলং স্মারং স্মারং"এর একঘেঁয়ে সুরের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

আর মহাকবি জয়দেব কি মাহেন্দ্রক্ষণেই "ক্রীড়ং কোকিলকাকলী কলকলে"র আমদানি করিয়াছিলেন, যে তাহার প্রতিধ্বনি আধুনিক কবির কাব্যে অপ্রাসঙ্গিক স্থলেও শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের নিমন্ত্রণ পত্রীর কবিতাবলীও স্থিরলগ্নেই রচিত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে সেই আদিম অবস্থার সুরের ব্যতিক্রম অদ্যাপি লক্ষিত হইতেছে না।

যাহা হউক, প্রাসঙ্গিক কথা ছাড়িয়া এখন প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাইতেছে। হিন্দুকাব্যে জন্মান্তরবাদ নিহিত থাওয়ায় ইহাতে ভালবাসার যে অনন্যসাধারণত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অনেক স্থলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা ক্রমে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা সরল প্রাণ গোপরমণী বিরহে কাতর হইয়া সখীকে বলিয়াছেন,—

"যদি সখি যাসি নিকুঞ্জং মাধব চরণে নিবেদনীয়ং নঃ
যুগশত-কোটি নিমিত্তং প্রেম বিলুপ্তং কিমদ্যৈব ?"

ইহার অর্থ—হে সখি! তুমি যদি নিকুঞ্জে যাও, তবে প্রিয়তম মাধবের চরণে আমাদের কিছু নিবেদন আছে। তাঁহার সহিত আমাদের যে প্রেম, উহা শত কোটি যুগের জন্ম, অর্থাৎ শতকোটি যুগে যত জন্ম হইবে, তাহাতেও এই ভালবাসা ফুরাইবার নহে, তাহা কি আজই ফুরাইয়া গেল ?

সহৃদয় পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, এই যে শতকোটি জন্ম ব্যাপী অবিনশ্বর ভালবাসার কল্পনা, উহা হিন্দু সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র সম্ভবপর হয় কি ?

আবার আদর্শ সতী হিন্দু মহিলাদিগের পবিত্র চরিত্র জন্মান্তরবাদের সংমিশ্রণে কিরূপ পবিত্রতররূপে হিন্দু সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শৈশব হইতে চির সহচরী সরলচেতা পতিপ্রাণা, জনক-দুহিতা অপরাধ ব্যতীত কেবল লোকনিন্দার ভয়ে গর্ভিনী অবস্থায় দোহদচ্ছলে রাম

কর্ত্তৃক অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া রামের প্রতি কোনও কোপচিহ্ন ধারণ করিলেন না; প্রত্যুত রামকেই একান্ত চিত্তে ভাবিয়া তাঁহার নিকটে লক্ষ্মণের দ্বারা মনোগত ভাব নিবেদন করিলেন—

"সাহং তপঃ-সূর্য্য নিবিষ্ট-দৃষ্টি, রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।

ভূযোযথামে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা নচ বিপ্রয়োগঃ।"—রঘুবংশ।

সেই আমি সন্তান প্রসবের পর সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিহিত করিয়া তপস্যা করিতে চেষ্টা করিব, যাহার ফলে জন্মান্তরেও তুমিই আমার পতি হইবে, এবং এই জন্মের মত ভবিষ্যজ্জন্মে আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না। এই যে প্রতিহিংসা-শূন্যভাব, এবং ভাবিজন্মের সুখলালসায় বর্ত্তমান দুঃখে তুচ্ছ জ্ঞান, ইহা জন্মান্তরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসশালী হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় কবির কল্পনায় আসিতে পারে কি? জন্মান্তরবাদের মূলগত যে অদৃষ্টবাদ রহিয়াছে; যাহার প্রভাবে শত শত বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও হিন্দু পরের দোষ না দেখিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া ইহা নিজেরই জন্মান্তরীণ দুষ্কর্ম্মের ফল মনে করিয়া নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হয়, সেই অদৃষ্টবাদেও হিন্দু সাহিত্যের অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়াছে। সীতার আকস্মিক ভাগ্য বিপর্য্যের ঘটনা বর্ণনেও কবি অদৃষ্টবাদের প্রকটন দ্বারা সীতা চরিত্রের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"ন চাবদদ্ ভর্ত্তুরবর্ণ মার্য্যাঃ নিরাকরিষ্ণো র্বৃজিনা দৃতেঽপি।

আত্মান মেব স্থির দুঃখভাজং পুনঃ পুন র্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ"।

পবিত্র চরিত্রা সীতা নিষ্কারণে পরিত্যাগকারি ভর্ত্তার কোন রূপ নিন্দা বাক্য বলিলেন না, কেবল স্থির দুঃখভাগী আত্মাকেই পাপী বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিলেন।

সীতা ভাবিলেন, রামের দোষ কি? তিনি আমাকে প্রাণভরা ভালবাসেন, তাহা আমি জানি, তবে তিনি যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, উহা আমারই কর্ম্মফল। আমি পাপ করিয়াছি; সুতরাং তাহার ফল আমাকেই ভুগিতে হইবে, ইহা ঈশ্বর-বিহিত অপরিহার্য্য নিয়ম।

পরলোকে মিলন প্রসঙ্গে কবি শূদ্রক মৃচ্ছকটিকের উপক্রমে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। ক্ষুধায় কাতর সূত্রধার গৃহে উপস্থিত হইয়া অস্বাভাবিক আড়ম্বর দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি? গৃহিণী বলিল—আর্য্য! আমি উপবাস গ্রহণ করিয়াছি। সূত্রধার বলিল—এ উপবাসের নাম কি? গৃহিণীর উত্তর—এই উপবাসের নাম অভিরূপ পতি,

অর্থাৎ ইহার ফলে মনোজ্ঞ পতি লাভ হয়। সূত্রধার জিজ্ঞাসা করিল—ইহার ফল কি ইহলোকে হয় অথবা পরলোকে হয়? গৃহিণীর উত্তর—পরলোকে।

তখন সূত্রধার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল—ভদ্র মহোদয়গণ আপনারা দেখুন, আমার অন্ন ব্যয়ের দ্বারা পরলোকে প্রাপ্য পতি অনুসন্ধান করিতেছে। তখন গৃহিণী বিনীত ভাবে বলিল,—আর্য্য! প্রসন্ন হও; তুমিই জন্মান্তরে আমার পতি হইবে। তখন সূত্রধারের ক্ষোভ প্রশমিত হইল। এইরূপ জন্মান্তর-বাদের অক্ষুণ্ণ প্রভাব হিন্দুর প্রত্যেক সাহিত্যেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শিত করিতে চেষ্টা করিব।

পনরই বৈশাখ।

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল।]

(১)

প্রজারঞ্জক আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বের সময়ই বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। বর্গীরা প্রজাগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত, শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল উৎখাত করিত—প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদের গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিত। ১১৪৮ সনে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার এক সেনাপতির উপর সকল ভার অর্পণ করেন।

বৈশাখের মধ্যভাগ। সেনাপতি আহারান্তে তাঁহার তাঁবুর ভিতর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দুই জন অধীনস্থ সৈনিক এক প্রাণদণ্ড-আজ্ঞা-পত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইল।

"এটা কিসের কাগজ?" তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রাণদণ্ড-আজ্ঞাপত্র। একজন সৈনিক প্রাতে ইহাকে পাহাড়ের উপর ধরিয়াছে।"

"লোকটা কোথায় যাচ্ছিলো?"

"বলে তার ভাইকে দেখবার জন্য আসছিল। কিন্তু সে সব মিথ্যা কথা। লোকটা পাকা বদমায়েস। আমাদের দলের দু'চার জন বলে ওকে চেনে। বধ করা হবে ও?"

"আচ্ছা, এই দাও।"

তিনি আজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হুকুমটা বিশেষ বিচার না করিয়াই তাড়াতাড়ি দেওয়া হইল। কাজটা ভাল হইল না। লোকটা হয়ত নির্দ্দোষও হইতে পারে। তাঁহার মনে একটু অনুতাপেরও উদয় হইল। তিনি আদেশ রোধ করিবার জন্য দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন, কিন্তু বধ্যভূমিতে যাইয়া দেখিলেন, হতভাগ্যের জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। বেচারীর রক্তাক্ত কলেবর ভূমির উপর শায়িত। লোকটী যুবক ও দেখিতে সুশ্রী। কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

বিশ্বনাথকে বধ করিবার সময় অনেক দর্শক বধ্যভূমিতে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তাহার ভাইও তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিল। হত্যাকার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সে তাহার বিধবা বৌদিদির নিকট গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানান্তর গম্ভীর ভাবে বলিল "এর প্রতিহিংসা না নয়ে জলগ্রহণ করবো না।" তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

এমন সময় কে একজন দরজায় ধাক্কা মারিল।

বড় ছেলে দরজা খুলিয়া দেখে তাহাদেরই এক প্রতিবেশী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। ইনি পাড়াপ্রতিবেশীর হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন; সেই জন্য পাড়ার লোকেরা ইহাকে বাবাঠাকুর বলিয়া ডাকিত ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

"বাবাঠাকুর এসেছেন।"

তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন বিশ্বনাথের ভাই একটি বহুদিনের অব্যবহৃত মরিচাপড়া তরবারি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিতে বসিয়াছে। মৃতের দুটি বালকপুত্রও তাহাকে সাধ্যমত এ কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। হতভাগিনী বিধবা শুষ্ক নেত্রে তাহাদের সম্মুখে বসিয়া এ সব নিরীক্ষণ করিতেছিল।

"তুমি তা'হলে প্রতিহিংসা লবার জন্য সব বন্দোবস্ত করছো?" বিশ্বনাথের ভায়ের দিকে তাকাইয়া কঠোর স্বরে বাবাঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

অস্ত্রটি পরিষ্কার করিতে করিতেই সে উত্তর দিল, "তা'রা বিনা দোষে কাপুরুষের ন্যায় আমার ভাইকে হত্যা করেছে!"

"প্রতিহিংসার চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর করে দাও। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে। দোষীকে শাস্তি দিবার ভার তাঁর উপর। পৃথিবীতে যা'রা

অন্যায় কার্য্য সমাধা করে, এ জন্মে অবিরাম অনুতাপানলে তারা দগ্ধ হবে, ও পরজন্মে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।"

তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধে দু'চারটা কথা বলিলেও, মোটের উপর অনেকটা সুফলই ফলিল। সে অস্ত্রটি সরাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "অনেক ভেবে দেখলাম, আপনি যা' বলছেন, তাই ঠিক। আমার হয়ে তারই বিবেক দংশনএর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে। আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, তার রক্তপাত করবার জন্য কখনও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না।"

(২)

সেদিন সন্ধ্যার সময় সেনাপতি বিষণ্ন অন্তঃকরণে প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক পার্শ্বরক্ষক অনুচর দ্রুতপদে তাঁহার শিবিরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার মুখ কাগজের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘন ঘন কাঁপিতেছে। সে সেনাপতির হাতে একখানি গালা-আঁটা পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল,—

"১১৪৮ সন ১৫ই বৈশাখ বিশ্বনাথ মরিয়াছে। সেনাপতি ১১৪৯ সন ১৫ই বৈশাখ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর ঠিক বার মাস।"

চিঠির তলদেশে পত্রলেখকের নাম স্বাক্ষর পড়িবার যো নাই।

"এ চিঠি কে নিয়ে এলো ?"

অনুচর ভীতিবিহ্বল স্বরে উত্তর করিল,—"বিশ্বনাথ।"

"বিশ্বনাথ! সে ত মারা গেছে! তুই পাগল হয়েছিস ?"

"আমি স্বচক্ষে তার হত্যা দেখেছি। মৃতদেহ যখন শ্মশানে নীত হয়, তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি মিথ্যা কথা বলবো না। কারণ এ সবের হিসাব নিকাশ একদিন এক জনকে আমাকে দিতেই হবে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। আমি শপথ করে বলতে পারি যে, সেই আমার হাতে চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

সেনাপতির বীরহৃদয় এ সব কুসংস্কার বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করিল বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত পত্র পাঠে তাঁহার মন বড়ই অশান্ত হইয়া উঠিল। যাহোক, তিনি ভাবিলেন দিনকতক বাদে এ ঘটনার কিছুই তাঁহার মনে থাকিবে না। আর বাস্তবিকই পাঁচ দিন পরে তিনি উহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন।

পরবর্ত্তী মাসের চৌদ্দ তারিখে সেনাপতি দু'চার দিনের জন্য কাহাকে কিছু না বলিয়া বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী আসিলেন। পরদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিল, একজন রোগা লম্বা লোক এখানি সেনাপতিকে দিবার জন্য তাহাকে দিয়া গেল। এ চিঠিখানির বাহ্যাকৃতি ও ভিতরের লিখিত বিষয় সর্ব্বাংশেই প্রথম খানির অনুরূপ; কেবল মাসের সংখ্যা বারোর পরিবর্ত্তে এগারতে পরিণত হইয়াছে। ইহা পড়িয়াই সেনাপতির মনে সেই অতীত আশঙ্কার ছায়া আবার নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল। কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপও আবার ভূতের ন্যায় তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। ভয়গ্রস্ত বিবেকবাণী যেন তাঁহাকে স্থির বলিয়া দিল যে, এই রহস্যের সহিত নিশ্চয়ই অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক কিছু ব্যাপার জড়িত হইয়া আছে। তিনি যে এখানে আসিবেন, সে অভিপ্রায় ত তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, রাজদরবারে অবকাশের প্রার্থনা না করিয়াই গোপনে গত রাত্রে এখানে পৌঁছিয়াছেন। সাধারণ মানুষে কি শক্তির বলে তাঁহার এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া এ প্রকারে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইবে? একটা উদ্বেগ ও অশান্তির ছায়া তাঁহার মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার আহার নিদ্রা একেবারে দূর হইল। এ চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তিনি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইলেন। কিন্তু কিছুতেই নিস্তার পাইলেন না। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল।

দশম তারিখ আবার তিনি এক বন্ধুর বাড়ী প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যান। সমবেত বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় চাকর আসিয়া তাঁহার হাতে গালা দিয়া আঁটা একখানি পত্র দিল। পরক্ষণেই তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাক্‌শক্তি যেন তাঁহার একেবারে লোপ পাইল। পরে অসুখের ভাণ করিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর হইতেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন প্রকার ক্রীড়াকৌতুকে তিনি আর যোগদান করিতে পারিলেন না। সুখভোগ এখন তাঁহার নিকট সুদূর অতীতের বপ্নরাজ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেদিন আর ফিরিবে না। কেবল ক্ষণস্থায়ী একটা সান্ত্বনা, ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়াই আবার অতীতের যা কালশী স্মৃতি লইয়া তীরে ভাসিয়া উঠা। তিনি শারীরিক পরিশ্রমে ও যুদ্ধ-

কার্য্যে দিন রাত নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া স্মৃতিপিশাচীর দংশন-যন্ত্রণা এড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্তফলক হইতে অপসৃত হইল না। তীক্ষ্ণধার শরের ন্যায় সেটা সেখানে বিঁধিয়া রহিল। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে নিহত যুবকের সেই রক্তাক্ত দেহ ভূমিশায়িত দেখিতেন এবং তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টিও সর্ব্বদাই যেন তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত।

(৩)

শ্রাবণ মাস ও পরবর্ত্তী মাসগুলি এই প্রকারে কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে পাহাড়ে বহুক্ষণ বেড়াইয়া ক্লান্তচরণে বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি এক ক্ষুদ্র তটিনীর তীরবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আসিতেছেন, পথের মোড়ে পাহাড়ের তলদেশে দণ্ডায়মান এক লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লোকটা হঠাৎ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি তাহার সম্মুখীন হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। এ কি, এ যে বিশ্বনাথ! তাঁহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল; তাঁহার ডান হাত অলক্ষিতে কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিল। তিনি তদ্দ্বারা লোকটাকে সজোরে আঘাত করিলেন। সে ছায়াকৃতির ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি খেলিয়া গেল। নিশ্চল ভাবে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া যেন যাদুমন্ত্রের দ্বারা অদৃশ্য হইল। সেনাপতি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া দেখিলেন, লোকটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে লেখা, আর মাত্র ছয়মাস এ পৃথিবীর আলোক বাতাস ভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে!

এ ঘটনার পর সেনাপতির মনে আর বিন্দুবিসর্গও সন্দেহ রহিল না যে, এই অদ্ভুত রহস্যের ভিতর নিশ্চয়ই কিছু অস্বাভাবিক আছে। তাঁহার ভয় ও মানসিক যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। পরবর্ত্তী মাসে যেদিন নূতন পত্র পাইবার কথা, সেদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সেদিন দিনের বেলা কিছুই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল না। সন্ধ্যা আগত হইতেই তিনি ভাবিলেন বোধ হয় যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দের সহিত বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র সেতু উত্তীর্ণ হইতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই সেনাপতি

চিনিতে পারিলেন যে, এই বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্প্রতি দস্যু বলিয়া ধৃত, ও রাজ-দরবারে তাহার দোষও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল ইহার বাড়ী ঘেরোয়া করিয়া সর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া আসিয়াছে। সমূহ বিপদপাতে বৃদ্ধের মাথা বোধ হয় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিম্বা তাঁহার নিকট কোনরূপ সাহায্যপ্রার্থী। তিনি আর তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ধীরভাবে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ এক পাও না সরিয়া তাঁহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "আমি আপনার জন্যই এতক্ষণ পথে অপেক্ষা করছিলাম।"

"তুমি আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলে? কেন? যারা রাজবিদ্রোহী, দস্যু, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নাই।"

"আপনার ধারণা ভুল। তবে শুনুন,—"

এ অপমানে সেনাপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আমাকে বিনা শাস্তিতে কেহ কখনও সামান্য অপমানও করে যায় না। অস্ত্র ধর; আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হও।"

"কিসের জন্য? সংসারে আমার যা কিছু বন্ধন ছিল, সব জোর করে তুমি ছিন্ন করে দিয়েছ। তদবধি এ দুঃখময় জীবন আমার কাছে মস্ত বড় একটা ভার বলে মনে হয়। শুধু আত্মরক্ষা কেন, ইচ্ছা করলে এর উপযুক্ত প্রতিশোধও নিতে পারতাম। ধর্ম্মের বল আমার দিকেই, ধর্ম্মযুদ্ধে অসি ধরতে পাপীর হাতই সর্ব্বদাই কাঁপে।"

"কই, আমার হাত কি কাঁপছে?" সেনাপতি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ ঘৃণাসহকারে ঈষৎ হাসিল। পরে পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া কৃত্রিম ধীরভাবে বলিল,—"আমার কার্য্য ফুরালো। এর জন্যই আমার আসা। ওকি, তোমার হাত কাঁপে কেন?"

সেনাপতি পত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, পত্রলেখক কে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু অদূরেই শিবনাথের গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁহার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে।

(৪)

এই জীবণ নির্য্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সেনাপতি অনেক

চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। সে সব অনেক কথা। তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। তিনি কিছুতেই মনের শান্তি পাইতেন না। শান্তির অন্বেষণে কাজকর্ম্মে অবসর লইয়া নানা জনহীন প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যাহাতে এ সাম্বাতিক পত্র আর তাঁহার নিকট না পৌঁছাইতে পাবে। কিন্তু বাসস্থান গোপন রাখিবার বিশেষ চেষ্টা সত্বেও প্রতি মাসের ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে পত্র তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল।

শেষে বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিয়া সুদূর সিংহল দ্বীপে তাঁহার এক ভগ্নীর শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। বিদেশী বণিকদের জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালার শেষ সীমা অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার মনে হইল যেন হৃদয় হইতে মস্ত একটা গুরুভার নামিয়া গেল। কিন্তু মধ্যরাত্রে পথে সমুদ্র-বক্ষ স্ফীত করিয়া প্রবল ঝড় উঠিল। জাহাজ টলমল করিতে লাগিল। সেনাপতি জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নাবিকদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তারকার ক্ষীণ আলোকে বিশ্বনাথকে তাহাদের মধ্যে দেখিয়া আতঙ্কে তাঁহার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় জাহাজের কামরায় যাইবার পথে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া গেল এবং কাল গালা আঁটা একখানি পত্র ঠস্ করিয়া তাঁহার পদতলে ফেলিয়া দিল। ইহাতে এ হতভাগ্য পলাতকের মন যে গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল এবং উদ্ধার লাভের এই শেষ ক্ষীণ আশাটুকুও একেবারে নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

তিনি যথাসময়ে ভগ্নীর গৃহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার চেহারার এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তাঁহাকে চিনিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইল। তাঁহার চিন্তা-জীর্ণ দেহ মৃত্যুবিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেকার সে সদাপ্রফুল্ল ভাবের পরিবর্ত্তে বিকৃত বদনে যেন বিষাদের কালিমা সর্ব্বদাই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বড়ই চঞ্চলমতি ও অল্পভাষী এবং যৌবনেই অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। এ সব অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে বৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইত না।

একদিন অপরাহ্নে মল্লক্রীড়া দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় পথে তাঁহার ভগ্নী তাঁহার এই সদা বিমর্ষ ভাবের কারণ জানিবার জন্য বড়ই জিদ করিতে

লাগিলেন। সেনাপতি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তাঁহার কথা শুনিলেন। ভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নারীসুলভ কোমল কণ্ঠে তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"কেন বৃথা এত কষ্ট পাচ্ছ? তোমার মুখ দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায় যে! যদি কোনও কৃতকর্ম্মের অনুতাপানল দিনরাত মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে, তাহলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত কর। মনে বিমল শান্তি পাবে। কি হয়েছে, আমার কাছে বল, লক্ষ্মী ভাইটি আমার!"

মূর্ত্তিমতী করুণার শীতলকর স্পর্শে তাঁহার বুক হইতে যেন একটা পাষাণের চাপ সরিয়া গেল। তিনি হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"হায়, আমার মতন আর হতভাগ্য পৃথিবীতে কে আছে? ঈশ্বরের নিকট যে অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করে প্রার্থনা করবো, সে সান্ত্বনা লাভ হতেও আজ আমি বঞ্চিত। অথচ আজ সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষীণ জীবন-প্রদীপও চিরঅন্ধকারে নিভে যাবে। এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রী হতে তোমাদের কাছ থেকে, চিরবিদায় গ্রহণ করতে হবে। দেখ, দেখ ঐ যে,—" বলিতে বলিতে তাঁহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। রাস্তার অপর ধারে মৃদুমন্থর গতিতে চলিতেছে, একটি লম্বা লোকের দিকে তিনি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিলেন।

সেনাপতিকে কোনও রকমে কোলে করিয়া বাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পথটুকু হাঁটিয়া যাইতে পারিলেন না।

তাঁহার ভগ্নীর বিশ্বাস হইল যে, এ অদ্ভুত রোগের উৎপত্তি-স্থল ভ্রাতার বিকৃত মস্তিষ্ক। সেনাপতিকে একটা ঘরের ভিতর বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া তাঁহারা ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে সন্ধ্যা হইবার অনেক পূর্ব্বেই ঘরে প্রদীপ জ্বালিলেন। সেনাপতি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত প্রায় দেখিয়া বিছানার উপর ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল অথচ বিশেষ কিছুই ঘটিল না দেখিয়া তিনি নিজেকে অনেকটা সুস্থ বিবেচনা করিলেন। সাহসে ভর দিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া এতদিন যে বৃথা কল্পনায় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া তিনি তাহাদের সহিত রসিকতা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এমন সময় নীচের সিঁড়িতে কাহার পদ-

শব্দ শুনা গেল। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া কে একজন রোগীর শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। সেনাপতি সেই অপরিচিত ব্যক্তির দিকে তাকাইবামাত্র তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছে! তখন সেই সবে মাত্র দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে, সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন।

এ ব্যক্তি বিশ্বনাথের ভ্রাতা।

সেনাপতির ভগ্নীপতি সক্রোধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে তোমার কি দরকার?"

"আজ্ঞে সেনাপতি মহাশয় যে জাহাজে এখানে এসেছেন, আমি সে জাহাজের একজন নাবিক। আমাদের জাহাজ আবার কাল দেশে ফিরে যাবে। তাই খবর দিতে এলাম, যদি ইহার দেশে কা'কেও কিছু সংবাদ দেবার থাকে।"

আধুনিক গবেষণা।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

পূর্ব্বতন পণ্ডিত-সম্প্রদায় গ্রন্থের পাঠ লাগাইতে পারিলেই কৃতকৃত্য হইতেন; গ্রন্থকার হিন্দু, না বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, না শূদ্র, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক, না পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণা করিবার জন্য তাঁহারা মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের আবির্ভাব-কালাদি সম্বন্ধে নানাবিধ আন্দোলন আলোচনা হইতেছে, ইহা যে সুখের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গ্রন্থকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে, গুরু শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহার গ্রন্থসকল অধ্যয়ন না করিলেও অন্ততঃ সাধারণভাবেও সেই গ্রন্থকারের পুস্তকাবলীর সর্ব্বাংশে একবার চক্ষুঃসংযোগ করা উচিত। যে গ্রন্থ-কর্ত্তার প্রাদুর্ভাব ও জীবনী সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য, অবহিত হইয়া তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিলেই বহু উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। অন্যত্র প্রমাণ সংগ্রহের পূর্ব্বে গ্রন্থকারের স্বলিখিত গ্রন্থসমূহের আলোচনাই 'প্রত্নতাত্ত্বিক'গণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা লিখিতে হইবে, তাঁহার গ্রন্থ পড়া না থাকিলে বিবিধ ভ্রম প্রমাদ ঘটিবারই অত্যন্ত সম্ভাবনা।

খ্যাতনামা মনীষী রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ বাহাদুর, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী সহিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। শাস্ত্রী মহাশয়, গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থকার বিশ্বনাথের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সভায় 'ভাষাপরিচ্ছেদ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। * * * ঐ প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বনাথকৃত গৌতম-সূত্রবৃত্তি গ্রন্থের উপসংহার হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলি মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় না, পরন্তু ইণ্ডিয়া আপিস্ পুস্তকালয়ের পুস্তক ও বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের হস্ত লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের জন্য ক্রীত একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে তিনি ঐ শ্লোকগুলি দেখিয়াছেন। শ্লোকগুলি এই :—

এষা মুনিপ্রবরগৌতমসূত্রবৃত্তিঃ শ্রীবিশ্বনাথকৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাম্বুজচঞ্চরীকঃ (?) শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃপ্রচয়ৈরকারি ॥
কঠিনার্থপদাং কৃতিং যদেতাম্ মৃদুনি ত্বচ্চরণে সমর্পয়ামি।
অপরাধমিমং প্রভো ক্ষমেথা ননু নারায়ণ দেব দীনবন্ধো ॥
রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে বহুলে কামতিথৌ শুচৌ সিতাহে।
অকরোন্মুনিসূত্রবৃত্তিমেতাং ননু বৃন্দাবিপিনে স বিশ্বনাথঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের ভ্রমর, গ্রন্থকার বিশ্বনাথ মুনিপ্রবর-গৌতম-রচিত সূত্রের বৃত্তি শ্রীমচ্ছিরোমণির (শ্রীরঘুনাথ শিরোমণির) বাক্যাবলম্বনে সুগম ভাষায় সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছেন. হে দীনবন্ধো নারায়ণ, আমি আমার কঠিনার্থ-পদ-বিরচিত এই নিবন্ধ আপনার কোমল চরণে সমর্পণ করিতেছি। হে প্রভো, আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। এই সেই বিশ্বনাথ শক নরপতির ১৫৫৬ অব্দে (১৬৩৪ খৃঃ অব্দে) জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) এই মুনিসূত্রবৃত্তি প্রণয়ন করেন।"—(ভূমিকা, /০—৶০ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রামাণ্যে সন্দিহান। তিনি লিখিয়াছেন, "তবে মুদ্রিত পুস্তক সমূহে যখন ঐ শ্লোকগুলি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তখন উহাদের প্রামাণিকত্বে সন্দেহের অবকাশ নাই, এ কথা বলা

যায় না।" * * * বিশ্বনাথকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ বা গৌতমসূত্রবৃত্তি—**কোন গ্রন্থেই শিরোমণির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।** * * এরূপ স্থলে "শিরোমণিবচঃপ্রচয়ৈরকারি" ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তবে মুক্তাবলী গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় "বস্তুতস্তু প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেনে"ত্যাদি ব্যাপ্তির যে সিদ্ধান্ত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শিরোমণিকৃত গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ লক্ষণ কাহার উদ্ভাবিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং উক্ত লক্ষণ হইতে **বিশ্বনাথ ও শিরোমণির পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় হইতে পারে না।**"—(ভূমিকা, ৴৹—৶৹ পৃঃ)

এই ভাবে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া বিশ্বনাথের সময় নিরূপণের উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, এক ঘটককারিকা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ঘটককারিকায় বিশ্বনাথকে ভট্টনারায়ণ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ [ভট্টাদ্ দ্বাদশকঃ কামঃ বিশ্বনাথঃ ত্রয়োদশঃ।] বলা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এক্ষণে যদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনকাল ৯৯৯ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করা যায় * * আর যদি প্রাচীনগণের দীর্ঘজীবিতা স্মরণ করিয়া ৪০ বৎসরে এক এক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাব কাল ৯৪২ + ৫২০ = ১৪৬২ খৃঃ অব্দ হইয়া পড়ে ও তিনি কাণভট্ট শিরোমণির, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৫-১৫২৭ খৃঃ) সামসময়িক ছিলেন, কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন। টোলের অধ্যাপক মহাশয়দিগের মতেও বিশ্বনাথ, শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। অতএব এই শেষোক্ত মত গ্রাহ্য করিলে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী ও কাণভট্ট শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।"—(ভূমিকা, ৶৹—৷৹ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, "এষা মুনিপ্রবরগৌতমসূত্রবৃত্তিঃ"—ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে চাহেন যে, বিশ্বনাথ, রঘুনাথ শিরোমণির পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। আর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে উক্ত শ্লোকগুলি অপ্রমাণ, তাই তিনি ঘটককারিকার অনুসারে বিশ্বনাথকে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত স্থির করিয়া শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, উদ্ধৃত শ্লোক তিনটীর মধ্যে "শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃপ্রচয়ৈরকারি॥"—ইত্যন্ত প্রথম শ্লোকটী, মুদ্রিত ন্যায়

সূত্রবৃত্তির উপসংহারে নিবদ্ধ আছে। তবে "শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাম্বুজচঞ্চরীক" এখানে বিসর্গ নাই, চতুর্থ চরণের সহিত সমাস হইয়াছে। বিসর্গান্ত পাঠ অশুদ্ধ, 'অকারি' এই ক্রিয়া পদ কর্ম্মবাচ্যের নিষ্পন্ন, সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাম্বুজ চঞ্চরীকঃ' এই প্রথমান্ত পদ 'শ্রীবিশ্বনাথকৃতিনা' এই তৃতীয়ান্ত কর্তৃপদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় উক্ত প্রথম শ্লোকের "অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের ভ্রমর গ্রন্থকার বিশ্বনাথ—" এইরূপ যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ নহে। "শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃপ্রচয়ৈরকারি" এই শ্লোক, বিশ্বনাথের গোতমসূত্রবৃত্তিতে থাকুক, আর নাই থাকুক, তিনি যে দীধিতিকার কাণভট্ট রঘুনাথ শিরোমণির পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশ্বনাথ যে রঘুনাথের পরবর্ত্তী, এ সম্বন্ধে ঘটককারিকা বা হস্তলিখিত পুঁথির বিবাদাস্পদ কাচিৎক পাঠের অনুসন্ধান করিতে হয় না, বিশ্বনাথের স্বীয় গ্রন্থ গোতমসূত্রবৃত্তিতেই অতি স্পষ্টভাবে তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। "যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ"—(১।১।৩০) এই গোতমসূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকরের মতের কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন যে, "যদর্থসিদ্ধিং বিনা যোঽর্থঃ শব্দাদনুমানাদ্ বা ন সিধ্যতি সোঽধিকরণসিদ্ধান্ত ইতি, বস্তুতস্তু শব্দত্বমনুমানত্বঞ্চাবিবক্ষিতং প্রমাণমাত্রমপেক্ষিতম্।" ইহার ভাবার্থ এই যে, যে পদার্থসিদ্ধি ব্যতীত যাহা কোনও প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। যেমন ইন্দ্রিয়নানাত্ব সিদ্ধ না হইলে "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ"—(৩।১।১) এই সূত্রে যে আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, এইরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সে প্রতিপাদন হইতে পারে না, এইজন্য এ স্থলে ইন্দ্রিয়নানাত্ব অধিকরণ সিদ্ধান্ত। [ইন্দ্রিয়ে চৈতন্য স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, চাক্ষুষ জ্ঞানের আশ্রয় চক্ষুরিন্দ্রিয়, স্পার্শন জ্ঞানের আশ্রয় ত্বগিন্দ্রিয়। অন্যথা একই ইন্দ্রিয়কে নিখিল জ্ঞানের আশ্রয় স্বীকার করিলে অন্ধের স্পার্শন, ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগগ্রস্তের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। এই ভাবে যখন চক্ষুঃ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিতে হইবে, তখন অতিরিক্ত আত্মা না মানিয়া ইন্দ্রিয়কেই চৈতন্যের আশ্রয় বলা যায় না। কেন না, 'যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি স্পর্শ করিতেছি' এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং এই 'আমি' বা চৈতন্যের আশ্রয় যে এক, তাহা মানিতে হইবে।

কাজেই অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করিলে উপায় নাই।] বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, এ স্থলে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতানুসারেই অধিকরণ সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনাথ, উদয়নাচার্য্যকৃত "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র 'দীধিতি' নামক টীকায় বার্ত্তিককারের লিপি উদ্ধৃত করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়নানাত্বই যে অধিকরণ সিদ্ধান্ত, তাহা প্রতিপন্ন হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, উদ্ধৃত ১।১।৩০ সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে স্পষ্টভাবে দীধিতিকারের নাম করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, "তত্রচ বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যোঽর্থঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্ত ইতি বার্ত্তিক-ফক্কিকাং লিখিত্বা যেন কেনাপি প্রমাণেন বাক্যার্থসিদ্ধৌ অনুমানাদ্যাং যোঽন্যার্থঃ সিধ্যতি স তথেত্যর্থঃ, ইতি ব্যাখ্যাতং দীধিতিকৃতা।" বিশ্বনাথ-বৃত্তিতে এইরূপ স্পষ্টভাবে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির নামোল্লেখ থাকিলেও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিশ্বনাথকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ বা গৌতমসূত্রবৃত্তি—কোন গ্রন্থেই শিরোমণির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।" দীধিতিকারের নামোল্লেখযুক্ত বিশ্বনাথবৃত্তির পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠ অন্বেষণের জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না,—প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকেই ত্রিংশসূত্রের ব্যাখ্যাবসরে উহা লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যদি বিশ্বনাথবৃত্তির "ইতি ব্যাখ্যাতং দীধিতিকৃতা"—এই পাঠ দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর অনর্থক বাদানুবাদের অবসর হইত না। রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, ঘটককারিকা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "উপরি উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রামাণিকত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।" (ভূমিকা, ।/• পৃঃ) কিন্তু উক্ত বচনের প্রামাণ্যে আমাদের বহু সন্দেহ হইতেছে। তথাকথিত ঘটককারিকায় লিখিত আছে,—

"চত্বারঃ কামদেবস্য পুত্রা বিশারদাঃ স্মৃতাঃ। বিশ্বঃ কৃষ্ণঃ হরিঃ সোমঃ সর্ব্বে নাথান্তসংজ্ঞিতাঃ॥
বিদ্যাবন্তো যশস্বন্তঃ সর্ব্বে রাজ্যভাজশ্চ তে। ভট্টাদ্ দ্বাদশকঃ কামঃ বিশ্বনাথঃ ত্রয়োদশঃ॥
* * * * ক্ষ্মাপতিরপি ছাত্রাণামধ্যাপনে রতঃ সদা।"

কামদেবের চারি পুত্র—বিশ্বনাথ, কৃষ্ণনাথ, হরিনাথ, সোমনাথ। প্রত্যেক ভ্রাতারই রাজ্য ছিল। বিশ্বনাথ রাজা হইয়াও ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনায় রত ছিলেন। কামদেব পর্য্যন্ত কোনও রাজ্যের কথা নাই, হঠাৎ তাঁহার চারি পুত্র কেমন করিয়া রাজ্য পাইলেন, জানি না। আবার একজন রাজা নহে,—চারি

ব্রাহ্মণাই রাজ্যের অধিকারী,—"সর্ব্বে ব্রাহ্মণাজন্ত তে।" সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বিশ্বনাথ যে রাজা ছিলেন, তাহার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আর কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং যে ঘটককারিকার এইরূপ অসম্ভব কথা নিবদ্ধ আছে, তাহার প্রামাণ্যে আমাদের খুবই সন্দেহ হয়। পরিশেষে আমরা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষাতেই বলি, তাঁহার "নির্ণীত কল অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা করা ব্যতীত আর উপায় নাই।"

আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বাগ্রে সেই সেই গ্রন্থকারদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহের অনুশীলন করেন। গ্রন্থকারের নিজের লেখায় তাঁহাকে যেরূপ ধরিতে পারা যায়, অন্য সহস্র প্রমাণেও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা সন্দর্ভ সমাপ্ত করিলাম :—

"বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।" স্বদেশপ্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অমরকবি বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এরূপ কথা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল। এখন সে প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক লেখা লিখিতেছে। সুতরাং এখন যথাযোগ্য ভাবে ইতিহাস রচনা করিবার প্রয়োজনের কথা শুনাইবার সময় আসিয়াছে। এখন আর "যে যাহা লিখুক না কেন," তাহাকে "মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি" বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই।"—"ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক," "সাহিত্য," কার্ত্তিক, ১৩২১।

স্ত্রীশিক্ষায় হারিসন।

[৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।]

নারী জাতির কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-কল্পে, য়ুরোপীয় সাময়িক সাহিত্যে কিয়ৎকাল হইতে প্রবল প্রবন্ধ-যুদ্ধ চলিয়াছে। এই প্রবন্ধ-নিচয় বিশ্লেষ করিলে প্রতীত হয় যে, য়ুরোপের পণ্ডিতবর্গ ও সমীচীন ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণ, তথাকার নারী-

সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আদৌ সন্তুষ্ট নহেন; প্রত্যুত সে সমাজের আশু অশুভ ফল উপলব্ধি করিয়া, এবং নিত্য সংঘটিত শোচনীয় অবস্থা নিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা মহা শঙ্কিত হইয়াছেন। ফলতঃ নারীদিগের পুরুষোচিত শিক্ষা, পুরুষোচিত শ্রম ও পুরুষদিগের সমকক্ষত্ব-প্রিয়তা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এতাদৃশ স্থলে যাইয়া এখন উপস্থিত হইয়াছে যে, রশ্মি সংযত করিয়া সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে, গৃহীর গার্হস্থ্য-জীবনের সুখশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতার অতলস্পর্শী গহ্বরে অচিরাৎ নিপতিত হইবে। সংপ্রতি হার্পার্স ম্যাগাজিন নামক মাসিকপত্রে জনৈক মার্কিন লেখক যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি ভয়ঙ্কর, অতি শোচনীয় এবং বীভৎস। ম্যাগাজিনের লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে, "আমেরিকায়—য়ুরোপে গৃহীর আর এখন গৃহ নাই। উত্তম উত্তম অট্টালিকা আছে,—ক্ষুদ্র বৃহৎ নিবাস স্থান আছে; তথায় স্নানাহার সমাধা হয়, রাত্রি যাপন ও নিদ্রাগমনও করা হয়, ক্ষৌরকার্য্য, বেশবিন্যাস ও বিলাসদ্রব্যের উপভোগও লোকে তথায় করে; কিন্তু এই সকল স্থল গৃহ নহে;—পান্থ-নিকেতন। কারণ "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" গৃহীর গৃহে গৃহিণী নাই। গৃহিণী তবে কোথায়, গৃহিণী ষ্ট্রীটে, গৃহিণী ক্লবরুমে, কনফারেন্স মিটিংয়ে; গৃহিণী থিয়েটারে, অপেরায়, বেলাভেটাস্কী লজে; গৃহিণী কলে-কারখানায়, কলেজে, হাটে বাজারে,—গৃহের বাহিরে সর্ব্বত্র, কেবল গৃহে নহেন। গৃহ গৃহিণীশূন্য। যদি বা কচিৎ গৃহিণী উপস্থিতা থাকেন, তৎকালে তিনি শ্রম বা বিলাসক্লান্তা; স্নায়বীয় অবসাদে অবসন্না; শয্যা বা ইজি-চেয়ারে শায়িতা, অর্দ্ধ উপবিষ্টা; ম্রিয়মাণা; ঈষদুষ্ণ চা বা অম্ল অম্ল "আলকহলে" ক্লান্তি-কাতরতা প্রশমিত করিতেছেন।"

গার্হস্থ্য-জীবনের কি সুখদ, শীতল দৃশ্য ইহা! বিলাতী গৃহস্থালীর গৌরব অতি প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে আর সভ্যতার আগুনে সে গৌরব এখন বিনাশোন্মুখ। গৃহস্থ ভীত, চকিত, ব্যাকুলিত হইয়াছেন; সমাজ-নেতৃগণ সুপন্থা আবিষ্কারে সযত্ন হইতেছেন। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল, এ সম্বন্ধে সাহিত্যে শক্তিশালিনী লেখিকা বিবি লিন লিনটনের অভিমত নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকটিত করিয়াছিলাম। অদ্য এ সম্বন্ধে য়ুরোপের অতি উচ্চ স্থানীয় পণ্ডিত ফ্রেডরিক হেরিসনের অভিমত আমরা আলোচনা করিব। এ আলোচনায় আমাদের আর কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নাই; উদ্দেশ্য কেবল এদেশীয় উন্মাদ অত্যুন্নতিশীল

সমাজ-সংস্কারকদিগের প্রচারিত সংস্কাররূপ সখের জলপানের বিষাক্ত ফল প্রদর্শন করা। যুরোপ ঠেকিয়া শিখিয়াছে, ঠকিয়া শিখিয়াছে; তাহার পরিগৃহীত পন্থা ত্যাগ করিয়া, পরিবর্ত্তিত করিয়া সমাজ ও সংসারের সুখ শান্তি রক্ষার্থে নূতন পন্থা আবিষ্কার ও অবলম্বনের উপায় অনুসন্ধান করিতেছে। যুরোপ যাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া, যাহাতে জলিয়া পুড়িয়া, যাহাতে অনন্ত অসুখের আকার ও অস্বাভাবিক অনুভব করিয়া, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছে, আমাদের উন্নতিশীলগণ তাহাই প্রাপ্ত হইবার জন্য উধাও দৌড়িতেছেন, সনাতন হিন্দুসমাজে কতই না অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন। হায় অদৃষ্টের ঐ কি বিষম বিড়ম্বনা! যুরোপ অন্ততঃ তাহার দূরদর্শী বিবেচক ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ আমাদের সনাতন সামাজিক পন্থা,—যথাসম্ভব অবলম্বন করিবার জন্য উদ্‌গ্র হইয়াছেন, আমাদের পুণ্যশ্লোকগণ কিন্তু পবিত্র পথ ভঙ্গ করিয়া অসার যুরোপীয় উপকরণে তাহা গঠন করিবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছেন! ভবিতব্যের একি ভয়ানক লীলা! মানব-চিন্তাস্রোতের একি বিচিত্র প্রবাহ!!! সাহেব বিবিরা চাহেন হিন্দু জেনানা, আর বাবু বাব্বীরা চাহেন বিবি সাহেবিয়ানা! যে সংখ্যা নাইন-টিনথ্‌ সেঞ্চুরিতে বিবি লিন লিনটন বিবি-য়ানা চাল চলনের উপর চূড়ান্ত আঘাত করিয়াছেন, সেই সংখ্যাতে এক ভারতীয়া মহিলা (কুমারী সরবজী) বিবিয়ানির জন্য ব্যতিব্যস্ততা জানাইয়াছেন। দুই দিক দিয়া দুই দ্বিবিধ বিপরীত স্রোত; অপরূপ দ্বন্দ্ব। মেয়ে কোন্দলে মর্ম্মস্পর্শী কথা! কিন্তু পরিপক্কবয়স্কা প্রাজ্ঞতায় পারদর্শিনী বিবি লিন লিনটনের পার্শ্বে স্বল্পবুদ্ধি শফরীচঞ্চলা পার্শি-বালিকার লেখনী ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা এবং "বাবু-বুদ্ধির" পরিচায়ক হইয়াছে। এখন এংলোইণ্ডিয়ানেরা এ বিবাদে কি বলেন? এই শ্রেণীর জনৈক ভদ্রলোক এই সেদিন মাত্র স্বজাতীয় সমাজ প্রথার প্রতি আক্ষেপ-কটাক্ষ করিয়া এবং হিন্দু-কুলবতী প্রথার গুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রাত্যহিক ষ্টেটসম্যান পত্রে বলিতেছিলেন,—

If I were an oriental, I should distinctly act towards Women and accept them according to the rules laid down in the Holy Books of the Hindoos…ইত্যাদি।

যৎকালে যুরোপে এবং এংলোইণ্ডিয়ান সমীচীন সাহেবদিগের মধ্যে এই প্রকার সদ্ভাব এবং সৎচিন্তা চলিতেছে— ঠিক সেই সময়েই আমাদের কাংগ্রেসিক

কৃতীগণ "গোপেন কনফারেন্স" করিয়া সনাতন হিন্দু সমাজ সংহার করিতে উদ্যোগী! অহো বিড়ম্বনা! বলিহারি তোমায়!

ফ্রেডরিক হ্যারিসন জগত্ত কোমৎ প্রচারিত হিতবাদ তত্ত্বের বর্তমান নেতা,—পণ্ডিত, প্রবীণ, প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি। ইনি সাম্য স্বাধীনতার শত্রু নহেন; প্রকৃত স্বাভাবিক সাম্যের ও সুনিয়মিত স্বাধীনতার মন্ত্র-শিষ্য, তাহাদের শক্তিবান সমর্থক। এই ফ্রেডরিক হ্যারিসন স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-জাতির শিক্ষা ও স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে সংপ্রতি "ফর্ট নাইট্‌লি রিবিউ"তে যে এক অতি সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই দুই চারি কথার প্রতি আজ আমরা আমাদিগের সৌখিন সংস্কারক কোম্পানীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এই সঙ্গে অবশ্য ইহাও বক্তব্য যে, উপরোক্ত পত্রে মিষ্টার হ্যারিসনের সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের বিপরীত অভিমত-ব্যঞ্জক আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; সেটী বিবি ফসেট কর্ত্তৃক লিখিত। আন্দোলনে বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছে কি না, তাই এ প্রকার জোড়া প্রবন্ধে তর্ক যুদ্ধ। বিবি ফসেটের সন্দর্ভে আর সবই আছে; নাই কেবল সারত্ব এবং সূক্ষ্মদর্শন; সুতরাং তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে এবং যদ্দ্বারা হ্যারিসনের অকাট্য একটী কথাও কাটা পড়ে নাই; বরং সিমন্তিনীদিগের অস্বাভাবিক শিক্ষায় যে সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফ্রেডরিক হ্যারিসন বলেন, স্ত্রীলোক হয় স্ত্রীলোক হইবে; নতুবা নিষ্ফলা পুরুষ হইবে। আধুনিক অস্বাভাবিক শিক্ষায় য়ুরোপীয় নারীগণ নিষ্ফল নর (Abortive men) হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদের নারী ধর্ম্ম অত্যদ্ভুত ও অব্যবহার্য্য পুংধর্ম্মে পরিণত হইতেছে! তাঁহারা আপনাদিগের অতি মূল্যবান জীবন অনর্থক মাটী করিতেছেন; আপনাদিগকে অবমানিতা এবং অত্যন্ত নিম্ন-গামিনী করিতেছেন। কুশিক্ষায়, কদাচারে ও নারী জন্মে অনুচিত ব্যবসায়ে ও ব্যবহারে স্ত্রীগণ স্ত্রীলিঙ্গবিচ্যুত (unsexed) হইতেছেন; পতিভক্তি, সন্তানপালনাদি নারী জাতির নারী-ধর্ম্ম ত আছেই; তাছাড়া তাঁহারা সমাজের সুশিক্ষক এবং উন্নত সভ্যতার প্রবর্ত্তক। নারী জাতির স্বধর্ম্ম পালন, নরের সহিত সমকক্ষতা দ্বারা সিদ্ধ হয় না; ইহা স্কুলের উচ্চ শিক্ষা এবং আফিসের কাজকর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না; ইহা সিদ্ধ হয়, ইহা সংসার-যুদ্ধে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও সিদ্ধ হয় না; ইহা সংসারের শীতল ছায়ায়, গৃহের অভ্যন্তরে গৃহিণীর গৌরবময় কার্য্য দ্বারা; ইহা সিদ্ধ হয় আত্মসংযম, আত্ম

ত্যাগ, স্নেহ কোমলতা প্রীতি এবং পবিত্রতার সাধনা দ্বারা। পবিত্রতাই স্ত্রী জাতির সর্ব্বোচ্চ সাধন। এ সাধনা বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীতে সচ্ছেদ করিতেছে না; সম্যক প্রকারে সংহার করিতেছে। আধুনিক প্রথা নরনারীকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন করিতে চাহে; কিন্তু এই নিরঙ্কুশ অবাধ-স্বাধীনতা কি আদৌ সম্ভব? সমাজ শরীর, সাম্রাজ্য শরীর, সমগ্র মানব-সংহিতা, সংসার, ধর্ম্ম, সমস্তই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর সংস্থাপিত। নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এ সমস্তেরই বিরোধী। নারীজাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা যুরোপীয় সমাজ নিশ্চয়ই ধ্বংস করিবে। যখন নর নারী মাত্রেই সঙ্গী ও সঙ্গিনীর পরিবর্ত্তে পরস্পরে প্রতিযোগী হইয়া সংসার-আসরে নামিবেন, যখন তাঁহারা এ'ক অপরকে সাহায্যের পরিবর্ত্তে উভয়ে একই অর্জ্জনের জন্য কলহ করিবেন; যখন নরের এবং নারীর একই প্রকার অভ্যাস এবং একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হইবে, তখন আর নারীর নারীত্ব থাকিবে না; পুং ও স্ত্রী চিহ্ন ব্যতীত নরনারীতে তখন আর প্রভেদ থাকিবে না; সমস্তই নর হইয়া যাইবে; নারীত্ব লোপ পাইবে। এই অবস্থা হায়! অচিরেই বা য়ুরোপে মার্কিণে দেখিতে হয়!

আমাদের সংস্কারের সখের সৈন্য দল সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের বিধি মানেন না; হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থায় মানেন না; কিন্তু কোমৎ শিষ্যের কথা মানিবেন কি? এক দিন না তাঁহারাই কোমৎ ধর্ম্মে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন?

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
পত্রাবলী।

আমি তখন মডেল স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার শ্রেণীতে পড়ি। 'এডুকেশন গেজেট' আমাদের বাড়ীতে আসিবার কিছু দিন পরেই আমার মধ্যম ভগিনী-পতির সহিত ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসিয়া-ছিলেন। শুনিলাম হাইকোর্টের উকীল এবং চিন্তাতরঙ্গিণীর লেখক। মডেল স্কুলের এবং নিজেদের বাড়ীর বাঙ্গালা পুস্তক অনেকই পড়িয়াছিলাম; সেই সঙ্গে চিন্তাতরঙ্গিণীও পড়ি। প্রথম খানিকটা বেশ লাগিয়াছিল, তাহার পর

সম্ভবতঃ বেশ বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তেমন ভাল লাগে নাই। এডুকেশন গেজেট যখন আমাদের বাড়ীতে আসিল, তখন একদিন আমার মধ্যম ভগিনী-পতির সহিত আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছিলাম। 'হতাশের আক্ষেপ' এডুকেশন গেজেটে বাহির হয় এবং পর পর অন্যান্য কবিতা বাহির হইতে লাগিল। সুমিষ্ট কবিতাগুলি সকলকেই ভাল লাগিত। আমি একটী ছোট খাতায় ঐগুলি আঁটিয়া রাখিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে কবিতাবলীর প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয় এবং আমি ঐ খাতাটী ছাপিবার সুবিধা জন্য দেওয়াতে একখণ্ড পুস্তক উপহার পাই।

ভারত বিলাপ এবং ভারত সঙ্গীত প্রকাশিত হইবামাত্র হেমবাবু যে পদ্মিনী উপাখ্যানের লেখক অপেক্ষাও বড় কবি হইয়া দাঁড়াইলেন তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। হেমবাবুর 'ইন্দ্রের সুধাপান' যে কয়েকটী শিক্ষিত সাহিত্যিক মজলিসে মদ্যপান সময়ে উচ্চৈঃস্বরে মহোৎসাহের সহিত পঠিত হয় ইহা আমাদের বারিকের মাঠে ছাত্র-সম্প্রদায়ের সান্ধ্য মজলিসে সম্বাদ আসিয়াছিল। ঐ সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তিদিগের অনেকেই পানদোষে দুষ্ট ছিলেন। 'ইন্দ্রের সুধাপান' বঙ্গদর্শনে ছাপা হইয়াছিল। তখন আমাদের ইংরাজী পড়া চলিতেছে। ড্রাইডেনের আলেকজাণ্ডারস্ ফীষ্ট সেই বারিকের মাঠে আনিয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া বাঙ্গালী কবিরই প্রাধান্য এণ্ট্রান্স ক্লাসের দলপতি ছাত্রেরাও আমাদের নিকট খ্যাপন করায় আমাদের জাতীয় গৌরব তৃপ্ত হইয়াছিল। হেম বাবুকে আমাদের বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছিলাম। ভক্ত জানিয়া একটু স্নেহের সহিত সম্বোধন করিতেন। একদিন শুনিলাম যে জোড়াবাটের ঠিক উপরের বাড়ীতে বঙ্কিমবাবুর বাসায় আসিয়াছেন। দুজনকে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পিতৃদেবের আদেশে গিয়া দেখিলাম যে হেমবাবু দাঁড়াইয়া একটা বোতল মুখে ধরিয়া সুরাপান করিতেছেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "দেখ! তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কাণ্ড দেখ!" হেমবাবু বোতল নামা' বলিলেন "তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের অতিথি-সৎকার দেখ। গেষ্ট ক্যাননট বি চুজার্স (অতিথি ত ইচ্ছামত খাইতে পায় না।)।" তাহারা দুজনে খুব হাসিলেন এবং বলিলেন, একটু পরেই আমরা যাইব।

তখন ইহাঁদের পান ভোজনের দোষ ছিল—সেটা সকলের জানা কথা—সেইজন্য এই বিষয়ের উল্লেখে সঙ্কোচ করিলাম না। কিন্তু উহাঁদের দুই জনের 'ভারত সঙ্গীত' এবং 'বন্দে মাতরং' যে বাঙ্গালীকে "জন্মভূমির পূজার স্তোত্র' দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হেমবাবুর সহিত আমার অনেকবার দেখা হইয়াছে। অন্যান্ত বারের কথা তেমন মনে নাই। শেষ দেখা হয় ৺কাশীতে তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার পূর্ণ বাবুর অট্টালিকায়। তখন হেমবাবু অন্ধ, তখনও কিছু কিছু কবিতা লিখিতেছিলেন। খুবই যে ক্ষুব্ধ এরূপ দেখিলাম না। পিতৃদেবের কথাই হইয়াছিল। "তোমার বাবাই আমার জীবনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার সহিত সংসর্গে এবং তাঁহার ফরমাইসেই 'ভারত সঙ্গীত' এবং 'ভারত বিলাপ।' সে সবই তুমি জান। যোগেন্দ্র ঘোষের সহিত কোমটির দর্শন সম্বন্ধে তোমার পিতার চিঠি পত্র আমি দেখিতাম এবং দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে আমার সহিতও চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল। পিতৃতুল্য তাঁহার কথা শুনিয়া যদি কিছু কিছু সঞ্চয় করিতাম। যতবার দেখা হইয়াছে, ততবারই বলিয়াছেন "কত জমাইলে ? ওকালতীর পেনসন নাই, কিন্তু এখন এদেশে ৫৫ বৎসরের পর পুরা খাটুনিও করিতে নাই।" উঁহার নিকট হইতে বিদায় লওয়ার পর পূর্ণবাবু একটু সঙ্কুচিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা কি বলিলেন ?" আমি সব কথাই মোটামুটি বলিলাম। পূর্ণবাবু বলিলেন "কাগজওয়ালারা গোলমাল করিয়া উঁহার জন্ত ৫০৲ টাকা পেনসন ব্যবস্থা করিল—আমার কিন্তু বড়ই মনে কষ্ট হয়। উনি বড় ভাই, আমার অবস্থা ত মন্দ নয়। আমি ত সুখে রাখিতেছি এবং অক্লেশেই পারিতেছি। ওটা বেইজ্জতি ; যেন ওঁর আপনার কেহ নাই। ওটা প্রত্যাখ্যান করিলেই ভাল হইত।" আমি বলিলাম "ও ভাবে দেখিবেন না। বাঙ্গালী কবির বাঙ্গালা ভাষার সেবাকেও যে গবর্ণ-মেণ্ট এখন গবর্ণমেণ্টের এক ভাবে সেবা রূপে দেখিয়া কিছু পেনসন দিতে চাহিতেছেন তাহাতে একটা জাতীয় তৃপ্তি আছে। আমাদের জাতীয় অধি-কারের অনুমাত্র বৃদ্ধিতে আমাদের সকলের আনন্দিত হওয়া চাই।" পূর্ণবাবু একটু ক্ষুন্নভাবেই বলিলেন, "ভাই ঠিক ও ভাবে দেখিতে পারে না।"

হেমবাবুর দুইখানি ইংরাজী পত্র পাইয়াছি। উহাদের বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

(১)

খিদিরপুর, ৯ই নভেম্বর, ১৮৮২।

মহাশয়।

আমার প্রস্তাবিত কথামত আমি কাব্যটা একরূপে শেষ করিয়াছি। লেখাগুলি আপনার কিরূপ লাগিবে তাহা জানি না। সে যাহা হউক, যে

প্রথমাংশটি যাহা আপনার অত ভাল লাগিয়াছিল, ইহার দ্বারাই তাহা আমি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। সাধারণে কবিতাটি কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে —তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না এবং ঈর্ষাপরায়ণতা ও অনুপলব্ধি প্রযুক্ত সমালোচনার যন্ত্রণা যাহা আমার সহ্য করিতে হইবে— সে বিষয়ে আমার ভয় হইতেছে। কিন্তু এসব নৈরাশ্য, হতাশা ও প্রত্যাহত আত্মগৌরবের সময় আপনার অনুমোদনলাভই আমার একমাত্র আনন্দের বিষয় থাকিবে। আপনার সম্বন্ধে সুখ্যাতির কথা বলিতে যাওয়া আমার সাজে না, কিন্তু একথা না বলিলে নয় যে—কবিতাটির পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপনার সুন্দর পরামর্শটা আমাকে আপনার নিকট চিরবাধিত করিয়াছে। আপনার পরামর্শের সারবত্তা এবং আপনার ওজস্বী ও সমভাবে সহানুভূতিপূর্ণ ধীশক্তি সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু চুপ করিলাম।

আর একটী প্রার্থনা। উমার স্বরূপ একটী ধ্যান লিখিয়া দিতে পারেন কি যাহাতে তাঁহার স্নেহবত্তা সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের পরিচয় থাকিবে, রুদ্র কিছুই থাকিবে না। ধ্যানটি যেন উমার শিশু ক্রোড়ে জগৎজননী রূপে আবির্ভাবের উপযুক্ত হয়। যদি অনুগ্রহ করিয়া এইটি দেন—তো বড়ই বাধিত হইব।—সত্যকার তান্ত্রিক আমি যতদূর দেখিয়াছি এক আপনাকেই দেখিয়াছি। কাছারি খুলিবার পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আগামী সপ্তাহে কবে আপনি বাড়ীতে থাকিবেন ও আপনার অবসর থাকিবে লিখিবেন।

অনুগত

হেম।

(উপবোদ্ধৃতের উত্তর)

চুঁচুড়া—১১ই নভেম্বর, ১৮৮২।

প্রিয় হেমবাবু,

তোমার স্নেহপূর্ণ ও সম্মানসূচক পত্রের প্রত্যুত্তরে মাতৃক্রোড় শিশুরূপ মানব সমষ্টির চিত্র (হিউম্যানিটী) সম্বন্ধে কোমটির ধারণার বিষয় প্রথমে আমার কিছু লিখিবার আছে। এ ধারণাটী অতীব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি কোথায় এবং ইহাতে সত্যই বা কতদূর? মাইকেল এঞ্জেলো ব্যাফেল ও টিসিয়েন্ প্রভৃতি আপনাদের উদ্ভাবনী শক্তি অনুযায়ী যে মাতৃমূর্ত্তির (ম্যাডোনা মূর্ত্তি) অমর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতই তাহা হইতে সংগৃহীত। এই চিত্রকরেরা কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন? খৃষ্টধর্ম্মের পৌরাণিক

কথা হইতে। খৃষ্টধর্ম্মের উদ্ভব কোথায়? ইহুদীদিগকে পুরুষানুক্রমে যে সকল ক্ষমতাপন্ন প্রতিবাসী জাতিদিগের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল, সেই সকল জাতীয় দ্বৈত উপাসনার ফলে সংঘটিত ভ্রান্ত মত সংযুক্ত জুডাইজম্ হইতেই অধিকাংশে বোধ হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা যাহা সেণ্ট পল তাঁহার নিম্নলিখিত উজ্জ্বল মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "যাঁহাতে আমরা বিচরণ করি, জীবিত আছি এবং যাহার সত্ত্বাই আমাদের সত্ত্ব" জুডাইজমে সে ধারণার সম্পূর্ণ অভাব এবং সেইজন্য খৃষ্টধর্ম্মেও ইহার অত্যধিক অভাব আছে। মোট কথা খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপীয় আর্য্যদিগের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর জাতিদিগের দ্বারায় গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিধর্ম্মের যে মিলের সহিত ইহার উৎপত্তি,সে মিল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মাতৃমূর্ত্তি (ম্যাডোনা মূর্ত্তি) মানবজাতি বাচক বলিয়া ধরিতে গেলে স্বতই অপরিপূর্ণ। যদি কোমট্ ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি অধিকতর পরিসর গ্রহণ করিত, এবং তিনি যে তাঁহার পূজার লক্ষ্য মানবজাতিকে বিশ্ব প্রকৃতির সহিত একই করিতেন বলিয়াই মনে হয়। আরও একটু দেখ। মানবচিত্র যেরূপ কোমট ধারণা করিয়াছেন, তাহা কি নির্দ্দেশ করিতেছে? শিশুক্রোড়ে এক যুবতী মূর্ত্তি। দেখিতেই পাইতেছ যে, ইহাতে দুইটি মূর্ত্তি আছে, মাতা ও সন্তান। এই মাতা কে? প্রকৃতি। এই সন্তান কে? মানব। আমার বোধ হয় কোমট কোথাও এই ব্যাখ্যা দেখাইয়া দেন নাই। —তবে এ দ্বৈত্যবোধ কিসের জন্য? এ দ্বৈতচিত্রের জড় ও চৈতন্যের সহিত কোনও দূর সম্পর্ক আছে কি? কোম্‌ট কিন্তু তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। জড় ও চৈতন্যের সুসঙ্গত ধারণায় তাহারা 'সমকালীক' মাতা ও সন্তানের ন্যায় একের পূর্ব্বস্থানীয়, অপর নহে। যেখানে তন্ত্রে অদ্বৈত ধারণা হইতে দ্বৈত ধারণায় অবতারণা করা হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ধারণাই আছে। তন্ত্রে জড় ও চিতের ধারণা মাতা ও সন্তান পুরোবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী স্রষ্টা ও সৃষ্টরূপে করা হয় নাই; ভর্ত্তা ও ভার্য্যা, পরিধি ও অন্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষেত্র দুইটী সমবর্ত্তী বস্তুরূপেই ধারণা করা হইয়াছে। তাহার চিত্র এইরূপ—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দুকলাভরণ বিলোক্যহৃষ্টাং ভজেদ্ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রী॥

এ মূর্ত্তির চিন্তন কর। এ মূর্ত্তি অদ্ভুত ভাবে অতীন্দ্রিয়। তোমার মনে হইবে যে তুমি ঈশ্বরী (চিৎস্বরূপিনী) কে দেখিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল

তাঁহার পরিচ্ছদ, তাঁহার অলঙ্কার, তাঁহার ভাব ভঙ্গী মাত্র দেখিতেছ; এবং তাঁহার জগৎ-প্রেমও দেখিতে পাও; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাও না। তুমি গতিশীল ও ক্রিয়াশীল, যাহা যথার্থতঃ দেখিতে পাও, তাহা সেই জড় অংশ। উপরিউক্ত ধ্যানটি অন্নপূর্ণার ধ্যান। কিন্তু এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি যাহা দ্বৈত অধিকারীর জন্য—ইহা আদি মূর্ত্তি নহে—এই (তারা পরিবার) সমষ্টির প্রথম মূর্ত্তি ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি; তাঁহার প্রতি-প্রতিরূপে দ্বৈত নাই—অদ্বৈত। ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ—

উদ্যদ্দিন দ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচং নয়নত্রয়যুক্তাং।
বরদাঙ্কুশপাশ ভীতিকরাং
স্মেরমুখীং প্রভজে ভুবনেশ্বরীং॥

ইহাতে একটি মাত্র মূর্ত্তি আছে, এবং ইহাতে জড়কে চিৎ হইতে পৃথক করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া তুমি ঈশ্বরীর স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ; তাঁহার তুঙ্গকচযুগ্ তাঁহার ত্রিনেত্র তাঁহার ভীতিকর অস্ত্রধারী ও বরাভয় যুক্ত হস্ত সকল ও স্মিতমুখ দেখিতে পাইতেছ। হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলনে একটি বিষয় ভুলিলে চলিবে না। ইহার নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ (যোগিজম্) যাহা একেশ্বরবাদ (মনোথিজম্) নহে, নিখুঁত ও নিরঞ্জন, অদ্বৈতবাদ ইহার সার্ব্বকালিক দৃঢ় ধারণা—শুধু বিশ্বাস নহে যে এই ব্যষ্টি জগৎ বিশ্বাত্মার অবস্থিত। বহুদিন হইতেই আমি দেখিয়াছি, এবং বাস্তবিক আমাকে প্রথমে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবার, উহার ভিতরে ঢুকিবার ইহাই প্রকৃত চাবির স্থানীয় এবং আজ পর্য্যন্ত এই চাবিটী আমার নিকটে তন্ত্র ও পুরাণের গুপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যার অপারগ হয় নাই। কিন্তু না বলিতেছিলাম, ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে অদ্বৈত চিত্র এবং অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দ্বৈত চিত্র উভয়ই পূর্ণদৃষ্টির চিত্র। গণপতির নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সৃষ্টি কালীন মূর্ত্তি পাইয়া থাকি—

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ।
তদ্বীচি ধৌত পর্য্যন্তং মন্দমারুত সেবিতং॥
মন্দার পারিজাতাদি কল্পবৃক্ষলতাকুলং।
উদ্ভূত রত্নচ্ছায়াভিররুণীকৃত ভূতলং॥
উদ্যদ্দিন করিন্দুভ্যাং উদ্ভাষিত দিগন্তরং।
তত্র মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ॥

ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়ভিরনিশং প্রীতি বর্দ্ধনৈঃ
তস্যাধস্ত মহাপীঠে রচিত্তে মাতৃকাম্বুজে।
ষটকোণস্তি ত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ।
হস্তীন্দ্রনিনমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসাদাশ্লিষ্টং
প্রিয়য়া সাপদ্ময়েয়া স্বাকস্থয়া সন্ততং॥

তুমি জান যে গণপতি গণেশ = ব্রহ্ম = প্রাণ (শক্তি)। কাজেই দেখিতেছ আমরা এখনও প্রকৃতির কথাই বলিতেছি এবং প্রকৃতির যে অংশকে মানব সমষ্টি বলা হয় এবং যাহাকে কোমটবাদীরা পূজার বিষয় করিতে চান, এখনও তাহার কাছে আসে নাই। অবতার উপাসনায় মানবে ঈশ্বরোপাসনা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সন্তানের কথা পাই:—[এই স্থানটা যে "নকল" পাইয়াছি তাহাতে ফাঁক আছে। কোন সুপণ্ডিত ইহার উদ্ধার করিয়া দিলে উপকৃত হইব। ঐ ধ্যানটিতে গোপ এবং গোপীর কথা যে ছিল, তাহা পরের লিখিত অংশে সুস্পষ্ট।]

নিম্নলিখিত কথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক কি না বলিতে পারি না।

গো = পৃথিবী ; গোপ গোপী = পৃথিবীর রক্ষণশীল শক্তিপুঞ্জ।

তার পরের ধ্যানটীতে আমরা মানবের সাক্ষাৎ পাই।

উৎপ্রে হেমসঙ্কাশাং, লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাং
নানালঙ্কার সুভগাং শুক্লবাসাযুগাবৃতাং
লীলয়া দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম পাশাঙ্কুশ ধনুঃশরান্
ধাবাখং জগন্নাথং রক্ত পদ্ম রুণেক্ষণং॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের কথা বলিবার সময়ও হিন্দু ঈশ্বরবাদ স্ত্রী পুরুষ জড় চৈতন্যরূপ সমকালীক দ্বৈতের কথাই আনয়ন করেন, কোমট্ ও খৃষ্টধর্ম্মীর পরকালীক দ্বৈতের অবতারণা করেন না। আমি আবার বলিতেছি, হিন্দু চিন্তাশীলতা অদ্বৈত ধারণায় শিক্ষিত হওয়াই ইহার কারণ।

আরও দেখা যাউক। অনন্তের অচিন্তনীয় রাজত্ব ছাড়িয়া, কালের নিম্ন স্তরে, আসা যাউক। জ্ঞানের চর্চ্চার কথা ছাড়িয়া, কামনার বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই উপবিদ্যাদিগের স্তরে বনদুর্গা, সুরসুন্দরী—প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, মূর্ত্তি সকল ও উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী, কপালমালিনী প্রভৃতি

ভয়াবহ ও ভীষণ (যদি ঐরূপই বলিতে ইচ্ছা কর) চিত্র সকলের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এ সব বিষয়ে অধিক কথা বলা আবশ্যক মনে করি না। গণেশ-জননী যিনি সর্ব্বকাল ফলপ্রদারূপে উপবিদ্যাগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় তাঁহার ধ্যান দিয়ে দিতেছি। ইনি মহাবিদ্যা নহেন, পরাজ্ঞান ও মুক্তি দান ইহাঁর কার্য্য নহে, কিন্তু তথাপি ইনি কোমটের সমগ্র মানব ধারণার বিশেষ সন্নিকটবর্ত্তিনী।

তাঁহার স্বরূপ এই—

ধ্যায়েদ্ বরাননীং দেবীং লোচনত্রিয়ান্বিতাং
বিম্বোষ্ঠং চারুদশনাং হাস্যযুতাভয়প্রদাং
নানালঙ্কার সংযুক্তাং দ্বিভুজাং নীলচেলিকাং
ক্রোড়স্থিত গণেশেন পীতস্বাত পয়োধরাং
গৌরবর্ণাং ক্ষীণমধ্যাং রত্নপীঠোপরিস্থিতাং
গণেশ জননী দুর্গাং সর্ব্বকাম ফলপ্রদং।

আমার বোধ হয় অত্যন্ত খুঁতখুঁতে আধুনিকেরও ইহার সম্বন্ধে আপত্তির কিছু থাকিবে না। যীশু মাতা মেরীর মত অবশ্য তিনি শিবকে লইয়া দণ্ডায়-মানা নহেন। শিশু তাঁহার অঙ্কেস্থিত, আর শিশুকে তিনি স্তনদান করিতে-ছেন, কেবল সম্মুখে উপস্থিত মাত্রই করিয়া নহেন। মাতা ও সন্তান—ইহাতে কাল ও পর্য্যায় (একের পর অন্য) রহিয়াছে। তাঁহার সুন্দর দন্তপংক্তি, সুন্দর ওষ্ঠদয় এবং তাঁহার মুখে মাতৃস্নেহপূর্ণ স্মিতহাস্য—যে মাতৃস্নেহ বিশ্বজীবনের সহায়তাকারী—এগুলির প্রতি দৃষ্টি কর এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, ভারত-বর্ষে ইটালীর মত চিত্রকরগণ ছিলেন না বলিয়াই গণেশ-জননীর মূর্ত্তি ম্যাডোনা মূর্ত্তির মত সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয় নাই। কিন্তু কিন্তু—কিন্তু আর একটা বাধা আছে—"ত্রিনয়না" হিন্দু যে সকল মূর্ত্তিতেই মহান প্রকৃতির উপাসনা করিতেছে, সর্ব্বরূপেই সেই বিশ্ব মহানের পূজা একথা যে হিন্দু কিছুতেই ভুলিতে পারে না—ঐ ত্রিনয়ন তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই ত্রিনেত্র, ইহা সত্যই সুন্দর নহে কি? অবশ্য স্ত্রীজাতির ত্রিনয়ন নাই কিন্তু নাসিকার মূলভাগে কজ্জলটিপে তাহারা ইহারই অনুকরণ করে না কি?—ত্রিনয়ন কোন মতে অসামঞ্জস্যকর নহে।

স্নেহপূর্ণ
ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

(২)

খিদিরপুর, ১৮।১১।১৮৮২

মহাশয়।

আপনার শেষ পত্রে আমার জন্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রখানি অমূল্য এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির একান্তই চিন্তাকর্ষক হইবে। আমার উপরে ইহাতে অত্যুজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে এবং আমার মনে বড়ই ক্ষোভ উদ্রেক করিয়াছে যে, আমি আপনার নিকট-প্রতিবাসী নই এবং আপনার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গভীর জ্ঞানের পূর্ণ সুবিধা পাইতেছি না। আমি সামাজিক বিষয়ের এবং কোমটির দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই; কিন্তু যাহা জানি তাহাতেই আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবর যোগেন্দ্র বিশেষজ্ঞ; পত্রখানি তাহাকেও দেখাইলাম এবং দিলাম। আমার কাব্যখানি সম্বন্ধে আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। সতীকেই উত্তমরূপে শিবের পার্শ্বে দেখান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—হরগৌরীরূপে—তাহাই করিলাম। সন্তান-ক্রোড়ে জননীরূপে দেখাইলাম না। কৈলাসে জগৎসৃষ্টির সহিত এই মূর্ত্তির আবির্ভাবই দেখাইয়াছি।

আমি কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদিগকে দিয়াছি। আমাদের ইংরাজ মনিবদিগের নববর্ষের প্রথম দিনে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইতে পারিব। কাব্যটীর শেষাংশ লইয়া একদিন আপনার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—কি নানা কারণে তাহা ঘটে নাই। চিঠির উত্তর লিখিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

আপনার স্নেহাস্পদ—হেম

‘গোবিন্দলাল’-চরিত্র।

[লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।]

প্রখর মনোবিশিষ্ট মানব হয় খুব ভাল নয়ত খুব মন্দ হইয়া থাকে। উর্দ্ধে উঠিবার সময়ে তাহাদের যেমন তীব্র বেগ, নামিবার সময়েও ঠিক তদ্রূপই দেখা যায়। ‘শৈবলিনী’-চরিত্র সমালোচনাপ্রসঙ্গে আমরা এই তত্ত্বটি (নব্য-ভারতে ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যায়) পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। আজ আবার এমন একটি চরিত্রচিত্র পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি

তাহাতেও ঐ তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ যে সচ্চরিত্র, উদার ও পত্নীগত প্রাণ, কাল সে লম্পট, পরদাররত ও হত্যাকারী। মানবের কৃতকর্ম্ম অত্যুৎকট হইলে ইহজীবনেই তাহার ফল দেখা যায়—ইহা হিতোপদেশপাঠী বালক হইতে দার্শনিক পণ্ডিত পর্য্যন্ত অবগত আছেন।

"গোলাপকে যে নামেই ডাক না, তাহাতে কিছু যায় আসে না" ইহা পাশ্চাত্য কবির উক্তি। হউক, শুধু একজন পাশ্চাত্য কবির কেন, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির কথা। তথাপি ভারতের অধিবাসী, উপনিষৎ বেদান্ত পুরাণ-বাদী আমরা ইহা নতমস্তকে মানিয়া লইতে পারি না। যে দেশে মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষফলদ, নামের মহিমা ভগবানের চেয়েও বড়, শব্দের ভিতর ব্রহ্মের প্রকাশ সে দেশ ইহা মানিবে না। নাম ও রূপের ভিতর দিয়া অরূপ অনামের বিকাশ যেথানকার লোকের ধারণা, সে দেশের লোক ইহা শুনিবে না। কে বলিল নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ নাই? হউক সে ব্যবহারিক, তথাপি ব্যবহারিক জগতে উহাই সত্য সম্বন্ধ। গোলাপের নাম অঘোরঝিণ্টিকা, সাবিত্রীর নাম শূর্পনখা, রামের নাম কুম্ভকর্ণ হইলে কখনই মানায় না। যে যে জাতীয় মনোভাববিশিষ্ট, যাহার নামোচ্চারণে যে জাতীয় মনোভাবের স্ফুরণ হয়, সেই নামই তাহার স্বাভাবিক।

বঙ্কিমবাবুর অনেকগুলি চরিত্রে এইরূপ সার্থক নাম পরিকল্পনা আমরা দেখিতে পাই। আর আমরা যদি সর্ব্বত্র ঐ পরিকল্পনা নাই বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে, নামের কোন সম্বন্ধানুগত অর্থ নাই? রাশি নক্ষত্র বিচার করিয়া যে দেশে নাম রাখার পদ্ধতি, (অবশ্য রাশ নামই আসল নাম) সে দেশে নামের অর্থ অনুসন্ধান মাত্র বুদ্ধিকল্পিত একটি আবিষ্কার মাত্র নহে।

'অর্চ্চনা'য় ভ্রমর সমালোচনায়, 'নব্যভারতে' শৈবলিনী সমালোচনায়, 'ব্রাহ্মণ সমাজে' মহাশ্বেতা, কাদম্বরী প্রভৃতি সমালোচনায় আমি নামের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ যে অতি নিকট, তাহা বুঝাইয়াছি। যে কোন চরিত্র সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে সমালোচককে দেখিতে হইবে, নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ কতটুকু।

গোবিন্দলাল নামটির প্রথমে গোবিন্দ শব্দ, উহা নারায়ণের নাম। গোবিন্দ নামে একটি ভক্তিভাব ও ধর্ম্মপ্রাণতা বিরাজমান। প্রথমে ও শেষে যাহার ভাল দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যকার মন্দটা তত ধর্ত্তব্য নহে।

"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎতথা" বিশেষতঃ, যিনি শেষে সর্ব্বস্ব

গোবিন্দ পদে সমর্পণ করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, বৈরাগ্যে হউক বিকারে হউক, সাধনার ফলে যিনি শ্রীভগবানে মন দিয়া পরিণামে একজন যথার্থ মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন—তিনি যে কতদূর ভক্তির পাত্র, ও ধর্ম্মপ্রাণ, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। লাল কথাটি গ্রাম্য। এই গ্রাম্যতার যোগেই গোবিন্দলালের জীবনের মধ্যভাগ মোহে পাপে পরিপূর্ণ। গোবিন্দলালের জীবাত্মা যদি বাস্তবিকই পাপাত্মা হইত, তবে তিনি কখনই শেষ জীবনে ঐরূপ সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীভগবৎ পদে অর্পণ করিয়া প্রকৃত শান্তিরসাস্বাদে মনপ্রাণ তৃপ্ত করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে জলে ডুবিয়া মরা, আত্মহত্যা করিয়া চিরদিন অন্ধতামিস্র লোকে বাস করাই তাঁহার পক্ষে ঠিক হইত। মানব পূর্ব্বজন্ম হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, পিতামাতা হইতে যাহা লাভ করে, আর শিক্ষা সংসর্গ অবস্থাদি হইতে যাহা গ্রহণ করে, তাহার বলাবল এখানে বিচার করিব না। তাহা কঠোর দার্শনিক তত্ত্ব। সম্প্রতি "শাণ্ডিলী ও সুমনা" প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে 'ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকা'র পৌষ মাসের সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিতে পারেন। গোবিন্দলালের মধ্যকার ঐ যে পতন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বজন্ম হইতে বা পিতামাতা হইতে লব্ধ নহে। তাই গোবিন্দলাল উহা চিত্ত হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাই জীবনকে স্বর্গের চেয়েও পবিত্র ভগবৎপ্রেমামৃত রসাস্বাদে ভরপুর হইয়াছিলেন। আসল প্রেম যে কিরূপে ভগবৎপ্রেমের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, মোহের প্রবল আবর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাসিয়া গেলেও যে উহা এক স্থানে গিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা গোবিন্দলাল চরিত্রে দেখিতে পাই। গোবিন্দলালের জীবনে অভিমানের প্রাবল্য, ক্রোধের ঔৎকট্য, বিলাসিতার ঔজ্জ্বল্য দেখাইবার জন্য কবি "গোবিন্দ" কথাটির সহিত "লাল" যোগ করিয়া দিয়াছেন। রজোগুণ লাল। অভিমান, ক্রোধ, বিলাসিতা, রজোগুণেরই কার্য্য।

গোবিন্দলাল বড়লোকের ছেলে। আধুনিক ধর্ম্মভাবশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সভ্য, মার্জ্জিতরুচি, দয়ালু, উদার ও পত্নীপ্রাণ। তাঁহার যৌবনের রজোরাগপূর্ণ সৌখীন মনপ্রাণ একরূপ ভ্রমরের কালরূপেই আসক্ত ছিল। ধনীর ধর্ম্মভাবশূন্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সৌখীন মনপ্রাণের মধ্যে রূপতৃষ্ণা কতখানি ছিল বা না ছিল, কতটুকু সে সাধ মিটিয়াছিল কি না মিটিয়াছিল, প্রেমের মধ্যে মোহের কি পরিমাণ খাদ মিশ্রিত ছিল, তাহা আমরা অগ্রে জানিতে পারি

নাই; গোবিন্দলাল স্বয়ংও জানিতে পারেন নাই। আমাদের বোধ হয়, গোবিন্দলালকে শেষে শ্রীভগবচ্চরণে চিত্ত সমর্পণ করিতে হইবে বলিয়া, প্রকৃত সন্ন্যাসীর মহত্তম পদে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া, ঐ অতৃপ্ত অন্তরের গভীরতম দেশে অবস্থিত রূপতৃষ্ণা মিটাইতে হইয়াছিল। তাই অস্ফুট একটুখানি সাধ পরিপূর্ণ করা আবশ্যক বলিয়া উহা অমন প্রবল ভয়ানক পাপরূপে দেখা দিয়াছিল। আসল স্বর্ণ চাই বলিয়া খাদটুকু অগ্নির তাপে গলাইবার প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল। তাই গোবিন্দলাল লম্পট, পরদাররত ও হত্যাকারী। তথাপি আমাদের মনে হয়, ঐ হত্যাটি ইংরাজী সাহিত্য সেবার ফল। আর গোবিন্দলালও ইংরাজী শিক্ষিত আধুনিক রুচিসম্পন্ন প্রখরচিত্তবিশিষ্ট যুবক বলিয়া তাঁহার পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক হয় নাই। আর এই মধ্যকারের শিক্ষা সংসর্গ অবস্থা প্রভৃতি হইতে সংজাত কল্পিত আগন্তুক এই নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির সম্যক বিনাশ ব্যতীত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ইহা রোগে রাজদণ্ডে মৃত্যু নহে। এ হত্যা। এই জঘন্য মনোবৃত্তিকে হত্যা ব্যতীত অন্যে অন্যে দমন করা সম্ভবই নহে। রোহিণীর হত্যা এই হিসাবে উপরোক্ত মনোবৃত্তির বিনাশ। আর ইহা কঠোর অধ্যবসায়ীর দ্বারাই সম্পাদ্য। ইহা হত্যার মত আপাততঃ ভীতিপ্রদ। পরিণামে সুমনোবৃত্তির বিকাশে জীবনের সার্থকতা হইল, তাই ভ্রমরের স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। ইহাতে পাঠক এমত ধরিয়া লইবেন না যে, আমরা রোহিণী ও ভ্রমরকে কাল্পনিক, রূপক দাঁড় করাইতেছি। রোহিণীর হত্যা আর ভ্রমরের সুবর্ণময়ীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সহিত গোবিন্দলালের পতন ও অভ্যুদয়ের নিবিড়তম সম্বন্ধ বিদ্যমান, ইহাই আমাদের বক্তব্য। শিক্ষা ও সংসর্গজাত মনোবৃত্তি হইতে জন্মপ্রাপ্ত ও পিতৃপিতামহলব্ধ মনোবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। এই উভয় মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রথম শিক্ষা ও সংসর্গজাত মনোবৃত্তি পরাজিত হয়। গোবিন্দলালের আত্মা পুণ্যময় ছিল, পিতৃপিতামহরক্ত বিশুদ্ধ ছিল, ইহা নিশ্চয়ই। গোবিন্দলালের মাতা পাকা গৃহিণী ছিলেন না, তাই সংসার ভাঙ্গিল, অঘটন ঘটিল, ঠিক এমত নহে। তবে আশু যে ঝঞ্ঝা বহিল তাহাতে গৃহিণীর বুদ্ধিহীনতা একটু হাওয়া দিয়াছিল এই মাত্র। এবং কিছু মাত্র বাধা দিতে পারেন নাই, ইহা সত্য।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।]

গান, কবিতা ও 'মা' (সমালোচনা) ;—

গান আর কবিতার মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য আছে। এই দুই প্রকার রচনার বাঁধুনি এক রকমের নহে। আধুনিক অনেক লেখকের কবিতা সুর দিয়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে; ইহাতে না থাকে গানের মাধুর্য্য, না থাকে কবিতার গাম্ভীর্য্য। গান জিনিসটা যদিও কবিতাই বটে, তবু আবার অনেক কবিতাই কিন্তু গান নহে।

কবিতা ফেনিল; গান প্রগাঢ়। উচ্ছ্বসিত আবেগপূর্ণ ভাবরাশি যখন মনের ভিতরে মিছরির মত দানা বাঁধিয়া উঠে, তখন যাহা সুরের মধ্য দিয়া বাহির হইতে চায়—তাহাই গান। গানের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কবিতায় একটা হিসাব আছে; অত্যন্ত আবেগের সময়ও তাহার ভিতরে একটা পরিমাণ মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু গানের রাজ্যে বাধা-বন্ধন অনেকটা শিথিল।

আজকাল, উপাসনা কালে গাহিবার উপযুক্ত গান প্রায়শঃ রচিত হইতেছে না। গানের ভিতর সরলতাই কবিত্ব। আধুনিক অনেক গান শুনিয়া ভগবদ্ভাবোদ্দীপনা অপেক্ষা তাহার কবিত্বের দিকেই লক্ষ্য পড়ে অনেক বেশী। যদি কোনও মানুষের পোষাকটাকেই তাহার নিজের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে হয়, সেখানে আসল মানুষটাকে কেবল অপমানই করা হয়।

যাঁহারা কেবল কবিত্ব ফলাইয়া বাহবা কিনিবার জন্যই গান লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের গানে মানুষকে বিস্মিত করিতে পারে বটে, কিন্তু তৃপ্ত করিতে পারে না। জীবনের মুখ্য সাধনার সঙ্গে সম্বন্ধহীন যে কবিত্ব, তাহা নিতান্তই বস্তুতন্ত্রতাহীন। তাই বড় দুঃখে নিজের কথাই লিখিয়াছি—

তাই মানুষের প্রাণ পেলি নে
নিতে গেলি মুখের যশ;
রৈলি সুধা নদীর কূলে
ডুব্ না দিলে কোথায় র'স ?

প্রাণ দিয়ে রে কইলে কথা
সবার প্রাণে উঠ্‌বে ঢেউ
সোণার মালিক শুন্‌লে পরে
শুন্‌তে বাকি রয় না কেউ।
প্রাণের পরশ, প্রাণে লাগে
মানুষ তো নয় কথার বশ !

কার কথা শুনায়ে রে তুই
বাহবা চাস্‌ কোথায় ?
এম্‌নি করে কথায় কথায়
কাল গেল বৃথায়—
কথার মতন লাগে কথা
যখন রে তুই নিজের ন'স !

বহুদিন পরে আবার সেকেলে ধরণের গান শুনিতে অনেকেরই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কারণ, তাহার ভিতরে একটা সহজ সরলতা আছে। সে গানে সুরগুলিও মনে রাখিবার জন্য বিশেষ কোনও প্রকার প্রয়াস করিতে হয় না। তাহার সুর ও ভাষা যেন সহজেই মনকে পাইয়া বসে। আমাদের বাঙ্গালী জীবনের বিশেষত্ব, ও বহু বৈচিত্র্য সে গানের ভিতরে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। গানের ছত্রে ছত্রে গান-রচয়িতার প্রাণের রস সঞ্চারিত থাকিলেই, তাহা শ্রোতার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে।

আধুনিকতার হিড়িকে পড়িয়া গান গাহিবার এবং লিখিবার ধারাটাকে বদ্‌লাইয়া ফেলিতে উঠিয়া পড়িয়া যতই লাগি না কেন, সাবেককে যে আমরা একেবারেই বাদ দিয়া চলিতে পারি না, তাহার পরিচয় পদে পদেই পাইতেছি। আজকাল অনেকেরই আধুনিক সাজিবার রোগ এমন অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারা পুরাতন বলিয়া দেহের চামড়াটাকেই কোন্ দিন সাপের খোলসের মত উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন! দেশ কাল পাত্রের অনবরতই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সত্য; আমাদেরও তাহা স্বীকার করিয়া অবশ্যই চলিতে হইবে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া, স্থিরভাবে দেখিতে হইবে যে, সেই পরিবর্ত্তনের ধারাটা কিরূপ। নতুবা কেবল পূর্ব্বাপর জ্ঞানহীন উন্মাদের মতন পুরাতনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া শুধু নূতনের দিকে একান্ত অস্বাভাবিক ঝোঁক

দিয়া কোন্ দিন আমরা পুরাতন আত্মীয় স্বজনকেই পুরাতন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া বসিব।

অনেক গানের রচনার ভিতরে দেখিতে পাই, বেচারী ভাবটুকু যেন প্রবল শাব্দিকতার তুমুল কোলাহলের ভিতরে আড়ষ্ট ভাবে নিতান্তই কোনঠেসা হইয়া চিঁচিঁ করিয়া মরিতেছে। শুনিয়াছি গানের জোরে—জগম্মাতা রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন, গানের প্রভাবে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী সুরধুনীর উৎপত্তি; গানে মহাদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, নারদমুনি গানে পাগল হইয়াছেন। সুতরাং গানের রচয়িতা ও গায়ক হওয়া তো সহজ কথা নহে। কলাবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য গায়কের গানে, আর কবিত্বেরও সর্ব্বোত্তম অভিব্যক্তি সঙ্গীত রচনায়।

আজকাল কেহ কেহ একান্ত পক্ষে শক্তির অভাব বশতঃই গান সম্বন্ধে তাল ও রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা মানিয়া চলার অত্যাবশ্যক অঙ্গটাকে অনাবশ্যক বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুই চারিজন করিয়া ক্রমে একটা দলেরও সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ইঁহারা গানের আলোচনা না করিয়া যত দিন কেবল গান সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি, উহার বাহিরের দিকটা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন, ততদিন কিছুতেই তাঁহাদের এ ভ্রম সংশোধন হইবার উপায় নাই। কারণ গান আর কথা দুইটা পৃথক জিনিস। গানকে বুঝাইতে হইলে—তাহা বুঝাইতে হইবে গান দিয়া, প্রবন্ধ অথবা কবিতা দ্বারা কিছুতেই নহে।

সুরসে রসিকতা মনুষ্যত্বের একটী প্রধান অঙ্গ। উৎকৃষ্ট রসাস্বাদন করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করিতে হইলে তদুপযোগী—হৃদবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। উত্তম পুস্তক উপেক্ষা করিয়া বটতলার নবেল যদি কেহ পড়িতে বেশী অনুরাগ প্রকাশ করেন, সেটা তাঁহার নিজেরই বিকৃত রুচির পরিচয় মাত্র। কলাবতের গান শুনিয়া আনন্দলাভ করিতে হইলে, আগে একটু নিজেকে তৈরী করিয়া লইতে হইবে। বিধাতা এ জগতে কোনও ব্যক্তিকেই সর্ব্ববিষয়ে সম-শক্তিমান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বলিয়া সঙ্গীত বিদ্যাতেও যে অনায়াসে পারদর্শী হইতে পারিব, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। কোনও একটা বিষয়ে আমার উপলব্ধি করিবার অক্ষমতা থাকিলেই যে তাহাকে তুচ্ছ করিতে আরম্ভ করিব, এরূপ স্পর্দ্ধা নিতান্তই হাস্যকর। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই তাহার সেই বিষয়ের

উপরে আঘাত করিতে যাওয়া কখনই উচিত নহে। জগতে অনেক বড় মানুষকে সহজে হাল্কা করিবার যদি কোনও প্রবল উপায় থাকে ত তাহা এই অনধিকার চর্চ্চা। আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন অনেক সমাজেই সুশিক্ষিত কলাবৎগণের গান গাহিতে গিয়া বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত এবং উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের আদর যেন ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে,— তাই এ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথার আলোচনা করিলাম।

অতঃপর আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রণীত "মা" নামধেয় একখানি নব প্রকাশিত গানের বহি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার আলোচনা করিয়াই বক্তব্য বিষয় শেষ করিব। ক্ষিতিবাবু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ব্যক্তি। আমরা তাঁহার "মা" নামধেয় গানের বই খানিতে যে কেবল গানই পাইয়াছি, তাহাই নহে,—সঙ্গে সঙ্গে গানের ভিতরে আমরা বিশ্বমাতার সন্ধান পাইয়াছি। ক্ষিতিবাবু সেই বিশ্বদেবতাকে কেবল "ওঁ পিতানোঽসি" বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি তাঁহার প্রাণের ভিতরে সেই অরূপ অথবা বহুরূপের নিখিল মাতৃত্বের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। ভক্ত ভগবানকে যখন মা বলিয়া ডাকিতে পারেন, তখনই তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তাই— ঋষি কহিয়াছেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা"।

ক্ষিতিবাবু মা চিনিয়াছেন। তিনি কখনও মায়ের সঙ্গে আব্দার করিতেছেন, কখনও ঝগড়া করিতেছেন, কখনও বা অভিমান আর কখনও বা পূজা করিতেছেন। এই তো চাই! না হইলে ছেলে হইয়া সুখ কি? আমরা যে সব আদরিণী মায়ের আদরের দুলাল। পৃথিবীর ভালমন্দের সঙ্গে, হিসাব-নিকাশের সঙ্গে, আমাদের সম্পর্ক রাখিয়া দরকার কি! আমরা কেবল মায়ের কোলে বসিয়া থাকিব। সন্তান মায়ের কোলে থাকিতে পারিলে আর কিছুই চায় না। জীবনে তাঁহারই কেবল মঙ্গলদুঃখ লাভ করার মহদ্ভাগ্য লাভ হয়, যিনি দুঃখের ভিতরে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন।

মায়ের সঙ্গে ছেলে যখন কথা কয়, তাহার ভাষা সরল, ছন্দোবদ্ধ অবাধ। তখন হিসাব-নিকাশ বেশী চলে না। সে কথার সহিত যেন হৃদয় খালি বাহির হইয়া আসিতে চাহে। ক্ষিতিবাবুর এই গানগুলি সাধনার সহায়, অবসাদের প্রতিষেধক, জীবনের উৎসাহ এবং অবসরের আনন্দ। এ গুলি

সর্ব্বত্র 'প্রসাদী সুরের' প্রসারে, প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। মায়ের ছেলেরা আজীবন এ প্রসাদলাভে পরিতৃপ্ত হোক্। আজ বিশ্বমাতার ডাকে বিশ্ব-মন্দিরে মহামিলনারতির বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। আজ আকাশ পাতাল স্পন্দিত করিয়া এ সঙ্গীত ধ্বনিত হউক—"মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে।" আজ যে আমরাই মাকে ডাকিয়াছি তাহা নয়, মা আমাদিগকে ডাক দিয়াছেন। এ আহ্বান বড় মধুর, বড় স্পষ্ট, বড় প্রাণস্পর্শী। আজ বিশ্বমাতার মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিশ্বমানবের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া গাহিতে হইবে ;—"মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে"।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও বিতরণ।

কাগজের দাম কিরূপ বাড়িয়াছে কাহারও অবিদিত নাই। এই দারুণ দুর্ম্মূল্যের দিনেও বিখ্যাত 'সুরমা'র প্রস্তুতকারক মেসার্স এস্ পি সেন এণ্ড কোম্পানী ১৩২৫ সালের সুরমা পঞ্জিকা বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন পকেট পঞ্জিকায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পঞ্জিকায় স্থান পাইয়াছে। এই পঞ্জিকার সহিত সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 'কলেরায় কর্ত্তব্য' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হইল। কবিরাজ মহাশয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাধারণের যে উপকার করিতেছেন, এই পুস্তিকাদ্বয় তাহার একটী সামান্য নিদর্শন।

কাশ্মীরে শাস্ত্রচর্চ্চা।

[ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীহারানচন্দ্র বিদ্যারত্ন।]

(১)

কাশ্মীর দেশ প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এক সময়ে জ্ঞানগৌরবেও সমুজ্জ্বল ছিল। ন্যায়, বেদান্ত, কাব্য, ইতিহাস, তন্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিতগণ অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ এক্ষণে অনেকাংশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, জয়াপীড় নামক প্রবল পরাক্রান্ত কাশ্মীরনৃপতি নেপাল আক্রমণ করিয়া তথায় শত্রুহস্তে বন্দী হ'ন। রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজ্ঞী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই অবসরে সুযোগ বুঝিয়া রাজার শ্যালক কাশ্মীর আক্রমণ করেন। ভ্রাতার নিকট রাজ্ঞীর প্রেরিত সৈন্য পরাজিত হয়। পতিব্রতা রাজ্ঞী পতির শত্রু স্বীয় ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার না করিয়া, খুব সাধারণ ভাবে কতিপয় বিশ্বাসী পরিজন সঙ্গে লইয়া, রাজধানী হইতে পলায়ন করেন এবং এক গ্রামে ছদ্মবেশে সামান্য ভাবে বাস করিতে থাকেন। রাজ্ঞী অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন। সেই গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ যুবা রাজ্ঞীর রূপলাবণ্যে অত্যন্ত বিমোহিত হন; অবশেষে মানসিক উৎকট চাঞ্চল্যবশতঃ তিনি কঠিন পীড়ায় অভিভূত হইয়া পড়েন। অনেক চিকিৎসা করিয়াও ঐ পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না, ব্রাহ্মণ যুবা উত্তরোত্তর অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, অবশেষে মৃত্যুর করালছায়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই ব্রাহ্মণ যুবা এক বিধবার একমাত্র পুত্র ছিলেন। অনাথা বিধবা অনেক চেষ্টায় পুত্রের পীড়ার কারণ সবিশেষ অবগত হইলেন। রাজ্ঞীকে তিনি রাজ্ঞী বলিয়া জানিতেন না; পরন্তু এক সুশীলা মহীয়সী মহিলা বলিয়া জানিতেন। তিনি রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইয়া একান্তে তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া উপস্থিত বিপদে কাতর ভাবে তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিলেন। মহীয়সী রাজ্ঞী তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করিলেন, এবং পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন। তাহার পর, পরদুঃখকাতরা জয়াপীড়-

মহিষী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি কোন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার্থ কোন নারী নিজের পাতিব্রত্য খণ্ডিত করে, তবে তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি? পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এরূপস্থলে তুষানলই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ধর্ম্মপরায়ণা রাজ্ঞী সেই অনাথা বিধবার পুত্রের প্রাণ-রক্ষা করিয়া অবশেষে তুষানলে জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন। এদিকে জয়াপীড় কৌশলে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের সৈন্য সকল একত্র করিলেন এবং অতুল বিক্রমে নেপাল আক্রমণ করিয়া পদদলিত ও লুণ্ঠিত করিলেন। তাহার পর, বিজয়ী সৈন্য লইয়া কাশ্মীরের দিকে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার শ্যালক তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। জয়াপীড় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া পত্নীর শোচনীয় পরিণাম অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার পত্নীর এইরূপ শোচনীয় পরিণামের কথা সাধারণে জানিত না, রাজাও প্রচার করিলেন না। এক সময়ে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই পণ্ডিতেরা তুষানলের ব্যবস্থা দিলেন না, দান ও অন্যরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, পরন্তু বাহিরে হৃদয়ের ভাব কাহাকেও জানিতে দিলেন না; যথোচিত সম্মানের সহিত পণ্ডিতবর্গকে বিদায় করিলেন। ইহার পর, রাজা মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন যে, "আমার শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; আমার রাজ্যে যাহার নিকট যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সমস্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ঘোষণা করা হউক যে, শাস্ত্রগ্রন্থের বিনিময়ে গ্রন্থের স্বামী তুল্য পরিমাণ সুবর্ণমুদ্রা পাইবেন।" রাজার আদেশানুসারে এইরূপ ঘোষণা করা হইল, প্রজাবৃন্দ দলে দলে আসিয়া স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শাস্ত্রগ্রন্থ সকল রাজভাণ্ডারে প্রদান করিতে লাগিল। রাজকোষ শূন্য হইল, সেখানে স্বর্ণমুদ্রার শূন্যস্থান গ্রন্থরাশির দ্বারা অধিকৃত হইল। এইরূপে যখন গ্রন্থ সংগ্রহ সমাপ্ত হইল, তখন একদিন অকস্মাৎ জয়াপীড় শুষ্ক কাষ্ঠ-স্তূপের সহিত অমূল্য গ্রন্থরাজি সজ্জিত করাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্বে মন্ত্রী বা প্রজাবর্গ কেহই তাঁহার অভিপ্রায় বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই। এইরূপে পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায় রাজা জয়াপীড়ের ক্রোধের ফলে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্ম হইয়া গেল।

এই ঘটনা 'তবারিখ কাশ্মীর' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত—কাশ্মীরের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণীতে এ কথার কিছুমাত্র

উল্লেখ না থাকায় অনেকেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন (১)। পাঠান রাজগণের সময় বহু শাস্ত্রগ্রন্থ 'ডল' নামক হ্রদে নিমজ্জিত করা হইয়াছে, এমন কি সেই সময়ে 'ডলে'র অন্তর্গত একটী পথ শাস্ত্রগ্রন্থের সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা অদ্যাবধি জনশ্রুতি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী 'বিচারনাগ' ও 'পণ্ডিতপুর' নামক দুইটী গ্রাম বিদ্যাপীঠরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। পাঠান রাজগণের প্রথম আক্রমণের সময় এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছিলেন; ঐ সকল গ্রন্থ কেহ আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই, সমস্তই পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ধ্বংসলীলা প্রবল ভাবে চলিলেও, কাশ্মীরের গ্রন্থ সম্পত্তি এখনও যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কাশ্মীর একদিন শারদার প্রিয়তম লীলা-নিকেতন ছিল। কাশ্মীরদেশীয় জয়ন্তভট্ট-প্রণীত "ন্যায়মঞ্জরী" অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক সময়ে পঠন-পাঠনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'ন্যায়'রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থে জয়ন্তভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশ্মীরে এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। একজন বয়োবৃদ্ধ কাশ্মীরক পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি গুরুর নিকট "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট যেমন নৈয়ায়িক, তেমনই অসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি বহুস্থলে অতিনিগূঢ় দার্শনিক বিচার সকল সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের অনেক বিষয়ে জয়ন্তভট্ট নিজের স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী সি, আই, ই মহোদয়ের সম্পাদকতায় কাশীতে 'ভিজিয়ান গ্রাম সংস্কৃত সীরিজে' মুদ্রিত হইয়াছে।

কাশ্মীরক-সদানন্দ-প্রণীত অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ' অদ্বৈতমতের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা বাল্মীকি-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, ইহার রচনাপদ্ধতি ও রামায়ণের রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহোদয় ইহার রচনা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থ কোন কাশ্মীরী পণ্ডিতের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম

---

(১) এই ঘটনা আমরা কাশ্মীরের বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয়, পূজ্যপাদ ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে অদ্বৈতমতের অত্যন্ত পোষক গ্রন্থ, পরন্তু আচার্য্য শঙ্কর কোন স্থলেই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কোন শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন নাই অথবা কোন প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্ঠের নাম কোথাও করেন নাই—ইহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

"প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন" কাশ্মীরের অনন্যসাধারণ সম্পত্তি। তন্ত্রশাস্ত্রের তিনটী আম্নায় প্রসিদ্ধ,—কাশ্মীর আম্নায়, গৌড় আম্নায় ও কেরল আম্নায়। কাশ্মীর আম্নায়ের তন্ত্রসকল আমাদের বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ নাই। এই কাশ্মীর আম্নায়ের তন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর দেশে "প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন" প্রচারিত হইয়াছে। জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসায় যেরূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করা হইয়াছে, বাদরায়ণের উত্তর মীমাংসায় যেরূপ উপনিষদের মীমাংসা করা হইয়াছে, এই "প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে" সেইরূপ তন্ত্রের মীমাংসা করা হইয়াছে। এই "প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন" শৈবদিগের দর্শন। এই দর্শনের মত শাঙ্করদর্শনের সহিত অনেকাংশে একরূপ। কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে সম্প্রতি "শিবসূত্রবিমর্শিনী" "ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা" এবং "প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্" নামে তিনখানি "প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন" সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ

হলধর মণ্ডল।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

আজ প্রাতে উঠিয়া যে মহাত্মার কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, জানি না কপালে অন্ন জুটিবে কি না। আমাদের গ্রামের লোকের অন্ততঃ এই বিশ্বাস। কিন্তু কপালে যা'ই থাক্—আমাকে ত লিখিতেই হইবে। কারণ, আমার দু' একটা গল্পে শ্রীহলধর চরিতামৃতের আস্বাদ পাইয়া, অনুরোধ হইয়াছে, এ হেন মহাত্মার বিস্তারিত জীবনী লিখিতে হইবে। আহারের লোভে বন্ধু-বিচ্ছেদ করিতে পারিব না।

শ্রীমান্ হলধর যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিল—তাহা জাতিতে ক্ষৌরকার। তা'র বাপ কেনারাম ভাগে জমী করিয়া, যজমান রক্ষা করিয়া, দুধ বেচিয়া

নানা প্রকারে বেশ দু' পয়সার যোগাড় করিয়াছিল। তাই সে তার একমাত্র আদরের পুত্রের সৌখিন নাম রাখিয়াছিল চিরঞ্জীব এবং ছেলেকে ক্ষৌরকর্ম্ম না শিখাইয়া পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। লোকে বলে, যার প্রতি মা-লক্ষ্মীর কৃপা হয়, সরস্বতী তার প্রতি বিরূপ হন। তাই পাঁচ বৎসর পাঠশালে পড়ার পর যে দিন ইন্‌স্‌পেক্টিং পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে তার নামের বানান করিতে বলিলেন, সে দিন তার জীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে আর কোন মতেই চিরঞ্জীব বানান করিয়া উঠিতে পারিল না। পণ্ডিত মহাশয় তা'র বিদ্যার দৌড় দেখিয়া এবং যুক্তাক্ষরের সহিত তার অহি-নকুল সম্বন্ধ দেখিয়া বলিলেন,—"কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন! যা' আজ হ'তে তোর নাম 'হলধর'।" সেই দিন হইতে চিরঞ্জীব মণ্ডল হইল হলধর মোড়ল ওরফে হলা নাপিত।

ইহার পর তাহাকে পাঠশালা ছাড়িতে হইল। কেনারাম তাহার যজমান জমীদার বাবুকে ধরিয়া অনেক করিয়া তাঁহাদের কাছারীতে তাহাকে জমা সেরেস্তায় ঠিকা মোহরের করিয়া দিল। সেই অবধি হলধরের নাম ফিরিল না বটে কিন্তু কপাল ফিরিল। সে গোমস্তাদের কাগজ নকল করিয়া, মোকদ্দমার আরজী লিখিয়া এবং মধ্যে মধ্যে এক আধখান দলিল লিখিয়া দু' চারি টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তার পর শুভক্ষণে জমীদারের সঙ্গে এক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার মোকদ্দমা বাধিল। জমীদারের পক্ষ হইতে এক 'রোহননামা' দাখিল করা হইল। প্রজা বলিল যে, ইহা জাল, সে নিজেই কত লোককে টাকা ধার দেয়—নিজের জমী বন্ধক রাখিবে কেন? জমীদারের পক্ষের সাক্ষীর মধ্যে 'খেলাপ্' হইতে লাগিল। একজন বলিল—'দলিল মুখুজ্জেদের চণ্ডীমণ্ডপে কম্বলের উপরে বসিয়া কঞ্চীর কলমে লেখা।' আর একজন বলিল 'মাছুরের উপর বসিয়া নিবের কলমে লেখা।' মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া জমীদারের উকিল তাড়াতাড়ি তৃতীয় সাক্ষী হলধরকে হাজির করিলেন। সে অত্যন্ত সপ্রতিভ-ভাবে মুন্সেফকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! লেখা কঞ্চির কলমেও বটে, আর নিবেও বটে, আর কম্বলের উপরে বসিয়াও বটে, মাছুরের উপরেও বসিতে পারা যায়।" বিস্মিত হাকিম ব্যাপার কি জানিতে চাওয়ায় হলধর বলিল, "হুজুর কঞ্চীর কলমের মুখে একটা নিব লাগান ছিল, আর মাছুরের উপর কম্বল বিছান ছিল। ধর্ম্মাবতার সর্ব্বজ্ঞ, বিচার করিবেন—হুজুরের সাক্ষাতে আমি কখনও মিছা বলিব না।"

এই মোকদ্দমার পর হইতে জমীদারের কাছে হলধরের খাতির বাড়িয়া গেল, এবং তার শিক্ষা-নবিসী ঘুচিয়া সে ৪৲ টাকা বেতনের পাকা মোহরের পদ পাইল। ইহার পর আর এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী হইয়া এবং এক মাস জেল খাটিয়া শ্রীমান্ হলধর মোড়ল একবারে পাশের গ্রামের ৬৲ টাকা বেতনে গোমস্তা হইয়া গেল। এখন আর তাহাকে পায় কে? ক্রমে তার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং জাতি-সুলভ ধূর্ত্ততায় গ্রামের নিরীহ প্রজার দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে এখন রামের জমী শ্যামকে দিয়া এবং শ্যামের পুকুর যদুর নামে লিখিয়া শান্ত গ্রামবাসীর মধ্যে বেশ একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিল। এদিকে গরিব ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর "বাজেয়াপ্ত" করিয়া জমীদারের আয় বাড়াইয়া সে জমীদারের কাছেও নিজে "কারগুজারী জাহির" করিতে লাগিল। শুনা যায় যে, সে এই উপায়ে তার পুরাতন শত্রু সেই ইন্‌স্‌পেক্টিং পণ্ডিত মহাশয়কেও জব্দ করিয়া তার পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিল। কিন্তু হায়! এত করিয়াও সে তার পুরাণ নামের লুপ্তোদ্ধার করিতে পারিল না—এই যা' আপ্‌শোস।

গোমস্তা পদ পাইয়া হলধরের প্রথম কাজ—তার বাপের সঙ্গে পৃথক হওয়া—কেন না, ইতিমধ্যে কেনারামের আর একটি পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু দশের কাছে হেয় হইতে হয় বলিয়া হলধর সুযোগ খুঁজিতেছিল। পাশের গ্রামের গোমস্তা হওয়ায় বড় সুবিধা হইল, এবং ক্রমে তার স্ত্রীর সহিত পিতামাতার অসদ্ভাব এবং তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি গুরুতর কারণ উপস্থিত হওয়ায় অগত্যা পিতৃভক্ত হলধর গৃহে শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই স্ত্রীকে লইয়া কাছারীর নিকট একটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখিল। ক্রমে তাহার নিজের গৃহও প্রস্তুত হইল। দুষ্ট লোকে বলে যে, পাছে তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভাই ভবিষ্যতে দাবী করে—হলধর এই উপায়ে তাহারই পথ বন্ধ করিল। সে যাই হো'ক, গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে সে তার পিতামাতা ও ভাইকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলে নাই, এবং শুনা যায়, নূতন বাড়ী করিয়া ঋণগ্রস্ত হওয়া অজুহাতে সে কেনারামের নিকট বেশ দু'পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

ক্রমশঃ হলধরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং যত বহুদর্শিতা বাড়িতে লাগিল, ততই সে উপার্জ্জনের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিল। ফৌজদারী দেওয়ানী মোকদ্দমাকারীদের সে প্রধান পরামর্শ-দাতা এবং নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের প্রায় সব বড় বড় মোকদ্দমার তদ্বির হলধরই করিত। পুলিশ

বশ করিবার ক্ষমতায় সে অদ্বিতীয়। অতি জবরদস্ত সেকেলে দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক শিক্ষিত ইনস্‌পেক্টার বাবুকে পর্য্যন্ত সে যে কি করিয়া "রজত-মন্ত্রে" বশীভূত করিত—তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। যখন মাঝে মাঝে দেশের লোকের সুবুদ্ধি আসিত, এবং তাহাদের মোকদ্দমা করা বন্ধ রহিত—তখন হলধরের উদার উপদেশের গুণে ভাইয়ে-ভাইয়ে, প্রতিবেশীর মধ্যে, জমীদারে-প্রজায় যে কেমন করিয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিত,তাহার রহস্য ভেদ করা কঠিন। মোকদ্দমা কিন্তু বাধিত এবং উভয় পক্ষের অর্থ, এবং ভূসম্পত্তি যে কোন উপায়েই হউক, হলধরের নিকট আসিয়া পৌছিয়া তাহার কাঠের সিন্দুকটিকে "নারিকেলফলাম্বুবৎ" পূর্ণ করিত।

কিন্তু হলধরের উপার্জ্জনের আর প্রধান উপায় ছিল—তেজারতি। তাহার নিকট ঋণ-গ্রহণ করিয়া অধমর্ণের আর নিষ্কৃতির কোন উপায় ছিল না। সুদে আসলে চতুর্গুণ দিয়াও কেমন যে হলধরের হিসাবের গুণ লোকে দেখিত বাকীর জের তখন মিটে নাই। জমীজমা বন্ধক দিলে সে জমী ক্রমে তাহারই হইত, সপ্তরথীর মধ্যে বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় অধমর্ণ দেখিত যে সুদ, সুদের সুদ এবং তস্য সুদ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—জমীজমা ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কিন্তু তাতেই কি তাহার নিস্তার ছিল? বাকীর জের যে অমর। তাই "হলধরের ধার" আমাদের গ্রামে প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল।

আমাদের বাল্যকালে যখন হলধরকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স ষাটের উপর। তখন সে পরম বৈষ্ণব, সে যখন সর্ব্বাঙ্গে 'অলকা-তিলকা' করিয়া, কণ্ঠে তুলসীমালা পরিয়া, হরিনামের মালার "থলি" হাতে কাছারীতে বসিয়া থাকিত—তখন, জানি না কেন, আমাদের মনে একান্তে নদীতটে দণ্ডায়মান স্তিমিতদৃষ্টি বকের উদাহরণ উদয় হইত। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হলধরের অচল ভক্তি ছিল এবং সে কাছারীতে অতিথি-সৎকারের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিল। প্রজারা বলিত কিন্তু যে এই অতিথি-সৎকারও তার একটা ব্যবসার মধ্যে—কেন না, প্রজারা এই উপলক্ষে যাহা দিত—তাহা হইতেও বৎসরে তাহার বেশ দু' পয়সা উদ্‌বৃত্ত থাকিত। কিন্তু যাক্ সে কথা, হলধর যে ব্রাহ্মণ দেখিলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পদধূলি লইয়া মস্তকে, মুখে এবং চক্ষে স্পর্শ করিত, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

যখন এক পুত্র এবং দুই পৌত্র এবং পৌত্রবধূ রাখিয়া হলধর-গৃহিণী গঙ্গা-লাভ করিল, সে দিনের কথাও মনে পড়ে। তখন হলধরের বয়স সত্তরেরও

কম। এ বয়সে 'গৃহ-হীন' হইয়া হলধর চারিদিক অন্ধকার দেখিল ; কিন্তু বুদ্ধিমানের বিপদ কত দিনের জন্য ! হলধর গ্রামস্থ বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের বিশেষ অনুরোধে ছয় মাসের মধ্যে এক চতুর্দ্দশীর পাণিগ্রহণ করিল, এবং যথা-সম্ভব শীঘ্র সভ্রাতা নূতন গৃহিণীকে স্বগৃহে আনিয়া 'শূন্য ঘর' পূর্ণ করিল। তাহার বয়স্ক পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি তখন হইতে নিজগৃহে 'পর' হইয়া রহিল—নূতন রাণীর রাজত্বে তাহাদের স্থান ক্রমে দাস-দাসীদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় হলধরের উপর বিধাতার ডাক পড়িল।

হলধর চক্ষু বুজিতে না বুজিতে তাহার নূতন শ্যালক, তাহার পুত্রের সহিত মোকদ্দমা সুরু করিয়া দিল। তাহার ফলে 'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে' যাইতে লাগিল। গ্রামবাসীদের সহায়তায় অগ্নি বেশ জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্রমে আশা হইল যে, সত্বরে লক্ষ্মীদেবী হলধরের গৃহ হইতে "গজভুক্ত কপিত্থবৎ" অন্তর্দ্ধান করিবেন। হলধরের পুত্র বলিত, "বাবা বাঁচিয়া থাকিয়া চিরদিন লোককে জ্বালাইয়াছিল, মরিয়াও আমাদের জ্বালাইয়া গেল।"

পঞ্চভূত।

(কার্ত্তিক-সংখ্যা হইতে অনুবৃত্ত)

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

(৩)

যদি বলা যায় যে, অবয়বাবয়বি-প্রবাহের বিশ্রাম স্বীকার করি না ; তবে যে পর্ব্বত ও সর্ষপের পরিমাণের বৈষম্য হইয়া থাকে, তাহার হেতু এই, সর্ষপাবয়বগত সংযোগ অপেক্ষা পর্ব্বতাবয়বগত সংযোগ অত্যন্ত শিথিল, সেই শিথিল সংযোগ বা 'প্রচয়' হইতেই পর্ব্বত পরিমাণের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। পরিমাণ বিশেষের প্রতি প্রচয়েরও কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে (১)। দুই ভাগ তুলার অবয়বের সংখ্যায় কিছুমাত্র বৈষম্য না থাকিলেও তাহার এক ভাগ তুলা পিঁজিলে তাহার পরিমাণের যে উৎকর্ষ হইয়া থাকে, তাহার প্রতি তুলার অবয়বগত শিথিল সংযোগ বা প্রচয়ই হেতু। ইহার উত্তর এই যে, সর্ষপাবয়বের

(১) "প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।
পরিমাণং তূলকাদৌ—" —ভাষাপরিচ্ছেদ, ১১২ শ্লোঃ।

অপেক্ষা পর্ব্বতাবয়বে অধিক শিথিল সংযোগ স্বীকার করিলে সর্ষপ অপেক্ষা পর্ব্বতের কোমলতার আপত্তি হয়। সমপরিমাণ দুই ভাগ তুলার মধ্যে যে ভাগকে পিঁজিয়া বড় করা হয়, তাহার কোমলতা সর্ব্বসিদ্ধ। কাজেই অবয়বা-বয়বি-ধারার বিশ্রাম স্বীকার না করিলে পর্ব্বত ও সর্ষপের তুল্য পরিমাণের আপত্তি বারণ করা যায় না। এই অবয়বাবয়বি-ধারা যেখানে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, তাহারই নাম পরমাণু। ত্রসরেণুতে এই বিশ্রান্তি স্বীকার করা যায় না। ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়। গবাক্ষপথে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইলে উড্ডীয়মান যে ধূলীসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাকেই ত্রসরেণু বলে। "মনুসংহিতা"য় ইহার প্রমাণ আছে,—

"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥"

মনু, ৮ম, অঃ, ১৩২ শ্লোঃ।

ত্রসরেণু যখন চাক্ষুষ দ্রব্য, তখন অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইবে। অনুমানের আকার এই,—"ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ, ঘটবৎ"—ত্রসরেণু সাবয়ব, যে হেতু তাহা চাক্ষুষ দ্রব্য, দৃষ্টান্ত ঘট। এই অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে সেই অবয়বেরও যে আবার অবয়ব আছে, তাহা অনুমানান্তরের দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে। সেই অনুমানের প্রণালী এইরূপ,—"ত্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বা মহদবয়বত্বাৎ কপালবৎ"—ত্রসরেণুর অবয়বও সাবয়ব, যেহেতু তাহা মহতের অবয়ব, দৃষ্টান্ত কপাল। এই অনুমান-প্রণালী প্রচলিত "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। দ্বিবিধ অনুমান না করিয়া এক অনুমানের দ্বারাই যে ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক ও দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু সিদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা নব্য নৈয়ায়িক জগদীশের, দুর্লভ "সূক্তি" গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। জগদীশ, উদয়নাচার্য্য কৃত "ত্রসরেণুর্মহানেকদ্রব্য-বাংশ্চ অস্মদাদিচাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবদিতি।" ইত্যাদি কিরণাবলী গ্রন্থসন্দর্ভের অনুবর্ত্তন করিয়া "সূক্তি"তে লিখিয়াছেন,—

"ত্রুটিঃ সাবয়বদ্রব্যারব্ধা চাক্ষুষদ্রব্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যনুমানেন দ্ব্যণুকস্যেব পরমাণোরপি সিদ্ধেরিত্যাচার্য্যাঃ।"

ত্রুটি অর্থাৎ ত্রসরেণু সাবয়ব দ্রব্য হইতে উৎপন্ন, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ দ্রব্য; যে দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সাবয়ব দ্রব্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, দৃষ্টান্ত ঘট। এই এক অনুমান হইতেই ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক ও দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হয়।

ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক ও দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণুর সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে,তাহা অনুকূল তর্করহিত নহে। প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে যাহা বহুদ্রব্যবিশিষ্ট হইবে,তাহাতেই মহত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রসরেণুতে মহত্ব আছে, এখন ত্রসরেণু যদি সাবয়বদ্রব্যারব্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাতে মহত্ব থাকিতে পারে না। ত্রসরেণু যখন মহান্, তখন উহা সাক্ষাৎপরম্পরাসাধারণ বহুদ্রব্য প্রযোজ্য হইবেই। সুতরাং "ত্রসরেণুর্যদি সাবয়বদ্রব্যারব্ধো ন স্যাৎ তর্হি মহান্ ন স্যাৎ"—এইরূপ তর্কই পূর্ব্বদর্শিত অনুমানের ব্যভিচারশঙ্কা-নিবর্ত্তক।

তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথ, এ ক্ষেত্রে ভিন্নমতাবলম্বী। তিনি পরমাণু ও দ্ব্যণুক মানেন না। তিনি স্বকৃত "পদার্থতত্ত্বনিরূপণে" লিখিয়াছেন,—

"পরমাণুদ্ব্যণুকয়োশ্চ মানাভাবঃ ত্রুটাবেব বিশ্রামাৎ।"—(১১ পৃঃ)

পরমাণু ও দ্ব্যণুকে কোনও প্রমাণ নাই। যদি বল, পরমাণু ও দ্ব্যণুক যদি না থাকে, তাহা হইলে ত্রসরেণুর উৎপত্তি হইল কি করিয়া? সমবায়ী কারণ ব্যতীত দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাই রঘুনাথ বলিলেন,—"ত্রুটাবেব বিশ্রামাৎ।" ত্রুটি অর্থাৎ ত্রসরেণুতেই অবয়বীর বিশ্রাম স্বীকার করি। এখানে 'অসমবেতত্বসামানাধিকরণ্যে'র নামই বিশ্রাম। কাজেই ত্রসরেণু অসমবেত দ্রব্য বলিয়া তাহা নিত্য,—তাহার উৎপত্তি না হওয়াই ইষ্ট।

পূর্ব্বে পরমাণু ও দ্ব্যণুকের সিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, রঘুনাথ বলিয়াছেন, তাদৃশ অনুমান অপ্রয়োজক। অন্যথা 'পরমাণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্য সমবায়িসমবায়িত্বাৎ, কপালাবয়বৎ'—ইত্যাদি অনুমানের সাহায্যে অনবস্থিত অবয়বিপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তি হইয়া পড়ে। যদি বল, প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, কাজেই ত্রসরেণুর যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহাতে মহত্ব মানিতেই হইবে। ঈদৃশ মহত্বের প্রতি অবয়বের সংখ্যাই কারণ, সুতরাং ত্রসরেণুর অবয়ব না মানিলে উপায় নাই। কাজে কাজেই ত্রসরেণুর অবয়বসাধক যে অনুমান, তাহাকে অপ্রয়োজক বলা চলে না। ইহার উত্তর এই যে, ত্রসরেণু যখন নিত্য, তখন তাহার মহত্ব পরিমাণও নিত্য—তাহার উৎপত্তি নাই। অতএব ত্রসরেণুর অবয়ব-সাধক অনুমানে অনুকূল তর্ক দেখান যায় না।

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, যদি পরমাণু ও দ্ব্যণুক না থাকে, তাহা হইলে 'অণু' ব্যবহার কোথায় হইবে? ত্রসরেণু স্থূল দ্রব্য, তাহাতে 'অণু' ব্যবহার হইতে পারে না। সুতরাং 'অণু' ব্যবহারের উপপত্তির জন্য পরমাণু ও দ্ব্যণুক মানিতে হইবে। ইহার উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছেন,—

"অণুব্যবহারশ্চাপকৃষ্টপরিমাণনিবন্ধনো মহত্যাপি মহত্ত্বাদণুব্যবহারাৎ।" (১৫ পৃঃ)

কাল আকাশ প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ পরম মহত্ত্ব আছে, এইজন্য তাহাতে কদাপি 'অণু' ব্যবহার হইতে পারে না। কিন্তু ত্রসরেণুতে যখন অপকৃষ্ট পরিমাণ আছে, তখন তাহাতে 'অণু'ব্যবহারের কোনও বাধা নাই। মহৎ পদার্থেও মহত্তম পদার্থ হইতে অণুব্যবহার হইয়া থাকে। যে বস্তু অপেক্ষা যে পদার্থে অপকৃষ্ট পরিমাণ থাকে, সেই পদার্থকেই সেই বস্তু অপেক্ষা 'অণু' বলা হয়। তাহা না হইলে 'নারিকেল হইতে আমলকী অণু' ইত্যাদি ব্যবহার কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে?

এখন শঙ্কা হইতে পারে, পরমাণু অদৃশ্য, এইজন্য ঘটের অদৃশ্যত্বের আপত্তি হয় বলিয়া পরমাণুপুঞ্জকে ঘট বলিতে পারি না; কিন্তু ত্রসরেণু যখন প্রত্যক্ষের বিষয়, তখন ত্রসরেণুপুঞ্জকেই ত ঘট বলিতে পারি,—অতিরিক্ত কার্য্যকারণ ভাব মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, 'ঘট' ইত্যাকারক প্রতীতির বিষয়তা অসংখ্য ত্রসরেণুতে স্বীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হয়। তার পর ঘটকে যদি ত্রসরেণুপুঞ্জ বলা হয়, তাহা হইলে ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে একেবারে ত্রসরেণুসমূহই দেখা যায় না কেন? কপাল প্রভৃতি ছোট বড় নানা খণ্ডের প্রত্যক্ষ হওয়া ত উচিত নহে।

[ক্রমশঃ

গোবিন্দলাল।

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।]

গোবিন্দলালকে যখন আমরা প্রথম দেখিতে পাই, তখন তিনি জমীদার বাড়ীর মেজবাবু। জমীদার বা রাজার সহিত জমীদারের ছেলে বা রাজার ছেলের তুলনা হয় না। মাথার উপর কুম্ভকাণ্ডের মত জ্যাঠা মহাশয় বর্ত্তমান, কাজেই কি জমীদারীর, কি সংসারের, কোন হাঙ্গামাই তাঁহাকে পোহাইতে হয় না। স্নানের সময় স্নান, ভোজনের সময় ভোজন, ইচ্ছামত বাগানে ভ্রমণ, আর সময় নাই অসময় নাই, ভ্রমরের সহিত রঙ্গ তামাসা ছাড়া তাঁর কোন কার্য্যই ছিল না। কার্য্যের মধ্যে কদাচিৎ ইচ্ছা হইলে একটু আধটু জ্যাঠা মহাশয়ের কাছে গিয়া জমীদারী কাজ কর্ম্ম দেখা। গোবিন্দলালের চিত্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখকাতর ও প্রেমপ্রবণ ছিল; সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট, প্রতারণা

ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন এখনও গঠিত হয় নাই। আপনি ভাল হইলেও পত্নী, ভ্রমরের মত পত্নীও অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিতে পারে, লোকে অন্যায় কুৎসা রচনা করিতে পারে, এ শিক্ষা তখনও তাঁর হয় নাই। নরনারীর প্রত্যেক কার্য্যেই সাধু উদ্দেশ্য মনে হওয়াই তখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বাস্তবিক মনটি তখন আকাশের মত উদার, অনাঘ্রাত কুসুম কোরকের মত মধুর, গঙ্গোদকের মতই পবিত্র ছিল। তাই রোহিণীর দুঃখে দুঃখ হইল, তাহার রোদনে প্রাণ কাঁদিল, তাহার বিপদের কথা শুনিয়া উদ্ধারের জন্য পরদুঃখকাতর চিত্ত ব্যগ্র হইল।

রোহিণী চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। গোবিন্দলাল তাহার উদ্ধারের জন্য জ্যাঠা মহাশয়ের নিকটও গেল। বড়র কাছে বলিয়া কোমলবৃত্তি দয়ার প্রকাশ লজ্জাকর বলিয়া গোবিন্দলাল "বলি বলি" বলিতে পারিতেছিলেন না। পরদুঃখকাতরতার সহিত লজ্জা ও সঙ্কোচের মিলন বস্তুতই মধুর। বলা বাহুল্য, এ দয়ার মধ্যে কোনরূপ যৌবনসুলভ ছলনা ও চাতুরী ছিল না। কামের কি স্পষ্ট কি প্রচ্ছন্ন কোন প্রকার আকর্ষণ বেগ অনুভূত হয় নাই।

দয়া, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা হইতে অনেক সময়ে প্রগাঢ় ভালবাসার ও তীব্র মোহের উৎপত্তি দেখা যায়, কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ দয়া ও সহানুভূতি, ভালবাসা বা মোহ নহে। উহাকে ভালবাসার প্রথম অবস্থা বলা যায় না, কারণ ঐ দয়া ও সহানুভূতি আবার অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসার জনয়িত্রী হয় না। "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র, সুন্দর মুখের অশ্রুপ্লাবনে সংযমী মুনিরও দয়া জাগে" এই সাধারণ ন্যায় গোবিন্দলালেও কিছু ঘটিয়াছিল, ইহা মানিলেও কোন ক্ষতি নাই।

যে কেহ, বিশেষতঃ সুন্দরী রমণী তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, তোমারই জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগে চেষ্টা পাইয়াছে—ইহা জানিলে তোমার প্রাণে আহ্লাদ নিশ্চয়ই জাগিবে, পক্ষান্তরে রাগও হইতে পারে। গোবিন্দলাল প্রখরমনোভাববিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণের সহিত কি ভালর দিকে, কি মন্দের দিকে তাঁহার তুলনাই হয় না। তাই তিনি দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের মত রোহিণীর হৃদয়তল স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন "ভ্রমরও যে মন্ত্রে মুগ্ধ, এ যুবতীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তখন তাঁহার আহ্লাদ হইল না, রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।"

একটী নিরীহ নিষ্পাপ মানবকে বেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক যদি ক্রমশঃ পাপপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি বেশ প্রতিকূল ভাবে দেখা দেয়, তবে সে মানবের সাধ্য কি, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করে। বিশেষতঃ রক্তমাংসময়হৃদয়সমন্বিত অতৃপ্ত রূপপিপাসু পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ধনী যুবকের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। "স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায়" জলতলে ভাসমানা রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া, গোবিন্দলালকে তাহার সেই "ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া ফুৎকার দিতে হইল। প্রভাতশুক্রতারারূপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী যুবতী জলাযভূতা রোহিণীকে ক্রোড়ের উপর শোয়াইয়া সেই নির্জ্জন কক্ষে গোবিন্দলালকে তাহার জীবন সঞ্চারের জন্য যত্ন পাইতে হইল। ধন্য গোবিন্দলাল, "চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে রাত্রিদিন মরার চেয়ে একেবারে মরা ভাল" এই কথা শুনিয়া তবু আপনাকে অবিচলিত, স্থির রাখিলে! রোহিণী চলিয়া গেল। তার পর গোবিন্দলাল বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া "নাথ, আমার এ বিপদে রক্ষা কর" বলিয়া আত্মজয়ের প্রার্থনা করিলেন। মনোবৃত্তির যুদ্ধে আপনাকে অটল রাখিবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মপরায়ণতার লক্ষণ।

বাস্তবিক গোবিন্দলাল মানবরূপে দেবতা নহে কি? গোবিন্দলালের পতন যদি না হইত, তাহা হইলে প্রতাপের অপেক্ষাও তাঁর আসন ঊর্দ্ধে স্থান পাইত। আঘাতের প্রতিঘাত, ভালবাসার আকর্ষণ, গোবিন্দলালের হৃদয়সাগরে বিক্ষোভ আনিয়া দিল। গোবিন্দলাল রোহিণীর স্মৃতি ভুলিবার জন্য যতই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, সে স্মৃতি ততই তাহাকে চাপিয়া বসিল। ভালবাসা বলপূর্ব্বক ফিরাইতে গেলেই তাহা আরও প্রবলভাবেই প্রভাব বিস্তার করে। যে দাগ লইয়া তিনি পতিপ্রাণা সতী ভ্রমরের কাছে উপস্থিত হইলেন, তাহা অপ্রকাশিত রহিল না। সতী রমণীর হৃদয়ে পতির অন্তরের ছবি এমতই চিত্রিত থাকে, তাহার একটু পরিবর্ত্তনই তাহার কাছে অজ্ঞাত রহে না।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য শেষ বিদেশে চলিয়া গেলেন। চক্ষুর আড়াল হইলে রোহিণীও ভুলিয়া যাইতে পারে, বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশে আপনার দুর্দ্দান্ত হৃদয় শাসিত হইতে পারে, এ ধারণা গোবিন্দলালের হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। গোবিন্দলালের যাহা সাধ্য, তাহা তিনি করিতে ত্রুটী

করিলেন না। সাগরতরঙ্গতুল্য উদ্বেলিত মনোবৃত্তির দমন করিতে যাইয়া ক্রমে রোহিণীর রূপ নীলমেঘমালার মত এই হতভাগ্য চাতকের লোচনপথে সুস্পষ্টভাবে উদিত হইল—প্রথম বর্ষায় মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত তার মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিল। "মরিতে হয় মরিব, তবু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" গোবিন্দলাল আধুনিক ধর্ম্ম-ভাবশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত—তাই অকলঙ্ক চরিত্র, অতএব ধর্ম্মের কথা তাঁর মনে পড়িল না। ভ্রমরকে বড় ভালবাসাই বাসিতেন, তাই তার কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইবার ভয় বেশী। কিন্তু যদি সে ভালবাসা আর না থাকে, তবে ত রোহিণী-প্রাপ্তির কোন বাধাই নাই। গোবিন্দলালের চিত্তে রোহিণী মূর্ত্তি চাপিয়া বসিয়া আছে, তার স্মৃতি গোবিন্দলাল কোনমতেই হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে পারিতেছিলেন না। ইহাতেই তিনি ভ্রমরের কাছে মনে মনে লজ্জিত, একটু একটু অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন না হইতেছিলেন, এমন নহে।

তারপর ভ্রমর বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। গোবিন্দলালের প্রবল অভিমান জন্মিল। কি! আমি যার কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইবার ভয়ে নিশিদিন তুষানল যন্ত্রণা সহিয়া আপনাকে রক্ষা করিতেছি—আর সে, সেই আমার উপর অভিমান করিয়া লোকের কাছে আমাকে খাট করিয়া চলিয়া গেল। ভ্রমর যদি বাপের বাড়ী যাইবার সত্য কারণটি স্বামীকে পত্র দিয়া না জানাইত, তাহা হইলে এত প্রবল অভিমান তাঁহার না হইতে পারিত। যে সময়ে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলেন, যে সময়ে ভ্রমরের কাছে আরও আদর, আরও ভালবাসা, আশ্বাসের কথা শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি পাইলেন কি না, তাঁর সেই ভ্রমরের অন্যায় বিশ্বাস, অপ্রত্যাশিত ঘৃণা।

গোবিন্দলালের হৃদয়ে ভ্রমরের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা ছিল, তাই রোহিণী তথায় আসিয়াও জাঁকিয়া বসিতে পারিতেছিল না। যেমন ভ্রমরের উপর দারুণ অভিমান ও ক্রোধ জন্মিল, অমনই ভ্রমরের মূর্ত্তি কুয়াসার উদয়ে তপন প্রভার মত কোথায় মিলাইয়া গেল, রোহিণী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল।

তারপর গোবিন্দলালের হৃদয়ে যে রূপতৃষ্ণা একদিন লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহা জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিতে দেখা দিল। শিক্ষিত যুবক রোহিণীকে লইয়া পড়িলেন, তখন ভ্রমরের বুক-ফাটা রোদনধ্বনিতে কোন ফলই হইল না। রূপতৃষ্ণা

রাক্ষসীর মত ব্যাদনব্যাদান পূর্ব্বক লেলিহান রসনা বাড়াইয়া বসিয়া আছে। ভ্রমরের করুণ মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি গোবিন্দলালের কর্ণের ভিতর দিয়া অন্তরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সে রাক্ষসী গিলিয়া খাইল।

গোবিন্দলালের শুধু যে ভ্রমরের উপর ক্রোধ অভিমান জন্মিল, তাহা নহে। সমস্ত লোকের উপরও তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল। কি, আমাকে বিনা দোষে লোকে লম্পট আখ্যা দিল! যদি রোহিণীর সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়াই আমার লাম্পট্যখ্যাতিতে দেশ জুড়িয়া গেল, তবে রোহিণীকে লইয়া সেই খ্যাতিই না হয় হইল। তখন গোবিন্দলাল বেগবতী অনুভূতির দ্বারা চালিত হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়াই রোহিণীর সহিত পলাইবার পরামর্শ করিলেন। গোবিন্দলালের এত যত্ন সবই বৃথা হইল। স্বর্গের সোপানগুলি এক দিনেই ভাঙ্গিয়া গেল। গোবিন্দলাল নরকের কূপে যাইয়া পড়িলেন।

গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপমোহে উন্মত্ত হইয়াই যে এই কার্য্য করিলেন, ইহা নিশ্চয়। ভ্রমরের উপর ক্রোধ অভিমান, লোকের উপর বিতৃষ্ণা কিঞ্চিৎ সহায়তা করিল, কিছুমাত্র বাধা দিল না, এই মাত্র।

তারপর দুইজনে প্রসাদপুরের কুটীতে আত্মগোপন করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথের কুন্দপ্রতি মোহ দুইদিনে কাটিয়া যায়, কিন্তু গোবিন্দলালের এক বৎসরেও কাটিল না। রূপমোহ এমনই তীব্র যে, এক বৎসরে তাহা সমানই জাগরূক রহিল। নচেৎ তিনি নিবিষ্ট মনে যুবতী রোহিণীর চঞ্চল কটাক্ষ প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবেন কেন?

তারপর নিশাকর আসিয়া বিষয়পত্তনির কথা পাড়িলেন। ভ্রমরের কথা উত্থাপিত হইবা মাত্র গোবিন্দলাল উন্মনা হইলেন। নিশাকর চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলালের তাল কাটিল। ঘুমাইবার ছলে অন্য ঘরে গিয়া দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

ভ্রমরের কথা যে এতদিন মনে পড়ে নাই; নিশাকর মনে করাইয়া দিল, তাই মনে পড়িল, এমত কখন হইতে পারে না। তবে গোবিন্দলাল কাঁদিলেন কেন? "ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই, হরিদ্রাগ্রামে মুখ দেখাইবার যো নাই। হরিদ্রা গ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে, কান্না বৈ আর উপায় নাই" ইহাই রোদনের কারণ? কিন্তু আজ নিশাকরের কথায় কান্না আসিল কেন? মুখ দেখাইবার উপায় নাই, হরিদ্রা গ্রামে ফিরিবার যো নাই, তাহা কি বুদ্ধিমান গোবিন্দলাল এতদিন ভাবেন নাই, না জানেন না। এক্ষণে

দেখিতে হইবে, নিশাকর এমন কি কথা বলিলেন, যাহাতে গোবিন্দলালের কান্না আসিবার কারণ আছে।

নিশাকর বলিয়াছিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানা জানেন না, পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছুকও নহেন।"

এই তিনটি কথাই গোবিন্দলালের চিত্তে পূর্ব্বেকার স্মৃতি উদ্রিক্ত করিল, অভিমানে আঘাত দিল, বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিল, প্রচ্ছন্ন আশা ভরসা সমূলে উচ্ছেদ করিল। ১ম, বিষয় ভ্রমরের, যাহা ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা তাহার আছে, তথাপি এখনও অবিশ্বাসী পতির অনুমতি সাপেক্ষ! পরস্ত্রী লইয়া দেশত্যাগী, লোকের ঘৃণাপাত্র পতির অনুমতি ব্যতীত বিষয় পত্তনি দিতে অস্বীকার!.

২য়, ঠিকানা জানেন না! আমি এতটাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছি যে, সেই ভ্রমরকে ঠিকানা পর্য্যন্ত দিতে অনধিকারী। এমনই আমার অবস্থা যে, ভ্রমরের নিকটও ঠিকানা দিতে আমি কুণ্ঠিত!

৩য়, "পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছুকও নহেন"। ভালবাসার ধর্ম্মই এই, যতই অপরাধ করি না কেন, তবু ক্ষমা চাহিবার অনধিকারী, এমন কথা ভাবিতে পারি না। ভালবাসা যত গভীর; অভিমান তত তীব্র, ক্ষমার দাবীও তত অধিক। গোবিন্দলাল ভাবিল, এত বড় অকথ্য অপরাধ করিয়া আসিয়াছি, সেই ভ্রমর তাই আমাকে ক্ষমা করে নাই, এতদিনের অদর্শনেও আমার উপর বিতৃষ্ণা যায় নাই। যে ভ্রমর একদণ্ড চক্ষুর আড়াল করিলে ছটফট্ করিত, সেই আজ "পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছুক নয়।" গোবিন্দলালের মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ভ্রমর এতদিনে ক্ষমা করিয়াছে। আমি আবার ফিরিয়া যাইলে ভ্রমরের কাছে অবশ্যই ক্ষমা পাইব। পতিপ্রাণা ভালবাসায় ভ্রমর আবার এই পাপীকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিবে। আমি পাপী, লজ্জায় সতী সাধ্বীর কাছে উপস্থিত হইতে পারি আর না পারি, সে কিন্তু আমাকে বুকে তুলিয়া লইবে।

এই আশা ভরসা নষ্ট হইল। গোবিন্দলালের বুক ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে যন্ত্রণা সহ্য করিবার মত আজ গোবিন্দলালের শক্তি নাই। পূর্ব্বস্মৃতি-বহ্নি উপরোক্ত ঘাত-প্রতিঘাতে অতি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। আজ গোবিন্দলাল বুঝিলেন যে, রূপতৃষ্ণার মোহে তিনি অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত করিয়াছেন, যে ক্রোধ বা অভিমানের বশে ভ্রমরের

বুক ফাটা রোদনধ্বনি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, আজ আর সে রূপমোহ তেমন তীব্র নাই; সে ক্রোধ অভিমানও আর নাই। নিশাকর ঘটিত ব্যাপারে রোহিণীর উপর দারুণ ঘৃণা যদি গোবিন্দলালের না জন্মিত, তাহা হইলে গোবিন্দলাল আর রোহিণীর সহিত ঠিক তেমন ভাবে বসবাস করিতে পারিতেন না, —সাধারণ লম্পট ও রক্ষিতার মত বসবাস করায় রোহিণীর আপত্তি না থাকিতে পারে, গোবিন্দলালের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

সাময়িক মনোবৃত্তির হঠাৎ উত্তেজনায় অন্ধ, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করেন নাই। সঙ্গে করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া হত্যা করা এক প্রকার মৃত্যুদণ্ড। গোবিন্দলাল রূপপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও ভাবিয়া চিন্তিয়াই অধঃপতনের পথে যান, আর আজও ক্রোধ ও দারুণ ঘৃণা দ্বারা চালিত হইয়াও ভাবিয়া চিন্তিয়া রোহিণীর হত্যারূপ দণ্ডবিধান করিলেন। রাজার অধিক ঐশ্বর্য্য, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সেই অবিশ্বাসিনী! এ অবস্থায় গোবিন্দলালের মত তীব্র মনোভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি হত্যা না করিয়াই পারে না। কার্য্যটি ভাল আমরা বলিতেছি না, তবে এই অবস্থায় এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, ইহাই মাত্র বলিতেছি।

সাত বৎসরের পর হত্যাকারী, অনুতাপে দগ্ধ হৃদয়, লজ্জায় নতশির গোবিন্দলাল ভ্রমরকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ভ্রমর স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; আর এই আশীর্ব্বাদ চাহিল, "জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" ভ্রমর জীবনে বড় দুঃখ, জ্বালা, বড় অপমান পাইয়াছিল, তাই সে জন্মান্তরে তোমাকে যেন পাই, ইহা মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিল না। জন্মান্তরে গোবিন্দলাল ব্যতীত অপর কাহাকে পতিরূপে চাওয়া সতী ভ্রমরের পক্ষে অসম্ভব। ভ্রমর স্বামীর যশ মান সম্ভ্রম ও ধর্ম্মকে স্বামীর দেহের চেয়ে, আপনার সুখের চেয়ে বড় ভাবিত। ইহলোকে জীবন বৃথাই যাউক, তথাপি স্বামীকে নরকের পথে, দেশের ঘৃণা তাচ্ছিল্যের মধ্যে যাইতে দিব না—ইহা পতিভক্তির অন্যতম আদর্শ। পতির সঙ্গে থাকার সুখ, সেও নারীজীবনের প্রলোভন, সেও স্বার্থপরতা, সেও আত্মসুখ; তাহার জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, লোকনিন্দা অঙ্গের ভূষা করিতে হইবে? ভ্রমর মৃত্যুশয্যায় নিজে ক্ষমা চাহিয়া গেল বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া ক্ষমা করিয়া যাইতে পারিল না। পতি দেবতা, তাহাকে ক্ষমা করিবার সে কে? তাই ক্ষমা করিল না।

অথবা গোবিন্দলাল এ সান্ত্বনা লাভের যোগ্য নহে। গোবিন্দলাল প্রকৃতই ক্ষমার পাত্র, সান্ত্বনায় অধিকারী হন নাই!

দীর্ঘ বার বৎসর পরে গোবিন্দলাল ভগবৎপদে মনঃস্থাপন করিয়া যখন শান্তিলাভ করিলেন, তখনই ভ্রমরের কাছে যথার্থ ক্ষমার যোগ্য, পার্শ্বে দাঁড়াইবার অধিকারী হইলেন। তাই তিনি ভ্রমরের সুবর্ণময়ী মূর্ত্তির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভ্রমর চাহিত, পতি সুমেরুর মত স্বতন্ত্র উন্নত, বহ্নির মত স্বতঃ পবিত্র, চন্দ্রের মত মৃদূজ্জ্বল থাকিবেন। গোবিন্দলাল আজ তাহাই হইয়া আসিয়াছেন। গোবিন্দলাল আজ ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছেন। ভ্রমর, তোমারই পুণ্যে তোমার স্বামী আজ নিষ্পাপ ও পবিত্র। ধন্য তুমি ভাগ্যবতী, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে; জীবনে সিদ্ধ করিতে পারিলে না, মরণের পরে গিয়া তাহা সিদ্ধ করিলে!

পোষা কুকুর। *

[লেখক—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্‌-এ।]

আবদুল কাদের সারেং মধ্যাহ্নে খাইতে বসিয়াছে, সম্মুখে এক থাল ভাত তরকারি, আর বড় চিনে মাটির বাটিতে এক বাটি মাংসের ঝোল। সারেঙের স্ত্রী কাছেই বসিয়াছিল। ঝোল ঢালিয়া লইয়া ভাত মাখিতে মাখিতে আবদুল মিঞা জিজ্ঞাসা করিল, "হাগা! ভুলো কুকুরটা আজ গেল কোথা? রোজ খাবার সময় সে দাওয়ার নীচে ব'সে থাকে, আজ তাকে কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না—কেমন ধারা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।"

সারেঙের স্ত্রী মোরিয়ম খাতুন সুন্দরী যুবতী। প্রায় ছয় মাস হইল সদাগরী জাহাজের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রৌঢ় আবদুল কাদেরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার বাপের বাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে। পিতা পটিয়ার একজন মধ্যবিত্ত চাষী গৃহস্থ। স্বামী-গৃহেও কোন কিছুর অভাব ছিল না। আবদুল দেশ বিদেশে ঘুরিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাতে এখন পর-এক্তারী না করিয়াও এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যায়।

---

* Louis Enault প্রণীত Chien du Capitaine নামক মূল ফরাসী গ্রন্থ অবলম্বনে

স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া মরিয়ম খাতুন মুখ বাঁকাইয়া একটু বিরক্ত ভাবেই বলিল, "ভুলো আর থাকবে কোথায়! আমি তাকে গোহালে বেঁধে রেখেছি।"

"বাঁধলে যে?"

বাঁধবো না। না বাঁধলে আর রক্ষা আছে; যে গুণধর কুকুর, তোমার—খাবার সময় খোলা থাকলে একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলে, সমস্ত দিনটা ত পায়ে পায়ে ঘোরে, একটু সরবার নড়বার যো নাই, খাবার দাবার সময়টাও যদি রেহাই না পাওয়া যায়—

আবদুল-ঘরণী আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় এক পেলেট হৌনি মাছের তরকারী হাতে লইয়া বাড়ীর দাসী ও পাচিকা মাকুনী আসিয়া উপস্থিত হইল। মাকুনিও চাষার মেয়ে, রংটি কিছু ময়লা, দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট, প্রায় স্থূলাঙ্গী বলিলেও হয়। যৌবন-সীমা বহুদিন উত্তীর্ণ হইলেও এখনও শরীরে বেশ সামর্থ্য আছে।

স্বামী পুত্রহীনা অনাথা—অবস্থার ফেরে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম্মে তাহার বেশ তৎপরতা দেখা যাইত। নূতন গৃহিণীকে পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে সে সহসা হাত দিতে দিত না। তাহার স্বভাবটিও বেশ মধুর, ঝগড়া ঝাঁটির ভিতর সহজে যাইতে চাহিত না, কেবল দোষের মধ্যে ছিল একটু পল্লিসুলভ স্পষ্টবাদিতা। মাকুনি মাছ পরিবেশন করিয়া ঘরের বাহির হইতেছে, এমন সময় কোথা হইতে একটা মাঝারি রকমের দো-আঁশলা কুকুর ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। সুন্দর নিকান মেঝেতে তাহার নখের আঁচড় লাগিয়া মাটি উঠিয়া গেল। ছোট টুলের উপর একখান রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন ছিল, ধাক্কা লাগিয়া টুলটা উল্টাইয়া গেল—খাবার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, কুকুরটা শূন্য রেকাবির উপর পা রাখিয়া জিব দিয়া রস চাটতে লাগিল। দাঁড়ের উপর আবদুলের সখের একটী লালবর্ণের মুরী পাখি ছিল, সে এই গোলমালে ত্রস্ত হইয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিল। সারেং-গৃহিণী বয়স-দোষে স্বভাবতই একটু অসহিষ্ণু, তাহার উপর এই আকস্মিক উৎপাতে তাহার ক্রোধানল হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাগে চোখ দিয়া যেন আগুনের ফিনকি বাহির হইতে লাগিল। সেই তীব্র দুঃসহ দৃষ্টি অনুভব মাত্রেই কুকুরের লাফালাফি একবারে বন্ধ হইয়া গেল। কে যেন তাহাকে সম্মোহন মন্ত্রে নিতান্ত নিরীহ জীবে পরিণত করিয়া দিল। ভুলো ভয়ে ভয়ে লেজ গুটাইয়া তাহার মনিবের পিছনে গিয়া লুকাইল।

যেন এতক্ষণে তাহার স্মরণ হইল যে, তাহাকে পুনরায় গোহালে নির্ব্বাসন দেওয়া গৃহিণীর পক্ষে বড় কঠিন নহে।

মরিয়মের রুদ্ধ রোষ এতক্ষণে কথায় ফুটিয়া বাহির হইল। সে তীব্র কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া স্বামীকে বলিয়া উঠিল, "কুকুরটাকে তাড়াবে কি না, আজ তা আমাকে স্পষ্ট করে বল। আজ আমি এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ছি না।"

কাদের মিঞা কিছু ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। প্রৌঢ় বয়সে যুবতী ভার্য্যার আদেশ উপেক্ষা করা সকলের সাহসে কুলাইয়া উঠে না। তাই সারেং সাহেবকে পত্নীর মন ভিজাইবার জন্য যথাসম্ভব মিষ্ট সুরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হইল, "তা! এবারটা ওকে মেহেরবাণি করে না হয় মাপই কর। কি করি, কুকুরটা বড়ই কাছ-ঘেঁসা!"

জবাব শুনিয়া বিবি সাহেবের রাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি এবার রীতিমত ঝগড়ার ভঙ্গীতে আরম্ভ করিলেন, "কোথাকার এক নেমকহারাম নোঙরা জানোয়ার! তার জন্যে এত! নমাজি মুসলমানের ঘরে এ আর সহ্য করা যায় না। আজ আমি তোমায় সোজা কথা বলে দিচ্ছি—সাদির জরু আর সখের কুকুর দুটোর মধ্যে যাকে হয় রাখ; একজনকে বিদায় না করলে চল্‌বে না।"

কাদের নেহাৎ ভালমানুষের মত বলিল—"অত চট্‌ছ কেন? রাগ ঝাঁজ ত দেখি সবই এক তরফা। ওতো আর তোমার নামে নালিশ দায়ের করছে না। মস্করা যাক্‌গে। নিজের বিবিকে আর মহব্বতের কথা বল্‌ব কি! তোমাকে পেয়ার করি কি না, তা কি এত দিনেও বুঝ্‌তে পার নি? বেশী টান বুঝ্‌লে বুঝি জুলুমটাও বেশী করেই করতে হয়!"

"জবানে ত খুব দড় দেখ্‌ছি, এদিকে কুকুরটা যে খাবারের পাশে এসে আড্ডা গাড়ল, তা কি দেখেছ? তোমরা দু'জনে কুকুরে মনিবে যে কি করতে চাও, তা আমি মনে মনেই ঠাহর করছি।"

আবদুল স্ত্রীর কথায় কোন জবাব না দিয়া খাইতে খাইতে উঠিয়া পড়িল। বাহিরে গিয়া চাপা গলায় নাম ধরিয়া ডাকিতেই ভুলো বুঝিতে পারিল যে, তাহার আর জারিজুরি খাটিবে না, সেও ঘরের কোণ হইতে উঠিয়া ভাল মানুষের মত আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল।

বৈঠকখানায় যাইয়া আবদুল কুকুরটার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে

বলিল, "আরে হতভাগা, এখন কি আর সেকাল আছে যে যা খুসি তাই কর্‌বি, সে আমলের মত আর কিছুই চল্‌বে না রে চল্‌বে না, এখন লাফ ঝাঁপ সবই তোকে খাট করে নিতে হবে।"

কুকুরটাকে বাহিরের একটী চালা-ঘরে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া সারেং ক্ষুণ্ণমনে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিল। পুনরায় আহারে বসিল বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিল না। এদিকে গৃহস্বামী হার মানিতেই গৃহিণীর রাগ পড়িয়া যাওয়ায় মেজাজের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের ভাবটাও নরম হইয়া আসিতেছিল। আসলে মরিয়ম বিবির মনটাও বড় মন্দ ছিল না। নিজের জিদ্ বজায় থাকিল দেখিয়া, স্বামী বেচারীকে নাকানি-চোবানী খাওয়াইবার তাহার আর বড় প্রবৃত্তি ছিল না। পত্নীর মনোভাবের সত্বর পরিবর্ত্তনে কাদের মিঞাও যে খুসি হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। হয়তো তাহারও মনে হইয়া থাকিবে যে, সামান্য একটা কুকুর লইয়া পতি পত্নীতে মনোমালিন্য হইতে দেওয়া কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, তাই সে আর সে সব কথা উত্থাপন না করিয়া সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় নিজ গৃহিণীর দিকে নীরবে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

মরিয়ম স্বামীকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না, বরং বেশী ভালবাসিত বলিয়া ভালবাসার অত্যাচারকেও নিজের ন্যায্য দাবি বলিয়া মনে করিত। কেবল দোষের মধ্যে মেজাজটা ছিল কিছু হাল্কা ধরণের, আর সেই সঙ্গে ছিল একটু বেশী রকমই খামখেয়ালী বা একগুঁয়েমীর ভাব। এইজন্য তাহার চরিত্রগত সৎগুণগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাহির হইতে বড় একটা আভাষ পাওয়া যাইত না। তাহা সে দোষে গুণে যেমনই হউক না কেন, বাহ্যিক ব্যবহারে স্বামী স্ত্রীর এরূপ গরমিল ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের দাম্পত্য সুখের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। কাদের মিঞার বয়স হইলেও মাথার চুলে এখনও পাক ধরে নাই। তাহার রীতিমত পালোয়ানী শরীর। বিশাল বুক, চওড়া কাঁধ, ও রোদ-পোড়া মুখ, শক্তিমত্তা ও দেশ বিদেশ ভ্রমণের স্পষ্টই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। কাদের এখনও দেহে এত বল ধারণ করিত যে, সে কিছুমাত্র না দমিয়া বস্তা বস্তা ধান খন্দ বাহির দুয়ার হইতে অনায়াসেই খিড়কীর গোলায় তুলিতে পারিত। কঠিন পরিশ্রমেও তাহাকে সহসা হাঁপাইতে দেখা যাইত না। শক্তির অনুপাতে চেহারাটা কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর ছিল না। গাল উঁচু, মুখের হাঁ বড়, চোয়াল চওড়া, মাথার চুলগুলি সিংহ কেশরের ন্যায় দীর্ঘ ও ঘন-সংলগ্ন, চিরুণী ত্রাসের সহিত তাহার

বড় সম্পর্ক ছিল না। যাহা কিছু যত্ন ছিল, তাহা কেবল দাড়ীর উপর। দাড়ীটীরও কিছু বিশেষত্ব ছিল। হঠাৎ দেখিলে মার্কিণী ফ্যাসানে ছাঁটা বলিয়া মনে হইত। সারেংএর সরলতা মাখান চাহনী দেখিলে ও তাহার সরল প্রাণের উচ্চ হাসি শুনিলে কেহই তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। সমুদ্র-পথের দোদুল পাটাতনের উপর বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহার কেমনতর অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাই ডাঙ্গার উপরও সর্ব্বদাই দুই পায়ের উপর সমান ভর রাখিয়া নিজের ঋজুতা বাঁচাইয়া চলিত।

বহুদিন কোম্পানীর চাকরি করিয়া আবদুল সারেং প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে নিজ ভদ্রাসনে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহা কিছু সামান্ত সঞ্চয় করিয়াছে, ভরসা আছে, সংসার পাতিয়া জীবন-অপরাহ্ণ তাহাতেই নির্ব্বিবাদে চালাইয়া লইতে পারিবে। দেশে আসার অল্প দিন পরেই মরিয়মের পিতার সহিত তাহার জানাশুনা হয়, কন্যাটী বয়স্থা শুনিয়া কাদের তত্ত্ব লইতে লোক পাঠায় এবং প্রথম কথাবার্ত্তার একমাস মধ্যেই যথাবিধি উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহিত জীবনে সংসার-তরণী খুব সাবধানতার সহিত না চালাইলে লুকাইত শীলা সমুচ্চয় সংঘাতে উহার যে প্রতি মুহূর্ত্তে বানচাল হইবার সম্ভাবনা আছে, পক্কবুদ্ধি প্রৌঢ় কাদের সে কথা ভাল রূপেই জানিত। তাহার সংসারে অশান্তির বিশেষ কোন কারণ বিদ্যমান ছিল না। যাহা কিছু গোলমাল হইত, তাহা কেবল ঐ কুকুরটাকে লইয়া। ঈশান কোণে সামান্ত মেঘের আবির্ভাব হইলেই নাবিকগণ ভাবী বাত্যার সন্দেহ করিয়া থাকে। এস্থলেও দাম্পত্য-বিরোধের এই সামান্ত সূচনা অশান্তিময় ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস মনে করিয়া আবদুল কাদের যে কিঞ্চিৎ ভয় না পাইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলিব? মরিয়ম বিবির কথার ভাবে মনে হইত যে, তাহার স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া কুকুরটাকেই বেশী আদর যত্ন করিয়া থাকে। একথা যে সে সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত, তাহা নহে, কিন্তু পুনরুক্তি-ফলে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া কুকুরটার উপর ক্রমশঃ তাহার কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দ্বেষ জন্মিয়াছিল। ইতর জন্তুদিগের মানুষের মত বুদ্ধি না থাকিলেও কে ভালবাসে বা না বাসে তাহা বুঝিয়া লইতে বড় বিলম্ব হয় না। ভুলো যে দিন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মনিব-পত্নী তাহাকে মোটেই দেখিতে পারে না, সেই দিন হইতে সে আর তাহার নিকট মোটেই ঘেঁসিত না। কুকুরেরা সহজে নিমকহারামী করিতে চাহে না। যখন বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মনিবের এই নবাগতা বধূটী স্বেচ্ছায়

তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, তখন অগত্যা তাহাকে বাধ্য হইয়া এই প্রকার বৈরাগ্য-নীতিই অবলম্বন করিতে হইল। কাহাকেও স্বেচ্ছায় সন্তোষ দান করিতে গিয়া, ঘৃণা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিলে কুকুরেরও আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। তাই ভুলো তাহার মনিব-গৃহিণীর মন ভিজাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিত না। সংসারে যে মরিয়ম খাতুনের অস্তিত্ব আছে, এ কথাটাও যেন সে আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে।

স্ত্রী যে কুকুরটাকে মোটেই ভালবাসে না, এ কথা আবদুল কাদের ভালরূপেই জানিত। নিজ ধর্ম্মপত্নী ও পোষা কুকুরকে যে একই ভাবে ভালবাসা যায় না, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর স্নেহ ভালবাসা যে কোনমতেই সামঞ্জস্য হইতে পারে না, এ কথাও তাহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইত না। সারেং যে দুইটাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত, তাহাদের উভয়ের মধ্যে বনিবনাও হইলে তাহার আর দুঃখের কারণ থাকিত না। কিন্তু কুকুরেরই বা অপরাধ কি? সে ত আর গৃহকর্ত্রীর স্নেহ মমতা প্রত্যাখ্যান করে নাই; দোষ যাহা কিছু তাহা মরিয়মেরই বলিতে হয়। তাই ন্যায়-বিচার পক্ষপাতী আবদুল নিজ পত্নীর ত্রুটীর জন্য কুকুরটাকে বরং বেশী করিয়াই আদর যত্ন করিত। এইরূপ প্রকার আদর প্রদর্শনে সুফল না হইয়া কুফলই ফলিতে লাগিল। হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া মরিয়ম মনে করিতে লাগিল যে, কোথাকার এক কুড়ান কুকুর তাহার নিজের প্রাপ্য ভালবাসার ভাগ বসাইতেছে। কিন্তু যাহাকে লইয়া এই দাম্পত্য বিরোধের সূত্রপাত, সেই ভুলো কুকুরকে একবার দেখিলে সে যে কাহারও বিশেষ আদরের বা ঘৃণার বস্তু হইতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতে সে কথা মোটেই মনে হইত না। জনসমাজে সুপরিচিত অনেক মহাত্মার ন্যায় তাহার আকৃতিতে তেমন কোনও বিশেষত্ব দেখা যাইত না। তাহার শরীরের বর্ণ ও দেহের রক্ত উভয়ই পাঁচমিশালী রকমের ছিল।

ভুলো কুকুর দেখিতে বড় সুন্দর ছিল না। গলার কতকগুলি বড় বড় রোম ঘাড়ের উপর উঁচু হইয়া থাকিত বলিয়া দূর হইতে তাহাকে অনেকটা সোণাবাঁধার মত দেখাইত। তাহার মাথা প্রকাণ্ড, দেহ লম্বা, পাগুলি খাট খাট, মুখের দুই পাশে কয়েকটা খোঁচ খোঁচ গোঁফের ন্যায়। কুকুর বংশে এরূপ একটা অপরূপ জীব সহজে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ভ্রূর উপর হইতে দুই গোছা চুল নামিয়া চোখটাকেও প্রায় ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল।

এই একটী মাত্র নিদর্শন হইতে কেবল বোঝা যাইত যে, তাহার পূর্ব্ব বংশধরের মধ্যে কেহ না কেহ লম্বা লোমওয়ালা স্প্যানিয়াল জাতীয় কুকুর। ভুলোর ন্যায় এমন একটা কদাকার জন্তু কখনই শুচিবায়ুগ্রস্তা সুন্দরীর আদরণীয় হইতে পারে না। লোকে কেবল বাহির দেখিয়াই দোষ গুণ বিচার করিয়া থাকে। ভিতরের খবর কয়জনই বা লইতে চায়? ভুলোর বেলায়ও হইয়াছিল তাই। তাহার অর্দ্ধ রোমাচ্ছন্ন চোখে যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার প্রভা বিকশিত হইত, সে দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিত না। তাহার বুদ্ধিতে সে যে ৮।১০টী কুকুরকে হাটে বেচিয়া আসিতে পারে, তাহার চেহারা দেখিয়া এ কথা কাহারও বিশ্বাস হইত না। তাহার কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয়ের কথা জানিতে পারিলে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বুফঁ (Buffon) ও হয়তো পণ্ডিত-সমাজে তাহাকে জাহির করিতে ছাড়িতেন না।

সাধারণতঃ কুকুরেরা মনিবের প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, ভুলোর অনুরাগ যেন তাহা অপেক্ষা আরও তীব্র, আরও অধিক মর্ম্মস্পর্শী ছিল। আবদুল কাদের তাহার সাধের কুকুরকে কাহারও নিকট হইতে খরিদ করে নাই, বা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নাই। কুকুরটী তাহার গৃহে যে মোটেই প্রতিপালিত নহে, এ কথা শুনিলে হয়ত অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

সারেংএর কুকুর-প্রাপ্তির বিষয় একটু বর্ণনা করা আবশ্যক। বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে আবদুল কাদের একবার সদরঘাটে বেড়াইতে গিয়াছিল। সাংসারিক চিন্তাশূন্য আবদুল কাদের মিঞা তখন বেশ স্বচ্ছন্দ মনেই এখানে ওখানে বেড়াইতে পারিত। সদরঘাটে যত ষ্টীমারের আড্ডা, আর সেখানে অনেক পুরাতন সহকর্ম্মীর সহিতও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কাদেরকে মধ্যে মধ্যে সদরঘাটে দেখা যাইত। অবসরপ্রাপ্ত জাহাজী লোকের সময় কাটাইতে বড়ই বিলম্ব হয়। সমুদ্র বক্ষে জাহাজের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে, নিষ্কর্ম্মা ভাবে ডাঙ্গায় বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর বলিয়া ঠেকে। অনেকে যেমন বিদেশে গিয়া স্বদেশের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, নাবিকদিগেরও সেইরূপ সমুদ্র বা নদনদী বাহী অর্ণব যানাদি অদর্শনে চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাদের মিঞা বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল যে, একস্থানে কতকগুলি দুষ্ট বালক নদীতীরে একত্র হইয়া একটা কি লক্ষ্য করিয়া ঢেলা ছুড়িতেছে, এবং যেবার ঢিলগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইতেছে, সেবার সকলে মিলিয়া মুহু আনন্দে কলরব করিয়া উঠিতেছে। তাহাদের ভাব

ভঙ্গী দেখিয়া সারেংএর সন্দেহ হইল যে, এ আমোদ নিশ্চয়ই কোন নিষ্ঠুরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; কারণ, এ বয়সে এই শ্রেণীর ছেলেরা দয়ামমতার কিছুই ধার ধারে না। কাদের মিঞা নিকটে গিয়া দেখিল যে, একটী কুকুর নদী-জলে উজান সাঁতার কাটিতেছে। সেখানে স্রোতঃ অত্যন্ত তীব্র; তাই কুকুরটী কোন ক্রমেই বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। নদী-তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। কুকুরটী যত বার কিনারার নিকট আসিতেছিল, এই নির্দ্দয় বালকগুলা ততবারই চীৎকার করিয়া ঢেলা ছুড়িয়া তাহাকে জলের দিকে হাঁকাইয়া দিতেছিল। তাহারা যে সেখানে কুকুরটীকে ডুবাইয়া মারিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তাহাদের কথায় ও কার্য্যে ভালরূপেই বুঝা যাইতেছিল। তরঙ্গ সঙ্কুল নদীতে কুকুরটী ক্রমাগত সাঁতার কাটিয়া অবশেষে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, তখন সাহায্য না পাইলে তাহার আর পঞ্চত্ব প্রাপ্তির বিলম্ব হইত না। এ দৃশ্যে সারেং আর স্থির থাকিতে পারিল না। নিরীহ জীবের প্রতি অনুকম্পা ও এই পশুপ্রকৃতি বালকদিগের প্রতি ক্রোধ, তাহাকে অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইল। বালকদিগকে তাড়া দিয়া আবদুল দৌড়িয়া আসিয়া "তোদেরই হাত পা ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিব! যে কুকুরটাকে তোরা ডুবাইয়া মারিতেছিস্ তোরা তার পায়ের একটা নখের যোগ্যও নস্।" এই বলিয়া ভয় দেখাইয়া হাতের লাঠিখানা তুলিতেই ছেলের দল কোথায় পলাইয়া গেল। কুকুরটী বুঝিতে পারিল যে, আগন্তুকের কৃপায় আর উপদ্রব উৎপাতের ভয় নাই। এ যাত্রা সে বাঁচিয়া গিয়াছে। সাহস পাইয়া তাহার শরীরের বল ফিরিয়া আসিল, এবং স্রোতের প্রবল বেগ সত্ত্বেও সে নির্ব্বিবাদে সাঁতরাইয়া কিনারায় আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে ডাঙ্গায় পৌঁছিয়াই সে যে বুদ্ধির পরিচয় দিল,তাহা হইতেই সারেং বুঝিতে পারিল যে, দেখিতে যেমনই হউক না কেন, সাধারণ কুকুর হইতে ইহার বেশ একটু পার্থক্য আছে। কথায় বলে, ভিজা কুকুরের দশ হাত তফাৎ; কারণ জল হইতে উঠিয়া গা ঝাড়া দেওয়া বা সিক্ত দেহে গায় ঝাঁপাইয়া উঠা, কুকুর জাতির চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু এ কুকুরটী নদী হইতে উঠিয়াই খানিক দূরে গিয়া নিজের শরীর ঝাড়িয়া লইল, পরে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে দুঃখ-পীড়িত, সন্দেহাকুলিত চিত্ত মানবের ন্যায় তাহার পরিত্রাতার দিকে নিতান্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে অল্প দূর আসিয়া থামিয়া গিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবদুল সারেংএর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার লেজটী মাটিতে আছড়াইতে লাগিল।

বড় বড় বক্তাদের ফেনিল ভাষা ও অনর্গল বাক্যস্রোতে যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, মনের সেই ভাবটুকু তাহার এই নীরব চাহনীতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। আবদুল এ চাহনীর মর্ম্ম বুঝিল। লম্ফঝম্প বা চীৎকারের চেয়ে এই বাক্যহীন ভাষা তাহার কম প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হইল না। বরং ইহাতে ফল যেন অধিক হইল বলিয়াই বোধ হয়। তাই কাদের মিঞা তাহাকে বেশ মিষ্ট স্বরেই আদর করিয়া ডাকিল—কহিল "আয় দেখি বাছা কাছে আয়, তোর সঙ্গে একবার আলাপ পরিচয় করি।" কুকুরটী সারেংএর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ক্রমশঃ আরও নিকটে আসিতে লাগিল। কিন্তু খুব আস্তে আস্তে পা যেন উঠে না। এক পা এক পা করিয়া একটু নিকটে আসিল বটে, কিন্তু তবুও ভয়ে ভয়ে মানব বন্ধুটীর পানে চাহিয়া যেন তাহার স্নেহ ও অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সারেং আপন মনে ভাবিতে লাগিল, আমি ত উহার মন্দ করি নাই, তবু আমাকে দেখিয়াই যখন উহার এত ভয় করিতেছে, তখন না জানি ইহার উপর কতই না উৎপীড়ন হইয়াছে! তাহার স্বভাব-কোমল অন্তঃকরণ কুকুরটীর দুরবস্থায় স্বতঃই বিগলিত হইয়া উঠিল! তাহার পেটটী পড়িয়া আছে দেখিয়া,তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল— "হা কমবখ‍্‌ৎ! আজ আর কিছু জোটে নাই দেখ্‌ছি। চল্‌, আজ তোর আমার ওখানেই জেয়াফৎ। আজ তোকে পেট পুরাইয়া খাওয়াইয়া খুসি করিয়া ছাড়িয়া দিব। তা বাড়ী ত কাছের গোড়া নয়, এখন বলিস্‌ তো কিছু নাস্তার যোগাড় দেখি।"

আবদুল শুধু মিঠা কথার কারবারি ছিল না। তাহার যেমন কথা তেমনি কাজ। সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া সেই কাদা-মাখা কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সরলভাবে বলিতে লাগিল "তুই দেখ্‌তে সুন্দর নস্‌, তা মানি, কিন্তু চেহারা খানায় দুষ্টামি বড় দেখ্‌ছি না। দুদিন এক সাথে থাক্‌লেই একটা বুঝসুঝ হবে এখন। বুড়ো কুকুরটা মরে গিয়ে অবধি গোহালের পাশটা ত খালিই পড়ে থাকে। তাড়াতাড়ি চল্‌, এখন ১১টা কোনকালে বেজে গেছে। বাড়ী পৌঁছাতেই দুপুর হোয়ে যাবে। গিয়ে দেখ্‌ব খাবার ঠাইটাই হয়ে গিয়েছে, মাকুনিকে ত চেন না, তাকে হাঁড়ি নিয়ে বসিয়ে রাখ্‌লে আর রক্ষে নাই। চল্‌, তাড়াতাড়ি রওনা হই, মিছামিছি দেরী করে কাজ কি?"

কুকুরটী সারেংএর আহ্বান শুনিল বটে, কিন্তু শুনিয়াও এক পাও নড়িল না। মনে হইল, সে যেন সেখানে দাঁড়াইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছে।

তাহার পর যেন তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণ যথেষ্ট শোধ হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া সে হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া নদীর কিনারায় গিয়া বৃহদায়তন একখানি স্লুপের প্রতি নিতান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া রহিল। জাহাজখানি তখন তাহার সকল পাইল উঠাইয়া সাগরের দিকে পক্ষিনীর ন্যায় বেগে ছুটিয়া যাইতেছিল। কুকুরটার ভাব দেখিয়া কাদের মিঞা আপন মনেই হাসিয়া ফেলিল—বলিতে লাগিল "কাহারও ভাল করিতে নাই। আমি উহার ভাল চাহিয়া ঘরে লইতে গেলাম, আর উনি সরিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। তা তুমি মনেও স্থান দিও না যে, আমি তোমাকে সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া যাইব। তোমার এমন কি চেহারা বাপু, যে তোমার খোরাক পোষাক ধোলাই খরচা বহিবার জন্য জোরজাপট করিয়া বাড়ী না লইয়া গেলে আমার রাতে ঘুম হইবে না।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

পণসমস্যা বনাম স্ত্রীশিক্ষা।

[লেখক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

'পাত্রের মূল্য ও কন্যাদায়' হইতে "মালঞ্চ" 'মেয়েদের শিক্ষা'র কথা তুলিয়াছেন। "মালঞ্চ" বলেন, 'বিবাহ যতদিনে হয় হউক, সে ভাবনা না ভাবিয়া কন্যাদের শিক্ষার কথা এখন বেশী ভাবিতে হইবে। ছেলেদের জন্য যেমন ইস্কুল কলেজ হইতেছে মেয়েদের জন্যও যাহাতে তাহা হয়, তার আয়োজন চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকে শিহরিয়া উঠিবেন! বলিবেন, ছেলেদের পড়ার খরচের জ্বালায় অস্থির, তার উপরে আবার মেয়েদের পড়ার খরচ! সর্ব্বনাশ! বলে কি! কিন্তু শিহরিলে চলিবে না—ভয় পাইলে চলিবে না। মেয়েদের বিবাহের জন্যও ত অর্থব্যয় ও তার চেষ্টা করিতে হয়? সেই চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া এখন সেই অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে, তার শিক্ষার দিকে। তার পর বিনা খরচে বা অল্প খরচে বিবাহ যখন হয় হইবে।' তাহার পর "মালঞ্চ" বলেন, 'ছেলেরা যদি সংসারধর্ম্মে উদাসীন না হয়, তবে মেয়ে ভাল হইলে বিনা যৌতুকে বা অল্প যৌতুকেই তারা নিবে। কারণ, স্ত্রী ভিন্ন সংসারধর্ম্ম কাহারও হয় না। বুড়ো বুড়ো ছেলেরা সব বুড়ো বুড়ো গিন্নি মেয়ে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবে,

এই অবস্থাটা খুব ভাল বলিয়া অনেকে মনে না করিতে পারেন,—কিন্তু অবস্থাটা ঠিক এমনই হইয়া আসিতেছে, হওয়া কেহ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।'

মেয়েদের বিবাহের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর, এ কথায় আমাদের আপত্তি আছে। আপত্তির কারণ, ইহাতে হিন্দুসমাজে বিবাহের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা খর্ব্ব হইবে; হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত হইয়া বৈশিষ্ট্য হারাইবে। বৈশিষ্ট্য ত আমরা একে একে হারাইতেছি; সত্য কথা; কিন্তু এখনও যেটুকু আছে, তাহাও ইচ্ছা করিয়াই হারাইতে হইবে কি? বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন আমাদের দ্বারা না হইতে পারে; কিন্তু আমরা হাল ছাড়িয়া না দিলে, পরবর্ত্তিকালে এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের আশা করা যাইতে পারে। এক একটা জীবনে এক একটা সোপান নির্ম্মিত হইলে, কালে সেই সোপানাবলী স্বর্গ স্পর্শ করিতে পারিবে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য এই দৃঢ়তা চাই। শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না, ভয় পাইলে চলিবে না। হিন্দুর সমাজবন্ধন অধিকতর শিথিল হওয়ার ফলে, বুড়ো বুড়ো ছেলে যদি বুড়ো বুড়ো মেয়েকে নির্ব্বিবাদে বিবাহ করিতে পারে, এমন দিন আসে, তবে তাহা হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশের দিন। ইহা ভাবিয়া, হিন্দুর জাতীয় জীবনে যাহাতে তেমন দিন না আসিতে পারে, এখন হইতে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। 'স্ত্রী ভিন্ন কাহারও সংসারধর্ম্ম হয় না।' কথাটা কি সত্য? 'ঘরে বাইরে'র বিমলার ন্যায় স্ত্রী লইয়াও ত অনেকে সংসারধর্ম্ম পালন করেন, এবং করিতে পারেন। 'মেয়ে ভাল হইলে বিনা যৌতুকে তারা (ছেলেরা) নিবে।' অনুমান মাত্র। হিন্দুসমাজে ছেলেদের ইচ্ছায় সাধারণতঃ বিবাহ হয় না। (অভিভাবকহীন ছেলেদের কথা স্বতন্ত্র।) মাতাপিতার মত না হইলে, 'নৌকাডুবি'র নায়ক রমেশের ন্যায় দিগ্বিজয়ী ছেলেরাও বিবাহ করিতে পারে না। ব্যবস্থার আগে অবস্থার দিকে লক্ষ্য করা উচিত।

স্ত্রীশিক্ষার হুজুগে মাতিয়া দেশের বহু লোক যদি পুরুষদের ন্যায় নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তাঁহারা সেদিকে মন না দিয়াও নারীর জন্য পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থায় হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রক্ষায় ব্যাঘাত হয় না, অথচ তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষায় দেশ যে কিরূপে হু হু করিয়া স্বর্গে উঠিতে পারে, তাহাও পরীক্ষার সুযোগ হয়। পরীক্ষার সুযোগ এখনও আছে। বেথুন কলেজ আছে, হিন্দুবিদ্বেষী নবীন

ভদ্রের ব্রাহ্মরা আছেন! বেথুন কলেজের ছাত্রীদের কলেজে যাতায়াতের জন্য উহার অধ্যক্ষের ব্যবস্থা এবং সেই সূত্রে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারিণী 'সঞ্জীবনী'র বিলাপ, "মালঞ্চে"র সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই শ্রবণ করিয়াছেন, এবং কারণ কি, বুঝিয়াছেন।

'বিনা খরচে বা অল্প খরচে ' মেয়েদের) যখন বিবাহ হয় হইবে।' এ কথা যুক্তিহীন। আদর্শের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পৃথিবীতে এমন দেশ আছে, এই ভারতবর্ষে এমন সম্প্রদায় আছে, যাঁহাদের মেয়েরা পুরুষের মতই বিদ্যাশিক্ষা করেন—নাচ-গান পর্য্যন্ত! কিন্তু সেই সেই দেশের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐরূপ ব্যবস্থায় কি কন্যার বিবাহসমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছেন? অন্য দেশের অন্য কথা; অন্য সমাজের বা সম্প্রদায়ের অন্য কথা। আমরা হিন্দু, আমরা আমাদের নারীদিগকে 'মডেল ভগিনী' সাজাইতে পারিব না, তাহাতে দেশ চির-আঁধারে থাকে, থাকুক।

দেশে মেয়েদের স্কুল আছে, কলেজও আছে; যাহা আছে, তাহারই শিক্ষা আমাদের মেয়েরা হজম করিতে পারিতেছেন না; তাহার উপর আরও স্কুল, আরও কলেজ! দেশে শিক্ষিতা মহিলা পূর্ব্বে ছিলেন, এখনও আছেন,—অবশ্য পুরুষের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা কম; কিন্তু তাঁহারা কি করেন? কাব্যচর্চ্চা? তাঁহাদের কাব্যচর্চ্চায় হিন্দুসমাজ কতটুকু উপকৃত হইয়াছে? দশ গণ্ডা ব্যর্থপ্রণয়-মূলক গল্প ও বিশগণ্ডা ধোঁয়াটে কবিতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত না হইলে মা সরস্বতীর হস্ত হইতে বীণা কখনই খসিয়া পড়িত না! অনেক মহিলা উল ও কার্পেটের কাজ জানেন; কিন্তু তাঁহাদের তৈয়ারী জিনিস তাঁহাদেরই গৃহসজ্জা হয়। অধিকাংশ হিন্দুই দরিদ্র, নারীর হারমোনিয়ম শিক্ষায় বা গল্প-কবিতা পাঠে তাহাদের উদরপূর্ত্তির কোনও আশা নাই। নাকে দড়ি দিয়া নারীকে যদি বাহিরে আনিতে হয়, তবে ঘরের ব্যবস্থাটা পুরুষকেই করিতেই হইবে। নারী যখন সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি করিয়া শ্রান্তদেহে গৃহে আসিবেন, তখন পুরুষকেই তাঁহার কোমলাঙ্গসেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাঁহার পানভোজনের জন্য টেবিল সাজাইতে হইবে! অমৃতবাবুর 'তাজ্জব ব্যাপারে'র জীবন্ত অভিনয় করিতে হইবে! হিন্দুর আদর্শে ব্যাপারটা উদ্ভট বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু পুরুষের ন্যায় নারীর তুল্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে পারিবারিক সুখ—হিন্দুর গৃহে এখনও যেটুকু আছে—ঐ ভাবে শিকায় উঠিবে। সাংসারে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে হইলে অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন আছে। পুরুষের

ন্যায় নারীও অর্থার্জ্জন করিতে পারিলে মন্দ হয় না; কিন্তু আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য যে কোনও একটা পথ অবলম্বন করা যায় না। চুরি, ডাকাইতী করিয়াও মানুষ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু সাধুব্যক্তি সেই ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে সম্মত হন কি? অর্থহীন হইলেও সুখে ও শান্তিতে জীবন কাটিতে পারে, যদি মনের বল থাকে, দুরাকাঙ্ক্ষা না থাকে। অর্থ অবশ্যই উপেক্ষার বস্তু নহে, বিশেষতঃ এই কামিনী-কাঞ্চনের যুগে। আমার দেশে, আমার সমাজে—ঘরের বাহিরে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ঐ যে শত শত নরনারী, ঐ যে আমার অভুক্ত পাড়াপড়শী, তাহাদের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে, তাহার মূলে চাহি—প্রচুর অর্থ। ঐ অর্থ উপায়ের জন্য মানুষকে চিরকাল অর্থকরী বিদ্যার সাধনা করিতে হইতেছে। সেই অর্থ উপায়ের জন্য আমার মাতা, ভগিনী ও স্ত্রী যদি আমার সঙ্গেই খাটেন, আমারই মত ওকালতী বা কেরাণী-গিরি, মাষ্টারী বা দোকানদারী করেন, তাহা ত লাভের বিষয়,—ইহা সাম্যবাদীর কথা। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষ নারীর কাছে যাহা সাহায্য লাভ করেন, তাহা আধুনিক সাম্যবাদীরা আলোচনার কালে ভুলিয়া যান, এবং খতাইয়া দেখান না। হিন্দুর ঘরে—আমার মাতা, ভগিনী ও স্ত্রী কি আমার সাহায্য করিতেছেন না? আমি বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া টাকা আনিতেছি, কিন্তু টাকা চিবাইয়া ত আমার ক্ষুৎপিপাসা দূর হয় না। পুরুষ আমাদের মুখে কে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতেছেন? কে আমাদের সন্তান প্রতিপালন করিতে-ছেন? কে আমাদের গৃহকর্ম্ম করিতেছেন? তিনি নারী। 'ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে' তাঁহার জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি ধর্ম্মশীলা ও সুনীতি-পরায়ণা হইলেই যথেষ্ট। গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র। গৃহকর্ম্ম যথাবিধি সম্পাদন করিয়া যদি তিনি গৃহশিল্পের সাধনায় অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, ক্ষতি নাই। তিনি বাল্যে পিতা ও ভ্রাতার নিকট, এবং যৌবনে স্বামীর নিকট ধর্ম্মমূলক শিক্ষালাভ করিয়া গল্প-কবিতা রচনা করেন ত করুন। পরের বাড়ী গিয়া পরের কন্যাকে 'শিক্ষিতা' করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজের কন্যার শিক্ষার ভার লইলেই যথেষ্ট ফললাভের আশা করা যাইতে পারে। অনেক হিন্দুগৃহে এইরূপ পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাহাতে প্রত্যেক হিন্দুগৃহে নারীরা পারিবারিক শিক্ষায় উন্নতি লাভ করেন, সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। গৃহেই পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী নারীকে রামায়ণ, মহাভারত পড়াইতে পারেন, গৃহশিল্পাদি শিক্ষার সুব্যবস্থাও করিতে পারেন; যে নারীর স্বামী,

ভ্রাতা ও পিতা নিরক্ষর, তিনি মহাভারত না পড়িলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। নিরক্ষর হইলেও, যে ব্যক্তি হিন্দুর আচরিত বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলেন, তাঁহার গৃহের নারীরা আচার ব্যবহারের ফলেই ধর্ম্মশীলা, সুনীতিপরায়ণা ও সুভার্য্যা অতি সহজে হইতে পারেন, এবং হইয়াও থাকেন। হিন্দুসমাজভুক্ত যে যে জাতি আজিও আধুনিক শিক্ষার আলোকে আসে নাই, তাহাদের সমাজে ধর্ম্মশীলা, সুনীতিপরায়ণা ও সুভার্য্যার অভাব আছে কি? দেশের পল্লীগ্রামগুলি ইহার সাক্ষ্য দিবে।

"মালঞ্চ" বলিয়াছেন, 'মেয়েরা আমাদের মায়ের জাতি, স্নেহ মমতা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।' সত্য কথা। হিন্দুর ভারতে মায়ের জাতি এতকাল মায়েরই কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা শিশু-সন্তানকে লালনপালন করিতেছেন, রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছেন, রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু আজ যদি তিনি ভৃত্য ও পাচকের হাতে সে কাজের ভার দিয়া, পুরুষের প্রতিযোগিতায় মোক্ষমূলর পড়িয়া মোক্ষ-লাভের পথ পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হন, তবে বুঝিতে হইবে-মাতৃত্বের আসন হইতে তিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিচলিত হইয়াছেন। পুরুষের তুল্য শিক্ষার ব্যবস্থা পুরুষের প্রতিযোগিতা নহে কি? আমাদের দেশে যে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা নারীসমাজের পক্ষ হইতে সরকার বাহাদুরের নিকট পুরুষের ন্যায় ভোটের অধিকার চাহিতেছেন, তাহা কি পুরুষের প্রতিযোগিতা নহে? সাম্যের দৃষ্টিতে তিনি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু মায়ের জাতির কাজ তিনি এবং তাঁহারা কতটুকু করিতেছেন, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পুরুষ তাহার হিসাব লইতে পারেন।

তাহার পর বিধবার স্বাবলম্বনের কথা। স্বাবলম্বনের অনেক পথ খোলা আছে; প্রভেদের মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা বা মন্দ! বৈধব্যে বা চির-কৌমার্য্যে নারীকে যাহাতে অপরের গলগ্রহ না হইতে হয়, তাহার ব্যবস্থা হিন্দুর গৃহে আছে। হিন্দুর সংসারে বিধবার পালনের ব্যবস্থা আছে। স্থলবিশেষে বিধবাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না, এমন কথা আমরা অবশ্যই বলি না; কিন্তু সেইরূপ স্থলে সধবাদের অবস্থাও ভাবিয়া দেখা উচিত। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর ঘরে কয়টী সচ্চরিত্রা বিধবা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল হইতে বহিষ্কৃতা হন, তাহার খোঁজ লওয়া আবশ্যক। শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিলে কি 'পরের গলগ্রহ' হইতে হয় না? নারীর পক্ষে পাচিকার কাজও হেয় নহে। পাচিকার কাজ

হেয় হইলে, শিক্ষয়িত্রীর কাজও হেয় ; কারণ উভয় কাজেই প্রকারান্তরে পরের গলগ্রহ হইতে হয়।

তাহার পর "মালঞ্চ" বলিয়াছেন, 'ছেলের শিক্ষার যিনি ব্যয় করেন, মেয়ের শিক্ষার ব্যয়ে তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন? ছেলে রোজগার করিয়া খাওয়াইবে? মেয়ে যদি রোজগার করিতে পারে সেও কি বাপমাকে দুটি খাইতে দিবে না? আপত্তির কারণ কিছুই নাই। ব্যাপারটা একেবারেই নূতন, তাই কেমন কেমন লাগে।' আর্থিক হিসাবে আপত্তির কারণ আছে। হিন্দুর সংসারে ছেলে বড় হইয়া, যাহার যেমন শক্তি, রোজগার করিয়া মাতাপিতার অসময়ে তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার লয়, এমন রীতি আছে ; কিন্তু কন্যার পক্ষে সে রীতি নাই। সধবা কন্যা শ্বশুর-গৃহে স্বামীর কাছে থাকে। মাতা-পিতাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা পুত্রের ন্যায় কন্যারও থাকা স্বাভাবিক ; কিন্তু শ্বশুরালয়ে থাকিয়া কন্যা কি স্বাধীন ভাবে চলিতে পারে? তাহার দরিদ্র পিতার কথা কি তাহার ধনবান শ্বশুর ভাবেন? ভাবিলে আর পণসমস্যায় ছট্‌ফট্ করিতে হইবে কেন? বর্ত্তমান অবস্থায়, পুত্রবধূ তাহার মাতাপিতাকে সাহায্য করিয়াছে, এমন কথা পুত্রের পিতার কর্ণগোচর হইলে অনর্থপাতের আশঙ্কা আছে। কন্যা বিবাহের পর পুত্রের মতই পিতৃগৃহে থাকিতে পাইলে, কন্যার উপার্জ্জিত অর্থে তাহার মাতাপিতা লাভবান হইবার আশা করিতে পারিতেন। পতিপুত্রহীনা বিধবা কন্যার স্কন্ধে স্থলবিশেষে তাহার পিতা ও ভ্রাতা ভর করেন, দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা সাধারণ ঘটনা নহে, এবং 'বিবাহের অব্যবহিত পরে যেন আমার কন্যার স্বামী ও পিতা পরলোক গমন করেন', এমন প্রার্থনা কন্যার মাতাপিতা অবশ্যই করেন না।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলে বহু কথা বলিলাম, অনুকূলে (?) দুই একটা কথা বলিলে ক্ষতি কি?

স্ত্রীশিক্ষায় দেশের উন্নতি অবশ্যই হইবে ; কারণ পুরুষ আমরা যখন স্বরাজ-লাভের জন্য চীৎকার করিয়া হাঁপাইয়া পড়িব, সেই সময়ে দেশের নারীরা সভাসমিতি করিয়া চীৎকার করিবেন—চাই আমরা স্বরাজ! মোহিনীমায়ায় বিশ্বনাথ ভুলিয়াছিলেন, বিশ্বমানবের প্রেতাত্মা দর্শন যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারা ত ভুলিবেনই—চাই কি অতি সহজে দেশোদ্ধার হইবে! আর সমাজের কথা? সমাজের জন্য চিন্তা কি? ধেড়ে ধেড়ে মেয়েরা যদি ধেড়ে ধেড়ে ছেলে ধরিয়া বিবাহ করে, তবে নারীকে বৈধব্যযন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না।

তখন হিন্দুর ঘরের ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে 'জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া' বিবাহ করিবে। বাজালায় না জুটে ত বেহারে বা পঞ্জাবে বা মান্দ্রাজে তাহারা 'পরখ' করিয়া বর যাচাই করিবে, সেখানেও 'মনের মতন রতন' না জুটিলে, দেশের উন্নতির দোহাই দিয়া তাহারা সমুদ্রে পাড়ি দিতে দ্বিধা বোধ করিবে না; সুতরাং হিন্দুরা বিনা যৌতুকে বা অল্প যৌতুকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবেন এবং বরপণ সমস্যায় আর কাহাকেও অশ্রুবর্ষণ করিতে হইবে না।

যাহা হউক, পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই,—মাতৃত্বের বিকাশলাভের জন্য নারীর যে শিক্ষা আবশ্যক, আমরা সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, এবং নারীকে সে শিক্ষা গৃহেই দিতে বলি। যৌবনসঞ্চারের পূর্ব্বে হিন্দু নারীরা বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকেন এবং পড়িতে পারেন, কিন্তু যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সচ্চরিত্র নহে, এবং যেখানে ধর্ম্মমূলক সৎগ্রন্থাদি পাঠের ব্যবস্থা নাই, সেখানে বালিকাগণকে না পাঠানই উচিত।

দাদামশায় বা বালক-বৃদ্ধ।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল্।]

সত্য অনাবিল সত্য সারল্য মধুর,
হাসি চিরানন্দ দিয়া গড়িয়াছ তায়;
রসিকতা দিয়াছ গো তাহার জিহ্বায়,
আননে ঢালিয়া দেছ রহস্য প্রচুর।
শুভ্র কেশ, শ্বেত শ্মশ্রু, দন্তশূন্য মুখে
কত বা মহিমা প্রভা পড়িছে উছলি,
কি গৌরব-ভঙ্গে প্রাণ উঠিছে উথলি
কি সাহস-বর্ম্ম তা'র পরায়েছ বুকে।
নয়নে ধর্ম্মের জ্যোতি হৃদে ভক্তিরাশি,
অন্তরে বিশ্বাস গাঢ় রয়েছে আঁকড়ি,
ষাট বছরের শিশু সন্ন্যাসী-সংসারী
সকলে করিছ মুগ্ধ শুধু ভালবাসি।
কি খেলা খেলিছ দেব ভোলা মহেশ্বর
বৃদ্ধরে করিয়া দেছ বালক সুন্দর!

পাগলা মাষ্টার।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

(৩)

চক্রধরপুর ষ্টেশনে তদন্ত করিয়া যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে প্রফেসার সেনের অন্ততঃ দুইটা ধারণা যথার্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তস্কর বাস্তবিক কাফ্রী নয় এবং দ্বিতীয়তঃ সে গাড়ীতেই ছিল, জঙ্গলে নামিয়া পলায় নাই। গাড়ী থামিবার পর গাড়ীতে একবার খোঁজ হইয়াছিল—কোনও কৃষ্ণকায় ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চক্রধরপুরেও প্রত্যেক আরোহীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল—প্রফুল্ল স্বয়ং এবং পোদ্দার দুই জন প্রতি প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু কাফ্রী দস্যুর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

অথচ দস্যু গাড়ীতে ছিল—এ কথা বলিবারও বিশেষ যুক্তি আছে। চক্রধরপুরের লোকের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, প্রাণের মায়া যদি মানুষের সহজাত বৃত্তি হয়, তাহা হইলে যে স্থলে গাড়ী থামিয়াছিল, সে স্থলে রক্তমাংসের ক্ষণভঙ্গুর নরদেহ লইয়া কাহারও পক্ষে তিলার্দ্ধ অবস্থান করা সম্ভবপর নহে, বিশেষ অন্ধকার রাত্রে। ট্রেণে চুরি হইবার ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে একটা শার্দ্দূলের মৃতদেহ লইয়া দুই জন ড্রাইভারের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, স্থানটি কিরূপ হিংস্র-পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে বাঘ মারিতে পারিলে চাইবাসার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট পুরস্কার পাওয়া যায়। কিন্তু পুরস্কার পাইতে গেলে সাহেবকে ব্যাঘ্রের মস্তক দেখাইতে হয়। ভোর রাত্রে একখানি মালগাড়ীর ড্রাইভার খুব বড় একটা বাঘের দেহ লইয়া চক্রধরপুরের ষ্টেশনে আসিয়াছিল। কিন্তু সে দেহে মস্তক ছিল না। সকলে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—ঠিক সুড়ঙ্গের বাহিরে দুইটা ব্যাঘ্র দ্বন্দ্ব করিতেছিল, সে দ্রুততার সহিত মালগাড়ী চালাইয়া তাহাদের উপর পড়ে। বাঘিনীটা পলাইয়া যায়, কিন্তু সেই গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া ব্যাঘ্রটা পলাইতে পারে নাই। সে গাড়ীতে কাটিয়া মরে। ইঞ্জিনের সম্মুখে যে লৌহের "গরু ধরা" বা কাউক্যাচার থাকে, তাহাতে সেই মৃত শার্দ্দূলের শিরহীন দেহটা আটকাইয়া যায়। পলায়িত বাঘিনীটা পাহাড়ের উপর বসিয়া তখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, ড্রাইভার-সাহেব ভয়ে গাড়ী থামাইয়া ব্যাঘ্রের খণ্ডিত মস্তকটা তুলিয়া লইতে সাহস করে নাই।

বলা বাহুল্য, তাহার দক্ষতার সহিত এঞ্জিন চালাইবার অংশটুকু ছাড়িয়া দিলে, এবং বাঘিনীর তর্জ্জন গর্জ্জনে সাহেবের হৃৎকম্প হইয়াছিল, হয়তঃ সে ক্ষণিক লুপ্তচেতন হইয়াছিল—এটুকু যোগ করিলে, মোটের উপর গল্পটি সত্য। সাহেব ত বাঘের দেহ লইয়া কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল। তাহার দুই তিন ঘণ্টা পরে অপর একখানি মালগাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তখন সকাল হইয়াছে—প্ল্যাটফরমের উপর অনেক স্ত্রীপুরুষ জমিয়াছে। খুব বীরদর্পে সেই দ্বিতীয় গাড়ীর চালক নামিয়া সকলের সম্মুখে খুব বৃহৎ একটা ব্যাঘ্রের দেহহীন মস্তক বাহির করিল। সকলে বুঝিল—এ দেহহীন মস্তক, মস্তকহীন দেহের। সাহেব পূর্ব্ব কাহিনী জানে না। লোকটার কল্পনা-শক্তিও মন্দ নহে। সে খুব বুক ফুলাইয়া বলিল যে, বেগবান ট্রেণ হইতে গুলি মারিয়া সে ব্যাঘ্রটাকে মারিয়াছে। ট্রেণের তলায় পড়িয়া আহত ব্যাঘ্রের দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে কেবল তাহার মাথা কাটিয়া আনিয়াছে।

তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা এ গল্পের বিষয়ীভূত নহে। তাহাকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিগ্রহ অধিক হইয়াছিল কি কল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পীয় শকট-চালক অধিক নিগৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয় আপনারা মাথা ঘামাইয়া সিদ্ধান্ত করুন। আমি চুরির মোকদ্দমার ধান ভানিতে-এ শিবের গান গাহিলাম—আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য। বাঙ্গালী সম্পাদকেরা বলিয়া থাকেন যে, পুলিস কোনও তদন্তে চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারে না—নিরীহ দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিয়া এবং সাহেবদের "পিট-চাপড়ান"'র গরমে বাঙ্গালার পুলিস এমন অকর্ম্মণ্য! আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, কোন্ সম্পাদকপ্রবর এই সকল ঘটনা শুনিয়া স্থির করিতেন যে, চোর জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়াছে? তস্কর নিশ্চয় গাড়ীতে ছিল এবং তাহার কাব্রীর বেশটা ছদ্মবেশ মাত্র।

(৪)

ঘটনাস্থল দেখিয়া ঐ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইল। তাজমহল, জুমা মসজিদ বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শোভা তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি সরু রেলপথের দুই পার্শ্ব দিয়া খুব উচ্চ শৈল উঠিয়া যায়, তাহার পার্শ্বে আবার আর থাকে-থাক অদ্রির সারি বিরাট দেহে অসংখ্য চকচকে সবুজ গাছ বসাইয়া একটা সবুজের বিশালতার সৃষ্টি করে, আবার যদি সেই শৈলগুলার পরস্পরের সন্ধির জল বহিয়া ছোট ছোট ঝরণা গড়াইয়া পড়ে; আবার যদি দৃষ্টির

শেষ সীমায় সবুজ গাছের মাথায় আর নীল আকাশের তলায় মিশিয়া যায়; আর যদি সেই জঙ্গলটি নানাজাতীয় পাখীর এলোমেলো বে-সুর বেতালা কাকলীতে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে বলা শক্ত যে, এরূপ দৃশ্যের শোভা অধিক চিত্তাকর্ষক না মানুষের গড়া তাজমহল ও দেবমন্দিরের শোভা অধিক মনোরম। সে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লোকালয় নয়নগোচর হইল না। সেই পাহাড়গুলা চক্রধরপুরের দিকে দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া একটী উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু সেই অরণ্যে কেবল একটি বৃদ্ধকে উদরান্নের জন্য থাকিতে হয়। সে সুড়ঙ্গের প্রহরী—রেলওয়ে কোম্পানীর ভৃত্য। সেই সুড়ঙ্গে বা গিরিবর্ত্মে পাথর খসিয়া পড়িলে লাল নিশান বা লাল আলো দেখাইয়া তাহাকে ট্রেণ থামাইতে হয়। দিনের বেলায় সে ছোট একটী ঘানিতে তৈল নির্ম্মাণ করে আর রাত্রে পাথরের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে, আর ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনে। তাহার নিকট শুনিলাম সে জঙ্গলের অধিপতি একটী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র, তাহার মাথায় জটা জন্মিয়াছে, সে এই সুড়ঙ্গ-রক্ষকের কুটীরের পার্শ্ব দিয়া প্রত্যহ চলিয়া যায়, কিন্তু দয়া করিয়া তাহার ঘাড়টি মট্‌কাইয়া দেয় না। এই প্রহরীর নাম ঝুলুয়া। ঝুলুয়া চুরির কথা শুনিয়াছিল—হঠাৎ ট্রেণ থামিয়া যাওয়ায় সে সেইস্থলে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—আচ্ছা, এখানে কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে থেকে পরের ট্রেণে চলে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকের মত ঝুলুয়া আমায় ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল—বাবু এই একটা ঝুলুয়া যে কোন্ বেটার মাথার ওপর মাথা আছে এখানে থাকে। সেরাত্রে যখন ট্রেণ ছাড়ে, তখন ঐ পাহাড়টার টিবার ওপর আমি বাবাকে দেখেছিলেম।

"বাবা" অর্থে সেই জটাজুটধারী শার্দ্দূলটা। আমি বলিলাম—বাবাকে দেখেছিস ত' কি হ'য়েছে?

ঝুলুয়া বলিল—সে বাবা কেবল একটা মানুষকে খায় না, সে একটা ঝুলুয়া খায়। সে একটা অপর মানুষকে পাইলে কামড়াইয়া খায়। একদিন আগে—দুসরা দিন শির—তিসরা দিন—

সে যতক্ষণ কথা কহিতেছিল আমি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। তাহার মুখে সরলতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব ছিল না। তাহার সহিত ষড়যন্ত্র না করিলে ট্রেণের বাহিরের লোকের পক্ষে এ দস্যুতা অসম্ভব। আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—দেখ ঝুলুয়া, তুমি যদি না জানবে

চোর পালাতে পারত না। আমি হয়ত তোমাকে গ্রেপ্তার করব। তবে তুমি যদি বল কোন লোক তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, তা'হলে তোমার বিপদ নাই।

ছলুয়া আবার সেই অবজ্ঞার হাসি হাসিল। সে বলিল—সে একটা ছলুয়া এখানেও ঘানি টানে—জেলখানা হইলে না হয় সেখানেও ঘানি টানবে।

এবার তাহার মুখে একটু ভিন্ন ভাব দেখিলাম। সে ভাবটি সরলতার চিহ্ন নয়।

(৫)

প্রফেসার সেন পাহাড়কাটিয়া পাহাড়ের তলায় হাতীজোবড়া নদীর ধারে বসিয়াছিল। সে ঘাটশিলার বাসায় বড় একটা থাকিত না। তাহার সহিত বসিয়াছিল, তাহার কলিকাতার অপর একটী বন্ধু। বেশ লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ চেহারা। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি মিঃ রায়—কলিকাতার প্রফেসার। তাহার ভৃত্য দূর হইতে আমাকে স্থানট দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আমাকে দেখিয়া প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইল। একমুখ হাসিয়া বলিল—কি হে চোর ধরলে ?

আমি বলিলাম—না। তবে কতকটা ধারণা করেছি। ঘটনা স্থানটা বেশ করে দেখে এসেছি।

আমরা উভয়ে একখণ্ড খুব বড় কৃষ্ণবর্ণ শিলার উপর বসিলাম। প্রফেসার রায় আমাদের দিকে চাহিয়া একটা বড় পাথরের উপর শুইয়াছিল।

আমি বলিলাম, তোমার দোষ নেই। তোমার মত অবস্থায় সিদ্ধান্ত করতে হ'লে পুলিসের লোককেও ভাবতে হত যে, চোরটা ভরসা করে সে জঙ্গলে নামতে পারবে না। কিন্তু—

প্রফেসার বলিল—কিন্তু—

আমি বলিলাম—কিন্তু সেখানে নেমে একটু [illegible] করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, [illegible] একটু [illegible] থাকলেই ভরসা করে নেমে পড়া যায়।

মাষ্টার [illegible] বসিল [illegible] বলিল—সেখানে কি একটা টানেল-[illegible] থাকে ?

আমি বলিলাম—হাঁ। আর টানেলের [illegible] পার্শ্বেই তার বেশ শক্ত একখানি পাথরের ঘর আছে। [illegible] প্রবেশ করতে পারলে—

মাষ্টার বলিল—রেলওয়ের লোকের দ্বারা তার ঘরটা খানাতল্লাসী হওয়াই সকলের চেয়ে বেশী সম্ভবপর। সেদিন গার্ড বা ড্রাইভার তার ঘর তল্লাস করেনি দৈবক্রমে। কিন্তু যেটা সম্ভবপর সেইটে ভেবেই দস্যুরা কার্য্য করে। তার ঘটে কিছু বুদ্ধি থাকলে—

আমি বলিলাম—সে নিশ্চিত জানত যে সেখানে কেহ তদন্ত করবে না।

পাগলা মাষ্টার বলিল—বলিহারি পুলিস রত্ন! কেয়াবাৎ বুদ্ধি! এই তোমাদের দোষে দেশে এনারকিষ্টদের সৃষ্টি—

আমি বলিলাম—আজ্ঞে না, তোমার মত মাষ্টার ও বিদ্যাদিগ্‌গজ সম্পাদকদের অনুগ্রহে।

তাহাকে বাঘের গল্পগুলা বলিলাম। সেদিন গাড়ীর গার্ড ড্রাইভার যে দুলুয়ার কুটীরে অনুসন্ধান করেনি তার বিশেষ কারণ আছে।

আমি তাহাদিগকে "বাব" ব্যাঙ্কের কাহিনীটা বলিলাম। ঠিক ঘটনার দুই দিন পূর্ব্বেই, যে স্থলে বাঘ কাটা পড়িয়াছিল, যে স্থলের সহিত ব্যাঙ্কের অত্যাচারের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সেস্থলে পরের সোনার জন্য লোকে আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিবে না, তস্কর তাহা জানিত। সে চুপ করিয়া গিয়া দুলুয়ার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল।

প্রফেসার সেন অবজ্ঞার হাসি হাসিল। রায় মহাশয়ও সে উৎসবে যোগদান করিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—সে কাক্রিটার নামও পাইয়াছি। তাহার নাম জ্যাক বার্লি। আমি কাল তাকে গেরেপ্তার করব। সেন অস্ত স্বরে বলিল—বটে ?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তোমার কাছে এসেছি, তোমাকে নিয়ে যাব তাকে সনাক্ত করবার জন্ত।

সে বলিল—বেশ। [ক্রমশঃ।

বিদ্যার্থী ও সরস্বতী।

পুণ্যভূমি কাশীধামে   [illegible]
পাঠে রত ব্রাহ্মণ বালক।
অন্নপূর্ণা নাম জপি   অন্ন চিন্তা পরিহরি
নিরন্তর বেদের পাঠক। ১

হইলে ভোজন বেলা ছাড়িয়া শাস্ত্রের খেলা
অন্নসত্রে হ'য়ে উপগত।
যাহা কিছু শাক পাত করিয়া উদরসাত
পুনরায় পাঠে হন রত। ২

একদা বরষা কালে নিদারুণ মেঘ-জালে
সমাচ্ছন্ন হইল আকাশ।
ঢাকিল রবিমণ্ডল বেগেতে পড়িল জল
কোথাও না দেখায় প্রকাশ। ৩

ভীমবেগে প্রভঞ্জন বহিলেন বহুক্ষণ
মধ্যাহ্ন হইল সমতীত।
হয়ে গেল বরষণ সূর্য্য দিলা দরশন
বিপ্রবটু ক্ষুধায় পীড়িত। ৪

পুঁথি পত্র পরিহরি অন্নদা স্মরণ করি
অন্নসত্রে ছুটিলা তখন।
কিন্তু তথা যেয়ে হায় কাকে না দেখিতে পায়
গৃহদ্বারে কুঞ্চিকা বন্ধন। ৫

সরল বিশ্বাস মন এ ক্ষেত্রে কেহ কখন
অনাহারে রহিতে না পারে।
ইহা ভাবি পূত মনে ডাকিয়া বৃষবাহনে
চলিলেন জাহ্নবীর পারে। ৬

যেতে যেতে অকস্মাৎ করিলেন দৃষ্টিপাত
জীর্ণ দেওয়ালের ভগ্নদেশে।
দেখিলা কাঁসার থালে পরিপূর্ণ ঝোলঝালে
অন্ন রহিয়াছে সজ্জ বেশে। ৭

ইহা অন্নদার কাজ ভাবিয়া ব্রাহ্মণ রাজ
করিলেন সে অন্ন ভক্ষণ।
রজকী অদূর পথে পরিপূর্ণ মনোরথে
ব্যাপার করিল দরশন। ৮

ভাবিল প্রফুল্ল চিতে ভাগ্যলক্ষ্মী আচম্বিতে
মম প্রতি সদয় হইলা।
তাই ত ব্রাহ্মণ জানি মূর্ত্তিমান-তেজোরাশি
অবশেষে এ বর পাইলা। ৯

অর্চনা, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

হিন্দু সাহিত্যে ভারতচন্দ্র।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

হিন্দু সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত। ভাবের সাম্য সত্বেও ভাষার প্রভেদবশতঃ হিন্দু সাহিত্যের সবিশেষ পরিপুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই বাল্মীকির রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ, এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিরচিত হইয়াছে। যে সংস্কৃতভাষা জানে না, সে বাঙ্গালাভাষার রামায়ণ পড়িয়া সুখানুভব করিতেছে, পক্ষান্তরে তুলসীদাসের ভাষাভিজ্ঞ তুলসীর রামায়ণ পড়িয়া ভাবে বিভোর হইতেছে, সংস্কৃতবিৎ বাল্মীকির মধুরনিষ্যন্দি-রচনাবলী পাঠ করিয়া ভাবে আত্মহারা হইতেছে। যে পাঠক এতত্রিতয় পাঠে অধিকারী, সে তিন কাব্যেরই রসাস্বাদ করিতেছে। কিন্তু ইক্ষু-ক্ষীর-গুড়াদিগত মাধুর্য্যের প্রভেদ যেমন ভাষার দ্বারা বর্ণন করা সরস্বতীর পক্ষেও অসাধ্য, তেমনই এক ভাষার কাব্যের সহিত অপর ভাষার কাব্যের তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বিচারের ফল প্রকাশও অসম্ভব। যিনি অভিনব ভাবের উদ্ভাবনে সমর্থ, তিনি সাধারণের প্রশংসাভাজন, ইহাতে কোনরূপ মতভেদ নাই। পক্ষান্তরে পরের ভাব সংগ্রহ করিয়া যিনি নিজের ভাষায় প্রতিভোদ্ভাবিত অভিনব ছাঁচে ঢালিয়া চমৎকারোৎপাদনে কৃতী, তাদৃশ কবির মহিমা জগতে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহারা নিজের উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশে এবং পুরাতন ভাবের নবীকরণশক্তিপ্রদর্শনে কৃতী, আমরা হিন্দু সাহিত্যে এমন অনেকগুলি কবিকে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষের এবং তাঁহারই বংশধর বলিয়া সুপরিচিত বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি ভারতচন্দ্রের অনন্যসাধারণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইঁহারা যে কেবল ভাবসন্নিবেশেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, বিভিন্ন শাস্ত্রের জটিলতম প্রতিপাদ্যবিষয়নিচয়ের সাহিত্যাকারে পরিণমনেও ইঁহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। নৈষধের পদলালিত্য সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয় বলিয়াই সুবিখ্যাত, কিন্তু এই লালিত্য উত্তরাধিকারীসূত্রে ভারতচন্দ্রও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাই

দেখাইবার অভিপ্রায়ে আজ আমরা হিন্দুসাহিত্যসমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের মাতৃভাষার কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থনিচয়ের গুণ দোষ বিচারে সচেষ্ট হইলাম।

ভারতচন্দ্রের লিখিত কাব্যগুলির মধ্যে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, এই দুই খানা গ্রন্থেরই সমধিক উৎকর্ষ প্রতিভাত হয়। এই উভয়ের মধ্যেও আবার বিদ্যাসুন্দরই কেবল সংস্কৃতাভিজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে অধিকতর সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলেই প্রায় অভিনিবিষ্টচিত্তে বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতেন। অদ্যাপি প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যাসুন্দর প্রায় কণ্ঠস্থ আছে।

বিদ্যাসুন্দরের প্রতি পণ্ডিতদিগের অত্যধিক সমাদরের কারণ কি, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়,—অন্যত্র দুর্লভ পদলালিত্য ভাবগাম্ভীর্য্য শাস্ত্রার্থসন্নিবেশ রসসমন্বয় ছন্দঃপারিপাট্য ও অলঙ্কারনিধান এই কয়টি বিষয়ে অনন্যসাধারণতাই রসাভিজ্ঞ পণ্ডিতজনচিত্তকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

কবি ভারবি বলিয়াছেন যে—

স্তুবন্তি গুর্ব্বীমভিধেয়সম্পদং বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতিপুরুষং রুচৌ সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ।

কেহ অর্থের গুরুত্বকে প্রশংসা করেন, এক শ্রেণীর পণ্ডিত পদবিন্যাসের বিশুদ্ধি অর্থাৎ অলঙ্কারযুক্ত শব্দসন্নিবেশেরই পক্ষপাতী। এই প্রকারে প্রত্যেকব্যক্তিগত রুচির পার্থক্য নিবন্ধন সর্ব্বজনের মনোরম বাক্য কাব্যজগতে বড়ই দুর্লভ। কিন্তু ভারবির ন্যায় মহা কবির মতেও কাব্যের যে গুণ দুর্লভ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরে তাহার সুলভতা প্রতিভাত হয়। উহার যমকাদিসম্পৃক্ত নৃত্যৎপ্রায় পদাবলী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই যেন মধুরধারাবর্ষণে শ্রোতার চিত্তকে পীযূষহ্রদে নিমজ্জিত করে। অনেক দিন পূর্ব্বে কবিপ্রবর সুবন্ধু গাহিয়া গিয়াছেন যে,—

অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপিহি হরতি দৃশং মালতীমালা।

সৎকবির বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হইলেও তাহা কর্ণে মধুধারা বমন করিয়া থাকে। মালতীপুষ্পগ্রথিত মালার সৌরভ অনুভূত না হইলেও উহা দর্শন মাত্রে দ্রষ্টার নেত্রকে প্রলোভিত করিয়া তুলে। বৃদ্ধ কবির উক্তির সারবত্তা বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলেই প্রতিপন্ন হয়। এই কাব্যের অনেক স্থলেই

অল্পাক্ষরে জটিল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এমন কৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, ঐ সকল স্থলের মর্ম্মাবগতি বহুবিদ্য সূক্ষ্মধীষণাসম্পন্ন রসিক পণ্ডিত ব্যতীত সামান্যবিদ্য মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু পদের উদারতা নিবন্ধন অল্পজ্ঞ পাঠকও উহা পাঠ করিয়া মুগ্ধচিত্ত হইয়া থাকে। এই কথার সমর্থক কয়টি কবিতা আমরা বিদ্যাসুন্দর হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিল সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর ॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিন্তু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
বেদান্ত একাত্মবাদী ন্যায়বাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঙ্গুলি বান্ধি হারে ॥
সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল ॥
দুই এক কথা যদি আনপে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ বুঝাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া ॥
সুন্দরে বলেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যা বলে বেদান্ত ॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাটাবন।
তবন্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন ॥
রায় বলে তবে এক আত্মা তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥

বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিচার আরম্ভ হইল। বিচার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক, তাই কবি ষড়্দর্শনসহচর মদন পঞ্চাননকে সালিশরূপে উপস্থিত করিয়া বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। সুন্দর "আত্মতত্ত্বে" পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, বিদ্যা তাহার উত্তর করিতে একেবারে ফাঁফর হইয়া পড়িলেন। আত্মতত্ত্ব শব্দটায় দ্ব্যর্থ রহিয়াছে। ইহার আপাতপ্রতিভাত অর্থ আত্মার স্বরূপ বিষয়ক, অপর গূঢ় অর্থ "আত্মতত্ত্ব বিবেক" নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ। সুতরাং ইহাতে শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি হইয়াছে। ধ্বনি উত্তম কাব্য বলিয়া পরিচিত। প্রবীণ মধ্যস্থ সন্নিধানে যাহা তাহা বলিয়া অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই, কাজেই বিদ্যা ভয়ে জড়সড় হইলেন। পক্ষান্তরে কোকিল ভ্রমর প্রভৃতি সমভিব্যাহারে ষড়্ঋতুসহচর কামদেব সমীপে যুবতীর সবিশেষ চিত্ত চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী ; কাজেই বিচারের লক্ষ লক্ষ কোটি অর্থাৎ সন্দিগ্ধ বিষয় সত্ত্বেও তখন সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্বপক্ষ কিছুই মনে আসিল না। দার্শনিক বিচারের রীতি আছে, পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তার উপর ধরাট করিয়া অনেক সময় তাহাকে বিব্রত রাখা যায়।

কিন্তু অস্ফূর্ত্তি নিবন্ধন বিদ্যা তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। বেদান্ত মতে সর্ব্বভূতে একই আত্মা। তর্ক অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র দ্ব্যাত্মবাদী অর্থাৎ দ্বৈতবাদী; সুতরাং তাহার দ্বারা অভিপ্রেত উত্তরের সম্ভাবনা নাই। মীমাংসায় এই বিচারে মীমাংসার সম্পর্ক নাই, কারণ পূর্ব্বমীমাংসা যাগ, যজ্ঞ লইয়াই ব্যাপৃত, তাহাতে আত্মসম্বন্ধে বিশেষ কথাবার্ত্তা নাই। বৈশেষিক দর্শনও এই বিষয়ে বিশেষ কিছু কহিতে পারে না; কারণ দ্বৈতবাদী বৈশেষিক আত্মতত্ত্ব নিরূপণে সম্পূর্ণ প্রয়াসী নহেন। পাতঞ্জল দর্শন মাথায় অঞ্জলি বান্ধিয়াই হার মানিল, কেন না উহা যোগ নিরূপণেই ব্যাপৃত। বিশেষত ইহাও দ্বৈতবাদী। সাংখ্য দর্শনেও আত্মনিরূপণ সম্ভবপর নহে, কারণ ইহাও দ্বৈতবাদী, এবং উহার মতে আত্মা আনন্দময় নহে। পুরাণ সংহিতা স্মৃতি শাস্ত্রেও বিদ্যার বিজ্ঞতা নাই, অর্থাৎ কিছুই মনে পড়িল না। শ্রুতি ব্যতীত অর্থাৎ বেদবাক্য ব্যতীত সমাধার উপায় পাইলেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদোচ্চারণ নিষিদ্ধ, কাজেই তদ্দ্বারা বিচার চলে না। শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইলেন, তখন মধ্যস্থ পঞ্চানন মহাশয় উত্তরবাদীর পরাজয় প্রকাশ করিলেন। মধ্যস্থ পক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বিদ্যা চিন্তা করিয়া দু এক কথা ঠিক করা মাত্রই তিনি তাহা ভুলাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনোভূ কাম উভয়ের মনেই স্থিত আছেন, কিন্তু বিদ্যার চিত্তে তাহার অধিকতর প্রাকট্য বশতঃ বিদ্যা কোন কথাই স্থিরচিত্তে ভাবিতে পারিলেন না। সুন্দর তখন বিদ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সিদ্ধান্ত হইল? বিদ্যা বলিলেন, আর কোনও কথা নাই; বেদান্ত যাহা বলে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাই সত্য; কারণ অন্যান্য শাস্ত্র কাঁটাবন স্বরূপ, বাদরায়ণের উত্তর মীমাংসায়, আত্মতত্ত্ব যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত প্রমাণসহ। কবির এই সহজ কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য অতীব রহস্যপূর্ণ। কারণ খ্যাতনামা উদয়নাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে—"ইদন্তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বন্তু বাদরায়নাৎ" ইহার অর্থ—এই ন্যায়শাস্ত্রে যাহা বলা হইল, উহা কণ্টকাবরণ মাত্র। অর্থাৎ কাঁটার বেড়া দিয়া যেমন শস্যক্ষেত্র রক্ষা করা হয়; সেইরূপ তর্কের দ্বারা নাস্তিকদিগকে শাস্ত্রার্থের দূরে রাখা হয়। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বাদরায়ণের গ্রন্থ হইতে অবগত হইতে হইবে।

সুন্দরের মুখে বেদান্তমতে উভয়ের একাত্মকতার কথা শুনিয়া বিদ্যা হার মানিলেন, এবং সুন্দরকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। হিন্দু-দম্পতির একাত্মকতাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, এবং ইহাও বেদান্ত প্রসিদ্ধ।

"তবে এক আত্মা তুমি আমি" এই কথাটার ভিতরেও একটা গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। বেদান্তমতে যেমন সর্ব্বভূতে একই আত্মার অবস্থান সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তেমনই স্ত্রীপুরুষের একই দেহ দ্বিদলের মত অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ডাইলের খোসার মধ্যে যেমন দুইটা অংশ দেখা যায়, তেমনই স্ত্রী ও পুরুষ উভয় এক দেহের দুইটি ভাগ মাত্র। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের উৎপত্তিপ্রকরণ দ্রষ্টব্য। সহৃদয় পাঠকগণ! ভাবিয়া দেখুন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি কবি কেমন কৌশলে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার কাব্যে নিখুঁত হিন্দু ভাব কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥

রাজকন্যা হরগৌরী সাক্ষী করিয়া বরমাল্য দিলেন। ইহাতে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সূচিত হইল। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রশস্ত, বৌধায়ন বলেন যে, কোন কোন ঋষির মতে সকল জাতির পক্ষেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কারণ ইহাতে বর কন্যার অনুরাগ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।

সুন্দর প্রকাশ্য ভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেও বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে বিদ্যার তাদৃশ ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইত না; ঔৎসুক্যের দ্বারা রস সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহা রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

সুন্দরের সমাগমলালসায় বিদ্যা অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, এমন সময় সুড়ঙ্গ পথে সুন্দর হঠাৎ তাহার সম্মুখীন হইলেন। ইহাতে বিস্ময় রসের আর সীমা রহিল না। অবশ্য কালীর বরে সন্ধি কাটিয়া বিদ্যাসন্নিধানে উপস্থিতি বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না; সুতরাং অহিন্দুর নিকট এই ঘটনা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মণি-মন্ত্র-মহৌষধির অমোঘশক্তিবিশ্বাসী হিন্দুর পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্রদ্ধেয় বলিয়াই পরিচিত।

নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত নল দময়ন্তীসন্নিধানে নিষধরাজ দেববরে অদৃশ্যত্বশক্তি লাভ করিয়া সুরক্ষিত কন্যান্তঃপুরে অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন, নৈষধচরিতের এই ঘটনার ছায়া লইয়াই কবি সুন্দরকে কন্যান্তঃপুরে উপস্থিত করিয়াছেন।

চোরের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি অনেকটা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীর জিজ্ঞাসাতেই চোরের প্রত্যুৎপন্নমতিতা প্রকটিত হইয়াছে। সুন্দর মুন্শীকে বলিলেন—

চোর বলে মুন্সীজী তুমি সে বুঝিবে
জামাই হইলে চোর কি পাঠ শিখিবে ?

এইরূপে চোরের চাতুর্য্যে রাজপুরুষগণ সকলেই অসমর্থ হইলে, সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সুন্দর বিচারের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়া বলিলেন—

বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥

শব্দের সঙ্কেতগ্রহ জাতি গুণ ক্রিয়া ও দ্রব্যেতে হইয়া থাকে। উহা ব্যাকরণাদিপ্রসিদ্ধ। অভিধা লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা, শব্দের এই তিন প্রকার শক্তি আলঙ্কারিকপ্রসিদ্ধ। এই সকলের দ্বারা বিচার করিয়া লক্ষণ স্থির করার ভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উপর ন্যস্ত হইল। এইরূপে যে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহাই কবি দুই পংক্তিতে উপসংহার করিয়াছেন,—

এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥

অত্রত্য "বাক্‌ছল" কথাটার ভিতরেও ন্যায় দর্শনের একটা নিজস্ব কথা নিহিত রহিয়াছে। বিচারস্থলে বক্তা যে অর্থ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষোদ্‌ভাবনের নাম ছল। ছল তিন প্রকার,—বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল, ও উপচারচ্ছল। বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ কল্পনার নাম বাক্‌ছল। বাক্‌ছলের উদাহরণ—এই ব্যক্তি "নবকম্বল" এইস্থলে বক্তার অভিপ্রায় দৃশ্যমান মনুষ্যটির নূতন কম্বল আছে। কিন্তু ছলবাদী নবশব্দের নয় সংখ্যা অর্থ কল্পনা করিয়া উপহাস করিয়া বলিল, কোথায় ? ইহার ত একখানা বৈ কম্বল দেখা যায় না, তবে নবকম্বল হইল কি প্রকারে ? এই শ্রেণীর গূঢ় রহস্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অনেক স্থলেই নিহিত রহিয়াছে। মল্লীনাথের মত কোনও পণ্ডিত যদি এই গ্রন্থের টীকা করিয়া দিতেন, তবে উহার রসাস্বাদ সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইত। অধুনা সম্পূর্ণ রসাস্বাদে অসমর্থ ব্যক্তিরও ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনপ্রয়াসের অভাব নাই। বিদ্যাসুন্দরে প্রকট আদিরসের সমুল্লাস দর্শনে কেহ কেহ ভারতচন্দ্রকে একেবারে জাহান্নমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি, অভিনব বিক্রমাদিত্য নামে উল্লেখযোগ্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও সুরুচিভাণ্ডার মস্তিষ্কশালী সমালোচকের গরলবর্ষী লেখনীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই।

আমরা এই জাতীয় সমালোচনার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আমরা কয় পংক্তি পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়াছি। এই নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গুণসম্বদ্ধ একটি কবিতা মনে পড়িল। উহার লেখক কবিপ্রবর সুবন্ধু, কবিতাটিও প্রসঙ্গের উপযোগী, কাজেই উহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কবিতাটি এই—

"সারসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥"

কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সরোবরের ন্যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য কীর্ত্তিমাত্রশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে অর্থাৎ ধরাধাম পরিত্যাগ করাতে, জগতে সেই প্রসিদ্ধ রসবত্তা অর্থাৎ কাব্যরসগ্রাহিতা বিনষ্ট হইয়াছে। কাব্যের যথোচিত রসবিবেকক্ষম মানব আর দৃষ্ট হইতেছে না। সরোবর পক্ষে "রসবত্তা" গভীর জলশালিতা নষ্ট হইয়াছে। যে সরোবরে পূর্ব্বে অগাধ জল ছিল, তাহার সেই অবস্থা বিদূরিত হওয়ায়, সারসবত্তা অর্থাৎ সারসপক্ষিযুক্ততা বিনষ্ট হইয়াছে। শুষ্ক সরোবরে সারস বিচরণ করিতেছে না। তাহার ফলে অধুনা "নবকা বিলসন্তি" নূতন নগণ্য কবিরা শোভা পাইতেছে। "চরতি নো কঙ্কঃ" কোন্ ক্ষুদ্র কবি মস্তকে আরোহণ করিতেছে না? অথবা কে কাহাকে গ্রাস করিতেছে না? অর্থাৎ বিচারকের অভাবে নগণ্য মানবের নিকট উপযুক্ত কবি অবজ্ঞাত হইতেছেন। পক্ষান্তরে—জলরহিত সারসশূন্য জলাশয়ে বক পাখী কি শোভা পাইতেছে না? কঙ্ক (হাড়গিলা) কি ক্ষুদ্র জন্তু ধরিয়া খাইতেছে না? ইদানীন্তন সমালোচকদিগের সমালোচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে পদে পদেই সুবন্ধুর কথার যথার্থতার উপলব্ধি হয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কবিগণ রাজকর্ত্তৃক পরীক্ষিত এবং গুণানুসারে সমাদৃত হইয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহার পর বঙ্গের গৌরব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার মত সুকবি-পরিপুষ্ট সভার আর পরিচয় পাওয়া যায় না। সে সময়ে বঙ্গের গৌরবভূমি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত-সমাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সমাসীন হইয়া তাহার সুষমা পরিপোষণ করিতেন, এবং যোগ্যতানুসারে মহারাজের সমাদরের ভাজন হইতেন। তখন টেক্স্‌ট্‌বুক্ কমিটীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সুতরাং অভিনব গ্রন্থের উৎকর্ষাপকর্ষও রাজ-সভাতেই নির্দ্ধারিত হইত। সে সময়ে "রামায়ণী কথা" লেখকের ভাষা শ্রবণ মাত্র গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি লেখনী সংযমের জন্য রাজাদেশ নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া

বোধ হয় না। বিদ্যাসুন্দরের রচনায় অনেক স্থলেই মুসলমান সাহিত্যের উত্তমর্ণতা কল্পনাকারী বিকৃতচিত্তের জন্য পাগ্‌লাকাটকের ব্যবস্থা না হওয়া নিতান্তই অবিচারের নিদর্শন। কোন্ কোন্ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যে, অভিনব সমালোচকের একেবারেই নাই, তাঁহার নিজের কথাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"গম্ভীরভাববিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্নদামঙ্গলরূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি বাইনাচ্ দেখাইয়াছেন"। গম্ভীর ভাব কাহাকে বলে? আর অগম্ভীর ভাব কাহাকে বলে? সমালোচক তাহা বুঝাইয়া দিলে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইত। পূজামণ্ডপে বাইনাচ্‌টা কি মুসলমান সাহিত্যের অনুকরণ? কালিদাস মহাদেবের সম্মুখে চামরহস্ত বারবিলাসিনীকে মুসলমানাগমনের বহু পূর্ব্বেই যে নাচাইয়া গিয়াছেন। সমালোচকপ্রবর বাইনাচ্ কোথায় দেখিতে পাইলেন? তাহা খুলিয়া বলিলে ভাল হইত।

রায় সাহেবের সমালোচনাটা বাস্তবিক বড়ই কৌতুকপ্রদ। তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ৫৬৬ পৃঃ লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্টনী সংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ, এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক।"

আমরা দেখিতে পাই, উল্লিখিত বিষয়গুলি কাব্যের উপাদান-শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচায়ক। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে উক্ত বিষয়নিচয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত সমালোচনাই হিন্দু সাহিত্য এবং হিন্দুশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

সমালোচক ৫৬৯ পৃঃ লিখিয়াছেন "বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্ব্বে বরের এইরূপ প্রেমাবেশ আর ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই"। ভারতের পূর্ব্বে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যই আর হয় নাই; সুতরাং প্রেমাবেশ বর্ণিত হইবে কোথায়? নলরাজ দময়ন্তীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, নৈষধকাব্যে তাহার খবর পাওয়া যায়। হিন্দু কবি হিন্দুসাহিত্যের উপাদান হিন্দু গ্রন্থ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয়ের খবর না রাখিয়া যাহা তাহা বলা অপেক্ষা শৃগালের দ্রাক্ষোপেক্ষার ন্যায় অন্যাক্ষরে পণ্ডিতের গ্রন্থ উপেক্ষা করিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত।

৫৮০ পৃষ্ঠে লিখিত সমালোচনাতেই সমালোচকের প্রমত্ততার চিত্র একেবারে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য। এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর;

কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে। এই কাব্যে হীরামালিনী ভিন্ন অন্য কোন চরিত্র পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত হয় নাই। আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক নায়িকার তোটক ছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণবর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর প্রকৃতি উত্তেজনার ফল,—উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনী লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে" সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ! আপনারা অনুকম্পা পূর্ব্বক সমালোচক মহাশয়ের ভাষাটার প্রতিই প্রথমত একটু লক্ষ্য করুন—"ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর" ভারতচন্দ্রী এই পদটি কোন্ ব্যাকরণসিদ্ধ? "হীরামালিনী ভিন্ন অন্য কোন চরিত্র"—হীরামালিনী একটা চরিত্র, তদ্ভিন্ন চরিত্র। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন, সমালোচকের ভাষাজ্ঞানের ফলে হীরামালিনী নিজেই চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে, বিদ্যা সুন্দর কোটাল রাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলি "অন্য কোন চরিত্র" বলিয়া বুঝিয়া লউন। আপনারা এতদিন সীতার চরিত্র, সাবিত্রীর চরিত্র যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা আর দৈনেশ-যুগে বলা চলিবে না, এখন বলিতে হইবে—সীতাই চরিত্র, সাবিত্রীই চরিত্র।

রুচিগরিষ্ঠ সমালোচকের সাবধানতা অতুলনীয়, তিনি বিশুদ্ধ রুচির খাতিরে "বিহার" শব্দ উচ্চারণ করিতে ভীত হইয়া "তোটক ছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষার প্রভাবে অভিধানের কিয়দংশ বৃদ্ধি পাইল; কারণ এই যুগে খাঁটীহিন্দুভাবসম্পন্ন রুচিগরিষ্ঠের মতে "বিহার ও রাত্রিজাগরণ" একার্থক।

কালিদাস রঘুবংশের উনবিংশ সর্গে অগ্নিবর্ণের "শৃঙ্গার" বর্ণন করিয়াছেন। "অগ্নিবর্ণ শৃঙ্গারো নাম" এই স্পষ্টোক্তিতে উপসংহার করিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ের অষ্টম সর্গ—"সুরাঙ্গনা বিহারো নাম" নবম সর্গ—সুরসুন্দরী-সম্ভোগবর্ণনং নাম। শিশুপাল বধের সপ্তম সর্গ "বনবিহারো নাম" অষ্টম সর্গ জলবিহারবর্ণনং নাম। দার্শনিক মহা কবি শ্রীহর্ষ স্বকীয় গ্রন্থকে শৃঙ্গার ভঙ্গীর মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু সাহিত্যে বিহার বর্ণনা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রত্যুত উহা কাব্যের অঙ্গ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। কিন্তু রুচিগরিষ্ঠ সমালোচক এ সমস্ত বিষয়ের খবর একেবারেই রাখেন না, তাহার ফলে সর্ব্বত্রই ভূতাবিষ্টের অকাণ্ড তাণ্ডব কল্পনা করিয়া পাঠকের বিস্ময় রসোৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার পদজ্ঞান যেমন, পদার্থজ্ঞান ততোধিক, বিচারণা

শক্তি একেবারে লোকাতীত। তাঁহার মতে "রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন্ অঙ্গ পরিস্ফুট হয় নাই" আমরা কিন্তু বেশ দেখিতে পাই, অত্রত্য রাত্রিজাগরণের চিত্র এতই স্বাভাবিক এবং কামকলানুযায়ী হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তি হিন্দু মহাকবিদিগের কাব্যে ঈদৃশ চিত্র প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তি কবিদিগের গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিষয় সন্নিবেশের অভাব নাই। কিন্তু ভারতের শব্দ সম্পদের অনন্যসাধারণতা পুরাতন উপাদানকেও নূতন করিয়া তুলিয়াছে। সমালোচক আর একটা নিতান্ত হাস্যরসোৎপাদক দোষের আবিষ্কার করিয়াছেন,—"বিদ্যাসুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর প্রকৃতি উত্তেজনার ফল।" পাঠক মহোদয় একবার সমালোচক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মুনিঋষিপ্রকৃতি উত্তেজনার ফল ত্রিজগতের ভিতরে কোথায় দেখিয়াছেন? তাহা বলিয়া দিয়া সাধারণের কুতূহল নিবৃত্তি করুন। অপর কথা "উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না" কিন্তু যে সমস্ত লোকের সময়োচিত চরিত্র বিশ্লেষণের শক্তি আছে, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সময়োচিত বর্ণনায় বিদ্যাসুন্দরের কুত্রাপি চরিত্রক্ষীণতা প্রতিভাত হয় না। বিহার বর্ণনায় নায়ক নায়িকার যেরূপ অবস্থা প্রতিপাদ্য এবং লোকপ্রসিদ্ধ, কবির ভাষায় তাহাই নিখুঁতরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। এরূপস্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহই বাসরগৃহস্থিত শয্যা সমাসীন নবদম্পতির তুলসীমালা নামাবলী ধারণপূর্ব্বক হরিসঙ্কীর্ত্তনের বর্ণনা করেন নাই। কাজেই যেরূপ আদর্শে তিনি শিক্ষিত, তদনুরূপ চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন। সমালোচকের প্রশংসিত বাঙ্গালার একমাত্র কবি চণ্ডীদাসের নিকষিত প্রেম সংগ্রহ করিতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান সমর্থ হন নাই। তাহার কারণ চণ্ডীদাস রজকীর পাটে কাছাইয়া প্রেমের যাবতীয় দাগ দূর করত নূতন ইস্তরী করা ধপ্‌ধপা সাদা প্রেমের মালিক হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কবিতায় সাদা প্রেমের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভারতচন্দ্র অন্ত্যজস্পর্শ ভয়ে ধোপাবাড়ীতে যাইতে একেবারেই অসমর্থ।

অতঃপর সমালোচনার গাম্ভীর্য্য একেবারেই সাধারণের অবাঙ্‌মনসগোচরতা লাভ করিয়াছে। "বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনী লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে"। প্রথম জিজ্ঞাস্য—কবির লেখনী-লীলা ব্যতীত বর্ণনা সম্ভব হয় কি? আমরা ত এ পর্য্যন্ত মানসলীলা বিরচিত কোনও কাব্যের সন্ধান পাই নাই। দ্বিতীয়, কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে রূপবতীর রূপ ও কবির লেখনী-লীলা এতদুভয়ের লাঘব গৌরব পরিমাপিত হইল? আমরা ত সংস্কৃত

প্রাকৃত প্রভৃতি যে সমস্ত কাব্য পড়িয়াছি, তাহাদের মধ্যে এরূপ অলঙ্কার বিন্যাস যুক্ত ঔদার্য্যপূর্ণ পদবিন্যাস কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে রুচি-গরিষ্ঠ অভিনব হিন্দুভাবাপন্ন চরিত্র-পরীক্ষক সমালোচকের মতে অলঙ্কারবিন্যাস একটা গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য কাহারও মতে কবিতাবনিতার অলঙ্কারবিন্যাস দোষকর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রত্যুত হিন্দু সাহিত্যে কবিতার বৈধব্য বেশ কোনও সাহিত্যিকেরই অনুমোদিত নহে। ব্যাস বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া যত হিন্দু কবির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই অলঙ্কার বিন্যাসে প্রয়াসী। অলঙ্কারঘটিত কাব্যের মর্ম্মাবগতি বড়ই কঠিন, সমালোচকপ্রবর অসামর্থ্যবশতই অলঙ্কারের প্রতি রোষকষায়িত নেত্র বিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাণভট্টের বর্ণনাও কিছু নহে; হর্ষচরিত পাঠকের হর্ষোৎপাদনে একেবারেই অসমর্থ। মোটের উপর সর্ব্বত্রই তাঁহার হিন্দু কাব্যের প্রতি এবং হিন্দুর পুরাতন আচার ব্যবহারের প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কথায় অথবা তাঁহার মত লোকের সমালোচনার প্রভাবে কোমলমতি মানবদিগের হিন্দু কাব্যের প্রতি উপেক্ষা হইতে পারে; এই আশঙ্কাতেই আমরা এতটা বাজে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

প্রকৃত রসগ্রাহী অবস্থাবিশ্লেষণক্ষম হিন্দুপণ্ডিতদিগের মধ্যে ভারতের কাব্য অতীব উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, "বিদ্যাসুন্দর আদিরস প্রধান। ইহার কয়েক স্থলে কতকগুলি অশ্লীল বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য বিজ্ঞদিগের রুচিতে নিন্দনীয় হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়া ধরিলে ইহার অপর সমুদয় অংশ আগা গোড়া মধুর ও মনোহর। সুন্দর, মালিনী, বিদ্যা, রাণী, রাজা ও কোটাল প্রভৃতি গ্রন্থ-বর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রগুলি যে, কিরূপ যথোচিতরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যদিও এই সকল চরিত পূর্ব্বে অপর চিত্রকরেরাও চিত্রিত করিয়াছিলেন, তথাপি ভারতের ন্যায় কেহই রঙ্ ফলাইতে পারেন নাই। ইঁহার রচনার আদ্যোপান্তই যেন মাজাঘষা ও পরিষ্কার করা। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মধুবৃষ্টি অনুভব করিবে। পংক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা।"—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১৪০ পৃঃ।

অতঃপর ন্যায়রত্ন মহাশয়, বিদ্যাসুন্দরের অনেকগুলি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া

স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রুচিগরিষ্ঠের মতে হীরামালিনীর চরিত্র ভিন্ন অন্য কাহারও চরিত্র পরিস্ফুট হয় নাই। হীরামালিনীর মুখে বেশাতির হিসাব শুনিয়া মহাকবি ভারত ভারত স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত"। আমরাও রুচিগরিষ্ঠের সমালোচনা দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে বলিতেছি—এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত। স্বর্গীয় ভূদেব বাবু বালিকা মৃণালিনীর উচ্চারণ-ভ্রংশ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রেশ্" আমরাও অদ্ভুত সমালোচনায় মুগ্ধ হইয়া মহাপ্রাণে বলিতেছি—ইহার সর্ব্বত্রই "ভ্রেষ"।

অশ্লীলতাব্যপদেশে অবুদ্ধ কাব্যকে রুচিগরিষ্ঠ সমালোচক মহাশয় সুধী-সমাজের ঘৃণাভাজন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা হিন্দু শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ হিন্দুভাবাপন্ন সাহিত্যসেবীর নিকট সফল হইবার সম্ভব নাই। ব্যাস প্রভৃতির কাব্য যাহারা পড়িয়াছে, তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, অধুনা যে সমস্ত বিষয় অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হয়, পূর্ব্বকালে তেমন হইত না। ঐ দেখুন ঋষ্যশৃঙ্গের বেশ্যাসমাগম বৃত্তান্তটি ব্যাসের লেখনী কেমন স্বাভাবিকরূপে অঙ্কিত করিয়াছে। বালব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ জীবনে পিতা ভিন্ন দ্বিতীয় মানব দর্শন করেন নাই, বারাঙ্গনাকে দেখিয়া তিনি অভিনব ঋষিকুমার বলিয়াই স্থির করিতেন। কিন্তু বস্তুশক্তি কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে। এহেন সরলচেতাও গণিকাস্পর্শে মোহিত হইলেন, বারাঙ্গনা চলিয়া গেল, কিন্তু ঋষিকুমারের চিত্ত আর স্থির হইল না; তিনি দৈনিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা উগ্রতপা ঋষি বিভাণ্ডক আশ্রমে আসিয়া পুত্রের অভূতপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং কে আশ্রমে আসিয়াছিল, তাহাও জানিতে চাহিলেন। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ঋষ্যশৃঙ্গ তখন আশ্রমাগত মুনিকুমারের রূপ পিতার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অন্যান্য অবয়বাদির বর্ণনা-বসরে নারীগাত্রের অসাধারণ চিহ্নদ্বয়ের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"ত্তৌ চাস্য পিণ্ডা বধরেণ কণ্ঠা
দজাত রোমৌ সুমনোহরৌচ॥

মুনিকুমারের ব্যাপার এবং তন্নিবন্ধন নিজের হর্ষোৎপত্তির বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন,—

"সমে সমাশ্লিষ্য পুনঃ শরীরং জটাসু গৃহ্যাভ্যবনাম্যবক্ত্রম্।
বক্ত্রেণ বক্ত্রং প্রণিধায় শব্দং চকার তন্মে জনয়ৎ প্রহর্ষম্॥"

এইরূপ বর্ণনা ব্যাসের লেখনী হইতে কত বহির্গত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাত্রিজাগরণের ব্যাপারে আঁচড় দেখিয়া হয়ত সমালোচক মহাশয় কাঁকর হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলা বর্ণনায় ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

এই জাতীয় বর্ণনায় আদিকবি বাল্মীকির লেখনীরও ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় না। ঐ দেখুন ভরদ্বাজাশ্রমে অনুচরবর্গসহ ভগবান্ রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে তৎকালের সভ্যতানুসারে প্রত্যেক অতিথির উপভোগ্যরূপে মদ্যপানরত পাঁচ সাতটি করিয়া প্রমদা নিযুক্ত হইয়াছে।

"একৈকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্তচাষ্ট চ।
সংবাহন্ত্যঃ সমাপেতু নার্য্যো বিপুললোচনাঃ॥
পরিমৃজ্য তথান্যোন্যং পায়য়ন্তি বরাঙ্গনাঃ॥

—অযোধ্যাকাণ্ড, ৯১ সর্গ।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতার ভীতি পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক রুচি অনুসারে হিন্দুর অনেক ব্যাপারই অশ্লীল বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। তাহার প্রতি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও একটু ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়।

হিন্দুর আরাধ্য দেবতা আদ্যাশক্তি উপাসক কর্ত্তৃক "বিপরীত-রতাতুরা" রূপে নিরন্তর ধ্যাত হইতেছেন। শিবলিঙ্গ পূজা হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্য, এই সমস্ত বিষয়ে হিন্দুর মনে কোনরূপ অশ্লীলতা প্রতিভাত হয় না। অনেক দিন পূর্ব্বেই এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

সরস্বতী কণ্ঠাভরণে ভোজদেব বলিয়াছেন—

"সংবীতস্যাহি লোকেষু ন দোষান্বেষণং ক্ষমম্।
শিবলিঙ্গস্য সংস্থানে কস্যাসভ্যত্ববাসনা॥"

ইহার অর্থ—লোকে অর্থাৎ সমাজে যাহা সংবীত অর্থাৎ প্রচলিত আছে, তাহার দোষান্বেষণ উপযুক্ত নহে। শিবলিঙ্গের সংস্থান বিষয়ে কাহার অসভ্যতা-বুদ্ধি হয়?

[ক্রমশঃ।

স্বপ্ন জ্ঞান।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধণ, বি-এল্।]

(মোরে) অন্ধ হ'তে অন্ধতর করি কি সাধিলে হরি,
নাহি জ্ঞান—নাহি ত অজ্ঞান
জ্ঞান-দম্ভ দিলে শুধু এ হৃদয় ভরি।
নাহি মোর সে অন্ধ বিশ্বাস, নাহি মোর জ্ঞানের আশ্বাস
হতাশায় আপনা পাসরি
দেহ আঁখি দৃষ্টি নাহি তায়,
মেঘ যথা নাহি বরষায়
মোহে দিলে মনটী আঁধরি।
একে একে ধীরে পায় পায় দিন আসে দিন চলে যায়,
কৃষ্ণ কেশ শুভ্রকায় ছায় শিরোপরি
অঙ্গে ধীরে নামে শিথিলতা জিহ্বা ক্রমে ভুলে যায় কথা,
দেহে আসে ধরায় দীনতা স্নায়ু পেশি ধরি।
এক বার শুন দয়াময়, এ সময়ে হ'য়োনা নির্দ্দয়
শুষ্ক জ্ঞান-গর্ব্ব মোর দাও ধ্বংস করি।
অন্ধ কর—দাও গো বিশ্বাস; জ্ঞান দাও—ক'র না নিরাশ,
পূর্ণ জ্ঞান দাও তবে হরি।
জ্ঞানচক্ষে জীবনের শেষে ওই রূপ উঠে যেন ভেসে
বরমূর্ত্তি বিশ্বমোহকারী।

শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে ভারতীয় পূর্ত্তবিদ্যার জ্ঞান।

[লেখক—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি, এম্-এ।]

শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইহার মধ্যে তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। স্মরণাতীত প্রাচীনকালের কথা বলিয়াই ইহার গুরুত্ব আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় না। বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্ময়ের যথেষ্ট

কারণই দেখিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ত্তবিজ্ঞানের অসম্ভাবিত উন্নতির বর্ত্তমান যুগে নদীর উপর অপূর্ব্ব কৌশলে সেতু নির্ম্মাণ হইলেও, সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণের কোনও কল্পনা হইয়াছে বলিয়াও শুনা যায় না। বর্ত্তমানযুগে যোজক খনন করিয়া সমুদ্রের যোগসাধন হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধনের দ্বারা স্থলভাগের যোগের কোনও চেষ্টাই হয় নাই। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন যে প্রাচীন ও বর্ত্তমান উভয় কালেরই অদ্ভুত কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে দৈববলে, শিলা, জলে ভাসিয়াছিল বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে কাহারও কৃতিত্ব কিছুই প্রকাশিত হয় নাই, এই মনে করিয়া ইহাকে অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া ধারণা হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহাতেই ইহার সহিত পূর্ত্তবিজ্ঞানের কোনও সংস্রব থাকিতে পারে, এরূপ কথা আমাদের মনেই উদিত হয় না। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণনা পাঠ করিলে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা যে দূরীভূত হইবে, তাহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

রামায়ণের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র প্রথম অপার সাগর দর্শনে ইহা অতিক্রম করিতে পারিবেন না বলিয়া, হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, তদীয় বানর অনুচর নল সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে, তখন তিনি আশ্বস্ত হইয়া বানর সৈন্যকে সেতু নির্ম্মাণে আদেশ প্রদান করিলেন। নল সেতু নির্ম্মাণে আপনার যোগ্যতা প্রমাণিত করিতে যাইয়া, কোনও দৈববলের উল্লেখ করিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং পিতার অসাধারণ শক্তিপ্রভাবেই সেতু নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইবেন—ইহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন; যথা:—

"মম মাতুর্ব্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্ম্মণা। ময়াতু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি॥
ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্ম্মণা। নচাপ্যহমনুক্তোবঃ প্রব্রূয়ামাত্মনোগুণান্॥
সমর্থশ্চাপ্যহং সেতুং কর্ত্তুং বৈ বরুণালয়ে। তস্মাদদ্যৈব বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ॥"
"অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে। পিতুঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ॥"
—লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥

"পূর্ব্বে মন্দর পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা আমার জননীকে এই বর দিয়াছিলেন যে, 'দেবি! তোমার পুত্র আমারই তুল্য হইবে।' আমি সেই মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র এবং তাহার তুল্য নির্ম্মাণকুশল। আপনারা কোনও জিজ্ঞাসা না

করায়, আমি আপনাদের নিকটে আত্মগুণের পরিচয় দিই নাই। আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তত করিতে পারিব। সুতরাং অদ্যই বানরগণকে আমার সহিত সেতু নির্ম্মাণার্থ আজ্ঞা করুন॥"

"মহারাজ! সমুদ্র যাহা বলিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য, আমি পিতার শক্তিতে এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তত করিব।"

বিশ্বকর্ম্মার সামর্থ্যের অধিকারী হওয়াতে নল সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন—সাধারণ ভাবে কেবল ইহা উক্ত হইয়াই সেতুবন্ধনের বর্ণনা সমাপ্ত হয় নাই; পরন্তু কিরূপে নল বিশ্বকর্ম্মার শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণই প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি :—

"হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ। পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥
প্রক্ষিপ্য মানৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধতম্। সমুৎসর্প চাকাশমব্যাসর্পংস্ততঃ পুনঃ॥
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাসুর্নিপতন্তঃ সমন্ততঃ। সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্ণন্তি ব্যায়তং শতযোজনম্॥
নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ। সতদা ক্রিয়তে সেতুর্ব্বানরৈর্ঘোরকর্ম্মভিঃ॥
দণ্ডানন্যে প্রগৃহ্ণন্তি বিচিন্বন্তি তথাপরে। বানরৈঃ শতশস্তত্র রামস্যাজ্ঞা পুরঃসরৈঃ॥"

—লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥

"হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড এবং পর্ব্বত সকলকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্র দ্বারা বহন করিতে লাগিল। প্রস্তর খণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, সমুদ্র জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে চারিদিক্ হইতে প্রস্তর পতিত হওয়ায়, সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক বানর, সূত্র ধরিয়া, সেই সেতুর সমবিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে নল ঘোরকর্ম্মা বানরগণের সহিত সমুদ্র মধ্যে শত যোজন পরিমাণ দীর্ঘ সেতুবন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কেহ কেহ দণ্ড গ্রহণ করিল; অন্য কেহ বৃক্ষপ্রস্তরাদি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে রামের আজ্ঞায় শত শত বানর কার্য্যে নিয়োজিত হইল।"

বর্ত্তমানে প্রস্তরাদি দ্বারা জলমধ্য পূর্ণ ও জলবেগ রুদ্ধ করতঃ সেতু নির্ম্মাণের যে প্রণালী পূর্ত্তকার্য্যে অবলম্বিত হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই অবলম্বিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উল্লিখিত সূত্র ও দণ্ড যে বর্ত্তমান পূর্ত্তকার্য্যে ব্যবহৃত পরিমাপের উপকরণেরই ন্যায় উপকরণ বিশেষ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পর্ব্বত সকলের "সমুৎপাটিত হওয়া"র বর্ণনায় আমরা বর্ত্তমান ডিনামাইট্ যোগে উৎক্ষেপ প্রক্রিয়ার তুল্য প্রক্রিয়ার আভাসই প্রাপ্ত হইতেছি। সেই

প্রকাণ্ড পর্ব্বতখণ্ড সকল বাহিত হওয়ার বর্ণনায় যন্ত্র ব্যবহারের যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে ভারতীয় প্রাচীন পূর্ত্তবিজ্ঞানের অতীব মূল্যবান্ তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হয়। বহু প্রত্নবিৎ পণ্ডিতই ভারতীয় প্রাচীন প্রস্তর স্থাপত্যের যে সমস্ত নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত দর্শন করিয়া কিরূপে এ সকলের প্রস্তরোপাদান সকল স্বস্থানচ্যুত করা হইয়াছিল, কিরূপেই বা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় ভাবিয়া কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন না। "যন্ত্রৈঃ" শব্দটীই যেন এই সকলের প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করিয়া দিতেছে। হস্তীর ন্যায় বিরাট্ প্রস্তর সকল মনুষ্য শক্তিতে স্বস্থান হইতে উন্মূলিত বা অন্যত্র বাহিত হয় নাই, পরন্তু যন্ত্র-শক্তিতেই ঐরূপ হইয়াছিল।

সেতুটী ক্ষুদ্র সেতু নহে, পরন্তু একশত যোজন, অর্থাৎ দুই শত মাইল দীর্ঘ। এই সেতু পাঁচ দিনে সমাপিত হয়। রাক্ষসেরা পাছে বাধা প্রদান করে, এইজন্য সেতুটী শীঘ্র নির্ম্মাণের বিশেষ আবশ্যকতাই ছিল। সেতু নির্ম্মাণের ক্ষিপ্র-কারিতায় বিস্ময়ে একান্তই অভিভূত হইতে হয়। এস্থলে আমরা রামায়ণী বর্ণনার অনুবাদ প্রদান করিতেছি :—

"তৎকালে গিরিশৃঙ্গ এবং প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সমুদ্রে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। এইরূপে গজপ্রমাণ ক্ষিপ্রকারী মহা বেগ ও মহা বলশালী মহাকায় বানরগণ অপরিমিত আনন্দসহকারে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন দীর্ঘ সেতু প্রস্তুত করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ সেইরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় দিনে বিংশতি, তৃতীয় দিনে একবিংশতি, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, প্রস্তুত করিল। পরে পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিয়া, লঙ্কানিম্নস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিল।"

সেতুটী যেমন শত যোজন দীর্ঘ ছিল, তেমনই দশ যোজন প্রশস্ত ছিল :—

"দশ যোজন বিস্তীর্ণং শত যোজন মায়তং। দদৃশুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বানল সেতুং সুদুষ্করং।"

সেতুটী যে সহজসাধ্য ছিল না, তাহা "সুদুষ্কর" শব্দ দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

সেতুটী "সুদুষ্কর" ও সুবৃহৎ হইলেও যে বিশেষ সুগঠিত হইয়াছিল, রামায়ণেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে :—

"বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ। অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমান্তইব সাগরে॥"

"তৎকালে সেই সুনির্ম্মিত সুগঠিত সমতল সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ সেতু সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।"

ইহা যে অত্যাশ্চর্য্য, অভূতপূর্ব্ব পূর্ত্তকার্য্যরূপে বিবেচিত হইয়াছিল, রামায়ণেই তাহা উক্ত হইয়াছে :—

"তমচিন্ত্যমসহ্যঞ্চ হ্যদ্ভুতং লোমহর্ষণম্। দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্॥"

"এইরূপে সকল জীবগণই সেই অচিন্ত্য, লোমহর্ষণ, অসহ্য এবং অদ্ভুত সেতু দেখিতে লাগিল।" বলা বাহুল্য যে, সেই অদ্ভুত সেতু এখনও সকলেরই নিকট তেমন অদ্ভুতই রহিয়া গিয়াছে।

পঞ্চভূত।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

(৪)

পরমাণু সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিয়া এইবার অনিত্য পৃথিবীর কথা বলিব। অনিত্য পৃথিবী ত্রিবিধ,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পার্থিব শরীর দুই প্রকার,—যোনিজ ও অযোনিজ। শুক্রশোণিতের মিলনে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম যোনিজ। এতদ্‌ভিন্ন শরীর অযোনিজ (১)। যোনি দ্বারা নির্গত শরীরকেই যোনিজ বলা যায় না,—তাহা হইলে স্বেদজ কৃমি কীটাদি শরীরে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কেন না, কৃমিকীটাদিও কদাচিৎ যোনি দ্বারা নির্গত হইতে পারে। যোনিজ শরীর আবার দ্বিবিধ, জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মনুষ্যাদির শরীর জরায়ুজ ও পক্ষি সর্পাদির শরীর অণ্ডজ। ব্রহ্মার মানস পুত্র ঋষিদের শরীর, স্বেদজ কৃমি কীটাদি ও উদ্ভিজ্জ তরু গুল্মাদিও অযোনিজ। পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধাশ্রয়ত্ব, সুতরাং মনুষ্যাদির শরীর যখন গন্ধের আশ্রয়, তখন তাহা যে পার্থিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনও কোনও দার্শনিক, শরীরের প্রতি পঞ্চভূতকেই উপাদান কারণ বলেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে পার্থিব শরীরের প্রতি পৃথিবী উপাদান কারণ, জলীয় শরীরের প্রতি জল উপাদান কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন, পার্থিব শরীরের প্রতি পৃথিবীই উপাদান কারণ, জলাদি ভূতচতুষ্টয় নিমিত্ত কারণ।

---

(১) "শুক্রশোণিত সন্নিপাতো যোনিঃ তন্মাজ্জাতং যোনিজং তদ্বিপরীতমযোনিজং।"
—ন্যায়কন্দলী, ৩৩ পৃঃ।

শরীরের প্রতি এই ভাবে পঞ্চভূতেরই কারণতা আছে বলিয়া শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া ব্যবহার করা হয়।

শরীরত্বকে মনুষ্যত্বাদির ন্যায় জাতি বলা চলে না। তাহা হইলে পৃথিবীত্বাদির সহিত সাঙ্কর্য্য হয়। সাঙ্কর্য্য, জাতির বাধক। কিরণাবলীতে উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥"

পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকিয়া যাহারা পরস্পরের অধিকরণে থাকে, তাহাদিগকে 'সঙ্কর' বলে। শরীরত্ব ও পৃথিবীত্ব সঙ্কর। শরীরত্বের অভাবাধিকরণ ঘটে পৃথিবীত্ব আছে, পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ দেবতাদির তৈজস শরীরে শরীরত্ব আছে, আবার পার্থিব শরীরে শরীরত্ব ও পৃথিবীত্ব উভয়ই আছে। সুতরাং শরীরত্ব জাতি হইতে পারে না। চেষ্টাশ্রয়ত্বই শরীরের লক্ষণ। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।"—(১।১।১১)

হিতের প্রাপ্তি ও অহিতের পরিহারের উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম চেষ্টা। ক্রিয়া মাত্রই চেষ্টা নহে। সুতরাং ঘটাদিতে সাধারণতঃ ক্রিয়া থাকিলেও তাহাতে শরীরের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। বৃক্ষাদিরও চেষ্টা আছে, কাজেই শরীর-লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ নাই। ভগ্ন অংশের পরিপূর্ত্তি ও অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি নিবন্ধন বৃক্ষাদির সজীবত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। পাপবিশেষের ফলে মনুষ্যকেও যে বৃক্ষশরীর পরিগ্রহ করিতে হয়, শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে,—

"গুরুং হুং কৃত্য ত্বং কৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ।"

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানের আকার এইরূপ ;—'ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পার্থিবং রূপাদিষু মধ্যে গন্ধস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ বায়ূপনীতসুরভিভাগবৎ।' ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, যে হেতু তাহা রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক, দৃষ্টান্ত—বায়ুর দ্বারা আনীত সুগন্ধি-ভাগ। 'গন্ধস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ'—এই অংশ মাত্র হেতু বলিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়, এইজন্য 'রূপাদিষু মধ্যে' বলা হইয়াছে। পক্ষে [যে পদার্থে সাধ্যের অনুমিতি করা হয়, তাহার নাম পক্ষ.] যদি হেতু না থাকে,

তাহা হইলে সেই হেতুকে স্বরূপাসিদ্ধ বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পক্ষ, তাহাতে গন্ধমাত্র-ব্যঞ্জকত্ব নাই; কেন না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধত্বেরও ব্যঞ্জক হইয়া থাকে (২)। কিন্তু 'রূপাদিষু মধ্যে' বলিলে গন্ধ ভিন্ন যে রূপাদি অন্যতম, তাহার অব্যঞ্জকত্ব, সম্পূর্ণাংশের এই অর্থ লাভ হওয়ায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধত্বের ব্যঞ্জক হইলেও স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইল না। ব্যভিচারবারক বিশেষণের ন্যায় স্বরূপা-সিদ্ধি-বারক বিশেষণেরও যে সার্থকতা আছে, তাহা "সিদ্ধান্তলক্ষণ" গ্রন্থের 'যো যদীয়' কল্পে জগদীশ দেখাইয়াছেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাতেও তথাকথিত হেতু আছে, কিন্তু পার্থিবত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া ব্যভিচার হয়, এইজন্য হেতুতে 'দ্রব্যত্বে সতি' এইরূপ বিশেষণও দিতে হইবে।

পৃথিবীত্বাদির সহিত সাঙ্কর্য্য হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ত্বকেও জাতি বলা যায় না। আত্মভিন্ন হইয়া যাহা জ্ঞানকারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয়, তাহারই নাম ইন্দ্রিয়। চক্ষুর্মনঃসংযোগ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ, সেই সংযোগের আশ্রয় চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হইল। জ্ঞানের কারণ আত্মমনঃসংযোগ আত্মাতে থাকে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়, এইজন্য লক্ষণে 'আত্মভিন্ন' বলা হইয়াছে। যাহারা চর্ম্মমনঃসংযোগকেও জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে চর্ম্মভিন্নত্বও নিবেশ করিতে হইবে। কালা-কাশাদি বিভু, সুতরাং তাহাতেও মনঃসংযোগ আছে, এইজন্য সামান্যতঃ সংযোগের আশ্রয় না বলিয়া জ্ঞানের কারণ যে সংযোগ, তাহার আশ্রয় বলা হইয়াছে। কালাকাশাদির সহিত মনের যে সংযোগ আছে, তাহা জ্ঞানের কারণ নহে, কাজেই অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না। মনঃপদ না দিয়া জ্ঞানকারণ সংযোগের আশ্রয় বলিলেও কালে অতিব্যাপ্তি হয়। কেন না, কালে যে রূপাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ কারণ। এখন এই সন্নিকর্ষের ঘটক বলিয়া কালের সহিত চক্ষুঃসংযোগও জ্ঞানের কারণ, সেই সংযোগ কালেও আছে।

যাহা সুখসাক্ষাৎকার বা দুঃখসাক্ষাৎকারের সাধন, তাহারই নাম বিষয়। সুতরাং দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্তই বিষয়। বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—

"বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ।"

---

(২) "ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।"

—ভাষাপরিচ্ছেদ, ৫৩ শ্লোঃ।

২। জল।

জলের ১৪টী গুণ,—রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ। শুক্ল, নীল, পীতাদি নানা রূপের মধ্যে কেবল শুক্ল রূপই জলে থাকে, জলে অন্য রূপ নাই। এখন শঙ্কা হইতে পারে, জলে যে কেবল শুক্ল রূপই থাকে, এ কথা ঠিক নহে; কেন না, যমুনার জলে নীলিমার উপলব্ধি হয়। ইহার উত্তর এই যে, যমুনার জলে তাহার শ্যামল আধারের জন্যই নীল রূপের ভ্রমাত্মক প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন একই জল, লাল গ্লাসে রাখিলে লাল, নীল গ্লাসে রাখিলে নীল দেখা যায়। যমুনার জলেরও যে প্রকৃত রূপ শুক্ল, তাহা সেই জল শূন্যে নিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। "কণাদরহস্যে" শঙ্করমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"কথমন্যথা বিয়দ্বিক্ষিপ্তানামপাং ধাবল্যমুপলভ্যতে।"—(১৪ পৃঃ)

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধরও বলিয়াছেন,—

"শুক্লমেব রূপমপাং......অপসু রূপান্তরপ্রতীতিরাশ্রয়রূপভেদাৎ কথমেতদিতিচেৎ তাসামেবোদ্ধৃত্য বিয়তি বিক্ষিপ্তানাং ধবলিমমাত্রপ্রতীতেঃ পুনর্নিপতিতানামাশ্রয়রূপানুবিধানাৎ।"—(ন্যায়কন্দলী, ৩৭ পৃঃ)

জলের রস মধুর। এখন শঙ্কা হইতে পারে, কেমন করিয়া স্বীকার করিব—জলের রস মধুর?—জলে ত কোনও রসেরই উপলব্ধি হয় না। ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ, শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি বলিয়াছেন, হরীতকী বা আমলকী ভক্ষণের পর জলের মধুর রসের অনুভূতি হইয়া থাকে (৩)। জল-সংযোগে হরীতকীতেই মধুর রসের উৎপত্তি হয়, এ কথা বলা যায় না। কেন না, অকারণগুণোৎপন্ন পার্থিব রসের প্রতি কেবল অগ্নি সংযোগই কারণ। জল-সংযোগকেও যদি পার্থিব রসের উৎপাদক বলা যায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার নিবন্ধন গৌরব হইয়া পড়ে।

শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন, জলে মধুর রস থাকিলেও তাহার উৎকটতা নাই বলিয়া গুড়াদি মিষ্ট দ্রব্যের মধুর রসের ন্যায় তাহার উপলব্ধি হয় না (৪)। এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ভর্জ্জনকপালস্থ বহ্নিতে রূপ থাকিলেও তাহা অনুদ্ভূত বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, পাষাণে গন্ধ থাকিলেও তাহা

---

(৩) "হরীতক্যাদিভক্ষণস্য জলরসব্যঞ্জকত্বাৎ"।—মুক্তাবলী, ১৬৫ পৃঃ।

"হরীতকীভক্ষণানন্তরং মাধুর্য্যোপলম্ভাৎ।"—কণাদরহস্য, ১৪ পৃঃ।

(৪) "গুড়াদিবদপ্রতিভাসনন্তু মাধুর্য্যাতিশয়াভাবাৎ।"—ন্যায়কন্দলী, ৩৭ পৃঃ।

অনুৎকট বলিয়া অনুভূত হয় না, ইহা সকল তার্কিকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে জলে যে মাধুর্য্য আছে, তাহা ভীষণ গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে তৃষ্ণার সময়ে নির্ম্মল গঙ্গাজল পান করিলেই অনুভব করা যায়। তা'ই "মুক্তাবলী প্রকাশে" মহাদেব ভট্ট লিখিয়াছেন,—

"বস্তুতো নিদাঘপীতনির্ম্মলগঙ্গাজলমাধুর্য্যস্যানুভবসিদ্ধত্বাপলাপাসম্ভবান্মধুর এ বেতি যুক্তম্।" —(১৬৭ পৃঃ)

জলের স্পর্শ শীতল। উষ্ণোদকে তেজঃ সংযোগের জন্যই উষ্ণ স্পর্শের প্রতীতি হইয়া থাকে। দ্রবত্ব দ্বিবিধ,—সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব, একমাত্র জলেরই গুণ। স্নেহও জল ব্যতীত অন্য দ্রব্যে থাকে না। স্নেহবত্ত্ব বা সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ববত্ত্বই জলের লক্ষণ। যাহাতে স্নেহ বা সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব আছে, তাহাই জল। বরদরাজ, "তার্কিকরক্ষা"য় সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ববত্ত্বই জলের লক্ষণ বলিয়াছেন (৫)। যে গুণের জন্য চূর্ণীকৃত পদার্থ, পিণ্ডীভাব ধারণ করে, তাহারই নাম স্নেহ। অন্নংভট্ট, "তর্কসংগ্রহে" লিখিয়াছেন,—

"চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহঃ। জলমাত্রবৃত্তিঃ।"—(৬১ পৃঃ)

পৃথিবীর ন্যায় জলও দ্বিবিধ,—নিত্য ও অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য, তদ্‌ভিন্ন সমস্ত জলই অনিত্য। অনিত্য জলেরই অবয়ব আছে, নিত্য পরমাণু নিরবয়ব। অনিত্য জল ত্রিবিধ,—শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়। জলীয় শরীর সমস্তই অযোনিজ। জলীয় শরীরে পার্থিব ভাগের নিমিত্ত-কারণতা আছে বলিয়া হস্তপাদাদি অবয়ব অনুপপন্ন হয় না। এই শরীর বরুণলোকে বিদ্যমান আছে। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা। রসনা যে জলীয়, তৎপক্ষে অনুমানই প্রমাণ। অনুমানের আকার এই :—'রসনং জলীয়ং গন্ধাদিষু মধ্যে রসস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ-সক্তুরসাভিব্যঞ্জকসলিলবৎ।'—রসনা জলীয়, যেহেতু তাহা গন্ধাদির মধ্যে রসেরই ব্যঞ্জক, দৃষ্টান্ত, সক্তুরসব্যঞ্জক জল।

[ক্রমশঃ।

---

(৫) "তত্র গন্ধবতী ভূমিরাপঃ সাংসিদ্ধিকদ্রবাঃ।
উষ্ণস্পর্শগুণং তেজো নীরূপস্পর্শবান্ মরুৎ॥"
—তার্কিকরক্ষা, ১৩৩ পৃঃ।

পাগলা মাষ্টার।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(৬)

দুই তিন বার মত বদলাইতে হইয়াছিল বটে, কারণ একটা ধারণায় জোঁকের মত সংবদ্ধ থাকিলে সত্য অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। নূতন নূতন কথা জানিতে পারিলে, সিদ্ধান্তও নূতন করিয়া গড়িতে হয়। সুড়ঙ্গের ধারের জঙ্গল দেখিয়া এবং বাঘের কাহিনীগুলা শুনিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, দুলুয়ার কুটীর দেখিয়া এবং তাহার গল্প শুনিয়া সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তস্কর চুরি করিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সে ধারণা বর্জ্জন না করিলে উপায় ছিল না। দুলুয়া রেল-কর্ম্মচারী, বহু দিনের লোক, তাহার সাহসও অসাধারণ, কারণ সে একাকী এই হিংস্র-সঙ্কুল অরণ্যে বসবাস করে। সাহেবেরা সকলেই তাহাকে ভালবাসে, রেলের সাহেব, বাঙ্গালী সকলেই তাহার নিকট বাঘের গল্প শুনে। কাজেই সামান্য চুরি অপবাদ দিয়া তাহার কুটীরটা কেহ খানাতল্লাস করিবে না—তস্কর এবং দুলুয়া উভয়েরই সে বিশ্বাস ছিল। প্রফেসার সেন ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই সে ভাবিয়াছিল যে, গাড়ী থামিবার পর দুলুয়ার কুটীর অনুসন্ধান হইবার বাসনাটা লোকের মনে স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠিবে বলিয়া তস্কর সুবর্ণ ইষ্টকগুলা লইয়া সাহস করিয়া তাহার কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না।

দুলুয়া রেল-কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রিয় বলিয়াই রেল-কর্ম্মচারী চুরি করিয়া তাহার কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তস্কর বেঙ্গল নাগপুর রেলে কর্ম্ম করে, এবং সেদিন রাত্রে তাহার অবসর ছিল। লোকটা কৃষ্ণকায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান হওয়া সম্ভব। কিম্বা—

এবং এই ধারণাটাই তখন আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে দেখিয়াছিলাম, ধারণাটা ভ্রমমূলক। বেঙ্গল নাগপুর রেলে মান্দ্রাজীদের প্রাধান্য। তাই আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, কার্য্য হইয়াছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কাফ্রির দ্বারা কিম্বা কোনও মান্দ্রাজীর দ্বারা। কিন্তু চক্রধরপুর হইতে ঝামড়া অবধি রেল লাইনে যত মান্দ্রাজী কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র চারিজন

খুব কৃষ্ণকায়। সেই চারিজনের মধ্যে দুইজন খর্ব্বাকৃতি এবং তাহাদের বা অবশিষ্ট দুই জনের মস্তকে কাফ্রিজাতি-সুলভ কুঞ্চিত কেশ ছিল না। সুতরাং মান্দ্রাজী-থিওরী বর্জ্জন করিয়া আমাকে সেই প্রথমকার কাফ্রি-থিওরী রাখিতে হইয়াছিল। কাফ্রির পোষাকটা তস্করের ছদ্ম বেশ, সে ধারণা প্রফেসার সেনের। আমি এ বিষয়ে তাহার সহিত এক মত হইতে পারি নাই।

ঐ অঞ্চলে কাফ্রি কর্ম্মচারী ছিল মোটে একজন। লোকটা প্রায় ৬ ফুট লম্বা, খুব হৃষ্টপুষ্ট, মদ্যপায়ী, সুতরাং সদাই ঋণগ্রস্ত। জ্যাক বার্লীর সে রাত্রিতে অবসর ছিল—কেহও তাহাকে চক্রধরপুর ক্লাবে দেখে নাই। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম যে, জ্যাক বার্লির সহিত দুলুয়ার পরিচয় ছিল। আমি স্বয়ং দুলুয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—দুলুয়া, তুমি বার্লিসাহেবকে জান?

দুলুয়া বলিল—বার্লিসাহেব? সেটা কে আছে দারোগা বাবু?

আমি ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। দুলুয়া আমাকে দারোগাবাবু বলিয়া আমার মর্য্যাদা হানি করে নাই। যাক্ সে কথা। আমি তাহাকে বলিলাম, কাফ্রিসাহেব, জ্যাক বার্লি সাহেব।

দুলুয়া বলিল—ওঃ সে একটা জেক্‌সাহেব। খুব জানি দারোগাবাবু। সে দুজন লোক এক কোম্পানীর নিমক খায়, সে জানবে না। আমি রেলের সব সাহেবকে চিনি, এই ফিনি সাহেব কিনি সাহেব, কিণ্টু সাহেব, বাড্‌নি সাহেব,—

আমি তাহাকে থামাইয়া দিলাম। তাহার পর মনস্থ করিলাম, জেক্‌-সাহেবকে গেরেপ্তার করিব।

(৭)

প্রফুল্লকে ঘাটশিলায় সংবাদ দিলাম, বৃহস্পতিবার। সে রাত্রে তাহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়া মধ্যরাত্রে ট্রেণে চড়িলাম, সকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়া আবার হুগলী যাত্রা করিলাম।

দস্যুর সন্ধান পাইয়াছি, এ সংবাদে পোদ্দারদ্বয় বড় প্রীত হইল। তাহারা আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল। এত বড় দুরূহ সমস্যা যে সাত দিনের মধ্যে মীমাংসা হইয়াছে, এ সংবাদে তাহারা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিল। শীঘ্রই যে তাহাদের অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে, সে আশা প্রসন্নমূর্ত্তি লইয়া তাহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

আমি বলিলাম—মশায়, না আঁচালে বিশ্বাস নাই। আমি এখনও আসামী

ধরি নাই। সে আসামী কি না তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। হয়ত রেল-পথে সকলে তাহার চেহারা জানে ব'লে সে নিজে ডাকাতী করেনি, কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা এ কাজ করিয়েছে।

দিগ্বিজয় পাইন বলিল—মশায়, কান টান্‌লেই মাথা আসে। আপনি যখন একটাকে ধরেছেন, তখন সবগুলাই এক রকম আপনার হাতের ভেতর।

আমি বসুদাম পোদ্দারকে বলিলাম—আচ্ছা যখন প্রফুল্লবাবু শিকলি টেনে গাড়ী থামালেন তখন আপনি জানালা দিয়ে একবার বাহিরে চাইলেন না কেন?

সে বলিল—মশায়, এখন এখানে দাঁড়িয়ে কথাটা বলা যত সহজ, ঠিক সেই স্থলে—

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—হ্যাঁ, তা সত্য বটে, তবু—অর্থাৎ তাহ'লে লোকটা কোথায় গেল, ঠিক বুঝতে পারা যেত।

সে বলিল—মশায়, চল্লিশ হাজার টাকা চুরি গেছে, আট জনের—এর মধ্যে আমার নিজের ছিল পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু সেই রকম গুলিটা চালালে প্রাণটা যেত আমার একেলার।

আমি তাহার সহিত আর তর্ক করিলাম না। সেদিন তাহারা আমার সহিত যাত্রা করিতে স্বীকার করিল না। সোমবার সন্ধ্যার সময় হাওড়া ষ্টেশনে তাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইল। সকলে একত্র ঘাটশিলা যাইব। তাহার পর প্রফুল্লকে সঙ্গে লইয়া চক্রধরপুর যাত্রা করিব এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

(৮)

কিন্তু বন্দোবস্ত মত কাজ করিতে পারিলাম না। সেদিন পত্র দিয়া তাহাদের দুই জনকে ঘাটশিলায় প্রফুল্লর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তাহাকে লিখিলাম—"পোদ্দারদ্বয়কে তোমার নিকট পাঠাইলাম। তুমি তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তোমার নিজের কতকগুলা থিওরি করিও। আমি কাল কিম্বা পরশু ঘাটশিলা পৌঁছিব। আর একটা চুরি হইয়া গিয়াছে। সে বিষয়ও তোমার সহিত আলোচনা করিব।"

যে নূতন চুরির কথাটা লিখিলাম, তাহার সংবাদ পাইয়াছিলাম—রবিবারে বোম্বাই মেল ষ্টেশনে পৌঁছিলে। এ চুরি ঠিক কোথায় হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চুরি গিয়াছিল—কুড়ি হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল নোট। টাকা একটি কাচ্ প্রদেশের মুসলমান সওদাগরের। ইনি বামড়া রাজ্যের দুই

একটা জঙ্গলে কাঠ কাটিবার সত্ব কিনিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বামড়া হইতে বাইশ মাইল দূরে তাঁহার মোকাম আছে। সেই মোকামের গোমস্তার নিকট হইতে তিনি কুড়ি হাজার টাকা লইয়া শনিবার রাত্রে ট্রেণে উঠেন। টাকা একটি জালের থলির ভিতর ছিল—থলিটি ছিল তাঁহার ট্রাঙ্কের ভিতর। তাঁহার রুমালে ট্রাঙ্কের চাবি বাঁধা ছিল। বাইশ মাইল গো-শকটে আসিয়া করিম কাশিম সাহেব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন গাড়ীতে উঠেন, তখন মাত্র তথায় একজন আরোহী ছিল। বোধ হয় যাত্রী বাঙ্গালী। করিম কাশিম ভাল করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। যখন সে গাড়ীতে উঠে, তখন বাঙ্গালী সহযাত্রীটি নিদ্রা যাইতেছিল, একবার মাত্র চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর প্রত্যূষে গালুডি ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে সে নামিয়া গিয়াছিল।

শাখাপ্রশাখা বর্জ্জন করিলে মোটের উপর কাশিম করিমের গল্পটি উক্ত প্রকার। পোদ্দারের গল্পের সহিত এ গল্পের কি সংশ্রব ছিল, সে কথা বলিতেছি। সংশ্রব ছিল বলিয়াই এই চুরির সংবাদে আমি অত বেশী বিচলিত হইয়াছিলাম, এবং এ দস্যুতারও তদন্ত নিজ হস্তে লইয়াছিলাম।

বাঙ্গালী সহযাত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছিলাম, তাহা নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্র—আপনি বাঙ্গালী সহযাত্রীটিকে চিনিতে পারিবেন?

উ—না।

প্র—আপনার বাক্সে নোটের তাড়া ছিল—এ কথা তাহার জানিবার উপায় ছিল?

উ—সম্ভবতঃ ছিল কারণ আমি ট্রেণে উঠিবার পর চুরুট বাহির করিবার জন্য বাক্স খুলিয়াছিলাম। উপরেই টাকার থলি ছিল, তাহা তুলিয়া মধ্যের বেঞ্চের উপর রাখিয়াছিলাম। তাহার পর চুরুট বাহির করিয়া পুনরায় টাকার থলি বাক্সের মধ্যে ফেলিয়াছিলাম।

প্র—সে সময় বাঙ্গালী যাত্রীর দৃষ্টি সেদিকে গিয়াছিল?

উ—বলিতে পারি না। আমি তাহার দিকে তাকাই নাই।

প্র—আপনার টাকা ছিল থলির ভিতর। বেশ। থলিতে নোট ছিল, তাহা বাহির হইতে বুঝা যায়?

উ—ব্যাঙ্কের জালের থলি। নোট একটু একটু দেখাও যায়।

প্র—বাঙ্গালীটি গাল্‌ভিতে নামিবার পূর্ব্বে আপনি বুঝিয়াছিলেন যে নোটের থলি চুরি গিয়াছে ?

উ—না। চুরি হইয়া গিয়াছে, এ কথা প্রথম বুঝিলাম খড়্গাপুরের নিকট আসিয়া। গিড্‌নিতে ঘুম ভাঙ্গে। তাহার পর হাত মুখ ধুইয়া খড়্গাপুরের নিকট চুরুট খাইবার জন্য আবার ট্রাঙ্ক খুলিয়াছিলাম। সেই সময় প্রথম দেখি যে টাকার থলি চুরি গিয়াছে।

প্র—চাবি কোথা ছিল ?

উ—রুমালে বাঁধা।

প্র—রুমাল কোথায় ছিল ?

উ—লম্বা কামিজের পকেটে। লম্বা কামিজ গায়ে ছিল।

প্র—খড়্গাপুরে দেখিলেন চাবি বন্ধ আছে ?

উ—হাঁ। চাবি বন্ধ ছিল, কিন্তু কলের খিল আলতারাপের ভিতর দিয়া যায় নাই। সেইটা টিপিয়া চাবি দিলে তবে বাক্স ঠিক বন্ধ হয়। তাড়াতাড়ি চাবি দিলে কলের খিল বন্ধ হয়, কিন্তু বাক্স বন্ধ হয় না। চাবিটা তাড়াতাড়ি দেওয়া হইয়াছিল।

প্র—প্রথম আপনি যখন খড়্গাপুরে বাক্স খুলিলেন, বাক্সের আল্‌তারাপের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আপনি বিস্মিত হন নাই ?

উ—হ্যাঁ, প্রথমটা খট্‌কা হইয়াছিল। কিন্তু তখনই মনে হইয়াছিল যে, রাত্রে বাক্স খুলিয়া বন্ধ করিবার সময় বোধ হয় অসাবধান হইয়াছিলাম। কিন্তু চুরি যাইবার পর আমার মনে বেশ ধারণা হইয়াছিল যে, চোর টাকা লইয়া বাক্স বন্ধ করিবার সময় ঐরূপ ভ্রম করিয়াছিল। সেইটাই স্বাভাবিক।

প্র—তাহা হইলে আপনি ঠিক্ বলিতে পারেন না, বাক্স বন্ধ করিয়াছিলেন কি না ?

উ—না। তবে সাধারণতঃ আমি খুব সাবধানী। আর বিশেষ যখন বাক্সের ভিতর অত বেশী অর্থ ছিল, তখন অসাবধান হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্র—আপনার বাঙ্গালী সহযাত্রীর সঙ্গে কি রকম মাল আসবাব ছিল ?

উ—সামান্য একটি হাত ব্যাগ। গাড়ী হইতে নামিবার সময় সে সেই ব্যাগটি হাতে করিয়া নামিয়াছিল।

এই সকল উত্তর হইতে মাত্র একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কাশিম

করিম সম্ভবতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। রাত্রে বাঙ্গালী বাবুটি তাঁহার টাকার থলিটি নিজের হাত ব্যাগে ভরিয়া লইয়াছিল। কিম্বা সে চাবি বন্ধ করিয়াছিল। অবসর বুঝিয়া বাবু কাসিমের পকেট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়াছিল—বন্ধ করিবার সময় তাড়াতাড়িতে আলতারাপ টেপে নাই। কিম্বা সাধারণ ট্রাঙ্কে বাবুর নিজের চাবির থোকার একটা চাবি লাগিয়া গিয়াছিল। সেই নিজের চাবির সাহায্যে সে দস্যুতায় সফলকাম হইয়াছিল। গালুডিতে সন্ধান করিলে বাবুর স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে, আর জানিতে না পারিলেও আমাদের তত ক্ষতি নাই।

কিন্তু সমস্যাটা ঠিক এইরূপ সহজ হইলে এস্থলে এত বিশদরূপে আমি ইহা বিবৃত করিতাম না। ইহার ভিতর দুইটা কথা ছিল, যাহাতে পোদ্দারের স্বুবর্ণ চুরির সহিত এ ঘটনার বিশেষ সংশ্রব ছিল। তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা আপনি যখন গাড়িতে ছিলেন, তখন সেই বাবু ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিয়াছিলেন?

অনেক চিন্তা করিয়া কাশিম করিম বলিল—কই না, আর কাকেও দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

আমি বলিলাম—আচ্ছা কোনও সাহেব, কাফ্রি—

কাফ্রি শুনিয়াই সে বিস্মিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, মাঝে একবার গাড়ি থেমেছিল—কোনও ষ্টেসনে কি মাঠের মাঝে, তা বল্‌তে পারি না, তখন দেখেছিলাম, জানালা দিয়া মাত্র একবার উঁকি মেরেছিল একটা কাফ্রি।

আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। কাফ্রি! তাই বলিতেছিলাম, এ চুরির সহিত পোদ্দারদের চুরির একটা সংশ্রব ছিল। আরও একটা সূত্রে দুইটা চুরির কাহিনী গ্রথিত ছিল, তাহা পরে বলিতেছি। [ক্রমশঃ।

কাশ্মীরে শাস্ত্র-চর্চ্চা।

[লেখক—ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীহারাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।]

(২)

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনকে প্রত্যভিজ্ঞা-শাস্ত্রও বলা হয়। প্রত্যভিজ্ঞা-শাস্ত্রের মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। এই আত্মাই মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্।

আত্মা স্বয়ং প্রকাশরূপ হইলেও মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান হয় না। এই জন্য আত্মার মহেশ্বরত্ব আমরা জানিতে পারি না। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যাদির দ্বারা আত্মার এই শিবত্ব দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিতে পারিলেই পূর্ণাত্মতা লাভ হয়। এই পূর্ণাত্মতা-লাভই মোক্ষ, মায়াদ্বারা অংশতঃ আচ্ছাদিত আত্মার এই পূর্ণস্বরূপ জ্ঞানের নামই প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা ও তাহার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা আছে, এই জন্য এই দর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের সূত্রাবলী শিবপ্রণীত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; এই নিমিত্ত সূত্রগুলিকে শিবসূত্র বলা হয়। আচার্য্য সোমানন্দ নাথ, আচার্য্য অভিনব গুপ্ত, আচার্য্য বসুগুপ্ত, উদয়করসূনু, উৎপলদেব প্রভৃতি সুপ্রাচীন বিখ্যাত আচার্য্যগণ প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। উৎপলদেব প্রণীত শিবস্তোত্রাবলী প্রথমে বোম্বাইতে ও পরে কাশীতে 'চৌখাম্বাসংস্কৃত-গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই আচার্য্যবর্গের মধ্যে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত অনেক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। অভিনব গুপ্তের প্রণীত ভগবদ্গীতার একটী টীকা পাওয়া যায়। এই ভগবদ্গীতার টীকার বিষয় আমি প্রথমে লাহোর মেডিকেল কলেজের ভৈষজ্যবিদ্যার অধ্যাপক, লাহোরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ কৌল মহাশয়ের নিকট কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারি। কৌল মহাশয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও অতিশয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত কাশ্মীরে একটী শৈবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। কৌল মহাশয়েরা এই শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কৌল মহাশয় তাঁহার পুস্তকালয় হইতে এই গীতার টীকা হস্তলিখিত একখানি পুস্তক আমাকে দেখিতে দেন। এখন এই টীকা বোম্বাইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই টীকা সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে অতি নিগূঢ় ভাবে পূর্ণ। টীকার প্রথমে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত মোক্ষ সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অনন্ত অসীম ব্রহ্ম-সমুদ্রে জীবগুলি এক একটী তরঙ্গ ফেন-বুদ্বুদের ন্যায়। এই জীব যখন সেই অসীম অপারে মিশিয়া যাইবে, তখনই তাহার কৃতকৃত্যতা—সেই অবস্থাই মোক্ষ। এই টীকার পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কাশ্মীরে ভগবদ্গীতার স্থলবিশেষে বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনার অবসর ইহা নহে,—এই জন্য একটী স্থল মাত্র এখানে প্রদর্শন করিতেছি;—গীতার প্রথম শ্লোকটীর প্রচলিত পাঠ এইরূপ;—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।

আচার্য্য অভিনব গুপ্তের টীকা অনুসারে ইহার পাঠ এইরূপ ;—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষত্রসমাগমে।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥

আচার্য্য অভিনব গুপ্ত এই শ্লোকটীর দুই রকম ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যাটী প্রচলিত ব্যাখ্যা; এই ব্যাখ্যা সকলেই জানেন। কেবল "সর্ব্বক্ষত্রসমাগমে" এই অংশ প্রচলিত পুস্তকে নাই বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা অন্য রূপ হইবে। সর্ব্বক্ষত্রসমাগমে—সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমাগম হইলে, অথবা যে কুরু-ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমাগম হইয়াছিল, সেই কুরুক্ষেত্রে,—ঐ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুগত। অপর ব্যাখ্যাটী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই পক্ষে কুরু অর্থ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়—এই কুরুর ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকাশক, অন্তঃকরণ—এই অন্তঃকরণ ধর্ম্মের ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান; যোগের দ্বারা আত্মদর্শন পরম ধর্ম্ম—'অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্'—এই পরম ধর্ম্মের আধার হওয়ায় অন্তঃকরণ ধর্ম্মক্ষেত্র। ক্ষত্র শব্দ ক্ষদ্ ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্ষদ্ ধাতুর অর্থ—হিংসা, ক্ষত্র শব্দের অর্থ হিংসক। অন্তঃ-করণে পরাপর হিংস্রভাবাপন্ন রাগ দ্বেষ, ক্ষমা ক্রোধ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি আছে। এই জন্য অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষত্রসমাগম আছে বলিতে হইবে। এই অন্তঃকরণে দুই রকম বৃত্তি আছে, একরূপ বৃত্তি অশুদ্ধ,—অজ্ঞান কলুষিত; অন্যরূপ বৃত্তি শুদ্ধ,—অজ্ঞানের প্রভাব হইতে বিনির্ম্মুক্ত। অজ্ঞানী পুরুষেরা সর্ব্বদা 'আমার' 'আমার' করেন ('মম' ইতি কায়তি—শব্দায়তে)। ইহাদের সম্বন্ধিনী বৃত্তির নাম মামক। জ্ঞানী পুরুষেরা শুদ্ধ,—স্বচ্ছ ("পাণ্ডবঃ"); তাঁহাদের সম্বন্ধিনী বৃত্তির নাম 'পাণ্ডব'। এই মামক—অশুদ্ধবৃত্তি এবং পাণ্ডব—শুদ্ধবৃত্তি—ইহারা কি করিল?—অর্থাৎ অন্তঃকরণে কলুষিত বৃত্তিগুলি ও পবিত্র বৃত্তিগুলির সংগ্রামে কাহারা জয়লাভ করিল? ইহাই প্রশ্ন।

কথিত আছে, আচার্য্য অভিনব গুপ্তের মৃত্যু হয় নাই। তিনি শিব-চতুর্দ্দশীর দিন শিবস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে শিবে লীন হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার রচিত এই অন্তিম শিবস্তোত্রটী বঙ্গদেশীয় ভক্তবৃন্দকে উপহার দেওয়ার জন্য একটী কাশ্মীরী পণ্ডিতের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ স্তোত্রটী কাগজ পত্রের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কাশ্মীরে অলঙ্কার শাস্ত্রের অতিশয় চর্চ্চা ছিল; এমন কি, কাশ্মীর দেশকে

অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্মস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শৃঙ্গারাদিরসের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে চারিটী মত উদ্ধৃত হইয়াছে। এই চারিটী মতের মধ্যে প্রথমে ভট্টলোল্লট প্রভৃতির মত প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর, শ্রীশঙ্কুরের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অতঃপর, ভট্টনায়কের মত উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বশেষে সিদ্ধান্তরূপে আচার্য্য অভিনব গুপ্তের মত প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরি কথিত আলঙ্কারিকগণের মধ্যে সকলেই কাশ্মীরক ছিলেন। রসের স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্য অভিনব গুপ্তের মতই সর্ব্বস্বীকৃতরূপে প্রচলিত। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা রচনা করেন; তাঁহার অলঙ্কার সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ আমরা দেখি নাই; হয় ত তাঁহার গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা কীটদষ্ট অবস্থায় লোপের পথে অগ্রসর হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কাব্যপ্রকাশই তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতগণের সবিশেষ আদরণীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থখানিকে 'সাহিত্যদর্শন' বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের প্রণেতা মম্মট ভট্ট কাশ্মীরী ছিলেন। এই গ্রন্থ অত্যন্ত কঠিন। বঙ্গদেশীয় গদাধর ভট্টাচার্য্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ, নাগেশ ভট্ট-প্রমুখ বিখ্যাত বৈয়াকরণগণ ও গোবিন্দ ঠকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণ সকলেই কেহ কাব্যপ্রকাশের টীকা লিখিয়া, কেহ বা টীকার টীকা লিখিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী, মৈথিল, দাক্ষিণাত্য, সকলেই এই গ্রন্থকে সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি এই গ্রন্থের কাঠিন্যের কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছে—ইহা আমাদের মনে হয় না। শ্রীনগরে আমরা যখন অবস্থান করিতেছিলাম, তখন দুইটী কাশ্মীরী ছাত্র আমাদিগের নিকট কাব্যপ্রকাশ পড়িতে আসিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিয়াছি, কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিতের রচিত কাব্যপ্রকাশের অনেকগুলি টীকা, সে দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। একটী ছাত্রের নিকট কাশ্মীরের শারদা-লিপিতে লিখিত, 'টীকাসারসমুচ্চয়' নামে কাব্যপ্রকাশের এক টীকা ছিল। এই টীকা সমস্ত টীকার সার সংগ্রহ করিয়া রচিত হইয়াছিল, ইহা নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই টীকার রচয়িতার নাম বোধ হয় আনন্দবর্দ্ধন। কাশ্মীরী পণ্ডিতের রচিত কাব্যপ্রকাশের কোন টীকা অদ্যাবধি মুদ্রিত হয় নাই। ধ্বন্যালোক নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি আনন্দবর্দ্ধনের রচিত। এই গ্রন্থখানিও অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থ।

কাব্যরচনায় কাশ্মীরকগণের কৃতিত্ব কম নহে। আমাদের মনে হয়, মিথিলা, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাত্য ও কাশ্মীর—এই চারি দেশেই বিশেষ ভাবে কাব্যশাস্ত্রের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশে উদাহরণরূপে উদ্ধৃত অনেক কবিতা কাশ্মীর দেশে রচিত। অমরু-শতক অতিশয় উৎকৃষ্ট কাব্য। এই অমরু-কবি কাশ্মীরক ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, বাণভট্ট কাশ্মীরী ছিলেন। বাণের হর্ষচরিত পূর্ব্বে কাশ্মীরেই প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরের মহারাজ ৺রণবীর সিংহ প্রথমে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে হর্ষচরিতের প্রচার করেন; তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদর্শ-পুস্তক কাশ্মীর হইতে আনীত হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজগণও কাশ্মীরী ছিলেন—ইহা আমাদের বিশ্বাস। প্রাচীন কাশ্মীরকগণের নামের শেষেই "বর্দ্ধন" শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী ইতিহাস হইলেও অসাধারণ কবিত্বে পরিপূর্ণ—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই রাজতরঙ্গিণী পর্য্যালোচনা করিলে কাশ্মীর দেশীয়গণের ইতিহাস রচনায় কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর রাজগণের ইতিহাস বর্ণিত আছে। আনন্দলহরী এবং সৌন্দর্য্যলহরী নামে প্রসিদ্ধ কবিত্ব পূর্ণ সুললিত স্তোত্র দুইটী শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আদি শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রণেতা কি না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই দুইটী স্তোত্রে কাশ্মীর দেশীয় রচনাপদ্ধতির ছায়াপাত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরক জলন্ধর ভট্টের প্রণীত স্তুতিকুসুমাঞ্জলি অতি সুললিত ভক্তিপূর্ণ স্তুতিরাজির সংগ্রহ। এই গ্রন্থ কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিতের বিরচিত টীকাসহ বোম্বাইতে 'কাব্যমালা'য় মুদ্রিত হইয়াছে। কাশ্মীরদেশে বহু কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কয়েক খানি বোম্বাইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এখানে সকলগুলির পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা সে উদ্যম হইতে বিরত রহিলাম।

ব্যাকরণ-চর্চ্চায় কাশ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল, এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কাশ্মীরদেশীয় ছিলেন, ইহা কাশ্মীর অধ্যাপক সম্প্রদায়ে চিরন্তন প্রচলিত প্রবাদ। আদ্যন্তবদেকস্মিন (অষ্টাধ্যায়ী ১।১।২১) সূত্রের মহাভাষ্যে "গোনর্দ্দীয়স্ত্বাহ" বলিয়া একটী মতবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। কৈয়টোপাধ্যায় এই স্থলে লিখিয়াছেন, এই মতটী ভাষ্য-

কারের নিজের মত। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺ শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের চরণপ্রান্তে বসিয়া আমরা শুনিয়াছি যে, 'ভাষ্যকারই গোনর্দ্দীয় অর্থাৎ গোনর্দ্দ-দেশীয়। গোনর্দ্দ কাশ্মীরদেশেরই নামান্তর; অতএব মহাভাষ্যকার কাশ্মীরদেশীয় ছিলেন।' মহাভাষ্যকারকে কাশ্মীরদেশীয় মনে করিবার আরও কারণ আছে।

নবেতি বিভাষা (অষ্টাধ্যায়ী ১।১।৪৪) সূত্রের মহাভাষ্যে উদাহরণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে, "অভিজানাসি দেবদত্ত যৎ কাশ্মীরেষু বৎস্যামঃ, যৎ কাশ্মীরেষবসাম যত্তত্রৌদনং ভোক্ষ্যামহে, যত্তত্রৌদনমভুঞ্জ্মহি * * অভিজানাসি দেবদত্ত কাশ্মীরান্ গমিষ্যামঃ কাশ্মীরানগচ্ছাম: তত্রৌদনং ভোক্ষ্যামহে তত্রৌদনমভুঞ্জ্মহি (১)।" এই অংশের তাৎপর্য্য এই—'দেবদত্ত, তোমার মনে আছে কি, আমরা কাশ্মীরে বাস করিয়াছিলাম, এবং সেখানে ওদন (অন্ন) ভোজন করিয়াছিলাম? আমরা কাশ্মীরে গিয়াছিলাম, এবং তথায় অন্ন ভোজন করিয়াছিলাম?' কাশ্মীরে অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়; সেখানকার লোকেরা বাঙ্গালীদের মত দুই বেলা ভাত খাইয়া থাকে। কাশ্মীর হিমালয়ের অধিত্যকায় অবস্থিত। এখানে জলের অভাব নাই। কোথাও পাহাড়ের উপর হইতে মনোহর নির্ঝর ঝরিতেছে, কোথাও বা পর্ব্বতের পাদমূল হইতে রমণীয় উৎস উৎসারিত হইতেছে। কাশ্মীরে কূপ অথবা পুষ্করিণী খননের প্রয়োজন হয় না। এখানকার কৃষি বৃষ্টির অধীন নহে। ঐ সকল নির্ঝর ও প্রস্রবণের জল খাল কাটিয়া গ্রাম ও মাঠের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ঐ সকল জল একত্র হইয়া ক্ষুদ্র তটিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের খালের সংখ্যা কাশ্মীরে কম নহে। প্রধানতঃ ঐরূপ খালের সহায়তায়ই এখানে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার, ভগবান্ পতঞ্জলি একস্থলে দৃষ্টান্তরূপে লিখিয়াছেন,—"শাল্যর্থং চৈব কুল্যাঃ প্রণীয়ন্তে তাভ্যশ্চ পানীয়ং পীয়তে উপস্পৃশ্যতে চ শালয়শ্চ ভাব্যন্তে (২)।"—শালি অর্থাৎ ধান্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদী (খাল) নির্ম্মিত হয়; তাহা হইতেই পানীয় পান করা হয়, আচমনাদি নির্ব্বাহিত হয়; আবার শালিও (ধান্য) উৎপাদিত হইয়া থাকে। যাহা সুপ্রসিদ্ধ, তাহাই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রীতি কাশ্মীরেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তাই সেই দেশেই এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, এরূপ মনে

(১) বিভাষাসাকাঙ্ক্ষে (অষ্টাধ্যায়ী ৩।২।১১৪) সূত্রের উদাহরণরূপে এইগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) মহাভাষ্য, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, পঞ্চম আহ্নিক ২৬ সূত্র।

করা অসঙ্গত নয়। পূর্ব্বে আমরা কাশীর অধ্যাপক সমাজে পূর্ব্বপরম্পরা প্রচলিত যে জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত মহাভাষ্যকারের লিখিত এই সকল কথা একত্র করিয়া বিচার করিলে, ভাষ্যকার পতঞ্জলিকে কাশ্মীর-দেশীয় বলিতে বিশেষ কোন আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, তিনি যে কাশ্মীরক ছিলেন না, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বাধক প্রমাণ না থাকায়, এবং জনপ্রবাদের অনুকূল সাধক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা আমাদের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিকে কাশ্মীরক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছি। মহাভাষ্যের ব্যাখ্যার মধ্যে কৈয়টোপাধ্যায়-প্রণীত 'মহাভাষ্য প্রদীপ' অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ; এই গ্রন্থ প্রাচীন অধ্যাপক-পরম্পরা হইতে পঠনপাঠনে আদৃত হইয়া আসিতেছে। কৈয়টের ব্যাখ্যা না থাকিলে, বর্ত্তমান সময়ে মহাভাষ্যের অনেক স্থলেরই অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হইত, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। যেমন মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' না পড়িয়া কেহ পূর্ণ আলঙ্কারিক হইতে পারে না, সেইরূপ কৈয়টের গ্রন্থ না পড়িয়া কেহ পরিপূর্ণ বৈয়াকরণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কৈয়ট কাশ্মীরক ছিলেন। 'উব্বট' নামে একজন কাশ্মীরদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়িসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য অতীব মনোহর ও প্রামাণিক বলিয়া আদৃত। মহীধর শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতার ভাষ্যরচনায় এই উব্বট ভাষ্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিত, "ভাষ্যং বিলোক্যোব্বটমাধবীয়ম্" এই শ্লোকাংশ হইতে জানিতে পারা যায়। এই উব্বট ভাষ্য কাশী ও বোম্বাইতে একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। শৌনক মহর্ষি-প্রণীত 'ঋকৃপ্রতিশাখ্যে'রও উব্বট একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য কাশীতে 'বেনারস সংস্কৃত সীরিজ্' নামক গ্রন্থমালায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষ্যও পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

[ক্রমশঃ।

পরলোকে ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সংসাহিত্যের প্রচারক বলিয়া যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন, যিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও সাহিত্যরথিবৃন্দের অকপট সুহৃদ বলিয়া চির পরিগণিত, সেই যশস্বী পুরুষ গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ৭৫ বৎসর বয়সে নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

গুরুদাস বাবু প্রথমে অল্প মূলধনে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের বাঙ্গালা চিকিৎসা-গ্রন্থ লইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকাগার—"বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী" স্থাপন করেন। সামান্য মূলধনে সততারূপ অমূল্য রত্ন সংযোজিত হওয়ায় সোণা ফলিয়া গেল। ক্ষুদ্র তৃণ মহান্ মহীরুহে পরিণত হইল। তিনি ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাবান্ অমর লেখক-বৃন্দের গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও প্রচারক হইলেন।

কত দরিদ্র গ্রন্থকার গুরুদাস বাবুর সহায়তায় জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যানির্ণয় অনাবশ্যক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহার পুস্তকাগারে একটা ছোটখাট সাহিত্যিক-সম্মিলনী বসিত। গুরুদাস বাবুর সহিত সরস মধুর আলাপনে সকলেই তৃপ্ত হইয়া ফিরিতেন।

গুরুদাসবাবুর দেশব্যাপী সুযশের কথা না বলিলেও চলে। আমরা বাল্যকালে কোনও বাঙ্গালা অ-খ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে প্রকাশকের নামটা পাঠ করিতাম। গুরুদাস বাবুর নাম দেখিলে পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হইত। আমাদের ধারণা ছিল, সৎগ্রন্থ না হইলে তিনি প্রকাশক হইতেন না। তাঁহার এমনই একটা ব্যাপ্ত সুযশ ছিল।

তিনি বেঙ্গল 'বুক সেলার্স এসোসিয়েসনে'র প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সম্মানের জন্য দুই দিবস পুস্তকের দোকান সমূহ বন্ধ ছিল।

গুরুদাসবাবু বিগত দশ বৎসর অন্ধ হইয়া বাটীতেই বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার উপযুক্ত কৃতী পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় পিতৃ-আদর্শে দক্ষতার সহিত ব্যবসায় পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা ভগবানের নিকট গুরুদাসবাবুর আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সমাচার।

প্রতিভা।—এপ্রেল ১৯১৮। মুরাদাবাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা মহাশয় সম্পাদিত হিন্দি ভাষায় প্রচারিত 'প্রতিভা' পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। প্রতিভার বিষয়-নির্ব্বাচন ও ভাষার দ্যোতনা বড়ই চিত্তাকর্ষক। মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ মনীষিগণ যখন চেষ্টা করিতেছেন যে, হিন্দি ভাষাকে নিখিল ভারতের রাষ্ট্র ভাষার উচ্চ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তখন হিন্দি-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রতিভায় 'সত্য ভক্ত' "লেখাকী-চোরী" নামক প্রবন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন তাহা পড়িলে হিন্দি-ভাষার ভক্ত মাত্রেরই হৃৎকম্প হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের এক শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর কথা স্মরণ করিয়া জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহাতে প্রাণে বড় বেশী আশার উদ্রেক হয় না। 'সত্যভক্ত' বলেন—"অত্যন্ত খেদ ঔর লজ্জাকা বিষয় হায় কি হিন্দী-সংসার মে লেখ-সম্বন্ধী চোরী কি কুপ্রবৃত্তি নিরন্তর বড়তী জাতি হায়। আয়ে দিন কিসী না কিসী মাসিকপত্রমে একাধ লেখ ঐসা মিলহী জাতা হায়, জোয়াতো হিন্দীকে হী কিসী অন্য লেখকা কুছ ঘটায়া বঢ়ায়া...লেখক...অপনে গুড নামকো মিঠা দেতে হৈ।" বাস্তবিক বিষয়টী বড়ই গুরুতর। আমরা জানি আধুনিক হিন্দী ভাষায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। সে সকল স্থলে অনুবাদক ও লেখক উভয়েরই

নাব আছে। এরূপ আহারপ্রদানে তাহা পুষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু 'সত্যভক্ত' মহোদয় যে কুপ্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দমন করিতে না পারিলে হিন্দী-সাহিত্যের উপর লোকের আস্থা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। এখন হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দের কিছুকাল ডিটেকটিভ সাজিয়া এই সকল তস্করকে গেরেপ্তার করিয়া তাহাদের "শুভ নামের" নির্ঘণ্ট না ছাপাইলে চলিবে না।

সম্মিলনী।—বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়-সমাজ-সম্মিলনীর মাসিক পত্রিকা "সম্মিলনী" পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শ্রমশীলতা ও বিশাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত। ভারতবর্ষে যে "দেশী" ভাব আসিয়াছে, বঙ্গীয় খৃষ্টান দর্শনে সেটিকে ধরিয়াছেন, শ্রদ্ধের ঘোষ মহাশয়। কিন্তু তাহার জন্ত তাঁহাকে যে প্রভূত সৎসাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত জে এন্ বসু, শ্রীযুক্ত হৃদয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার উচ্চ মত প্রকাশিত করিয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। ঘোষ মহাশয় খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ খ্রীষ্টের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা প্রচুর। বাইবেলের প্রত্যেক কথাটি তাঁহার ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু তাহা বলিয়া বাইবেলের ইংরাজ যে অর্থ করেন, সে অর্থ তিনি লজন নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের দুইটি দার্শনিক মত হিন্দু জগতের, শুধু হিন্দু জগতের কেন—ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের ভিত্তিস্তম্ভ। সে মত দুইটি পুনর্জ্জন্মবাদ ও নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অনেক সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য শাস্ত্র ঘাঁটিয়া ঘোষ মহাশয় বহু গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সত্য-দর্শনের পক্ষে এ দুইটি মতকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তাঁহার ইষ্টদেব প্রভু যীশু স্বয়ং এ দুইটি মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। যে ধর্ম্মে তিনি স্বয়ং দীক্ষিত হইয়াছেন, সে ধর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মের মূল-বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়, এ জ্ঞান দেশ-হিতৈষী বাঙ্গালী খ্রীষ্টানকে, এই জাতীয় জাগরণের যুগে নিশ্চয়ই গৌরবান্বিত করিবে। প্রাচ্য প্রতীচ্যকে চিরদিন ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে। ঘোষ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতীচ্যে প্রচার করিয়া আধুনিক দিনের মার্টিন লুথার হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বৈরাগ্যের পথে—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল সরস্বতী, এম্-এ, বি-এল্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; মূল্য ।০ আট আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে অমূল্য উপদেশ-রত্নাবলী দেশবাসীকে প্রদান করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সঙ্কলয়িতা তাহা হইতে খুঁজিয়া বাছিয়া সংসারীদের জন্ত পরমহংসদেব যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই শৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এ পুস্তকখানির ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকারী আমরা নহি এবং সে স্পর্দ্ধা কাহারও থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না; শুধু আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, এই পুস্তিকাখানি গৃহ-পঞ্জীর ন্তায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিলে সকলেরই বিশেষ কল্যাণ সাধন হইবে।

পাঠক! যে ঘোর সংসারীর এই পুস্তিকার নামকরণ হইতে সংশয় হইবে যে, তাঁহাকে গেরুয়া বসন পরিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে, তাঁহাকে আমরা অভয় প্রদান করিতেছি।

অর্চ্চনা, ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

ন্যায়ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

[লেখক—মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।]

মিরাটে অবস্থান-কালে পুত্র, পুত্রবধূ ও পত্নী নানাস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন, আমিও যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু যাই নাই। কি দেখিব? কি দেখিতে যাইব? কিসের জন্য পয়সা দিয়া গাড়ীভাড়া করিব? কিসের জন্যই বা রেল কোম্পানীকে ট্যাকের টাকা খুলিয়া দিব? হাঁড়ী দেখিলেই ত বাড়ী দেখা হয়, মাটী পোড়াইয়াই হাঁড়ীর সৃষ্টি, মাটী পোড়াইয়াই ত দিল্লীশ্বরের প্রাসাদের নির্ম্মিতি। হাঁড়ীতে আর বাড়ীতে প্রভেদ কি? সংস্থান-বিশেষ ভিন্ন ত আর কিছুই নয়, এই সংস্থান-বিশেষ দেখিবার জন্য এত কৌতুহল কেন? যাহা যাহা দেখিবার জন্য এত দিন কৌতুহল পোষণ করিয়াছি তন্মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য আজ দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছি, আনন্দে অধীর হইয়াছি।

অধ্যয়নকালে ও অধ্যাপনার সময়ে যাহা যাহা করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় এই বৃদ্ধের পক্ষে এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা আর ঘটিয়া উঠিবে না; এই জন্য সেই সঙ্কল্প অগাধ জলরাশিতে ভাসাইয়া দিয়াছি। নিজে পারিলাম না বলিয়া ক্ষান্ত হই নাই; যখন সুবিধা পাইয়াছি; তখনই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশে সম্মিলনের অভিভাষণে, সভার বৈঠকের বক্তৃতায়, লিখিত প্রবন্ধে অনেকবার বলিয়াছি। আমার অভিভাষণ, বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ফলে হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। বহু পূর্ব্বে শারীরক ভাষ্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইয়াছে, মধ্যকালে সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর ও পাতঞ্জল সূত্র ভাষ্যের অনুবাদ হইয়াছে। আমার মুখে আমার সঙ্কল্পের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহারা যে সেই সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি না। বলিতে পারি, আমার মত তাঁহাদিগেরও মনে এইরূপ আকিঞ্চনের উদয় হইয়াছিল; তাঁহারা "শুভস্য শীঘ্রং" মনে করিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই শুভকার্য্যের আরম্ভ করিয়াছিলেন, ক্লান্তি, শ্রান্তি, বিশ্রাম, অবসাদ ও আলস্যকে দূরে সরাইয়া নিয়ত পরিশ্রমে কার্য্যের শেষ করিতে পারিয়াছিলেন ও তজ্জন্য আত্মপ্রসাদ লাভে অধিকারী হইয়াছিলেন, আর আমি

রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির মত আজ কাল করিয়া সময় কাটাইয়াছি ও তজ্জন্য আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হইয়াছি।

যে মহাপুস্তকের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করাইবার জন্য অনেককে অনুরোধ করিয়াছিলাম; সেই মহামূল্য পুস্তকের ও অনুবাদের প্রথম খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অর্থব্যয়ে এতদিনে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদিন সাহিত্যপরিষদ্ কেবল পুরাতন মলিন কীটসঙ্কুল ধূলীপূর্ণ জীর্ণ কাঁথায় কোথায় কোন্ নূতন বস্ত্রের তালী আছে. বহু গবেষণায় তাহার নির্ণয় করিয়া উঠাইয়া ফেলিতেছিলেন ও বহু যত্নে বহু চেষ্টায় কোনও বৃদ্ধ ফকির সন্ন্যাসীর ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগ্রহ করিয়া সেই কাঁথার সেই স্থানে আবার তালী দিতে বসিয়া বুদ্ধি, কর্ম্ম, কল্পনার ব্যয়ে, সময়ের ব্যয়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন; আজ তাহা না করিয়া অমূল্য বা বহুমূল্য সুদৃঢ় সুপ্রাচীন এক খানি কাশ্মীরি সাল অনাদরে যে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল; সাহিত্য-পরিষদ্ তাহার মূল্য বুঝিয়া ধূলী ঝাড়িয়া লোকলোচনের সমক্ষে তাহা তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সালের উপর দিয়া কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কত রৌদ্র বৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, কত ঝড় তুফান চলিয়া গিয়াছে; তথাপি সূত্রগুলি এত দৃঢ়, এত শক্ত যে, অন্য কোন নবীন সুদৃঢ় সূত্র দৃঢ়তায় এই পুরাতন সূত্রের সমকক্ষতা করিতে পারে না; ইহার কারণ কি? সূত্রে সূত্রে পরস্পর এত দৃঢ় সন্নিবেশ যে, একটী সূত্রও ছিঁড়িয়া বাহির করিতে পারা যায় না; তাহার কারণ কি? এই সকল প্রশ্নের যিনি সদুত্তর করিতে সমর্থ, প্রত্যেক সূত্রের ভিতরে কি কি বহুমূল্য বস্তু নিহিত আছে; তাহা বুঝাইয়া দিতে যাঁহার সামর্থ্য আছে, প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা কৌশলে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, মূল্য অবধারণে যাঁহার শক্তি আছে, বস্ত্রবিনাশক কীটাদি নিবারণের উপায় ও ঔষধ যাঁহার পরিচিত; এইরূপ একজন সূক্ষ্মদর্শী বহুদর্শী বণিককে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সাহিত্য-পরিষদ্ আজ সেই সকল তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য কেবল পণ্ডিতসমাজের নয়, কেবল জ্ঞানপিপাসু শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর নয়, ভারতের নরনারী মাত্রেরই সাহিত্যপরিষদ্ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আজ আনন্দে অধীর হইয়া নন্দনকানন হইতে রাশি রাশি মন্দার কুসুম আহরণ করিয়া বিমানে চাপিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া গৌতম প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ সাহিত্যপরিষদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ মেঘধারায় সুধাবৃষ্টি করিতেছেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সাহিত্যপরিষদের কল্যাণকামনা করিতেছে।

ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী, কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, স্মৃতি ও ব্যাকরণে সুব্যুৎপন্ন মহাপ্রতিভাশালী কল্যাণভাজন শ্রীমান্ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এই ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। আজকাল নয়, অনেক পূর্ব্বে এই অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে, মুদ্রণাভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা অন্য কাহারও নেত্রের অতিথি হইতে পারে নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে নিজ ব্যয়ে এই সুবৃহৎ পুস্তক মুদ্রণ একান্ত অসম্ভব। তাই এতদিন পুস্তক খানি মুদ্রিত হয় নাই, সাহিত্যপরিষদ্ এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সকলের চক্ষুঃ ফুটাইয়া দিয়াছেন।

সংস্কৃতে যেরূপ অল্পাক্ষরে অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ হইতে পারে, পৃথিবীতে সেরূপ অন্য ভাষা নাই। একে সেইরূপ সংস্কৃত ভাষা, তাহাতে আবার ঋষিযুগের সূত্রগ্রন্থ, সূত্র আরও অল্পাক্ষরে নিবদ্ধ। সূত্রের লক্ষণে তাহাই আছে। সূত্রে নাম মাত্র বিষয়ের নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্বত্র বিষয়ের লক্ষণ নাই, সর্ব্বত্র বিষয়ের বিভাগ নাই, সর্ব্বত্র বিষয়ের উদাহরণ নাই। বিষয়কে বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য সূত্র প্রস্তুত নয়। বিষয়গুলি অভিজ্ঞ গুরুর নিকটে মুখে মুখে বুঝিয়া লও, কালে সেই মহান্ বিষয়গুলি ভুলিয়া যাইতে পার; সেই জন্য সূত্রের সৃষ্টি; সূত্র কেবল সেই গুরুগম্ভীর বিষয়গুলির স্মারক মাত্র। সুতরাং এই অল্পাক্ষরনিবদ্ধ গৌতম সূত্র দেখিয়া কেহ ন্যায়দর্শন আয়ত্ত করিতে পারে না। ভগবান বাৎস্যায়ন সেই অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে গোতমসূত্রের উপরে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা, তাহাতে আবার ঋষিপ্রতিম ইঙ্গিতভাষী গভীরাশয় বাৎস্যায়নের ন্যায় ভাষ্যকার; তাঁহার লেখনীপ্রসূত ভাষ্য সেকালের পণ্ডিতের সুবোধ্য হইলেও পরবর্ত্তি-কালের পণ্ডিতের সুখবোধ্য হয় নাই। এই জন্যই উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিকের সৃষ্টি, এই জন্যই বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়-তাৎপর্য্য-টীকার রচনা, এই জন্যই উদয়নের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধির নির্ম্মিতি। ন্যায়দর্শনোক্ত প্রমাণ চতুষ্টয় মাত্র লইয়া উপাধ্যায় গঙ্গেশ চিন্তামণি গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি তাহার দীধিতি নামে টীকা লিখিয়াছেন, মথুরানাথও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। জগদীশ গদাধরের প্রতিভা নব নব কল্পনার বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার উপরে তরঙ্গের পরে তরঙ্গ ছুটাইয়া অগাধ অকূল ন্যায়সিন্ধুকে অধৃষ্য ও অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছে। অভিজ্ঞ ডুবারু, এই তরঙ্গে ভীত হয় না, তরঙ্গের সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে অতলসিন্ধুতে ডুবিয়া অমূল্য রত্ন আহরণ করে, অনভিজ্ঞ ভয়ে সহস্র হস্ত

দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। শিরোমণি-সূর্য্যের প্রভাবে পক্ষধরের আলোক নিবিয়া গিয়াছে, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধরের গ্রন্থ অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মূল ন্যায়সূত্র ও ভাষ্যেরও অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে নৈয়ায়িক সমাজের যারপর নাই, ক্ষতি হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে যতগুলি বিষয় অবধারিত হইয়াছে; নৈয়ায়িকগণ তাহার অল্পই অবগত রহিয়াছেন। এই জন্য ন্যায়সূত্র ও ন্যায়ভাষ্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই উপযুক্ত সময়ে, এই অভাব বোধের সময়ে, শ্রীমান্ তর্কবাগীশ এই গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন; সন্দেহ নাই।

একে ন্যায়দর্শনোক্ত জটিল বিষয়ের সমাধান লইয়া গ্রন্থ, তাহাতে আবার সুপ্রাচীন কালের পণ্ডিতের সুপ্রাচীন কালের প্রচলিত শব্দে প্রাচীনকালের ইঙ্গিতে, প্রাচীনকালে ভঙ্গিতে সুসংযত সুসংক্ষিপ্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নিবন্ধ; অভিজ্ঞ গুরুর নিকটে অধ্যয়ন না করিয়া গুরুপরম্পরায় ইহার মর্ম্ম অবগত না হইয়া যিনি এই ন্যায়ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, যিনি বাৎস্যায়নের ন্যায় গভীরাশয় মিতভাষী গ্রন্থকারের মনের ভাব পর্য্যন্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে সমর্থ; কি বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিব, ভাষায় এরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাই না। সংস্কৃতের বিভক্তিগুলি তুলিয়া দিয়া বিশেষণ পদগুলি আগে ও বিশেষ্য পদগুলি পরে লিখিলেই সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গলায় অনুবাদ হইতে পারে। আবার যিনি একখানি অভিধান সম্মুখে রাখিয়া সংস্কৃতে "জলং" থাকিলে তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় "সলিল" লিখিবেন তাহার ত কথাই নাই। এই দ্বিবিধ অনুবাদ ভিন্ন অন্যবিধ বা তৃতীয়বিধ অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যে বড় দেখিতে পাই না। শ্রীমান্ ফণিভূষণ এই গতানুগতিক ন্যায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই; অধ্যাপক যেমন বিষয়টি যাহাতে ছাত্রের হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই উদ্দেশে নানা প্রকারে তাহা বুঝাইবার জন্য বিপুল আয়াস গ্রহণ করেন; শ্রীমান্ তর্কবাগীশও বুঝাইবার জন্য সেইরূপ আয়াস গ্রহণ করিয়াছেন, বলিলেও তর্কবাগীশের উপরে অবিচার করা হইবে। আমি এই পুস্তক খানি পাইয়া যখন নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল, শ্রীমান্ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ যেন আমার নিকটে উপবিষ্ট, তিনি অধ্যাপকের আসনে আসীন; আমি যেন ছাত্রের আসনে বসিয়া তাঁহার নিকটে ন্যায়ভাষ্য অধ্যয়ন করিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে আমার চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া পড়িল। বাল্যকালে

আমি একখানি সেতার শিক্ষার পুস্তকের বিজ্ঞাপনে পড়িয়াছি,—"ওস্তাদের প্রয়োজন নাই, এই পুস্তক খানি সম্মুখে রাখিয়া সেতারে আঙুল দেও, রাগ-রাগিণীর সহিত সেতার আপনিই বাজিয়া উঠিবে"। সেতারে পরীক্ষা করিতে পারি নাই, এত দিনে এই বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদে তাহার পরীক্ষা হইয়া গেল।

শ্রীমান্ তর্কবাগীশ ভাষ্যোক্ত "প্রয়োজন" শব্দের প্রযোজক অর্থ করিতে যাইয়া,ন্যায় কাহাকে বলে বুঝাইতে যাইয়া নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী কেহই হইতে পারে না, (শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক যদি বিতণ্ডাবলে বাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিতে পারে; তাহা হইলেই ত অবশেষে তাহার শূন্যবাদ টিকিয়া যায়; তাহাও ত প্রয়োজন বলা যাইতে পারে) যুক্তি দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে যাইয়া "শব্দঃ অশ্রাবণঃ কার্য্যত্বাৎ" দিঙ্‌নাগাচার্য্যের এই অনুমানে দোষ দেখাইতে যাইয়া মহর্ষি গোতম নবম সূত্রে প্রমেয়ের ভিতরে দুঃখের উল্লেখ করিয়াছেন, সুখের উল্লেখ করেন নাই কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, ব্যাপ্তি কাহাকে বলে প্রাচীন নৈয়ায়িক গ্রন্থকারেরা তাহা জানিতেন না; নব্য নৈয়ায়িক গ্রন্থকারদিগের উহা আবিষ্কৃত; এই মতের যাঁহারা আবিষ্কর্ত্তা; সেই সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া "লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং" ভাষ্যোক্ত এই বাক্যাংশের ভাবার্থ লইয়া, বিশিষ্ট ধূমে বহ্নির ঐরূপ সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে। সর্ব্বত্র সম্বন্ধের নামই ত ব্যাপ্তি। উহা নব্য নৈয়ায়িক-দিগের আবিষ্কৃত কোন নূতন শব্দ নহে।

অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই এই ব্যাপ্তি পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিয়া অনুমানের প্রমাণ কি? প্রমেয় কি? এ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সহিত নবীন পণ্ডিতদিগের কি কি মতভেদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা স্বমত প্রদর্শন করিয়া সূত্রস্থ "তৎপূর্ব্বকং" এই পদস্থ "তৎ" পদের অর্থ প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভাষ্যকার যে শেষবৎ অনুমানের উদাহরণে শব্দ দ্রব্য নয়, কর্ম্ম নয়; সুতরাং গুণ বলিয়াছেন,—তাহা বুঝাইতে যাইয়া বাচস্পতিমিশ্র যে টীকাকার হইয়াও এস্থলে ভাষ্যের মতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কেবল ব্যতিরেকী অনুমান-কেই শেষবৎ অনুমান বলিয়াছেন ও ভাষ্যে প্রদর্শিত অনুমানদ্বয় কেবল ব্যতিরেকী নয়, অন্বয় ব্যতিরেকী বলিয়াছেন, (১) তাহার এবং বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর

---

(১) "একদ্রব্যত্ব" এই পদের যদি একদ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব অর্থ হয়; তবে এই অনুমানটি অন্বয়ব্যতিরেকী হয়, সপক্ষে দৃষ্টান্ত যেমন সুখ, তাহার সমবায়ি কারণ একটী দ্রব্য'

যে "অন্বয়ী, ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ' এই ভাবে অনুমানকে ত্রিধাবিভক্ত করিয়াছেন,—তাহার উল্লেখ করিয়া নরশিরঃ কপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ" এই অনুমানে জগদীশের মত উদ্ধৃত করিয়া বৈধর্ম্মেও উপমিতি হয়, ইহার সমর্থন করিতে যাইয়া এমন কি, প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যায় ও প্রত্যেক সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় যুক্তিপূর্ণ বিচার-প্রণালীর অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্যের এক-শেষ, বুদ্ধিমত্তার একশেষ, ও বহুদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে ন্যায়গঙ্গা ভারতের বুকে নানা প্রকারে প্রবাহিত হইয়া পণ্ডিতদিগের মস্তিষ্কে উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া বঙ্গসাগরকে জলতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়াছে, যে ন্যায়গঙ্গার তরঙ্গে পড়িয়া দিঙ্‌নাগ হাবুডুবু খাইয়াছে; তাহার মূল কোথায়? কোন্ পথে সেই পবিত্র তীর্থে পঁহুছিতে পারা যায়? যিনি সেই পুরাতন পথের আবিষ্কার করিয়া অনুবাদ দ্বারা কণ্টক রাশিকে দূরে সরাইয়া ব্যাখ্যা দ্বারা কুটিলাংশকে সরলতায়, বন্ধুরকে অবন্ধুরতায়, বিষমকে সমতায় আনিয়া বঙ্গবাসীকে ক্রমোচ্চ ভূমিতে অবতীর্ণ করিয়া গোতমমুখ-গোমুখীকে প্রদর্শন করিতেছেন; তাহাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব জানি না।

মনে করিয়াছিলাম, এই অনুবাদ প্রকাশে দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে,

---

অর্থাৎ একটী আত্মা, বিপক্ষ ঘট বা আত্মাদি নিত্যদ্রব্য তাহারা একদ্রব্যরূপ সমবায়িকারণ জন্য নয়। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের আর অবান্তরভেদ নাই; সেই যদি একদ্রব্য হয়, যেমন আকাশ, কাল, দিক্; এক হইয়াছে দ্রব্য যাহার; সেই একদ্রব্য। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যে একটীমাত্র দ্রব্যে অবস্থিতি করে, তাহার নাম একদ্রব্য; তাহার সাধর্ম্ম্য একদ্রব্যত্ব। আকাশ, কাল, দিক্, এই তিনেতেই সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ আছে; এজন্য সেগুলিকে একদ্রব্য বলা যাইতে পারে না, কোন নৈয়ায়িক আপত্তি করিতে পারেন,—একত্বসংখ্যা একটীমাত্র ঘটে আছে; তাহাকেও ত একমাত্র দ্রব্যবৃত্তি বলা যাইতে পারে; কিন্তু একত্ব যেমন একটী ঘটে আছে, একখানি পটেও আছে, আকাশেও আছে, কালেও আছে, দিকেও আছে; শব্দ সেরূপ নয়, সে কেবল একদ্রব্য আকাশেই আছে, অন্যত্র নাই। নৈয়ায়িকের সেই আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশে একটী নিবেশ করিতে হইবে; যাহাতে এ পূর্ব্বোক্ত ভাবটী পরিস্ফুট হয়। এখনও বঙ্গভাষার সেরূপ সুদিন হয় নাই, সেরূপ শব্দ সম্পদ্ হয় নাই, যাহা দ্বারা নিবেশ প্রবেশ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এই একদ্রব্যত্বকে হেতু করিয়া শব্দ দ্রব্য নয় ইহা সাধন করিয়াছেন; সুতরাং ইহা বাচস্পতি মিশ্রের মতে কেন কেবল ব্যতিরেকী হইল না, বুঝিতে পারা গেল না, দ্বিতীয় অনুমান শব্দ কর্ম্ম নয়; [illegible] শব্দান্তরহেতুত্ব। শব্দান্তর বলাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়; শব্দ হইয়া যে শব্দান্তরের হেতু হয়। এ অনুমানটিও ত স্পষ্ট কেবল ব্যতিরেকী।

অন্ততঃ ছ'মাসের জন্য সাময়িক পত্রিকাগুলির একটা বড় রকমের খোরাক যুটিবে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে ও লেখনীমুখে নানা ভাবে নানা প্রকারের কিছু দিন ধরিয়া সমালোচনা বাহির হইবে; কিন্তু কৈ? কিছুই ত দেখিতেছি না, একেবারে কোন খানে কোন সাড়াশব্দ নাই। এই যে সংস্কৃত প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য, ও বার্ত্তিক পাঠ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সেই সকল পুস্তকের পরীক্ষাও চলিতেছে। অধ্যাপকও তেমনি বুঝাইতেছেন, ছাত্রও ঢোক্ গিলিয়া তেমনি বুঝিতেছে। আজ যে এই অনুবাদে ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়েরই প্রভূত উপকার হইল, সেজন্যও ত সম্পাদক মহলে দুই চারিটি কথা বলা উচিত ছিল। তবে হৈ চৈএর প্রতিকূলে অমার্জনীয় অনেকগুলি দোষ আছে; ১ম, গ্রন্থকার ভারতে জন্মিয়াছেন, ইউরোপে জন্মেন নাই; ২য়, ভারতে জন্মিয়াও ইউরোপে যাইয়া বিদ্যালাভ করেন নাই, হ্যাট্, কোট পরিয়া ভারতে আসেন নাই; ৩য়, ভারতেও কোন ইউনিভার্সিটি হইতে কোন ডিগ্রি পান নাই, তিনি টোলে পড়িয়া টুলো পণ্ডিত হইয়াছেন, আজও তাঁহার পরিধানে ত্রিকচ্ছ ধুতী ও কাঁধে একখানি চাদর। দেশীয় পণ্ডিত সমাজ, দেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়, পত্রিকা-সম্পাদক শ্রেণী কিছু বলুন বা না বলুন, ভিন্ন দেশীর নিকটে পুস্তকের আদর হইয়াছে। কাশী কুইন্স্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সরস্বতী ভবনের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা প্রাচ্য প্রতীচ্য দর্শনাদি বিদ্যায় পারদর্শী পরলোকগত বন্ধুবর ডাক্তার আর্থার ভিনিস এই পুস্তক খানি পাইয়া গ্রন্থকারকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি ৺ কাশীতে অবস্থানকালে তাহা দেখিয়া সকলের অবগতির জন্য সেই পত্রখানি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। বলা বাহুল্য, ডাক্তার ভিনিস্ এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কোন প্রশংসাপত্র দেন নাই, পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্ব্বে এই খানি মাত্র তাঁহার সাবধান হাত হইতে বাহির হইয়াছে। বলা আবশ্যক, এই প্রশংসাপত্র খানিই তাঁহার প্রথম, এই খানিই তাঁহার শেষ।

11th January, 1918.

"Dear Panditji,

I must thank you for the kind gift of your Nyayadarsana Volume I. It is a valuable contribution to the study of the Vatsyayanabhasya and should receive a hearty welcome from all who are interested in that early and difficult text. In glancing through the volume (and I have not had time to do more than this so far), I have been impressed by your original and most useful *tippanes* Wishing you all success with this and the succeeding volumes."

নিতুই-নূতন।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

চাহি আমি চিরপ্রিয় বিশ্বাস সরল, প্রথা পুরাতন
সে যে মধু নিরমল—অমৃত তরল, নিতুই নূতন!
পূর্ব্বপুরুষের দান-ধর্ম্ম-রীতি-নীতি চাই আমি চাই
পুরানো বান্ধব মোর—অস্থি-মজ্জা-প্রীতি র'ব লয়ে তাই।
ধন্য এ জীবন মম অতি সুনিশ্চয় জন্মেছি এ দেশে
মানব জীবন ধন্য করেছি প্রত্যয় দেবতার বেশে!
কোন্ বিশ্বে কোথা পাবে এমন উদার, ধ্রুব অনুভূতি
মহা মানবের চিহ্ন—পরম আত্মার প্রত্যক্ষ প্রতীতি!
স্বচক্ষে পাইবে কোথা দেখিতে এমন সুন্দর স্বরূপ
নররূপী নারায়ণ—মানস-মোহন এত অপরূপ!
প্রতি অণু—প্রতি বিশ্ব গড়েছেন একা—মহবিশ্বপতি
কোটী বিশ্ব—কোটী পতি—কোটীরূপে দেখা পুরুষ-প্রকৃতি!
প্রতি বস্তু মাঝে তিনি প্রতিরূপ ধরি' দিতেছেন দেখা
অনন্ত বিকাশ তাঁর—লীলাময় হরি বহু তিনি একা!
প্রতি কর্ম্মে প্রতি চিত্তে আঁধারে আলোকে অসীম-সসীম
প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে তিনি—গোলকে ভূলোকে চির রাত্রি দিন!
অনন্ত আকার তাঁর—নহে নিরাকার নহে অজানিত
মানব হৃদয়ে তিনি—স্বরূপ-সাকার চির পরিচিত!
মন্দিরে প্রতিমা মাঝে মৌনব্রত ধরে বিরাজ তাঁহার
ক'ন কথা ভক্তসনে মধুমিষ্ট-স্বরে অতি পরিষ্কার!
ধরার প্রতিমা তিনি—বিশ্ব জগন্মাতা—মাটীর পুতুল
চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি তাঁর মানিছে বারতা স্বতুল—অতুল!
কত মত মূর্ত্তি গড়ি পুজি মোরা তাঁরে গোময়ে গোচোখে
শান্তি পাই স্বস্ত্যয়নে—ব্রত উপাচারে পঞ্চগব্য পানে।
কোন্ শাস্ত্রে কোথা পাবে পবিত্র বিধান এমন সুন্দর
দেবময়ে এত কথা—অনন্ত নিদান এত মনোহর!
বড় ভালবাসি তাই আমার দেবতা, মাটীর পুতুল
শিল-নোড়া-শালগ্রাম তুলসীর পাতা সচন্দন ফুল।
যত ইচ্ছা ভাঙ্গ তুমি যত ইচ্ছা গড় ভরিয়া পরাণ
এক তিল ব্যতিক্রম কর দেখি তুমি কত মূর্ত্তিমান?
চাই তাই সেই পূর্ণ বিশ্বাস সরল, প্রথা পুরাতন
সে যে মধু নিরমল—অমৃত তরল—নিতুই-নূতন!

প্রলোভন।

[শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল্।]

(১)

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে যদুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! জমীদার আমায় আমাদের গ্রামের নায়েবের পদ দিয়েছে?"

প্রতিবাসী উত্তর দিল, "আর দেখছ কি! এইবার তোমার বরাত ফিরে গেল। এত বড় একটা মহলের কর্ত্তা—সদর নায়েব! যদুনাথ কিন্তু এ সংবাদে মোটেই খুসী হয় নাই। এই অপ্রত্যাশিত দান কেন আসিল—কে চাহিল! ইহা তাহার নিকট একটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হইল। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা! তাহাদের গ্রামেরই এক নায়েবের উৎপীড়নে তাহার পিতা কারাদর্শন করিতে বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সেই অপমানের তীব্র জ্বালা তাহাকে যে মৃত্যুর অর্দ্ধপথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল! আজ সেই অত্যাচার-পীড়িতের পুত্রকে সেই প্রকার অত্যাচারীর পদগ্রহণ করিতে হইবে? বিধাতার এ কি নির্ম্মম পরিহাস! যদুনাথ ভাবিল, না অর্দ্ধাশন অনশন বরং বাঞ্ছনীয়, তবু মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, দরিদ্রকে কাঁদাইয়া, শান্ত প্রজাদের মধ্যে কঠোর পীড়নের বন্যা আনিয়া নিজ দুঃখ নিবারণ—এ কাজ তাহার দ্বারা হইবে না।

গৃহে প্রত্যাগমন কালে সে তৎপ্রতি সাধারণের আচরণ দর্শনে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। দেখিল, তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ অযাচিত ভাবে উৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছে, এমন কি, তাহার শত্রুগণ পর্য্যন্ত তাহার মুখপানে আর বক্রদৃষ্টিতে চাহিতে সাহস করিতেছে না। এ দৃশ্যে সে বড়ই কাতর হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখে পত্নী নীরদাকে দেখিবামাত্র সে বলিল, "ব্যাপার কি নীরদা! এরা কি আমায় পাগল করে দেবে?" নীরদা বুঝিল, স্বামী অতিমাত্র বিরক্ত হইয়াছেন। সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি এ চাকুরী পছন্দ হয় নাই?"

"তুমিও তা'হলে এ কথা জান? তোমায় কে বল্লে?"

বিনা ভূমিকায় নীরদা বলিল, "সেদিন দুপুর বেলা মা জমীদার-বাড়ী গিয়েছিলেন। উনিই জমীদার-গিন্নীকে তোমার জন্য বলেন। তার পর আজ

সকালে এক পাইক এসে তোমাকে জমীদারের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বলে গেল, আর এই চিঠি দিয়া গেল।"

নীরদার হস্ত হইতে পত্র লইয়া যদুনাথ তাহা পড়িল, বলিল, "বটে! আমি দুই দিন বাড়ী নাই, আর ইতিমধ্যেই তোমরা স্বাধীন হয়ে পড়লে? যে চাকরী কর্ব্বে তার মতটা একবার জানবার জন্য অপেক্ষা না করেই জমীদারের বাড়ী গিয়ে দুঃখের গান গেয়ে এলে?"

তার পর এক দীর্ঘশ্বাস সহ সে বলিতে লাগিল, "তুমি না জানিতে পার, কিন্তু মা কি জানেন না যে, জমীদারের এক নায়েব আমাদের কি নিগ্রহ করেছিল? প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে এক হাকিম বেড়াতে আসেন। তাঁর কাছে সওগাৎ স্বরূপ আমার প্রিয় ছাগশিশুটিকে বাবা দিতে চাহেন নাই বলিয়া চোর অপবাদ দিয়ে জমীদারের নায়েব তাঁকে কাছারীতে চালান দেয়। বাবা আমার শুধু জলমাত্র পান করে তিন দিন আটক ছিলেন। তার পর আমি জমীদারের কাছে গিয়ে সেখান থেকে বাবাকে ছেড়ে দেবার হুকুম এনে যখন তাঁকে মুক্ত কল্লাম, তখন দেখলাম যে. অনাহারে ও অপমানে বৃদ্ধের অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, শেষ জীবনের সে অপমান তাঁহার মর্ম্মস্থানে দারুণ আঘাত করেছিল।" বলিতে বলিতে যদুর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, সে আর বলিতে পারিল না। অতীতের দুঃখভরা স্মৃতি তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতেছিল।

নীরদা কিন্তু এ চিন্তায় ব্যস্ত ছিল না। সে ভাবিতেছিল নায়েব-পত্নীর সুখ, নায়েব-গৃহিণীর মর্য্যাদা! সুদূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া সে যেন স্পষ্ট দেখিতেছিল তাহার অঙ্গ অলঙ্কারে ভরা, কটাহস্থিত ফুটন্ত দুগ্ধের মত তাহার সুখসৌভাগ্য উথলিয়া উঠিতেছে! ভবিষ্যতের এই মোহন চিত্র তাহার ক্ষুদ্র নারী-হৃদয়ে ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল—তাহার স্বামী-বর্ণিত অতীত দুঃখরাশির সাধ্য ছিল না যে, সে মানস প্রতিকৃতিকে বিকৃত করিয়া দেয়! ধীরে ধীরে সে উত্তর দিল, "আগেকার কথা ভেবে কেন এখন দুঃখ কর্চ্চ! বিশেষ জমীদার নিজে যখন তোমাদের প্রতি সে অত্যাচারের জন্য দায়ী নহেন! আর না হয় মনে কর না যে, জমীদার তোমাদের প্রতি সেই অতীতের নিজ দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করেই এখন এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করছেন।"

যদু উত্তর দিল, "জমীদার নিজে অত্যাচারী হয়ত না হইতে পারেন, কিন্তু

তিনি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রশ্রয় না দিলে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদের সাধ্য কি, যে নিরীহ প্রজাদের প্রতি উৎপীড়ন করে? না নীরদা, এ রকম চাকরী আমা'দ্বারা হবে না।"

এমন সময় যদুর মাতা আসিলেন, ও উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, "ভগবান এত দিনে মুখ তুলে চাইলেন বোধ হয়। যাও বাবা, শীঘ্র কিছু খেয়ে নিয়ে জমীদারের সঙ্গে দেখা করে এস।"

আরও ভগ্নোৎসাহ হইয়া যদু বলিল, "মা, পূর্ব্ব কথা কি তুমিও সব ভুলে গিয়েছ?"

"ভুল্‌বো কেন বাপ? কিন্তু কার ওপর রাগ কর্ব্ব? আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল তাই ভোগ করেছি। জমীদার-নায়েব তার নিমিত্ত মাত্র।"

"আমাকেও হয়ত ঐ রকম হ'তে হবে।"

"যদু, তুমি ভুল বুঝেছ। সে দুষ্ট ছিল বলে কি তুমিও দুষ্ট হবে? যদি তুমি সৎপথে থেকে নিজ কর্ত্তব্য কর্ত্তে পার, তাতে কি তুমি একটা গৌরব অনুভব কর্ব্বে না?" কাতর কণ্ঠে যদু জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তাহ'লে এই চাকৃরী গ্রহণ করাই তোমাদের একান্ত ইচ্ছা?"

"নিশ্চয়, এ দুঃসময়ে একমাত্র অভিমান-বশে এত বড় সংসারকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে রেখে দিও না! আর আমাদের কথা না শুনিস, তোর ঐ কচি মেয়েটার মুখপানে চেয়ে এ কাজে অমত করিস না, ওকে সুখে রাখাও কি তোর একটা কর্ত্তব্য নয়?" এক ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস যদুর অন্তস্তল হইতে ঝরিয়া পড়িল!

(২)

প্রথম প্রথম ভক্তি-নিদর্শন স্বরূপ প্রজারা টাকাটা সিকিটা দিতে আসিলে যদুনাথ তাহা ফিরাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তাহার নিম্নতন কর্ম্মচারীবর্গ ইহাতে বিপদ গণিল। তাহারা তখন এক বাক্যে পুনঃ পুনঃ তাহার কর্ণে ধ্বনিত করিতে লাগিল যে, সে তো আর বলপূর্ব্বক কিছু গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে যাহা প্রদান করিতেছে তাহা লইতে দোষ নাই। কিছুদিন এই ভাবে চাকরী করিয়া যদুনাথ দেখিল যে, সামান্য বিংশতি মুদ্রা মাহিনা হইতে পরিবারবর্গের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনই সম্ভব কিন্তু তাহাতে তো সুখে সংসার চলে না—দেনা শোধ হয় না—পত্নীর অঙ্গ অলঙ্কার-ভূষিত করা চলে না! কিন্তু যদি সে প্রজাদের স্বেচ্ছাদত্ত উপহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে হয়ত এক বৎসরের মধ্যেই সে তাহার সংসারের অর্থ[illegible]তা দূর করিতে পারে।

অন্ততঃ পৈতৃক দেনাটাও শোধ হয়। প্রায় দুই বৎসর হইল তাহার পিতা খৎ লিখিয়া শশী মহাজনের নিকট হইতে ৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। যদু তাহা শোধ করা দূরের কথা, বরং ছয় মাস পূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধের সময় তাহার নিকট হইতে আরও ত্রিংশ মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে। শশীও মহাজনী ব্যবসায়ে চুল পাকাইয়াছে। যদুর চাকুরী হইবামাত্র সে ক্রমাগত তাগাদা সুরু করিয়াছে। গত দুই মাসের মাহিনা পাইয়াও যদু তাহাকে কিছুমাত্র দিতে অক্ষম হওয়ায় সে এবার শাসাইয়া গিয়াছে যে, আগামী মাসে তাহাকে কিছু না দিলে সে জমীদারের নিকট গিয়া তাহার মাহিনা আটক করিবে।

সেদিন প্রাতঃকালে কাছারীতে বসিয়া যদু ঐ সম্বন্ধেই ভাবিতেছিল। এমন সময় দাশু কোটাল তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে এক প্রণাম করিল ও তাহার সম্মুখে একখানি দশ টাকার নোট রাখিল। যদু বিস্মিত নেত্রে তাহার প্রতি চাহিলে সে বিনীতস্বরে জানাইল যে, পরাণ মণ্ডল বলপূর্ব্বক তাহার জমীর ফসল কাটিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহাকে এ সম্বন্ধে একটা সুবিচার করিতে হইবে! যদুর বুকটা সহসা লাফাইয়া উঠিল! দশ দশটি টাকা! তাহার অর্দ্ধ মাসের পরিশ্রমের ফল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এক প্রবল বিপরীত বৃত্তি দেখা দিল। কে যেন তাহার মানসনেত্রে অতীতের একখানি বিষাদ-মলিন চিত্র তুলিয়া ধরিল, তার পর তাহার কর্ণে অস্ফুটস্বরে বলিল, মনে কর তোমার মাতার উপদেশ! মনে কর তোমার চাকুরী গ্রহণকালীন অবস্থা! তুমি ন্যায়পথে চলিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে, এই ধারণাতেই মাতা তোমায় এই কার্য্য গ্রহণে প্রোৎসাহিত করেন। আর সম্মুখের এই প্রলোভনে একবার মুগ্ধ হইলে ভূতপূর্ব্ব অত্যাচারী নায়েবের মতই তুমি হইবে—তোমার বিবেক, তোমার মনুষ্যত্ব সব অতলসাগরে তলাইয়া যাইবে! সঙ্গে সঙ্গে যদু বলিয়া উঠিল "না—ও পথে আমি চলিতে পারিব না। পরাণ মণ্ডল যদি বাস্তবিক দোষী হয়, আমি তাহার বিচার করিয়া দিব। টাকা তুমি নিয়ে যাও।"

দাশু কাতর কণ্ঠে আরও বিনীত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, পরাণই দোষী—ও জমী আমার—ধানও আমার। আর এটা আমি দিদিমণিকে সন্দেশ খেতে দিলাম। আপনি দয়া করুন—পরাণকে শায়েস্তা করে দিতে আজ্ঞা হোক্—আরও কিছু প্রণামী নিয়ে আমি হুজুরের চরণে হাজির হব।"

কৃষক ভাবিয়াছিল—এই সামান্য প্রণামী নায়েবের মনোমত হয় নাই।

যদুর মনে তখন দুইটি প্রবৃত্তির বিষম দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। এক দিকে শশীর

দেনা, অন্য দিকে মাতার উপদেশ—তাহাকে সত্যই বিচলিত করিয়া তুলিল। এ অযাচিত ভাবে দশ মুদ্রা দিতেছে, কাজ উদ্ধার হইলে কোন্ আরও দশ না দিবে। চিরদরিদ্র শত অভাবগ্রস্ত তাহার পক্ষে এ প্রলোভন তো সামান্য নহে! সে মনকে আঁখি ঠারিল—ভাবিল, টাকাটা লই—কিন্তু ন্যায় বিচার করিব—মাতার উপদেশটীও পালন করিব!

কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিত হস্তে সে ধীরে ধীরে টাকাটা গ্রহণ করিল। গ্রহণ কালে সে একবার বক্রদৃষ্টিতে দূরে উপবিষ্ট সহকারীদের প্রতি চাহিল—দেখিল যে তাহারা নিজ নিজ খাতার দিকে চাহিয়া আছে, তখন সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।

এই ঘুষ লওয়াই তাহার অধঃপতনের প্রথম সোপান। ক্রমে লোভ তাহাকে এমন অধিকার করিল যে, বৎসর না ঘুরিতেই নীরদার বাসনা পূর্ণ হইল। তাহার বেশভূষা, তাহার অলঙ্কার, তাহার সুখসৌভাগ্যের কথা, গ্রামের নারী সমাজে একটা বিলক্ষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। সে যাহা চাহিয়াছিল সবই পাইল। তাহার কন্যা সুশীলা এখন সর্ব্বদা দাসী-ক্রোড়ে থাকে। যদুর দূরসম্পর্কীয়া এক নারী রন্ধনশালার ভার লইয়াছে, সুতরাং তথাকথিত রাজরাণীর মত সুখে সে সংসার করিতেছে। যদুর মাতা কিন্তু পুত্রের এই হঠাৎ নবাবীতে মোটে সুখী হন নাই। প্রথম প্রথম মাতার তিরস্কার সত্ত্বেও যদু স্বীকার করিত যে, সে অবস্থাপন্ন প্রজাদের নিকট হইতে টাকাটা সিকিটা গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাতে মাতা অতিমাত্রায় বিরক্ত হন দেখিয়া, সে মাতাকে কোন কথা বলা ছাড়িয়া দিল। মাতার শত প্রশ্নের উত্তরে সে মৌন হইয়া থাকিত!

সেদিন যদুর মেজাজটা বড় মোলায়েম ছিল না। জমীদারের নিকট হইতে কড়া হুকুম আসিয়াছে যে, আশ্বিন মাসের মধ্যে যেন আশ্বিন-কিস্তির সমস্ত খাজনা আদায় করা হয়। এবার জমীদার-বাটী শারদীয় পূজার বেজায় ধূম। কলিকাতা হইতে থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদি আনা হইবে—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত এবার আনন্দে যোগদান করিতে পারেন। সুতরাং খাজনাটা খুব তাগিদ দিয়া আদায় করিতে হইবে। এদিকে প্রজাদের অবস্থাও যদুর অজ্ঞাত ছিল না। গত বৎসর দামোদরের বন্যায় সমস্ত 'আমন' ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবারও অনাবৃষ্টির জন্য আউস ধান্য মোটে জন্মায় নাই। এ অবস্থায় প্রজারা নিজেরাই বা কি খাইবে, কি লইয়াই বা আবার চাষ চালাইবে, আর কিসেই বা জমীদারের প্রাপ্য খাজনা দিবে! কিন্তু প্রজার অন্ন নাই বলিয়া তো আর জমীদারের বাটী আমোদ বন্ধ থাকিতে পারে না! সুতরাং খাজনা চাই-ই!

যদুও বেশ বুঝিয়াছিল যে, এবার মনিবকে খুসী করিতে পারিলে তাহার বেতনবৃদ্ধি নিশ্চয়। সে সংবাদ রাখিত যে, এবার এখনও কোন মহলের পূর্ণ খাজানা জমীদার পান নাই। তাই কি নিয়মে, কতটা কঠোরতা অবলম্বন করিলে তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, সে দুই দিন হইতে সেই চিন্তায় বিভোর ছিল।

আহার কালে যদুর মাতা বলিলেন, "যদু, হরিশ ভট্‌চাজ তোকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিল—দুপুরবেলা তার কাছে একবার যাস্।"

যদু চটিল, ভাবিল, ডাক্‌তে পাঠিয়েছিল? সামান্য হরিশ ভট্‌চাজের এত তেজ যে, সে সদর নায়েবকে ডাক্‌তে পাঠায়? সে সক্রোধে উত্তর দিল, "কেন? তার কি দরকার? সে নিজে আস্‌তে পারে না?"

মাতা বলিলেন, "সে কি রে? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোকে ডেকেছে, তা'তে দোষ কি হয়েছে?"

যদু। দোষ কি তা' তুমি কি বুঝিবে? আমি কি তার চাকর যে ডাক্‌লেই হাজির হব? আমার এখন সময় নাই।

মাতা। সে বল্‌ছিল যে, এ সনের খাজনাটা সে এখন দিতে পার্ব্বে না। তুই যদি জমীদারকে বলে দিস, তাহ'লে সে রেহাই পায়।

যদু। হুঁঃ, আমি তা' অনেকক্ষণ বুঝেছি।

মাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈকালে যাবি ত?"

যদু উত্তর দিল, "দেখা যাবে"।

(৩)

অপরাহ্নে নিদ্রাভঙ্গের পর হরিশ ভট্টাচার্য্য ডাকিবামাত্র তাঁহার পৌত্র অবনী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সংসারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর কোনও বন্ধন ছিল না। সাত বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চমবর্ষীয় অবনীভূষণকে রাখিয়া বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র সংসারযাত্রা শেষ করে, আর ছয় মাস মধ্যেই সাধ্বী পুত্রবধূও স্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করে। জীবনসন্ধ্যায় উপর্য্যোপরি এই দুই শোক পাইয়া বৃদ্ধ তাহার সাধের পৌত্রটিকে সংসারের একমাত্র অবলম্বনরূপে জড়াইয়া ছিলেন। তিনি ক্ষণেকের জন্য পিতৃ মাতৃহীন বালককে চক্ষের অন্তরাল করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। আর বালকও সত্যই ভালবাসিবার মত ছিল। তাহার হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্য ভরা দেহ, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, উজ্জ্বল কৃষ্ণতর নয়ন ও সরল মুখখানি দেখিলে সকলেরই ইচ্ছা হইত যে, তাহাকে একটু আদর করে।

পৌত্রকে মৌন থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া, জলখাবার খেয়েছ? হঠাৎ এমন গম্ভীর কেন হে?"

কোন উত্তর না পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন অসুখ করে নাই ত?" পৌত্র শিরঃসঞ্চালন করিলে, তিনি বলিলেন, "তবে হোল কি? কি চাই?" অবনীভূষণ দূর হইতে বলিল, "ও বাড়ীর শ্যামের বাবা আজ কলিকাতা থেকে এসেছে—শ্যামেদের জন্যে কেমন পোষাক এনেছে।"

"তোমার একটা পোষাক চাই?" বালক উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "হাঁ"।

হা ভগবন! যাহাদের কামনা পুরাইবার সামর্থ্য দাও নাই, সেই হতভাগ্যদিগকে কেন রাশি রাশি কামনা দিয়া অশান্তির সাগরে নিক্ষেপ কর? যাহাকে দু'বেলা শুধু ভাত খাওয়াইতে পারি না, নিজে অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও যাহার নিত্য প্রয়োজনীয় জামা কাপড়ের সংস্থান করিতে পারি না, সে কাহার প্ররোচনায় তাহার ধনী প্রতিবাসীর সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে! বৃদ্ধ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বালককে মিথ্যা প্রবোধ দিব? না—তাহা অসম্ভব। এই বয়স হইতে মিথ্যা আশায় নির্ভর করিয়া শুধু বুকপোরা অশান্তি টানিয়া আনা অপেক্ষা নিজ সত্য অবস্থা জানা ভাল। বৃদ্ধ আবার ভাবিলেন, কিন্তু তাহা হইলে বেচারীর সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় ঢল ঢল মুখখানি যে ম্লান হইয়া যাইবে! এই কয়দিন উমারাণীর পদার্পণ মাত্র বঙ্গের প্রাসাদবাসী ধনী হইতে কুটিরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলে আনন্দোৎসবে মাতিবে, আর তাঁহার সাধের পৌত্র ক্ষুন্নপ্রাণে এই নিরানন্দময় কুটিরে বসিয়া থাকিবে!

বৃদ্ধের মনে পড়িল এ বাড়ী চিরদিনই এমন নিরানন্দ ভরা ছিল না। এককালে তাঁহার কর্ম্মঠ পুত্র এমন সময় বাটী আসিয়া নানা দ্রব্যসম্ভারে তাঁহার প্রাণে আনন্দের উৎস বহাইত—তখন যে জগন্মাতার হাস্যকণা এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ আলোকিত করিত! হায়! সে এখন শুধু অতীতের স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বৃদ্ধ উঠিয়া ধীরে ধীরে পৌত্রের মাথায় হাত দিলেন। অবনী দেখিল, তাহার দাদার লোল গণ্ড বহিয়া মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে ছলছল নেত্রে বলিল, "না দাদা, আমি পোষাক চাই না।"

দাদার শোকরাশি আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

হায় মা! তোমার আগমনে দরিদ্র বাঙ্গালীর আজ এত কষ্ট!

শোকবেগ সংবরণ করিয়া বৃদ্ধ পৌত্রকে বলিলেন, "তোমার পূজার পোষাকের

কথা আমার মনে আছে। সেই জন্যই আমি আজ যদুর কাছে গিয়াছিলাম—দেখি যদি সে খাজনাটা এবার রেহাই দেয়, তাহা হইলে—”

সহসা বাহির হইতে কে ডাকিল—“ঠাকুর মশাই, কপাট খুলুন।”

অবনী দ্বার-উন্মোচন করিলে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, জমীদার-পাইক উপস্থিত। সে বিনা ভূমিকায় জানাইল যে, ঠাকুর মশায়ের নিকট হইতে দু'সনের খাজনা পাওয়া যায় নাই—এই মাসের মধ্যে তাহা যেন মিটাইয়া দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “কেন, আমি সকালে যদুর মাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, এখন আমি কিছু দিতে পারিব না।”

পাইক জানাইল যে, ওকথা সে জানে না। বৈকালে নায়েব মশাই তাহাদিগকে এই কড়া হুকুম দিয়াছেন যে, এবার কাহারও নিকট কিছু বাকী থাকিবে না—সমস্ত আদায় হওয়া চাই।

ব্রাহ্মণ হতাশ নয়নে অবনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দাও ভাই আমার উড়ানী খানা দাও, একবার কাছারী দিয়ে ঘুরে আসি।”

(৪)

কাছারীতে আসিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিলেন যে, এখনকার জমীদার-নায়েব যদুনাথ সরকার আর পূর্ব্বের সেই যদুনাথে বিস্তর প্রভেদ। তখন তাহাকে দেখিলে যদুর পিতা পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া আসিত—অতিমাত্র আগ্রহ সহকারে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিত, আর এখন ব্রাহ্মণ নজর আনেন নাই শ্রবণে গোমস্তারা তাঁহাকে যদুর নিকট পৌঁছাইতে দিল না। অনেকক্ষণ বৃথা অপেক্ষার পর বৃদ্ধ সেদিন ফিরিয়া আসিলেন। যদি বালক অবনীকে দেখিলে দয়া হয়, এই বিবেচনায় পরদিন তিনি পৌত্রসহ কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন ভিড় কম ছিল। শীঘ্রই যদুনাথের সাক্ষাৎ মিলিল।

যদুনাথ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া শুধু একটা শুষ্ক প্রণাম করিল, তাহাকে বসিতেও বলিল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে কাছারীবাড়ীর ভীড় কমিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, “বাবা আমাকে ডাকিয়েছিলে কেন?”

যদু। ওঃ আপনি এখনো আছেন? হাঁ, আপনার খাজনা বাকী কেন?

ব্রাহ্মণ। তোমার মাতা আমার কথা তোমায় বলেন নাই?

যদু চটিল, বলিল, “বিষয় কর্ম্মে স্ত্রীলোকের কথায় কি কাজ হয়? তা আপনি কি বল্‌তে চান?”

ব্রাহ্মণ। বাবা, এ কিস্তির খাজনা যে আমি কিছুতেই জোগাড় কর্ত্তে পাচ্ছি না—আর আমার অবস্থা তো তোমরা সবই জান!

যদু। অবস্থা দেখে যদি খাজনা আদায় কর্ত্তে হয়, তাহ'লে জমীদারকে তো ঘর থেকেই খাজনা গুন্‌তে হয়! আর আপনার কয়েক বিঘা লাখরাজ জমীও তো আছে।

ব্রাহ্মণ। এ বৃদ্ধের চাষ কে দেখ্‌ছে বাবা—পাঁচজনে যা এনে দেয় তাই তো আমায় নিতে হয়!

যদু। আপনার সঙ্গে বক্‌বার সময় আমার নাই। আপনি টাকার একটা ব্যবস্থা করুন। এ' আশ্বিন কিস্তীর খাজনা যথাকালে জমীদারকে এবার দিতেই হইবে।

ব্রাহ্মণ অনেক মিনতি করিলেন, যদু কিন্তু অটল। তাহার খাজনা চাই—তাহার চাকুরী বজায় থাকিলে তবে সে দয়া মায়া দেখাইতে পারে, নচেৎ নহে। আর এক জনকে দয়া দেখাইলে সকলেই আসিয়া কাঁদিবে—সুতরাং তখন অযোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া জমিদার-বাড়ী হইতে তাহার অন্ন ঘুচিবে।

অবশেষে ব্রাহ্মণ স্বীয় অন্তরালে অবস্থিত অবনীকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার প্রতি দয়া না কর, এই পিতৃমাতৃহীন বালকের মুখ চেয়ে এবার আমায় রেহাই দাও!"

অবনীর শ্রমক্লিষ্ট ঈষৎ ম্লান মুখখানি দেখিয়া যদুর মনে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ঐ সুন্দর মুখখানিকে সে পূর্ব্বে আদর করিয়া কতবার বক্ষে ধরিয়াছে! তাহার ইচ্ছা হইল, পূর্ব্বের মত বালককে ক্রোড়ে টানিয়া লয়—তাহার ম্লানমুখে হাসি আসুক—বৃদ্ধকে রেহাই দেয়! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই উজ্জ্বল আলোকদামভূষিত হাস্যকোলাহলমুখরিত জমীদার-ভবন তাহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিল—জমীদারের হাসিমাখা মুখ তাহার মনে জাগিল—সে বুঝিল যে, এইরূপ দয়া দেখাইলে সে আলো তাহার চক্ষে অন্ধকার ঢালিয়া দিবে, সে হাসি তাহার সম্মুখে রোষে পরিণত হইবে। আবার এদিকে গৃহিণী জড়োয়া চুরীর ফরমাইস দিয়াছেন, তাহাও কল্পনায় থাকিয়া যাইবে।

সাত পাঁচ ভাবিয়া যদু রাশভারি করিয়া জানাইল, "কি করি বলুন। মনিবের হুকুম আমার সাধ্য কি যে অমান্য করি। আচ্ছা, আপনাকে আমি এক সপ্তাহ সময় দিলাম, যেমন করে হোক, টাকাটা দিয়ে যাবেন।"

ভগ্ন-হৃদয়ে বৃদ্ধ কুটিরে ফিরিল।

যদু সেদিন গৃহে ফিরিতেই তাহার মাতা করুণ ও বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁরে, তোর হল কি? টাকাটাই কি এত বড়?"

যদু। কেন, কি হয়েছে?

"কি হয়েছে? ইচ্ছে কর্লে কি ভট্চাজ্দের খাজনাটা এবার রেহাই দিতে পার্তিস না? তুই কি নিজের আগেকার অবস্থা ভুলে গিয়েছিস্? তুই কি জানিস্ না, বামুন কি করে দিন কাটায়। মোটে বিঘে দশেক জমী ওর সম্বল। তাতে ফসল না হলে ও খাজনা দেবে কোথা থেকে?"

যদুকে পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, "আমার নিজের তো আর জমীদারী নয় যে, ইচ্ছে হলেও খাজনা ছেড়ে দোব। মনিবের হুকুম আমায় তামিল কর্ত্তেই হবে "

মাতা। জমীদারও তো মানুষ। তাকে তুই বুঝিয়ে বল্লে সে কি আর দু'মাস খাজনা ফেলে রাখ্তে পার্ত্ত না?

যদু। মা! এই জন্যেই আমি এ চাকরী কর্ত্তে প্রথমে রাজী হই নাই। তখন তোমরাই জোর করে আমায় এ কাজ কর্ত্তে বলেছিলে।

মাতা। আমি তখন কি করে বুঝ্বো যে, আমার শিবের মত ছেলে পয়সার লোভে বাঁদর হয়ে যাবে, পয়সার লোভে ব্রহ্মশাপ কুড়োবে?

যদু। ব্রহ্মশাপ? আচ্ছা, আমি তাকে সিধে করে দিচ্ছি। আমি দয়া করে তা'কে সাত দিন সময় দিলাম, আর সে আমায় গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্চে?

মাতা। গালাগালি দেওয়া হরিশ ভট্টাচার্য্যের স্বভাব নয়। আর শুধু গালাগালি দিলেই কি অভিসম্পাৎ করা হয়? অমন ব্রাহ্মণের এক ফোঁটা চক্ষের জলে আমাদের সোণার সংসারে আগুন লেগে যেতে পারে রে।

তিনি আর পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন না।

(৫)

সেদিন যদুনাথের মানসিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। তাহার একমাত্র কন্যা সুশীলা সাত আট দিন হইতে রক্ত আমাশয়ে কষ্ট পাইতেছে—কোন প্রকার ঔষধাদি দ্বারা কিছুতেই রোগ কমিতেছে না—বালিকা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এই কারণ সেদিন যদুনাথ তাড়াতাড়ি কাছারীর কাজ শেষ করিয়া বাটী ফিরিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কাছারীর দ্বারের নিকট আসিবামাত্র সে দেখিল, বালক অবনীভূষণ শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া আছে। বালক তাহাকে দেখিয়া দুই পদ অগ্রসর হইল ও দুইটি মুদ্রা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "দাদা এই টাকা আপনাকে দিতে বলেছেন। তাঁর অসুখ—নইলে তিনি নিজে এসে—"

বলিতে বলিতে বালকের স্বর ভগ্ন হইল, তাহার বড় বড় আরক্ত চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। যদু তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদ্‌ছো কেন অবনি! তোমার দাদার অসুখ কি খুব বেশী? ডাক্তার দেখ্‌ছে?"

সজলনেত্র বামহস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিয়া ভগ্নস্বরে মাটি পানে চাহিয়া বালক ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিল, পরে বলিল, "দাদা দুই দিন কিছু খান নাই।"

সহসা কে যেন যদুর বক্ষে লৌহের হাতুড়ি পিটিল। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। তবে তাহার মাতার কথাই সত্য? ব্রাহ্মণ কি সত্যই এমন দুর্দ্দশাপন্ন? আর সে এই দুই বৎসরে এমন একটা নির্ম্মম হৃদয়হীন দানবে পরিণত হইয়াছে যে, এই ভিক্ষুকসম সম্বলহীন পরিবারের দুঃখে সে মোটে কাতর হয় নাই? তাহার অত্যাচারে এক বৃদ্ধ অনাহার সম্বল করিয়াও খাজনার সংস্থান করিতেছে!

এই সদ্যস্ফুট গোলাপের সুদর্শন বালকটিও কি অনাহারে আছে? এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। মাতালের ন্যায় জড়িতস্বরে সে শুধু বলিল, "চল, তোমার দাদাকে দেখে আসি।"

তাহার তখন মনে শুধু জাগিতেছিল যে, বুঝি এই পাপের জন্য তাহার একমাত্র কন্যা এত কষ্ট পাইতেছে! তাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে একটা অব্যক্ত হাহাকার সবেগে ঠেলিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল।

বৃদ্ধের কুটিরে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল—অনিল তাহাকে দেখাইল—তাহার দাদা থালা ঘটি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া দুইটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। নায়েব আট দিন সময় দিয়াছিল, সেই আট দিনের মধ্যেই বৃদ্ধ সম্মুখে অনাহারকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াও ঐ টাকা জোগাড় করিয়াছে। এই মনোবেদনাই বৃদ্ধের অসুখের প্রধান কারণ। দুই দিন হইতে বৃদ্ধের ঘরে আহার্য্যের অনাটন পড়িয়াছে, তাই পৌত্রকে তিনি গ্রামের ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ আনিয়া খাওয়াইয়াছেন, তবে আজ আর উঠিবার সামর্থ্য ছিল না বলিয়া অবনীকে তিনি খাওয়াইয়া আনিতে পারেন নাই।

যদু আর শুনিতে পারিল না। ভট্টাচার্য্যের পদতলে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, 'জ্যাঠামশায়!' এই আহ্বানে সহসা ব্রাহ্মণের জরাতুর দেহ কাঁপিয়া উঠিল। অবসন্ন নয়নে জড়িতস্বরে তিনি বলিলেন, "কে যদু! এস বাবা! তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম! বাবা! অনিলকে তোমারি যতীনদাদার অভাগা

ছেলেকে দেখো! তা'র তোমরা ছাড়া আর কেউ রইলো না।" বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষু হইতে তুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। যতুর হৃদয়ে তখন ঝড় বহিতেছিল। সে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া বলিল, "আমি পিশাচ! আমিই আপনার এই তুর্দ্দশা করেছি!"

ব্রাহ্মণ। তুমি কিছু কর নাই! আপনার জন কখন কি পর হয়? আজ তুমি দেশের মধ্যে প্রধান শক্তিশালী হলেও আমি তোমায় যতীনের ছোট ভাই বলেই জানি, তাই আজ অনিলকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

যতুর চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিল—রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "আমায় মাপ করুন। অর্থলোভই আমায় দানব করে তুলেছে। নইলে আপনি তো জানেন, আমি আগে এমন ছিলাম না—আমায় মাপ করুন।"

অনশন-তুর্ব্বল কম্পিতহস্ত ভূলুণ্ঠিত যতুর মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, 'তোমার দোষ কি বাবা! এ আমারই কর্ম্মফল!'

হায়! এই উদার সাত্বিক বৃদ্ধকে সে অনাহারে হত্যা করিতেছিল! তাহার মনে পড়িল তাহার বৃদ্ধ পিতাও একদিন অত্যাচারীর নির্ম্মম পীড়নে এই ভাবে কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হইয়াও সেই নরকের দৃশ্য সম্মুখে দেখিয়াও তাহার শিক্ষালাভ হয় নাই! ধিক তাহাকে!

সে বৃদ্ধের পদতলে বসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে দাসত্ব মনে প্রবল অর্থলিপ্সা আনয়ন করে—মানবকে দানবে পরিণত করে,—সে দাসত্ব সে করিবে না। প্রকাশ্যে বলিল, "জ্যাঠামশাই, আজ থেকে এ কয় দিন অবনীর আমার ওখানে নিমন্ত্রণ। আজ আপনার জন্য ঠাকুরের ভোগ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি, কাল থেকে আপনিও আমার ওখানে সেবা নেবেন।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিলেন, "অবনীকে শীঘ্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, ওকে না দেখ্‌লে আমার কষ্ট হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া যতু বলিল, "না, কিছু দিন ও আমার কাছে থাক্। ও আমায় এক ভয়ানক পাপ থেকে বাঁচিয়েছে। ঐ বালকের কাছে আমি চিরঋণী। ওর স্পর্শে আমার এ অর্থমোহ শীঘ্র কেটে যেতে পারে।"

গৃহে আসিয়া যখন সে শুনিল যে, সুশীলা একটু ভাল আছে, তখন সে সত্যই একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতাকে বলিল, "আমার মন বড় তুর্ব্বল। ও নায়েবী কাজ আমা দ্বারা হবে না। যখন প্রলোভন জয় কর্ত্তে পার্ব্ব না, তখন ওর সংশ্রবত্যাগ করাই শ্রেয়।"

বৈষ্ণব-কবিতার বৈচিত্র্য।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং সদা বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

বৈষ্ণব-কবিতার সর্ব্বাংশেই বৈচিত্র্য। একজন খ্যাতনামা লেখক বলিয়াছেন,—"আমরা এই মোটা কথা বুঝি যে, ন্যাংড়া আম ও রসগোল্লা এই উভয়ের যেমন তুলনায় সমালোচনা চলে না, সেইরূপ বৈষ্ণব-কবিতার সঙ্গে অন্য কোনও কবিতার তুলনা হয় না। একজাতীয় বস্তু না হইলে তুলনা কি করিয়া করিবে? বৈষ্ণব-কবিতা যে একান্তই ভিন্নজাতীয়। কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, নবীন, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র কাহারও সহিতই ইহার মেলবন্ধন নাই। বৈষ্ণব-কবিতা একাই এক। যদি ইচ্ছা কর, তবে বলিতে পার যে, কাব্যরাজ্যে বৈষ্ণব-কবিতা একান্তই একঘরে।"

ভাব-বিহ্বল সুকণ্ঠ গায়ক যখন 'আখর' দিয়া দিয়া গায়,—

"সই নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম বঁধু বিনু না রহে মোর তনু
সোয়াস্ত নাহিক রাতি দিনে॥
ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে
পুন দেই সিঁথায় সিন্দূর।
তাম্বুল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে
কত গুণ কহিব বঁধুর॥
ঝাড়িয়া বান্ধয়ে চুল বেড়িয়া মালতী ফুল
বসন পরাই আমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ না জানি কি পায় সুখ
রসের আবেশে করে বুকে॥
হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহু থরহরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবা কতি
ধরণী স্থির নাহি বান্ধে॥"

তখন ভক্ত সহৃদয়গণের বক্ষঃস্থল, অজস্র অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া যায়।

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ॥"

ইত্যাদি "উত্তর-চরিতে"র কবিতা পাঠ করিলে চিত্তে আনন্দের উদয় হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কাহারও চোখে জল আসে না। 'মাথুর' শুনিয়া চোখে জল আসা খুব অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু 'অভিসারে'র পদাবলী শুনিয়া ভাবুক শ্রোতা যে 'হরি' 'হরি' বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, এ বৈচিত্র্য আর কোনও কবিতায় আছে কি ?

বৈষ্ণব-কবিতায় প্রেমের চিত্রও বিচিত্র। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতায় সখীদিগকে বলিতেছেন,—

"তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি কালিয়া-বরণ॥
কেশ আউলাইয়া কেশ বনাইতে
হাত নাহি সরে বান্ধি।
সে কালার ভরমে কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কান্দি॥"

"সই, তোমরা আমাকে ধর্ম্মের কথা আর কি বুঝাইবে ? আমি শয়নে স্বপনে কেবল সেই কালার রূপই চক্ষে দেখি। আমি যখন কেশরাশি আলুলিত করিয়া বেশ বানাইতে যাই, তখন আমার বেণী বাঁধিতে হাত সরে না,—আমি কৃষ্ণভ্রমে সেই কেশগুচ্ছ কোলে করিয়া 'কালা' 'কালা' করিয়া কাঁদিয়া উঠি।"

রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমও যে কত গভীর, রাধা তাহা নিজের মুখেই বলিতেছেন,—

"যব দেখাদেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥'
"হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই, সে জন মানুষ নয়।"

রাধা তাঁহার প্রিয়তমকে মানুষ বলিয়া মনে করেন নাই, তাই তিনি প্রেমের কঠোর সাধনায় কৃষ্ণকে পাইয়া ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। যাহার নয়ন মন

প্রেমের অমৃতসেকে ভরিয়া গিয়াছে, সে-ই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অবাঙ্মনসগোচর ভগবান্‌কে পাইতে পারে এবং সেই ভুবনমোহন নায়ককে হিয়ার মাঝারে লুকাইয়া রাখিয়া ভব-নদী পার হইতে সমর্থ হয়। চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পীরিতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥"
"সে কেমন যুবতি কুলবতী সতী
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে নায়কে লুকাইয়া
ভবনদী হয় পার॥"

ললিতা আসিয়া রাধাকে বলিলেন, "শ্যাম, আমাদিগকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইবেন।" শ্রীমতী রাধিকা এ কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "সই, শ্যাম আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইবেন, এ যে নূতন কথা,—এমন কথা ত কখনও শুনি নাই। আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রেম-শয্যায় হৃদয়েশ্বর ঘুমাইয়া আছেন, তিনি কোন্ পথে পালাইবেন? আমি বুক চিরিয়া বাহির করিয়া দিব, তবে ত শ্যাম মথুরায় যাইতে পারিবেন।"

"ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়ে শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছান হ'য়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে র'য়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বন্ধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥"

প্রেমের এমন পবিত্র চিত্র, বৈষ্ণব-কবিতা ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় কি? বৈষ্ণব কবির রাধা তাহার প্রিয়তমকে সামান্য মানুষ ভাবিয়া প্রাণ মন সমর্পণ করে নাই, সে বেশ জানিত,—তাহার হৃদয়স্বামী অখিলের নাথ—

যোগীর আরাধ্য ধন। ইহা জানিত বলিয়াই রাধা ইচ্ছা করিয়াই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। রাধা তাহার প্রাণনাথকে জগতের নাথ বলিয়া জানিত, তা'ই সে কুল, শীল, জাতি, মান সব বিসর্জ্জন দিয়া তাহার প্রাণাধিক কৃষ্ণের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥"

বৈষ্ণব-কবিতার অক্ষরে অক্ষরে গভীর সাধন-তত্ত্ব প্রকটিত। বৈষ্ণব-কবিতায় প্রেম পূজা হইতে বিভিন্ন নহে। শাস্ত্রে আছে, সাধক নিজেকে এবং সমস্ত পূজোপকরণকে অভীষ্ট দেবতারূপে চিন্তা করিবে।

"অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ।
সেবাধারো হ্যহং দেবো দেবং দেবায় যোজয়েৎ॥"

বৈষ্ণব-কবিতায় আমরা স্পষ্টই এই সাধন তত্ত্ব দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের রাধা, তাঁহার প্রেমাস্পদের নিকটে নিবেদন করিতেছেন,—

"কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥”

ভক্ত ঋষিবৃন্দ, ভগবান্‌কে পতি ভাবে পাইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, আনন্দ-ঘন লীলাময় ভগবান্, তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তচূড়ামণি রাধিকা, তাই শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ সার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-কবির রাধিকা তাঁহার অভীষ্ট দেবতাকে বলিতেছেন,—

“বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥”

বৈষ্ণব-কবিতায় অনেক রুচিবাগীশ, কামের গন্ধ পাইয়া শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু যে বৈষ্ণব-কবিরা—

“যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বান্দা তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত ত্যজি কিয়ে হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদ হি ভেলি॥
ভনহু বিদ্যাপতি সেহ মনে গুণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥”

এই ভাবে সংসারের ভীষণতা স্মরণ করিয়া চিত্তকে বৈরাগ্যময় করিতে পারেন, তাঁহারা কি কামশাস্ত্র রচিয়াছেন? যে বৈষ্ণব কবিরা আকুলভাবে ভগবান্‌কে

বলিয়াছেন,—উত্তপ্ত বালুকারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় স্ত্রী পুত্র মিত্র, অচির-স্থায়ী। হে মাধব, আমি তোমাকে বিস্মৃত হইয়া সেই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুতেই মন সমর্পণ করিয়াছি। এখন আমার দ্বারা কোন্ কাজ হইবে?—আমি ত পরিণাম সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। তবে এক ভরসা—তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা এবং দীনদয়াময়। হে প্রভো—

"আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারণ ভার তোহারা॥"

তাঁহারা যে কৃষ্ণলীলার নাম করিয়া কাম-কলার সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা বলা দুঃসাহস ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাসলীলার বর্ণন করিয়া জন্মযোগী শুকদেব, মরণ-প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন,—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

"ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই লীলার কথা শ্রদ্ধাপূত হইয়া যে শ্রবণ করে অথবা বর্ণন করে, সে সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণের উপর পরাভক্তি লাভ করিয়া অচিরকাল মধ্যেই স্থিরবুদ্ধি হয় এবং তৎক্ষণাৎ হৃদ্রোগ কামকে দূরীভূত করিতে পারে।"

যে রাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিলে হৃদ্রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয়, সেই লীলা-কথায় পরিপূর্ণ বৈষ্ণব-কবিতায় যাঁহারা অশ্লীলতা দেখিতে পান, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করে,—

"অতিরমণীয়ে বপুষি ব্রণমেব হি মক্ষিকানিকরঃ।"

যাঁহারা একটু ভাবুক, তাঁহারা বৈষ্ণব-কবিতায় উপনিষদের নিগূঢ় রহস্য অনুভব করিয়া আনন্দে পুলকিত হইবেন। রাধা, তাঁহার অভীষ্ট দেবকে বলিতেছেন,—

"না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥"

হেমকান্তি ভগবান্‌কে দর্শন করিলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই যে ছুটিয়া যায়, এ কথা শ্রুতিই বলিয়াছেন,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

ভগবান্ যে বিশ্বরূপ—তিনি যে একই সময়ে বিভিন্নরুচি ব্যক্তিগণের নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন—যে, যে ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়াছে, সে যে সে-ই ভাবেই ভগবান্‌কে দর্শন করে, ইহা "ভাগবতে" বর্ণিত হইয়াছে,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

এই শ্লোকেরই বিশ্লেষণরূপে নন্দ যশোদার বাৎসল্য, রাখাল বালকগণের সখ্য ও গোপীগণের প্রেম—এই ত্রিবিধ রসের সর্ব্বাতিশায়ী বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ কাব্য রচিয়াছেন। "স্বপিত্রোঃ শিশুঃ"—এই ভাব ফুটাইবার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে ভাবুকের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণ দুধের বালক। রাণী পরিধান-বসনে শ্রীকৃষ্ণের মুখ মুছাইয়া দেন, কোলে করিয়া হাওয়া করেন;—তাঁহার কাছে যে শ্রীকৃষ্ণ আঁচল-ধরা শিশু।—

"পিন্ধন বসনে রাণী মুখানি মুছা অই
বীজন করয়ে মুখ-ইন্দু।"

শ্রীকৃষ্ণও মায়ের সহিত প্রকৃত শিশুটীর মতই ব্যবহার করেন। মাকে না বলিয়া—মায়ের অনুমতি না লইয়া তিনি সঙ্গিগণের শত অনুরোধেও গোষ্ঠে যাইতে পারেন না। শ্রীদাম যখন গোষ্ঠে যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন কৃষ্ণ বলিলেন,—

"কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বান্ধি ধড়া পরি বসি রয়াছি॥
মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে॥"

তখন শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম প্রভৃতি—

"গেল সবে যশোদা-নিকটে।
প্রণতি করিয়া মায় কহিছে রাখাল রায়
কানুরে লইয়া যাব গোঠে॥"

রাখাল বালকগণের কথা শুনিয়া নন্দরাণী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কেন না,—

"বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে শতবার খায়।"

এ-হেন দুধের বালককে মা কি প্রাণ ধরিয়া গোচারণের জন্য মাঠে পাঠাইতে পারেন? তাঁহার প্রাণে কত ভয়, কত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। তখন মা যশোদাকে বুঝাইবার জন্য—

"শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগো নন্দরাণী,
নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী
ধেনু-বৎস চরাই কাননে॥

* * * *

"এ দাস শ্রীদামে কয় মা তুমি না কর ভয়,
কানু পেলে যত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায় বসিয়া মুরলী বায়
মোরা সবে ধবলী চরাই॥"

রাখাল বালকগণের এইরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যশোদা বলরামের হাতে তাঁহার দুধের গোপালকে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন,—

"হের, আয় রে বলরাম হাথ দে মায়ের মাথে।
ধড় রাখিয়ে প্রাণটী আমি দিলাম তোমার হাথে॥

* * * *

"যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে।
বেলা অবসান হৈলে সকলে আসিবে।"

বলরামকে এইরূপ উপদেশ দিয়া যশোদা কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন,—

"আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যাইহ সঙ্গছাড়া না হইহ,
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চায়্যা খাইও পথপানে চায়্যা যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারো বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাথ তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।"

যশোদা জানেন, তাঁহার কৃষ্ণ, দুধের ছেলে, তাহার কি গরু লইয়া মাঠে যাইবার মতন বয়স হইয়াছে। তা'ই তিনি কৃষ্ণ বলরামকে নানারূপে সাবধান করিয়া দিলেন—কৃষ্ণকে সকলের মাঝখানে থাকিবার উপদেশ করিলেন।

যশোদা ত কৃষ্ণকে দুধের বালক ভাবেন, কিন্তু রাখাল বালকগণ তাঁহাকে নিজেদের রক্ষক মনে করেন। তা'ই যশোদা কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাইতে অনুমতি করিলে ব্রজবালকবৃন্দ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহারা সকলে ধড়া চূড়া পরিয়া বেণু বাজাইয়া গোধন চরাইতে গোষ্ঠে চলিল। বৈষ্ণব কবিগণ, এই সখ্য রসের কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন,—

"প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর-রেণু,
সুর নর হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে যায় ব্রজবাল,
হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম,
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
কেহ যায় বৃষছান্দে কেহ কার চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥"

এই ভাবে গোপবালকগণ যখন গোষ্ঠে চলিলেন, তখন সেই একই কৃষ্ণকে ব্রজবধূরা চিত্তচোর নাগর মনে করিলেন। তাঁহারা অট্টালিকার উপর হইতে কৃষ্ণকে অনিমেষ নয়নে দেখিয়া প্রেমরসে বিভোর হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,—

"আনন্দ কো কহু ওর।
রসবতী ঠাড়ে অট্টালিকা উপরি
হেরইতে দুহুঁ দিঠি লুবধ চকোর॥
নয়নে নয়নে কত প্রেম রস উপজত
দুহুঁ মন দৈভে গেল ভোর।
প্রেম রতন ধন দোঁহে দুঁহা পিয়াওল
দুঁহু চিত দুঁহু কর চোর॥"

রত্ন অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে কৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন রূপ দেখিতে দেখিতে রাধিকার চরণ নিশ্চল হইয়া গেল;—

"রতন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হেরি অচল পদ পাণি।
রসিক জন মানসে হরি গুণ সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর বাণী॥"

তখন রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিবিনিময় হইল—উভয়েই উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সেই সুন্দর শ্রীমুখমণ্ডল দেখিয়া ব্যথিত রাধার মনে হইল, এ-হেন ধন বনে পাঠাইতে যশোদার মাতৃহৃদয়ে কি একটুও কষ্ট হইল না!—

"গবাক্ষে বদন দিয়ে প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে নয়ন মিলিল,
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ মণ্ডল সুন্দর
ব্যথিত হইলা রাধা।
এ হেন সম্পদ্ বনে পাঠাইতে
তিলেকৈ না করে বাধা॥"

আমাদের বৈষ্ণব কবিগণ, এই ভাবে বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য-রসের চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাবুক ভক্তগণ, বৈষ্ণব কবিতায় অনাবিল রসের আস্বাদন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন। ভক্তের হৃদয়ে ব্যাকুল ভাব সঞ্চার করিতে পারে বলিয়া—আনন্দঘন ভগবানের একটী অপরূপ মূর্ত্তি

মানস-নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে বলিয়াই বৈষ্ণব-কবিতার বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের জন্যই বৈষ্ণব-কবিতা কাব্য-জগতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তা'র পর ছন্দঃ ও অলঙ্কারের সম্পদে বৈষ্ণব-কবিতা কোনও কাব্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। পরবর্ত্তী অনেক কবিরাই বৈষ্ণব-কবিতার ছন্দঃ গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিতায় অলঙ্কারের মাধুর্য্য বুঝাইবার জন্য আমরা দুইটীমাত্র রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিব।—

"সুন্দর বদনে   সিন্দূর বিন্দু
শাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী   সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার।"

রাধিকার সুন্দর বদনে সিন্দূরবিন্দু, পশ্চাদ্‌ভাগে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আলুলিত। কবি বলিতেছেন, যেন অন্ধকার পিছনে রাখিয়া এক সঙ্গে রবি শশী উদিত হইয়াছে।

"উজোর হার উর   পীত-বসন ধর
ভালহি চন্দন বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী   তড়িত জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু।"

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল হার, পরিধানে পীতবসন, ললাটে চন্দনবিন্দু। কবি উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন, যেন মাল্যাকারে অবস্থিত, বলাকার সমীপবর্ত্তী, তড়িদ্‌বিজড়িত মেঘের উপরে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।

কিন্তু কেবল রচনার মাধুর্য্যই বৈষ্ণব-কবিতার বৈচিত্র্য নহে। নির্ম্মল-চরিত্র ভক্তের মনে অপূর্ব্ব রসভাবের সঞ্চার করে বলিয়াই বৈষ্ণব-কবিতার বৈচিত্র্য। শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দেখিয়া ব্রজগোপীরা 'সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন নয়ন হইল না' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল, বৈষ্ণব-কবিতায় সত্য শিব সুন্দর সেই ভুবন-মোহন রূপের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা তাহার পূজা করি। যে বৈষ্ণব-কবিতার প্রসাদে "কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্" তাহার কি আমরা আদর করিব না!

"সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্‌বৃন্দৈরমন্দাদরা
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে॥"

ইতি শম্। *

---

* ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৫) "বারাণসী-আনন্দবাহিনী-সভা"র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

রচনা-রহস্য।

[৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।]

যিনি যত বড় দরের লেখকই হউন, "লেখ" বলিলেই তখনই লেখার মত লেখা কিছুতেই লিখিতে পারিবেন না। লেখাটা স্থান কাল অবস্থা ও অবস্থিতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। শুনিতে পাওয়া যায় বটে যে, এমন সৌভাগ্যবান লোক কেহ কেহ ছিলেন এবং আজও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সকল সময়ে সকল অবস্থায়, সর্ব্বত্রই সমান রকম লিখিতে পারেন। কলমটী ঘড়ির কাঁটাটীর মত চব্বিশ ঘণ্টাই এক ওজনে চলে,—কেবল সময়ে সময়ে ঘড়িতে "দম" বা এঞ্জিনে জল ও কয়লা দিলেই হইল। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প, আর এই অল্পসংখ্যক লোক এঞ্জিন বা যোগ-সিদ্ধ পুরুষ।

সে কালে, এ দেশে অন্যান্য কার্য্যের ন্যায়, লেখাপড়ারও উপযুক্ত কাল নির্ণীত ছিল। দিন ক্ষণ লগ্ন শৌচাশৌচ পাত্রাপাত্র ও অবস্থিতির বিস্তর বিধি নিষেধ ছিল। অশৌচ, অসুস্থাবস্থা, অসংযত চিত্ত, অশুভ যোগ, অপবিত্র স্থল, বার বেলা, রাক্ষসী বেলা, ইত্যাদি অনেক সময়ে, অনেক স্থলে, এবং অনেক অবস্থাতেই লেখাপড়ার কাজ নিষিদ্ধ ছিল। এখন অবশ্য সেই সব বালাই (!) আর কিছুই নাই; "বার বেলা, কাল বেলা কেবল কথার কথা, কলম ধর কাপি লেখ"—এখনকার হইয়াছে, এই রীতি। কিন্তু, এ রীতি শুভদায়ক নহে, স্বাভাবিকও নয়। ইহাতে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই ঘটে; দেবতা গঠিতে বাঁদরই গঠিত হয়।

অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ, সংক্রান্তি, শুভাশুভ যোগ, অশৌচাশৌচ, এখন ত কেহ মানেনই না; শরীর মনের ও স্থানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পবিত্রাপবিত্রতার প্রতিও লেখক মহাশয়েরা লক্ষ্য রাখেন না। হয় ত তৈলমর্দ্দন করিতে করিতেই, "ত্রিগুণ-শক্তি" সম্বন্ধীয় রচনা "ডিক্টেট" করেন। কত কত লেখকের শুনিয়াছি, পায়খানায় যাইয়াই প্রবন্ধপ্রসব হয়,—অন্যত্র, সে কাজটা সম্পন্ন হওয়া একান্তই অসম্ভব। এ সব জ্ঞানপথে বা ভক্তিরথে, চলা ও চাপার দরুণই ভেদাভেদ রাহিত্যের ফল; নহিলে এরূপ নোংরামিকে আর কি বলা যাইতে পারে?

এক দিকে শৌচাশৌচ স্থানাস্থান ও কালাকালের ভেদাভেদজনিত আপদ

বালাই না থাকিলেও, অন্য দিকে কিন্তু তাহা বিলক্ষণ রকমই আছে। তাহার উপর আধিপত্য করা মানুষের অসাধ্য; মনের উপর ও অভ্যাসের উপর আধিপত্য স্থাপন ভিন্ন,—তাহা অস্বাভাবিকও বটে। মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে, অবশ্য স্থান কাল অবস্থা ও অবস্থিতির উপর আধিপত্য করা যাইতে পারে; অতএব আদেশমাত্রই লাবণ্যময়ী রচনালীলা আসিয়া লেখককে ও পাঠককে চুম্বন করে,—কেবল নশ্বর বা অবিনশ্বর ?) রচনালীলাই বা কেন, তখন লেখকের নিজের মুক্তি নিজের হাতে "হস্তামলকবৎ" অষ্ট প্রহর উপস্থিত থাকে। কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তির এরূপ আটপৌরে "অ্যাটেণ্ডেন্স" অধুনা, একান্তই নাকি অসম্ভব; কাজেই লেখাটা আবশ্যকমাত্রেই, উপজায় না;—স্থান, কাল, অবস্থা ও অভ্যাসের উপর অতিরিক্ত পরিমাণেই নির্ভর করে। এ নির্ভরতা, কেবল তোমার আমার যদু মধুর নয়; এখনকার বিখ্যাত বিদেশীয় লেখকদিগকেও বিশিষ্টরূপে করিতে হয়। এক এক জনের এক একরূপ রীতি; সে রীতি আবার সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। কেহ কেবল সুদিনে সুখের অবস্থাতেই সুমধুর সারগর্ভ লেখা লিখিতে সমর্থ; কেহ কেবল দুর্দ্দিনে দুঃখের অবস্থাতেই দুরন্ত রকম কলম চালান; কাহারও কাপি কেবল কারাগারে অন্ধকার কক্ষ হইতেই অনর্গল বহির্গত হয়, কেহ কেহ আবার সাজান গোছান সুশ্রী সুন্দর ছায়ালোকময় নিজের লাইব্রেরিটীর চির পরিচিত চেয়ারখানিতে না বসিতে পাইলে, লেখার একটী অক্ষরও উৎপন্ন করিতে পারেন না। কেহ তপোবনের নির্জ্জনতাতেই লেখেন ভাল, কাহারও হাত হট্টগোল নহিলে, একেবারেই চলে না। এ যেন সেই তৈলিকতনয়ের গীতাভিনয়ের মত। সে কেবল ঘানি বৃক্ষটীতে বসিয়াই সঙ্গীতালাপে সমর্থ; অন্যত্র নহে। কোন কোনও লেখক প্রফুল্ল প্রাতঃকালের প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধতা নহিলে লিখিতে পারেন না; কেহ কেহ কেবল গভীর নিশীথের মৃতমুহূর্ত্তেই লেখনী চালনা করেন,—অন্য সময়ে সে কার্য্য করিতে একান্ত অসমর্থ। কেহ ঘোড়ার পিঠে ছুটিতে ছুটিতে প্রবন্ধের বা পুস্তকের প্রধান অংশ মনে মনে লিখিয়া ফেলেন; কেহ আবার স্বগৃহের সুখশয্যাটীতে শয়ন করা ভিন্ন একটী ভাবও ভাবিতে পারেন না; পক্ষান্তরে মেইল ট্রেনে চলিতে চলিতেই, কাহারও কাহারও মগজ খুলিয়া যায়; ডাক গাড়ির ডবল এঞ্জিনের বেগে লেখা বাহির হয়। এইরূপ এক এক লেখকের এক এক রকম অদ্ভুত অভ্যাস লেখার রকমওয়ারি রীতি। কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া, চিরিয়া চিরিয়া, চিবাইয়া চিবাইয়া লেখেন;

কাহার কাহারও লেখা হয়, কেবলমাত্র ঝোঁকের মাত্রায়। ঝোঁক না আসিলে, লেখাও আসে না। উভয়েই অভ্যাসের বশ ও অবস্থার দাস। অবস্থানুসারেই অভ্যাস কার্য্য করে। কোন কোনও লেখক বর্ণবিন্যাসের জন্য ব্যস্ত,—রঙের উপর ক্রমাগতই রঙ চড়ান, কেহ কেহ বা কেবলমাত্র সাদা মাটা খড়ি মাটীতে মতলবটা আঁকিয়া তুলেন। উভয়েই আপন আপন কোটে কার্য্যক্ষম। কিন্তু কোট বদলাইলেই বিষম মুস্কিল। কিন্তু এমন লেখকও কেহ কেহ আছেন, যাঁরা সকল কোটেই কার্য্য করিতে পারেন। এক শ্রেণীর লেখক জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণের মত পা গণিয়া গণিয়া প্রবন্ধ প্রস্তুত ও পুস্তক প্রসব করেন—আবার অপর এক মেলের লেখক ঝড় বহিয়া, বিজুলী চমকিয়া চলিয়া যান।

গোল্ডস্মিথের "পরিত্যক্ত পল্লী" (Deserted Village) নামক পদ্য ইংরেজী ভাষায় অতিশয় প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়। গোল্ডস্মিথ তাঁহার এই পদ্য প্রথমতঃ গদ্যে লিখিয়া, তাহার পর বিপুল পরিশ্রমে তাহাকে পদ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কোনও দিন দশ লাইনের বেশী লিখিতে পারেন নাই; সে দশ লাইনও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে কত কত দিন রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে দ্রুত রচনায় শেলি সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কবি কালিদাস অজ্ঞাতবাসে বেহারার কার্য্যে বেগার ধৃত হইয়া, পাল্কী বহনকালে ব্যাকরণদুষ্ট কবিতা শুনিয়া ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

স্যর ওয়াল্টার স্কট কোন্ পথে যাইবেন, কিছুমাত্র নির্ণয় না করিয়া, তাঁহার নবেল আরম্ভ করিতেন। ডিওমাস উপন্যাসের আগা গোড়ার খুদটী কোনটুকু পর্য্যন্ত ঠিক ঠাক করিয়া তবে লিখিতে বসিতেন; উইল্কি কলিন্স আখ্যায়িকার একটা মধ্যকেন্দ্র ধরিতে পারিলেই, লেখা আরম্ভ করিতেন এবং ভাগ বিভাগ ও পর্য্যায় পরিচ্ছেদের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, সেই কেন্দ্রস্থল হইতেই সম্মুখে ও পশ্চাতে গ্রন্থন-সূত্র চালাইতেন।

প্রসিদ্ধ ও জীবিত ফরাসী নবেলিষ্ট এমিলি জোলাও অতি সাবধানে ও বহুশ্রমে প্রুফ সংশোধন করেন। পাঁচ সাতটা প্রুফ না দেখিয়া নিরস্ত হয়েন না। ইংরেজ কবি গ্রে, তাঁহার একটী মাত্র (Elegy) শোক সংগীতের জন্য, কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু, তাঁহার এই সঙ্গীতটী সম্পাদক-সিংহেরা পত্রস্থ করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই!

কিন্তু লেখার ভাল মন্দের কথা কিছুই বলা যায় না। যেটা যেমন উতরে

যায়। হয় ত ভালটাই মন্দ হয়, আবার মন্দটাও ভাল হয়। পাঠক সাধারণের প্রবৃত্তি-স্রোত গড্ডলিকা প্রবাহেরই মত। ভেড়িয়া ধসন ধাইতে যে দেরি। সমালোচকের সমালোচনারও কিছু মাত্র স্থায়িত্ব নাই। এক সময়ে যাহা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ান্তরে, তাহা নেহাত ভাল; পক্ষান্তরে পূর্ব্বে যাহা ভাল বলিয়া সমালোচক সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পরে তাহা নেহাত মন্দ অপেক্ষাও মন্দ বলিয়া বিবেচিত; নশ্বর সংসারের নিয়মই এই। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা কুষ্মাণ্ড কবি ও কূলি সমালোচকদিগের সান্ত্বনা স্থল নহে।

৺ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

বাঙ্গালার সম্বাদ ও সাময়িক পত্রিকাদির সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের নাম শুনেন নাই, এমন লোক নাই।

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পরে সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি সংবাদ পত্রের সংস্রবে আসিয়া 'আর্য্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রে কিছুদিন সহযোগী-সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। অধুনা-লুপ্ত 'প্রভাত-সমীর' নামক দৈনিক পত্রের তিনি প্রথম সম্পাদকতা করেন। এই পত্রখানি উঠিয়া যাইলে ইনি 'নববিভাকর' ও 'সহচরে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন, এবং বহুদিন বঙ্গবাসীর 'দৈনিক' পত্রিকার ও 'হিন্দুস্থান' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বাঙ্গালা সংবাদপত্র-বিভাগে ক্ষেত্রমোহনের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় তাঁহার সমকক্ষ দুর্লভ। সংবাদপত্র সম্পাদনে আবশ্যক, এমন কোনও ঐতিহাসিক বা বিশেষ ঘটনা ছিল না, যাহা গ্রন্থাদি না দেখিয়া তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে না পারিতেন। বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি তিনি অতি দ্রুত লিখিতে পারিতেন।

জীবনে তিনি অনেকগুলি শোক পাইয়াছিলেন, এখন তিনি মহাশান্তিতে চিরনিদ্রিত। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ-কামনা করিতেছি, এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

পৈতৃক সম্পত্তি—গার্হস্থ্য উপন্যাস—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ প্রণীত ও ৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড অন্নদা বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

গ্রন্থকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, উপন্যাসখানি 'একখানি ইংরাজী উপন্যাসের প্লটের ছায়াবলম্বনে রচিত।' অনুবাদ বা বিদেশী গল্প অবলম্বনে রচিত উপন্যাসাদি পাঠ করিতে সাধারণতঃ যে আশঙ্কা হয়, ইহাতে তাহা হয় না। লেখক না বলিয়া দিলে কেহ কেহ হয়ত বুঝিতে পারিতেন না যে ইহা বিলাতী গল্পের ভাবাবলম্বনে রচিত। প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত। ঘটনা-বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, এবং গ্রন্থের শেষ অবধি টানিয়া লইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, অনেকগুলি চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে। 'যূথিকা' ও 'অমিয়কুমারে'র বিমল প্রেম ও অকপট স্বার্থত্যাগ, 'বেলা'র বালিকাসুলভ চাপল্য, রহস্যপ্রিয়তা ও মানবচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি, 'নরেন্দ্রে'র লোভ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা ও পাপের পরিণাম প্রভৃতি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নবীন ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। উপন্যাসখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি পরিপাটী। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকের নিকট এই গ্রন্থখানি প্রীতি-প্রদ হইবে।

মৃত্যু যবনিকা—'মল্লিদার' সম্পাদিত, মূল্য কাগজের মলাট ১৲ এবং কাপড়ে বাঁধাই ১।০ ; প্রকাশক—কে, এম্, কনর এণ্ড কোং, লণ্ডন লাইব্রেরী, লিণ্ডসে ম্যান্সন্, কলিকাতা।

'আট আনা সংস্করণে'র উপন্যাসের মত 'রহস্য পিরামিড সিরিজে'র এইখানি প্রথম 'উপন্যাস'। এই গ্রন্থখানি আগাগোড়া রহস্য-জালে বেষ্টিত। 'বায়োস্কোপে'র রহস্য-নিবিড় ঘটনার মত পাঠকালীন্ হাঁফ্ ছাড়িতে দেয় না। ভাষা প্রাঞ্জল। যে শ্রেণীর পাঠক ডিটেক্‌টীভ উপন্যাস পাঠ করিতে ভালবাসেন, এ গ্রন্থখানিও তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হইবে।

বাঙ্গালার মহেন্দ্রকুমার লাহিড়ীকে বিলাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া 'মাইকেল লরি' নামকরণ করিয়া, তাঁহাকে গ্রন্থের নায়ক সাজাইবার সার্থকতাটুকু বুঝিলাম না। যদি গ্রন্থে বাঙ্গালার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি কোন বিষয়ে, কোনও অংশ ফুটিয়া উঠিত, ও তদ্দারা বঙ্গদেশ গৌরবমণ্ডিত হইত, তবে হাঁ, আমরা বুঝিতাম, গ্রন্থকার 'একটা নূতন কিছু' করিয়াছেন।

সায়নভাষ্যের সমালোচনা।

[লেখক—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, এম-এ, বি-এল।]

সায়নাচার্য্য নিজরচিত ঋগ্বেদভাষ্যের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর প্রাধান্য। সেই জন্য আমি যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা আগে করিয়াছি। এখন হোতার নিমিত্ত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করিব।"

"আধ্বর্য্যবস্য যজ্ঞেষু প্রাধান্যাদ্ব্যাকৃতঃ পুরা।
যজুর্ব্বেদোঽথ হৌত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে।"

ঋগ্বেদের একটি ঋকে হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু এই চার প্রকার ঋত্বিকের উল্লেখ করা হইয়াছে।

"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ।"

নিরুক্তকার যাস্ক এই ঋকের নিম্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হোতৃনামক এক ঋত্বিক্ যজ্ঞের সময় বিভিন্ন স্থলে উক্ত নিজ বেদের অন্তর্গত ঋক্‌গুলিকে একত্র করিয়া 'এখানে ইহাই প্রয়োগ করা উচিত' এইরূপে ঋক্‌গুলির পুষ্টিসাধন করেন। যাহা দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ঋক্‌গুলির নাম শক্করী। উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিক্ এই শক্করী ঋক্‌গুলি গান করেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ যাগকর্ম্মগুলিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। এক একটি কর্ম্ম করিবার সময় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, "এইটি করিব কি?" ব্রহ্মা তখন বলিবেন, "হাঁ, কর।" ঋগ্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদের সর্ব্বকার্য্যে অভিজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। কোন ভ্রম প্রমাদ হইলে তিনি তাহা সংশোধন বা কোন সংশয় উপস্থিত হইলে তাহার নিরাকরণ করিতে পারেন। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ যজ্ঞের স্বরূপ বিশেষরূপে সম্পাদন করেন।

সায়ন বলেন, যজ্ঞই শরীর। সামবেদ ও ঋগ্বেদে কল্পিত স্তোত্র ও শস্ত্র সেই শরীরের অবয়ব। শরীরই প্রধান। সুতরাং আমি যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যাই আগে করিয়াছি। এক্ষণে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সায়নাচার্য্যের পক্ষে যজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে। কারণ তিনি যে দেশে যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দেশকালানুযায়ী হইতে হইলে যজ্ঞের প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় তাঁহার ছিল না। শুধু দেশ-কালানুযায়ী হইয়াই যে তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাসও যে তাহাই ছিল তাহা আমরা বোধ হয় ধরিয়া লইতে পারি।

রচনাকাল অনুযায়ী ঋগ্বেদ যে অন্যান্য বেদগুলির বহুপূর্ব্ববর্ত্তী, তদ্বিষয়ে এখন আর কোন সংশয় নাই। ভাষা, রচনারীতি দেখিয়া ও আভ্যন্তরীন বহু প্রমাণ অবলম্বনে এ কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখানে ঐ সকল প্রমাণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কালানুযায়ী ঋগ্বেদ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, পরবর্ত্তী যুগে যাগ যজ্ঞ এত বাড়িয়া উঠিল যে, যজুর্ব্বেদই এক হিসাবে প্রধান হইয়া উঠিল। সুবিস্তৃত কর্ম্মকাণ্ডে যজুর্ব্বেদেরই প্রথম দরকার, সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্‌বেদ ও সামবেদেরও স্থান হইত। যতই কাল অতীত হইতে লাগিল, ততই যজুর্ব্বেদের এই প্রাধান্য সুদৃঢ় হইতে লাগিল। সায়নাচার্য্য এই হেতু সর্ব্বাগ্রে যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা করিয়া পরে ঋগ্বেদের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এখনকার দিনে অবশ্য কোন গ্রন্থের টীকা রচনা করিতে হইলে, এরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। কেহ জিজ্ঞাসা করেন না, "তুমি ঋগ্বেদের ভাষ্য আগে করিলে কেন?" করিলেও, "আমার খুসী" বা "আমার সাধ্য, সুবিধা বা সময় বুঝিয়া করিয়াছি" বলিলেই চলে। কিন্তু আগেকার কালে তাহা হইবার উপায় ছিল না। তাই সায়ন প্রথমেই কৈফিয়ৎ দিতে বসিয়াছেন।

যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের পথাবলম্বী, তাঁহাদের নিকট সায়নের উক্তি যুক্তিযুক্ত এবং তাঁহারা সায়নের পথাবলম্বী হইয়া অগ্রে যজুর্ব্বেদ, পরে ঋগ্বেদের অনুশীলন করিতে পারেন। কিন্তু আজকাল কর্ম্মকাণ্ডের আর সে বাহুল্য বা প্রচার নাই। বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিতগণের নিকটে বেদগুলি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই সমাদৃত ও অধীত। তাঁহারা বেদের ভাষা হইতে সমগ্র মানবজাতির আদিম একমাত্র ভাষা গঠনের গবেষণা করিতেছেন, মানবজাতির আদিম নিবাস স্থল, প্রাচীন ভৌগোলিক ও জ্যোতিষের বিবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন। কাজেই তাঁহাদের প্রয়োজনের হিসাবে যে বেদ প্রাচীনতম তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাদরের পাত্র। ঋগ্‌বেদ যে প্রাচীনতম তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে ঋগ্বেদই প্রথমে আলোচ্য।

ঋগ্বেদ যে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, এ কথা সায়ন অস্বীকার

করেন নাই। পুরুষ সূক্তে যেখানে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে ঋগ্বেদের নামই অগ্রে পাওয়া যায়। তাহার পর সামবেদ, তাহার পর ছন্দঃ ও শেষে যজুর্ব্বেদ। যথা—

"তস্মাদযজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।"

এতদ্ব্যতীত তৈত্তিরীয়গণ বলেন, "সাম ও যজুর্ব্বেদের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা শিথিল, কিন্তু ঋগ্বেদের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা দৃঢ়।" ("যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তৎ যদ্ ঋচা তদ্ দৃঢ়ম্")।

এই শিথিল ও দৃঢ়ের অর্থ কি? পরবর্ত্তী রচনাকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অন্যান্য বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে কোন কথা বলিয়া তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য "ঋগ্বেদে এই কথা আছে" এই বলিয়া ঋগ্বেদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে, এই এই ঋক্ অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ প্রয়োগ করিবেন। সামবেদ ত প্রায় সবই ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি লইয়াই গঠিত। অথর্ব্ববেদেও ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ঋগ্বেদ অন্য বেদ কর্ত্তৃকও সমাশ্রিত।

আবার অধ্যয়নবিধি হিসাবেও ঋগ্বেদের অধ্যয়নই প্রথমে বিহিত হইয়াছে, ছান্দোগ্যে সনৎকুমারের প্রতি নারদের নিম্নলিখিত বাক্য আছে, "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বাণঞ্চ"। মুণ্ডকোপনিষদে আছে "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বণঃ"। তাপনীয়োপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়, "ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তি।" এই সকল বাক্য হইতে ঋগ্বেদের অধ্যয়নই যে প্রথমে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সায়ন বলিয়াছেন, তা হউক, বেদাধ্যয়ন, ও ব্রহ্মযজ্ঞ জপ প্রভৃতিতে ঋগ্বেদ প্রথম স্থানীয় হইলেও, ঋক্‌গুলির অর্থ বুঝিলে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হইলে যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য। সুতরাং যজুর্ব্বেদেরই ব্যাখ্যা আগে করা উচিত।

যজ্ঞের প্রাধান্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সায়নের কথাই ঠিক, কিন্তু অন্য দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ঋগ্বেদেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সায়ন তাহার পর বেদের লক্ষণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সায়ন একজন

নৈয়ায়িককে প্রতিপক্ষ স্থির করিয়া তর্ক উপস্থাপিত করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ। বেদ বলিয়া কোন পদার্থই নাই। তা আবার বেদের বিভাগ ঋগ্বেদ? বেদ কি? ন্যায়শাস্ত্রের মতে লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। বেদের কোন লক্ষণও দিতে পারিবে না। কোনও প্রমাণও নাই।

সায়ন। তোমরা ত ন্যায়শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম এই চারি প্রকার প্রমাণ স্বীকার কর। ইহার মধ্যে আগম নামক শেষ প্রমাণটিই বেদ। ইহাই বেদের লক্ষণ।

প্রতিপক্ষ। তা কি হয়? আগমের লক্ষণ কি তা জান? সময়বলে প্রত্যক্ষের বহির্ভূত অনুভব যাহার দ্বারা ঘটে তাহাকে আগম বলে। মনুর স্মৃতি প্রভৃতিও ত আগম। তোমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল অর্থাৎ যাহাতে লক্ষণ না দিতে চাও তাহাতেও লক্ষণ গিয়া পৌছিল। মনু স্মৃতি প্রভৃতিও বেদ হইয়া পড়িল।

সায়ন। আচ্ছা, ঐ লক্ষণের সহিত "অপৌরুষেয় হইলে" এই শব্দ জুড়িয়া দিলে হয় না? মনু স্মৃতি প্রভৃতি পৌরুষেয় (ব্যক্তিবিশেষ নির্ম্মিত) আগম এবং বেদ অপৌরুষেয় আগম।

প্র। বেদ ত পরমেশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনিও ত পুরুষ।

সা। 'অপৌরুষেয়' বলিতে বুঝিতে হইবে, 'শরীরধারী জীব নির্ম্মিত নহে।' পরমেশ্বর ত আর শরীরধারী জীব নন।

প্র। কে বলিল? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষসূক্তে আছে, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" (সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পদবিশিষ্ট পুরুষ)। ইহা হইতেই ত বুঝা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরও পুরুষ।

সা। আমি বলিতেছি "কর্ম্মফলে যে শরীর উৎপন্ন হয় সেই শরীর যিনি ধারণ না করেন এমন পুরুষ।"

প্র। তাও খাটে না। জীববিশেষই ত বেদ উৎপাদন করিয়াছেন। বেদে আছে, "ঋগ্বেদ এব অগ্নেরজায়ত, যজুর্ব্বেদো বায়োঃ, সামবেদো আদিত্যাৎ"। ইহা হইতে জানিতে পারা যায়, অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

সা। আচ্ছা, তবে বেদের নির্দ্দোষ লক্ষণ বলিতেছি, শোন। মন্ত্র-

ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশির নাম বেদ। আপস্তম্ব যজ্ঞ পরিভাষায় এ কথা বলিয়াছেন।

প্র। কোন্‌গুলি মন্ত্র, কোন্‌গুলি ব্রাহ্মণ, তা এ পর্য্যন্ত কেহ ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে নাই। মন্ত্র কাহাকে বলে?

সা। যে বিষয়ের বিধান করা হইয়াছে, সেই বিষয় যাহার দ্বারা বলা হয়, তাহাই মন্ত্র।

প্র। "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত" (বসন্তে তিত্তিরী পক্ষী বলি দিবে) এই একটি বাক্য আছে। এটি বলি বিধান করিতেছে। ইহার দ্বারাই বিধান হইতেছে। অগ্রে অন্য কোন বাক্যের দ্বারা বিহিত কোন বিষয় বলা ইহার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং তোমার লক্ষণ অনুসারে এটি মন্ত্র নয়।

সা। ঠিক বলিয়াছ। ঐ লক্ষণ মানিলে অব্যাপ্তি (যাহাতে লক্ষণের প্রাপ্তি হওয়া উচিত, তাহাতে লক্ষণের অপ্রাপ্তি) দোষ ঘটে। আচ্ছা, তবে আর এক প্রকার লক্ষণ করিতেছি, মননহেতুই মন্ত্র।

প্র। তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। ব্রাহ্মণ সমূহও ঐ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সা। যদি বলি "যে পদের শেষে 'এবমসি' শব্দ আছে, তাহাই মন্ত্র" অথবা "যাহা উত্তমপুরুষান্ত তাহাই মন্ত্র"?

প্র। এ দুটি লক্ষণ পরস্পরে অব্যাপ্তি হয়। কারণ কতকগুলি হয়ত উত্তমপুরুষান্তও বটে, আবার 'এবমসি' শব্দযুক্তও বটে।

সা। তবে আর উপায় নাই। যাজ্ঞিকেরা যাহাকে মন্ত্র বলেন, তাহাই মন্ত্র। এই লক্ষণে আর কোন দোষ নাই।

এত তর্কের পর সায়ন যে স্থানে উপস্থিত হইলেন ও যে অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহা আমাদের মনঃপূত হইল না। সায়ন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া নিজেকে সিদ্ধমনোরথ বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু আমাদের মতে সায়নের এখানে পরাজয় হইয়াছে। যে লক্ষণ তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কিছুই নয়। এই কথাটি বিশদরূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের মতে মানুষের মনে প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু জ্ঞান হয়, তাহার পর এক শ্রেণীর বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়া উহাদের একটি নাম দেওয়া হয়। বিশেষ বিচার করিয়া লক্ষণও করা হয়। নাম দিবার সময় অবশ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে মানব, চক্ষে পতিত হয় নাই বলিয়া

যাহার কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, এমন কোন প্রাণী এখন নরচক্ষে পতিত হইলে, তাহার যে কোন নাম আমরা দিতে পারি। সকলে সেই নামটি মানিয়া লইলেই হইল। এইরূপ এখন আমরা যাহাকে 'অশ্ব' বলি, পূর্ব্বে সেই জীবের নামও ঐ প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছিল। আজ যদি সমস্ত মানব একত্রিত হইয়া 'অশ্ব'কে 'গর্দ্দভ' বলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কালক্রমে বর্ত্তমান অশ্ব নামক জীবটিরই গর্দ্দভ সংজ্ঞা হইবে। সাধারণের প্রয়োগবশে ও সাধারণের সম্মতিতে যে শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। 'রহস্য', 'পুলক' 'বিজ্ঞান' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় এক নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই কথা মনে রাখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সায়নের কথা ঠিক্। যাজ্ঞিকরা যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন তাহাই মন্ত্র। যাজ্ঞিকরা যদি মন্ত্রগুলিকে মন্ত্র না বলিয়া 'বৃক্ষ' বলিতেন, তাহা হইলে মন্ত্রগুলির 'বৃক্ষ' নামই হইত। কিন্তু এইটি মন্ত্রের লক্ষণ হইতে পারে না। ইহা মন্ত্র-শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র।

পাশ্চাত্যদর্শনে যে মত অবলম্বিত হইয়াছে, ন্যায়দর্শনের মতের সহিত তাহার বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। কোন্ শব্দে কি বুঝিব, নৈয়ায়িকের পরিভাষায় তাহাকে সঙ্কেত বলে। একজন বৃদ্ধ আর একজন বৃদ্ধকে বলিলেন, "গরু আন", তদনুযায়ী দ্বিতীয় বৃদ্ধ গরু আনিল। একজন বালক তাহা দেখিয়া 'গরু আন' ইহার সঙ্কেত গ্রহণ করিল। তাহার পর প্রথম বৃদ্ধ দ্বিতীয় বৃদ্ধকে বলিলেন, "গরু রাখিয়া আইস।" দ্বিতীয় বৃদ্ধ তাহাই করিল। তাহা দেখিয়া বালক 'গরু' এই শব্দের সঙ্কেত ও 'আন' ও 'রাখিয়া আইস' এই শব্দদ্বয়ের সঙ্কেত গ্রহণ করিল।

তবে একটা কথা আছে, ন্যায়ে বলিবে "সঙ্কেতটা ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ হইয়াছে।" পাশ্চাত্যমতে সেই ঈশ্বর আর কেহ নহেন, প্রথমে যিনি শব্দটি উচ্চারণ করিয়া ও এক বিশিষ্ট অর্থে তাহার প্রয়োগ করিয়া সাধারণকে তাহা মানিয়া লইতে রাজী করিতে পারিয়াছিলেন, তিনিই ঈশ্বর।

কিন্তু লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, কেবল এ কথা বলিলে চলিবে না, "যাহাকে যাজ্ঞিকেরা মন্ত্র বলিয়া মানেন তাহাই মন্ত্র।" কারণ এরূপে ত বিনা আয়াসে পৃথিবীর সব জিনিষের লক্ষণই করা যায়। 'যাহাকে মানুষেরা ঘোড়া বলে তাহাই ঘোড়া', 'যাহাকে মানুষেরা গাধা বলে তাহাই গাধা', এইরূপ লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, আর কোন চিন্তাই থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু ইহা লক্ষণ নয়।

অবশ্য আমরা এ কথা মানি-যে, মন্ত্রের লক্ষণ করা কঠিন। আমরা কোন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতেও পারিতেছি না। সায়ন বলিয়াছেন, মন্ত্রগুলি এত দূর পরস্পর বিজাতীয়, যে তাহাদের এমন কোন অনুগত ধর্ম্ম বাহির করা যায় না, যাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ব্যতীত তাহার অন্য কোনও লক্ষণ করা যাইতে পারে। কোন কোন মন্ত্র (যথা "উরু প্রথস্ব" ইত্যাদি) অনুষ্ঠান স্মরণ করাইয়া দেয়, কোন কোন মন্ত্র (যথা "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি) স্তুতি, কোন কোন মন্ত্র 'ত্বা' এই পদ যুক্ত (যথা "ইষেত্বা" ইত্যাদি), কোন কোন মন্ত্র আমন্ত্রণ-যুক্ত (যথা "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি), কোন কোন মন্ত্র প্রৈষ (অনুজ্ঞা) স্বরূপ (যথা "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি), কোন কোন মন্ত্র বিচাররূপ (যথা "অধঃস্বিদাসীতুপরিস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি), কোন কোন মন্ত্র বিলাপরূপ (যথা "অম্বে অম্বাল্যম্বিকে ন মা নয়তি কশ্চন" ইত্যাদি), কোন কোন মন্ত্র প্রশ্নস্বরূপ (যথা "পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যা" ইত্যাদি), কোন কোন মন্ত্র উত্তর স্বরূপ (যথা "বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যা" ইত্যাদি)। এইরূপ আরও বহুবিধ প্রকারের মন্ত্র আছে। সুতরাং ইহাদের সাধারণ এমন কোন ধর্ম্ম পাওয়া যায় না, যাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ করা যায়।

সায়নের ইহাই মত। আমরা বলি, সাধারণ ধর্ম্ম যখন নাই, বা সায়ন আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তখন লক্ষণ করা গেল না বলিলেই ভাল হইত। কারণ, সায়ন যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাকে লক্ষণ বলা যায় না।

হয়ত একটা কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষণ না করিলে কাজ চলিবে কিরূপে? ধরুন 'মানুষ' এই সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানটি যদি না থাকে, তাহা হইলে আমাদের যুক্তি, তর্ক, চিন্তা বা কথোপকথনের কত ব্যাঘাত হয়। পৃথক পৃথক অসংখ্য পদার্থের সাধারণ ধর্ম্মগুলি বুঝিতে পারিলে সেগুলি অল্প আয়াসেই আমাদের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। * সংক্ষেপে আমরা তাহাদের বিষয় চিন্তা করিতে বা তাহাদের কথা বলিতে বা লিখিতে পারি। যে সকল অসভ্য জাতির ভাষা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের ভাষা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের এইরূপ সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানের একান্ত অভাব।

কিন্তু লক্ষণ ঠিক না জানিলেও আমাদের কাজ চালান একেবারে অসম্ভব

* "বহুত্বেঽপি পদার্থানাং নাস্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ।"

হইয়া পড়ে না। আমরা প্রত্যহ যে ভাষা ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে সকল শব্দোক্ত সকল পদার্থের লক্ষণ যে আমরা অবগত আছি, তাহা নয়। মোটামুটি একটা জ্ঞান আছে মাত্র। ধরুন, 'কাক' বলিলে হয়ত কৃষ্ণকায় জীববিশেষের একটা ধারণা আমার মনে উদয় হয়। কিন্তু যদি শ্বেত কাক থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হওয়াকে কাকের লক্ষণের মধ্যে ফেলিতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত লক্ষণ না জানিয়াও সাধারণতঃ আমরা কাজ চালাইয়া থাকি।

কিন্তু রীতিমত বস্তুর স্বরূপ অববোধের জন্ত লক্ষণ আবশুক। শুধু কাজ চলে বলিয়া নিরস্ত থাকিলে হইবে না। কারণ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট না করিলে অনেক ভ্রান্ত যুক্তি তর্কে পড়িতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া যেখানে লক্ষণ না করিতে পারিব, সেখানে যা তা একটা লক্ষণ করা উচিত নহে। মন্ত্রের যদি লক্ষণ করিতে না পারি, তাহা হইলে স্পষ্ট বলিলেই হয় "কতকগুলি শব্দ রচনা মন্ত্র নামে প্রথিত হইয়া আসিতেছে। চিন্তা ও ভাষা ব্যবহারে সুবিধার জন্য আমরা 'মন্ত্র' শব্দ ব্যবহার করিব। কিন্তু কোন সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে না পারাতে আমরা ইহার লক্ষণ করিতে পারিলাম না।" এই কথা বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হইত। "যেগুলিকে যাজ্ঞিকেরা মন্ত্র বলেন, তাহাই মন্ত্র" ইহা মন্ত্রশব্দের সঙ্কেত বুঝাইয়াছে মাত্র। ইহা কখনও লক্ষণ হইতে পারে না।

কাজেই আমাদের মনে হয়, সায়নাচার্য্য তাঁহার প্রতিপক্ষ নৈয়ায়িককে প্রকৃতপক্ষে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। নিজেই পরাভূত হইয়াছেন।

সায়ন মন্ত্রের লক্ষণ করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মণেরও লক্ষণ করিতে পারেন নাই। তাহাই এখন দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মণ বাক্য বহু প্রকারের। নিম্নলিখিত শ্লোকে কতকগুলি প্রকার বর্ণিত হইয়াছে:—

"হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।
পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥"

অর্থাৎ (১) হেতু, (২) নির্ব্বচন, (৩) নিন্দা, (৪) প্রশংসা, (৫) সংশয়, (৬) বিধি, (৭) পরক্রিয়া, (৮) পুরাকল্প, ও (৯) ব্যবধারণকল্পনা; ব্রাহ্মণ এই এই বিষয়ক হইতে পারে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগুলি যথাক্রমে ঐগুলির উদাহরণ, (১) "তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে", (২) "তদ্দধ্নো দধিত্বম্", (৩) "অমেধ্যা বৈ মাষা", (৪) "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা", (৫) "তদ্ব্যচিকিৎসন্ জুহবানী মাহৌষাম্", (৬) "যজমানেন সম্মিতৌদুম্বরী ভবতি", (৭) "মাষানেব মহ্যং

পচন্তি", (৮) "পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ", (৯) "যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্নীয়াত্তা-বতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্ নির্ব্বপেৎ"।

পূর্ব্বোক্ত হেতু-প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম ব্রাহ্মণের লক্ষণ, এই বলিয়া ব্রাহ্মণের লক্ষণ করা যায় না, কারণ মন্ত্রের মধ্যেও এগুলি থাকিতে পারে। নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলিই তাহার প্রমাণঃ (১) "ইন্দবো বামুষন্তি হি", (২) "উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে", (৩) "মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতা", (৪) "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিব", (৫) "অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ", (৬) "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত", (৭) "সহস্রমযুতাদদৎ", (৮) "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা"। এইগুলি যথাক্রমে হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া ও পুরাকল্পের উদাহরণ। ব্যবধারণ কল্পনা বিশিষ্ট মন্ত্রের উদাহরণ সায়ন দেন নাই।

আচ্ছা, ব্রাহ্মণের এরূপ লক্ষণ করিলে হয় না 'যাহাতে 'ইতি' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে তাহাই ব্রাহ্মণ" ? না, তাহা করা যায় না, কারণ মন্ত্রেও 'ইতি' শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। যথা "ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ'।

যদি বলি, " 'ইত্যাহ' এই শব্দ যাহার শেষে থাকে, তাহাই ব্রাহ্মণ", না, তাহাও ঠিক হয় না, কারণ মন্ত্রের শেষেও 'ইত্যাহ' দেখা যায়। যথা "রাজা-চিদ্ভং ভগং ভক্ষীত্যাহ", "যো বা রক্ষাঃ শুচীরস্মীত্যাহ"।

যদি বলি "ব্রাহ্মণ আখ্যায়িকারূপ"। তাহাও ঠিক হয় না, কারণ যম-যমী সংবাদ প্রভৃতি আখ্যায়িকা মন্ত্র ভাগেও দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ? এ কথার উত্তরে সায়ন বলিতেছেন, "বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রের লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। মন্ত্র ছাড়া বেদের অবশিষ্ট ভাগই ব্রাহ্মণ।"

এই বলিয়া সায়ন জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা হইতে দুইটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, জৈমিনিও এই কথা বলিয়াছেন। যথা "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা। শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ।

এ লক্ষণেও আমাদের তৃপ্তি হইল না। এক ত মন্ত্রের লক্ষণই ঠিক হয় নাই। "যাহাকে যাজ্ঞিকরা মন্ত্র বলে তাহাই মন্ত্র। আর বাকিটুকু ব্রাহ্মণ। এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়াই বেদ। সুতরাং বেদের লক্ষণ হইয়া গেল।' সায়নের স্থূল কথা ইহাই দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণ কি ? না, মন্ত্র ছাড়া বেদের অংশ। বেদ কি ? না, এই অংশ ও মন্ত্র। মন্ত্র কি ? না, যাহা মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে তাহাই মন্ত্র।

যাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে চান হউন, আমরা কিন্তু হইতে পারিলাম না।

শেষে একটি তর্কের উত্তর সায়ন বেশ নিপুণ ভাবে দিয়াছেন। একজন আপত্তিকারী বলিতেছে, ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণে এই বচনটি আছে, "যদ্ ব্রাহ্মণানি ইতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীঃ" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত ইতিহাস (১), পুরাণ (২), কল্প (৩), গাথা (৪) ও নারাশংসী (৫) বেদে আছে। সুতরাং মন্ত্র ছাড়া সবই যে ব্রাহ্মণ তাহা হইতে পারে না। সায়ন এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই প্রকার ভেদ মাত্র। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত পৃথক্ কিছু নহে। যেমন কেহ যদি বলেন "বিপ্রদের ঘরের মধ্যে বসাও, পরিব্রাজকদের বাহিরে বসিবার আসন দাও।" তাহা হইলে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে, পরিব্রাজকরা বিপ্র নন। সেইরূপ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে ব্রাহ্মণের সহিত অন্যান্য ইতিহাস প্রভৃতি উল্লিখিত হইলেও ইতিহাস প্রভৃতি যে ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র এমন কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

সায়নাচার্য্য কৃত বেদের লক্ষণের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হইল। সায়ন-ভাষ্যের অন্যান্য অংশের সমালোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

পোষা কুকুর।

[লেখক—শ্রীগুরুদাস সরকার।]

(Louis Enault প্রণীত ফরাসী গ্রন্থ অবলম্বনে)

২

"সেলাম আলেকম্ সারেং সাহেব, কুকুরের সঙ্গে এত কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে—ও ত এদেশের কথা বুঝ্‌বে না। ওকে বুঝাতে হলে মগের জবানে বল্‌তে হবে।" আবদুল কাদের দেখিলেন বুড়া জনাব আলী তাঁহার প্রায়

---

(১) "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্" ইত্যাদি।

(২) "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" ইত্যাদি।

(৩) যথা, আরুণকেতুকচয়নপ্রকরণে যাহা বলা হইয়াছে।

(৪) যথা, অগ্নি চয়নে যমগাথা গাহিতে হইবে বলা হইয়াছে।

(৫) মনুষ্য বৃত্তান্ত প্রতিপাদক ঋকগুলিকে নারাশংস বলে।

পিছনে দাঁড়াইয়া। কুকুর লইয়া ব্যস্ত থাকায় তিনি তাহাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। জনাব আলী গঙ্গা সাগরের কাছে বাতিঘরে কাজ করিত, এখন পেন্সন পাইয়া তাঁহারই গ্রাম দেশে আসিয়া বাস করিতেছে। বুড়ার রহস্যে কাদের মিঞা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আলেকম্ সেলাম জনাব ভাই তা এতক্ষণ এ হতভাগা কুকুরটার দিকে নজর ছিল বলে তোমাকে দেখ্‌তে পাই নাই। এমন বেয়াদব জানোয়ার দেখেছ কখনো। ছোঁড়ারা নদীতে ডুবিয়ে মার্‌ছিল, আমি এসে তাদের গালিমন্দ দিয়ে ওকে প্রাণে বাঁচালাম। খেতে পায় নাই দেখে খাওয়ার জন্য বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর্‌লাম, তা দেখ এম্‌নি আক্কেল, পেছন ফিরে বসে রয়েছে—একটা কথার জবাব পর্য্যন্ত দিলে না।" এই বলিয়া আবদুল কাদের হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। জনাব বলিল, "তা হলে ওটা ত মস্ত বেকুব দেখ্‌ছি, বেটা দাওৎ পেয়েও কথা কয় না, আমি হলে ত এতক্ষণ তোমার বাড়ী গিয়ে পৌঁছাতাম। তা কুকুরটার আর কি দোষ দিব, ও বড়ই প্রভুভক্ত—মনিবছাড়া ও কা'কেও জানে না।"

"তুমি ওর মনিবকে চেন না কি ?

"চিনি না আবার—খুব চিনি—সে আগে "রাণী" জাহাজে বাবুর্চ্চি ছিল। তোমার মনে আছে বোধ হয় যে জাহাজে করে আগে বর্ম্মা থেকে চাল বোঝাই হয়ে আস্‌ত। তা সে মগটাও পাঁড় মাতাল, ডাঙ্গায় নেবেছে কি অম্‌নি দারুপিয়ে চুর্‌চুরে। কি করে যে জাহাজের উপর কাজ চালায়, তা সেই জানে। তাই কি ছাই কুকুরটার ওপরও একটু দয়া মায়া আছে—এর অদৃষ্টে ভাত মুঠোটার চেয়ে লাথি ঝাঁটাই বেশী মিল্‌ত দেখ্‌তাম। কিন্তু তা হ'লে হ'বে কি—নির্ব্বোধ জানোয়ার, একবার যার কাছ-ঘেঁষা হয়েছে, তাকে কি আর ভুল্‌তে পারে। মগ্‌ বেটা জাহাজ থেকে নাব্‌লেই দেখ্‌তাম কুকুরটা অম্‌নি তার সঙ্গ নিয়েছে, যেন তার জুতার শুকতলায় বাঁধা। দেখ জানোয়ারটা দেখ্‌তে খুবসুরৎ নয় বটে—কিন্তু এমন বুদ্ধিওয়ালা কুকুর আমি আর কখনও দেখি নাই। দেখেছ ত বাজীকরদের থলির ভিতর বনমানুষের হাড়, কামরূপ কামিক্ষের মাটি আরও কত কি আজ্‌গুবি জিনিস থাকে, কিন্তু এ কুকুরের পেটে যে বুদ্ধি আছে, তার কাছে ওসব কোথায় হার মেনে যায়। একবার ইসারা পেলে হ'ল, যা বলেছ তাত কর্‌বেই—পারে ত দু এক কদম আরও চড়িয়ে দেবে। কাকে যেন একবার বল্‌তে শুনেছি—যে মগেদের কথাবার্ত্তা ও সবই বুঝ্‌তে পারে, কেবল খাজনা দেবার

করে কথা কয় না। তা আমরা পাঁচজনেও দেখেছি যে, মনিবের কোন হুকুমটিও বুঝ্তেও কোনও দিন ভুল করেনি। বুদ্ধিত আছেই, তা ছাড়া ওর দিলটাও ভারি উঁচু—মনিবকে যে কি ভালবাসে, একবার দেখ তো অবাক্ হয়ে যাও। তার কথায় জলে ডুব্বে, আগুনে ঝাঁপ দেবে, কিছুতেই পিছপাও নয়।" কাদের হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে আমার ত নসীব ভাল দেখ্ছি, সকাল বেলাতেই কি না একদম্ দুনিয়ার সেরা কুত্তার সঙ্গে মুলাকাৎ। তা মস্করা রেখে বল্তে কি, এমন লোকও ঢের দেখেছি, যারা এ সব কুকুরের পায়ের কাছেও এগোতে পারে না।"

"সে কথা আর আমায় বল্ছ কি, এই ষাট বছর উমরে ভাল মন্দ দেখ্তে কি আর বাকী আছে। ব্যাপারটা কি বলতো হে—কুকুরটা অমন করে নদীর ধারে পাগলার মত দৌড়াদৌড়ি কর্ছে কেন?"

আবদুল কাদের মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, কুকুরটি নদীর ধার ধরিয়া ছুটিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার কিনারায় দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে—কি করিবে তাহা যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এইরূপ দুই চারবার দৌড়াদৌড়ির পর হঠাৎ যেন মনস্থির করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং বীচ দরিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বেগে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

জনাব মিঞা বিদ্রূপের স্বরে বলিতে লাগিল, "যাও বাছাধন সাঁতার কেটে তোমার মনিবের জাহাজে ওঠ গে—মোটে ক্রোশখানিক আগিয়ে গিয়েছে বই ত নয়—আর এখন সবে জোয়ারের মুখে পাইলে হাওয়া পেয়ে চলেছে—ধরে ফেলেছ আর কি—বেটা কমবখ্ত মিনিট পাঁচের মধ্যে যদি জল গিল্তে আরম্ভ না করে ত আমার নাম জনাব সর্দ্দারই নয়। মনে আছে আবদুল ভাই, সেবার সেই রসিদ চাচার দুই ছেলে ওখানে ওই ঘূর্ণিটার মুখে পড়ে ডুবে গিয়েছিল, সে আর ক'দিনের কথা—মাস দশেক হবে বোধ হয়, তা ও অবলা জানোয়ারের উপর রাগ কর্ব কি—রাগ হচ্ছে আমার সেই হারাম-খোর মগ্‌বেটার উপর—সে যদি ওকে না ফেলে যেত তাহ'লে সে মাতাল কাফেরটার জন্য এ বেচারী বেনাহাক আপনার জান্টা দিত না। বাহবা কুত্তা বটে, দেখেছ বেটার গায়ের জোর; এখন পর্য্যন্ত সটান সাঁতার কেটে চলেছে, আর পারে না বোধ হয়—এইবার ঘূর্ণীর পাকে পড়ে ঘুর্তে আরম্ভ করেছে—আবার যে মাথা তোলে দেখি, না ভাই, কুকুরটার জন্য একটা কিছু

করতে পারলে হতো; এ সময় যদি গ্যাট থেকে পাঁচার পয়সা দিয়েও একগাছ দড়িটড়ি পাওয়া যেত, তাহলে কিনারা থেকে ওর পানে ছুড়ে দিতাম, বেটা যে চালাক—একবার দড়িটা কামড়ে ধরলে ওকে ডাঙ্গায় তোলা মুস্কিল হতো না।”

“কশম্ আল্লার—আমার সাম্‌নে কেউ জলে ডুবে মর্‌বে, চুপটি করে দাঁড়িয়ে তা দেখতে পারবো না—কত বদসুরত বেতমিজ লোককে বাঁচিয়েছি, ও ত তবু নিমকহালাল পোষা কুকুর। হয় আজ ওকে জল থেকে তুলবো, না হয় ওর সাথেই কর্ণফুলীর জল খেয়ে ডুবে মর্‌বো।”

মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে শপথ করা বড়ই ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য, কিন্তু আবদুল কাদের সারেংএর মমত্বপূর্ণ হৃদয়ের এই আবেগজনিত অপরাধ ভগবান বোধ হয় বহুদিন পূর্ব্বেই মার্জ্জনা করিয়াছেন।

কাদের মিঞার যেই কথা সেই কাজ। নিকটে একখানা জেলেদের ছোট ডিঙ্গি বাঁধা ছিল—“আদাব জোনাব ভাই” বলিয়া সারেং তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া দড়ি খুলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় টানিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্য সীমায় উপনীত বিশাল দেহ পেন্সনভোগী ব্যক্তির এই আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা দেখিয়া জোনাব আলী নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ অঞ্চলে দাঁড় টানায় আবদুল কাদেরের সমকক্ষ খুব কম লোকই দেখা যাইত। দুই হাতে দাঁড় ধরিয়া কয়েক বার জোরে টান দিতেই কাদের সারেং অনেকটা আগাইয়া গেল। তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষ হইতে কাহাকেও বাঁচাইতে হইলে লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া যথা সত্বর নৌকা লইয়া যাওয়ার উপর সমস্তই নির্ভর করে। কাদের এ কৌশল জানিতেন, তাই দুই পাঁচ হাত আগে গিয়া দাঁড় থামাইতেই স্রোতোবেগে কুকুরটি আপনিই নৌকার পার্শ্বে ভাসিয়া আসিল। ইহার আগে বার দুই ঢেউয়ের তলায় পড়িয়া কুকুর বেচারা অনেক খানি জল খাইয়াছিল। সাঁতার কাটিবার আর তাহার শক্তি ছিল না—পুনরায় হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবার ডুবিলে বোধ হয় আর উঠিতে পারিত না, এমন সময় কাদের মিঞা নৌকা হইতে হাত বাড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার ঘাড়ের চামড়া ধরিয়া একটানে নৌকার পাটাতনের উপর তুলিয়া ফেলিলেন। কুকুরটা কাত হইয়া অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিল। তাহার নাক মুখ দিয়া অনর্গল জল বাহির হইতেছিল।

কাজ শেষ হইতেই হাল্‌কা ডিঙ্গি খানি পশ্চাতে ফিরাইয়া সারেং সবেগে দাঁড় টানিয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জোনাব বুড়া চলিয়া যায় নাই—নৌকা ধারে লাগিতেই সে দড়ি ধরিয়া খোঁটায় বাঁধিয়া ফেলিল।

দয়ার্দ্রচিত্ত আবদুল সংজ্ঞাহীন কুকুরটিকে কোলে তুলিয়া ডাঙ্গায় নামাইয়া পেট হইতে জল বাহির করাইয়া তাহার যথারীতি শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিহিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কোনও নিমজ্জমান মনুষ্যশিশু এইরূপে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার পাইলে তাহার আর ইহা অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে পরিচর্য্যা হইত কি না সন্দেহ।

ভাগ্যক্রমে কুকুরটার মনের তেজের ন্যায় দেহের তেজও বড় কম ছিল না। জলটলগুলা বাহির হইয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই সে বেশ একটু সামলাইয়া লইল—যেন সন্ত জলে ডোবা কুকুরই নয়। জলে মগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মতিগতিরও হঠাৎ যেন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনিব যে কি প্রকৃতির লোক, এত দিনে সেটা যেন তাহার ঠিক বোধগম্য হইল। সে যে তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া গিয়াছে, সেটা আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। এত করিয়াও যাহার মন পাওয়া গেল না, তাহার জন্য বৃথা প্রাণ দিয়া আর লাভ কি? অনুকূল বাতাসে জাহাজ খানি যেরূপ দূরে গিয়া পড়িয়াছে, এখন তাহা ধরিবার ভরসা করা পাগলামী মাত্র। মনে মনে বোধ হয়, এইরূপ একটা কিছু "বুঝসমজ" করিয়া কুকুরটি যেন নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ হয় কোন সুনিপুণ চিত্রকরও কুকুর দার্শনিকের চিত্র আঁকিতে গিয়া তুলিকার সাহায্যে এরূপ স্বাভাবিক ভাববিন্যাসে সমর্থ হইত কি না সন্দেহ। সে ভঙ্গী ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। যেন মানুষের সঙ্গে বহুদিন ব্যবহার করিয়া সকল ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। "বিষম নটী" ভাগ্যদেবীও এবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে, জীবনে এখন আর আশা ভরসার স্থল কোথায়? মূক হতাশ্বাসের এরূপ স্পষ্ট অভিব্যক্তি কুকুরের মুখে খুব কমই দেখা গিয়া থাকে। আশাহীন বিষাদ ব্যতীত অপর কোন ভাবই তাহার হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল না—এ কথা বলিলে হয় তো এ জন্তুটির প্রতি অবিচার করা হইবে। অপরিচিত রক্ষাকর্ত্তার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা থাকিলেও হয় তো সে ভাবিতেছিল "ইনি ত আমার জন্য যথেষ্টই করিয়াছেন, আর উঁহাকে জ্বালাতন করি কেন? উনিও হয় তো মনে করিতেছেন, এই বেলা সরিয়া দাঁড়াই নতুবা এ আপৎ আমার ঘাড়েই আসিয়া জুটিবে। এখন রাস্তার হাঘরে কুকুরগুলার ন্যায় অপরিচিত স্থানে এ দুয়ার ও দুয়ার করিয়া বেড়ান আর লোকের লাথি ঝাঁটা খাইয়া রাস্তা ঘাটে পড়িয়া থাকা ছাড়া আমার

আর উপায় কি? সংসারে নিরাশ্রয় হওয়া মানুষের পক্ষে যেরূপ কষ্টকর, কুকুরের পক্ষেও তাহার চেয়ে বড় কম নহে। যাহার চাল নাই চুলা নাই, তাহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ কি?

দুরবস্থায় পড়িলে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মানুষের মুখের ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আজ এই প্রভু পরিত্যক্ত কুকুরের মুখেও যেন তেমনি ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল। বিশেষ করিয়া সারমেয় মহাশয় নীচেকার ওষ্ঠটি বাহির করিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়াছিলেন, তাহা একবার লক্ষ্য করিলে তাহার বেদনাতুর বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয় সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ থাকিত না।

আবদুল কাদের সোৎসুকদৃষ্টিতে কুকুরের প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যেন এই মূক চতুষ্পদের মনের কথা তাঁহার কাছে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। এ অস্পৃশ্য জানোয়ারটির উপর কেন যে তাঁহার এত দরদ হইল—কেনই বা তিনি আজ অন্য দিকে মন ফিরাইতে পারিতেছেন না, তাহা সাহেব মিঞা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

তিনি আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, কুকুরটা যদি তাহার উপস্থিত মনের ভাবগুলি লিখিয়া বা মুখে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ সহরময় কি মজাই না লাগিয়া যাইত। হঠাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া নিকটবর্ত্তী কোনও সরকারী কার্য্যালয়ে ঘড়ি বাজিয়া উঠিল। কাদের মিঞা স্বগত বলিতে লাগিলেন, "এদিকে ত ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া অনেক কটাই বাজিয়া গেল, আজ বাড়ী গিয়া ভাত তরকারী ঠাণ্ডা খাইতে হইবে। দেরীর জন্য রাঁধুনির কাছে যে কত কথাই শুনিতে হইবে, তাহা কে জানে। কুকুরটারও দেখছি আমার মতই ত্রিসংসারে কেহই নাই—আমি ফেলিয়া গেলে আর কেহই উহার কোনও তত্ত্ব লইবে না। দেখি একবার যদি সঙ্গে আসে।"

আবদুল কাদের কুকুরের কাছে আগাইয়া আসিলেন, দেখিলেন সে সেই একভাবেই বসিয়া যেন অকূল চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। দেখিয়া কাদের মিঞা মিষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আর বাপ্ মিছামিছি মন খারাপ করিয়া আর লাভ কি—তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ ত চুকিয়াই গিয়াছে, এখন ভাবনা চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গে আয়, বাড়ী গিয়া আহারের চেষ্টা করা যাক্।" শুধু মুখের কথায় তাহাকে রাজী করান যাইবে না মনে করিয়া সাহেব মিঞা

নিজের কাঁধ হইতে চাদরখানি নামাইয়া তাহার গলায় কলারে বাঁধিয়া লইলেন। সেবার কিন্তু কুকুরটা আর কোনও ওজর আপত্তি করিল না, সুবোধ বালকের ন্যায় ধীরে ধীরে জীবনরক্ষকের সহগামী হইল।

চট্টলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা চট্টলসন্তান নবীনচন্দ্রের ন্যায় স্বভাব-কবির পক্ষেই সম্ভবে। শৈলনিতম্বিনী সাগরাঞ্চলা ধরিত্রীর সে মনোহারিণী রূপ যিনি ভাবুকের চক্ষে একবার দেখিয়াছেন, তিনি জীবনে আর বোধ হয় তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। পাহাড়ের ধারে সেই গর্জ্জন সামলিসের শ্রেণী—বেলাভূমে চঞ্চল চলোর্ম্মির সে অপূর্ব্ব লহরীলীলা বর্ণনার চেষ্টা করিব না—করিলে এ প্রেমকাহিনী-বর্জ্জিত কুকুরের গল্পে মানাইবে কেন?

[ক্রমশঃ।

আর্য্য জাতির যন্ত্রমুক্ত অস্ত্র।*

[লেখক—শ্রীললিতমোহন রায়।]

চতুর্ব্বিধ মায়ুধম্—"মুক্তং অমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ"। আয়ুধ চারি প্রকার—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত।

যাহা হস্তদ্বারা শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা যায়, তাহার নাম অস্ত্র—যেমন তীর, বোমা প্রভৃতি। যাহার একাংশ হাতে থাকে, অন্য অংশ শত্রুর প্রতি আঘাত করা যায়, তাহার নাম "শস্ত্র" যেমন খড়্গ কৃপাণাদি; বল্লম, বর্শা, গদা প্রভৃতির নাম মুক্তামুক্ত। আর যে অস্ত্র যন্ত্র সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম "যন্ত্রমুক্ত" যেমন বন্দুক প্রভৃতি। কামান প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রে "যন্ত্রমুক্ত" নামের বিষয়ীভূত। অন্যান্য অস্ত্রের বিষয় আলোচনা না করিয়া অদ্য আমরা "যন্ত্রমুক্ত" অস্ত্রটী কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ন কূটৈ রায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপুণ
ন কর্ণিভি নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নি জ্বলিত তেজনৈঃ। ৯০।৭। অধ্যায়, মনু—

মহাত্মা মনু বলিয়াছেন:—যোদ্ধৃগণ কখনও কূট আয়ুধ অর্থাৎ বহিঃ কাষ্ঠময় অন্তর্গুপ্ত শস্ত্র, অস্ত্র অথবা বিষাক্ত শর, বিষাক্ত গুলি কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র (কামান

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (বিরাট শাখা) ৫ম অধিবেশনে পঠিত।

বন্দুক) ব্যবহার করিবেন না। তাই মহামতি শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন, নালিকাস্ত্রেণ তদ্‌যুক্তং মহা হ্রাসকরং বিপোঃ। ৩৩৬।৪। স ৭ প্রকরণ শুক্রনীতি। পূর্ব্বকালের "নালিকাস্ত্র" "কর্ণী" অথবা "আগ্নেয়াস্ত্রই" যে আধুনিক "কামান বন্দুক", আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপিতামহগণই ইহার উদ্ভাবন করেন, এবং "কালস্ত কুটিলা গতি"র প্রভাবে আমরা এখন ঐ সকল যন্ত্রের ব্যবহার বা প্রস্তুত প্রণালী ভুলিয়াছি। এই আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয় আমাদের শাস্ত্রে ভুরিয়শঃ উল্লিখিত আছে। ইহার নাম কোথাও বা কর্ণী, কোথাও বা কর্ণকাবতী, কোথাও বা "শতঘ্নী", "সুর্ম্মী", "নালিকাস্ত্র" প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত হইয়াছে।

মহামতি শুক্রাচার্য্য তাঁহার শুক্রনীতিতে বলিতেছেন :--"নালিকং দ্বিবিধ-জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।" ১৯৫। শুক্রনীতি। নালিকাস্ত্র দুই প্রকার— "বৃহন্নালিক" ও "ক্ষুদ্র নালিক"। এই বৃহৎ নালিক অস্ত্রই 'কামান' ও ক্ষুদ্র নালিক অস্ত্রই 'বন্দুক।'

তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকম্।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিল বিন্দুযুতং সদা ॥ ১৯৬
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবথওধৃত কর্ণমূলকম্।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুল বিলান্তরম্ ॥ ১৯৭
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণ সন্ধাতৃশলাকা সংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ ॥ ১৯৮

যাহার দৈর্ঘ্য আড়াই হাত গোড়ার দিকে উত্তম কাষ্ঠনির্ম্মিত উপাঙ্গ বা বাঁট, নালের ভিতর মধ্যমাঙ্গুলি প্রবেশযোগ্য ছিদ্র, পার্শ্বদেশে বারুদ গাদিবার শলাকা, আগায় ও গোড়ায় লক্ষ্য ঠিক করিবার জন্য তিলবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত এবং গোড়ার দিকে একটু আড়ভাবে পলিতা দিবার রন্ধ্র ও একখণ্ড প্রস্তর ও বারুদ ধারণক্ষম কর্ণ থাকে ও যাহার কল টিপিলে আঘাত দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করে—তাহার নাম "ক্ষুদ্র নালিক" পদাতিক অশ্বারোহী সৈনিকেরা ইহা লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই প্রমাণের দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালের নালিকাস্ত্রের বারুদ ধারণক্ষম "কাণ" থাকিত। আগায় ও গোড়ায় লক্ষ্য ঠিক করিবার নিমিত্ত তিলবিন্দু থাকিত। এই কথা যে কেবলমাত্র শুক্রাচার্য্যই বলিয়াছেন, এমত নহে—মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবও বলিয়াছেন—

বাণভল্লকরাবর্ত্ত কাষ্ঠচ্ছেদনমেব চ।
বিন্দুকং গোলকযুগং যো বেত্তি স জয়ীভবেৎ ॥—ধনুর্ব্বেদ সংহিতা।

নালিকাস্ত্রের 'কাণ' থাকিত বলিয়া উহা "কর্ণকাবতী" নামের বিষয়ীভূত

হইয়াছিল—আর বিন্দুক থাকে বলিয়াই নালিকাস্ত্র "বন্দুক" নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

তাই আমরা নালিকাস্ত্রকেই "কর্ণকাবতী" প্রভৃতি শব্দে সংসূচিত হইতে দেখিতে পাই।

"এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবতী এতয়াহস্ম বৈ দেবা
অসুরান্ শততর্হান্ তৃংহন্তি।"—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ।

মনুও বলিয়াছেন—"নকর্ণিভির্ণাপি দিগ্ধৈর্ণাগ্নি জ্বলিত তেজসৈঃ।" আমাদের মনে হয়, বেদের এই কর্ণকাবতী শব্দ ক্রমশঃ ভাষার পরিবর্ত্তনে Latin ভাষায় "Canna" হইয়া পরে ফরাসী ভাষায় "Canon" ও পরিশেষে ইংরাজী ভাষায় "Cannon" শব্দে পরিণত হইয়াছে। সেই "Cannon" হইতে আবার আমরা "কামান" শব্দ তৈয়ারি করিয়াছি !!! আর মনুসংহিতার "কর্ণী" শব্দ ভাষার বিকারে "Gun" শব্দে পরিণত হইয়াছে !!

যাহা হউক, এক্ষণে সপ্রমাণ হইল যে, শাস্ত্রোক্ত "কর্ণকাবতী" "কর্ণী" বা "নালিকাস্ত্র" প্রভৃতি, আর একালের "কামান-বন্দুক" একই পদার্থ। কেবল ভাষাগত পার্থক্য মাত্র।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "নালিকাস্ত্র" দুই প্রকার—ক্ষুদ্র নালিকাস্ত্রের বিবরণ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। এইবার আমরা দেখিব যে, যাহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় "Artillery" এবং "Mountain Battery" বলে এরূপ কিছুর ব্যবহার ছিল কি না।

মহামতি শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন :—

"যথা যথা তু ত্বকসারং যথা স্থূল বিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদি তথা তথা। ১৯৯
মূলকীল ভ্রমাৎ লক্ষ্যো সমসন্ধান ভাজিয়ৎ।
বৃহৎ নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতং
প্রবাহ্যং শকটাদৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদং।" ২০০ ৪অ।৭ প্রকরণ।

যে নালিকাস্ত্রের ত্বক সমধিক পুরু ও কঠিন নলের মধ্যের ছিদ্র অপেক্ষাকৃত বড়, যাহাতে বড় গোলা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার ঘোড়ায় কোনও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাঁট থাকে না, দুইটী কীলক বা শঙ্কু থাকে, যাহা ঘুরাইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, যাহা শকট বা হস্তিদ্বারা বাহিত হইয়া থাকে, তাহার নাম "বৃহৎ নালিক।" ইহার দৈর্ঘ্য যত বেশী ও গর্ভ ছিদ্র যত স্থূল ইহাও তত দূরভেদী হইয়া থাকে। ইহা উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। ইহা

আজকালকার "Artillery" বা Mountain Battery হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর মহামতি শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"নালীকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ মোদিত
অত্যুচ্চ দূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতা॥" ২৭ পৃষ্ঠা। ঐ

এই নালিকাস্ত্রের বাণ (গুলি) অতীব দ্রুতগামী, ইহা নালযন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতি উচ্চ স্থানে (অতি দূরে) ও দুর্গ যুদ্ধে এই নালিকাস্ত্র প্রশস্ত।

তার পর নালিকাস্ত্র কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তদ্বিষয় তিনি তাঁহার শুক্রনীতিতে বলিয়াছেন :—

"নালাস্ত্রং শোধয়েৎ আদৌ দদ্যাৎ তত্রাগ্নিচূর্ণকং
নিবেশয়েৎ তু দণ্ডেন নালমূলে যথা দৃঢ়ম্। ২১০
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন লোলং লক্ষে নিপাতয়েৎ।" ২১১।৪ অঃ। ৭ প্রকরণ।

যোদ্ধৃগণ প্রথমে নালাস্ত্র পরিষ্কার করিবে। পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) দান করিয়া শলাকা দ্বারা দৃঢ়রূপে আঘাত করিয়া উক্ত অগ্নিচূর্ণকে বসাইবে। পরে উহার মধ্যে গোলা ও কর্ণে অগ্নিচূর্ণ দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। তাহাতেই গোলা যাইয়া লক্ষ্যে পড়িবে। সুতরাং এহেন বস্তু একালের পাশ্চাত্য "কামান বন্দুক" ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কামানের গোলা এবং বন্দুকের গুলি কিরূপ হইবে, এতদ্ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"গোলো লৌহময়োগর্ভগুটিকঃ কেবলোপি বা
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতু ভবোপিবা।" ২০৪।৪ অঃ। ৭ম প্রকরণ।

লঘুনালিক বা বন্দুকের জন্য যে গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা সীসানির্ম্মিত; আর বৃহৎ নালিক বা কামানের জন্য যে গোলা ব্যবহৃত হয়, তাহা লৌহনির্ম্মিত, এবং উহার মধ্যে কতকগুলি আবার শূন্যগর্ভ, ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি পূর্ণ। ক্ষুদ্র নালিকের গুলি "সীসক" ভিন্ন অন্য ধাতুজও হইয়া থাকে। Halhead says "Gun powder has been known in China as well as in Hindustan far beyond all period of investigation."

—*Elliot's History of India.*

কামানের প্রয়োজন সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

"সিংহাসনস্য রক্ষার্থং শতঘ্নীঃ স্থাপয়েৎ গড়ে।
রক্ষকং বহুলং তত্র স্থাপক বহু বীর্য্যতা" ॥ ১২।২৭ পৃঃ ধনুর্ব্বেদ।

রাজা আপনার সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য "শতঘ্নী" স্থাপন করিবেন। আর বুদ্ধিমানেরা তথায় অনেক বারুদ ও গোলাগুলি রাখিবেন।

একালের পাশ্চাত্যগণের ন্যায় স্ব স্ব দুর্গাদির প্রাকার সকল শতঘ্নী দ্বারা সজ্জিত রাখিতেন।

"উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নী শত সঙ্কুলাম্"। ১১ রামায়ণ, বালকাণ্ড।

ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ণনাকালেও ব্যাসদেব মহাভারতে বলিয়াছেন—

তীক্ষ্ণাঙ্কুশ শতঘ্নীর্ভির্যন্ত্রজালৈ শোভিতঃ।—আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধা তু ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ

জঘান পৃথিবীং * গত্বা তালজঘান্ সহৈহয়ান। উত্তর খণ্ড, বায়ুপুরাণ।

ঋক্‌বেদ বলিতেছেন—

"ত্বং পর্ব্বতং বজ্রেন পর্ব্বণঃ চকর্ত্তিথঃ"।

হে ইন্দ্র, তুমি বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতকে পর্ব্বে পর্ব্বে কাটিয়া ছিলে। এই ইন্দ্রের বজ্র ও কামান ব্যতীত আর কিছুই নয়। কামান দাগিয়া ইন্দ্র পর্ব্বত সকল সমতল করিয়াছিলেন মাত্র। এই জন্যই আমাদের একটী প্রবাদ বাক্য আছে যে, ইন্দ্র পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি কামান দাগিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, তাই এই গল্পের উদ্ভব হইয়াছে। অনেকে হয়ত বলিবেন বজ্র ত "বাজ"—বাজ পড়িয়া মানুষ প্রভৃতি জীবজন্তু মরে, গাছ পুড়িয়া যায়। এ সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয় না মানিয়া "বজ্র" যে কামানের ন্যায় "অস্ত্র" বিশেষ তাহা কেমন করিয়া মানিয়া লইব? তাহার উত্তর এই যে, এ "বজ্র" যে মেঘজ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎ নহে, পরন্তু কামান বন্দুকের ন্যায় "অস্ত্র" বিশেষ তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

"দেবাসুর বিমর্দ্দেষু বজ্রাশনি কৃতব্রণম্"।—রামায়ণ।

অর্থাৎ যখন দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে বজ্র ও অশনি লইয়া যুদ্ধ হয়, তখন ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে তাহাদের শরীরে ব্রণ বা ক্ষত হইয়াছিল। সুতরাং "বজ্র" বিদ্যুৎপাত নহে।

"বজ্রমস্ত্রং নবশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবতং তথা

দং প্রদাস্যামি যে শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দনম্।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—আমি তোমাকে বজ্রাস্ত্র শৈবশূল, শুষ্ক ও আর্দ্র সংজ্ঞক দুইটী অশনি প্রদান করিতেছি।

তাহা হইলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহা দানের যোগ্য

---

* "পৃথিবী" অর্থে ভারতবর্ষ।

তাহা মেঘজ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎ নহে। অতএব বজ্র মেঘজ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎ নহে, পরন্তু অস্ত্রবিশেষ। অবশ্য ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্যে একস্থলে বলিয়াছেন :—

"অমুক্ত" অস্ত্রের মধ্যে "বজ্রই" প্রধান। বজ্র কি? তাহা উত্তমরূপে বুঝা যায় না, সুতরাং বুঝানও যায় না।" বজ্র যে অস্ত্রবিশেষ তাহা তিনি স্বীকার করিয়াও কেন যে এইরূপ লিখিয়াছেন, "বজ্র কি? তাহা উত্তমরূপে বুঝা যায় না, সুতরাং বুঝানও যায় না।" তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আর "বজ্র" যে আয়ুধ তাহা আমরা গীতা পাঠেও বেশ বুঝিতে পারি। গীতা বলিয়াছেন—"আয়ুধানামাহং বজ্রং।" ২৮ শ্লোক। ১০ অধ্যায়।

অবশ্য এখন প্রশ্ন হইবে যে, যদি এইরূপ বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদি ছিল, সেগুলি নষ্ট হইল কি প্রকারে?

আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ করা প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিহ্ন নহে। আর সেদিনে Mr. Loyd George বলিয়াছেন —"war is a relic of barbarism"। বিশেষতঃ এই সমস্ত অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ প্রকৃত বীরত্ব নহে; পরন্তু মহা লোকক্ষয়কর—অতএব এই সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত।

তাই মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—

"ন কুটৈ রায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নি জ্বলিত তেজনৈঃ।"

কাজেই ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ও ব্যবহার একরূপ বন্ধ হইল। এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গ্রন্থগুলি খণ্ডপ্রলয় বা জলপ্লাবন, কীটদংশন এবং অন্য জাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গৃহদাহ ও অন্যান্য উৎপীড়নে নিঃশেষিত হইয়াছে।

কাশ্মীরে শাস্ত্র-চর্চ্চা।

[লেখক—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।]

(৩)

কাশ্মীর প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে; বিখ্যাত জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ ভাস্করাচার্য্যের তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল, কৈয়ট মম্মট এবং উব্বট—ইহারাই তাঁহার তিন পুত্র, কন্যার নাম লীলাবতী। কিন্তু এই

প্রবাদকে অত্যন্ত অমূলক মনে করিবার পক্ষে লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কৈয়টোপাধ্যায় স্বরচিত মহাভাষ্য টীকার প্রারম্ভে নিজেকে "জৈয়টাত্মজঃ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কৈয়টের পিতা ভাস্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত "লীলাবতী" নামক অঙ্ক-শাস্ত্রের গ্রন্থে অনেক স্থলে তিনি লীলাবতীকে "প্রিয়ে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্রী সম্বন্ধ ছিল না, পরন্তু তাহা হইতে অন্য প্রকার সম্বন্ধই বর্ত্তমান ছিল, ইহা এই সম্বোধন দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। যখন এইরূপে এই প্রবাদে বর্ণিত বিষয়ের অর্দ্ধভাগের অমূলকত্ব সুস্পষ্টরূপে সিদ্ধ হইতেছে, তখন অপর অংশেও কোনরূপেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।

কাব্যপ্রকাশের "সুধাসাগর" ব্যাখ্যার উপক্রমে ভীমসেন দীক্ষিত লিখিয়াছেন, কৈয়ট, উব্বট এবং মম্মট, তিন সহোদর ছিলেন; ইহাঁদের পিতার নাম জৈয়ট ছিল। ইহাঁদের সহোদরত্ব-সাধক অন্য কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে ইহাঁরা তিন জনেই কাশ্মীরী ছিলেন, ইহা নামের সাদৃশ্যে ও জনশ্রুতি বলে স্থির করা যাইতে পারে।

কৈয়টের নিবাস অবন্তিপুরে ছিল, ইহা কাশ্মীরের প্রচলিত জন-প্রবাদ। কিন্তু তত্রত্য গবেষণা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, শ্রীনগরের প্রান্তবর্ত্তী 'বিচার নাগ' নামক পল্লীই কৈয়টের আবাসভূমি ছিল। আমরা উভয় স্থানই পরিদর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রীনগর হইতে অনন্তনাগের (আধুনিক নাম ইসলামাবাদ) পথে বিতস্তার বালুকাময় তীরে অবন্তিপুর অবস্থিত। এখন অবন্তিপুরের সবই গিয়াছে। প্রাচীন রাজধানীর সামান্য ভগ্নাবশেষ যাহা ছিল, তাহাও ভূগর্ভে এতদিন প্রোথিত ছিল; কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় B. A. (Cantab) মহাশয়ের চেষ্টায় ঐ ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়া দর্শকগণের কৌতুহল কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত করিতেছে। অবন্তিপুরের নিকটে এখন বিতস্তা নদী যদিও কীর্ত্তিনাশার ন্যায় বিস্তৃত অথবা প্রবল নহে, তথাপি স্থানীয় জনশ্রুতি দ্বারা জানিতে পারা যায়, রাজধানীর প্রায় সমগ্র অংশই কালবশে নদীগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। অবন্তিপুরে এখন একখানি ডাকবাংলা ও একটী পোষ্টাপিস আছে। নগরের প্রাচীন ভগ্নাবশেষের কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী বর্ত্তমান; আশে পাশে

দূরেও মুসলমান পল্লী। এই রাজধানী বিখ্যাত পরাক্রমশালী কাশ্মীর নৃপতি অবন্তিবর্ম্মা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী সুবৃহৎ ভগ্ন প্রস্তর মন্দির ও তাহার চত্বরাদি উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, কৈয়টো-পাধ্যায় এই অবন্তিপুরের পর পারে ব্রাহ্মণ-পল্লীতে বাস করিতেন। এখন অবন্তিপুরের পর পারে বহুদূর পর্য্যন্ত জনমানবের বসতি নাই। কৈয়ট সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী গল্প আমাদের নবদ্বীপের বুনো রামনাথের গল্পেরই অনুরূপ; গল্পটী এই;—

কৈয়টের পাণ্ডিত্য কীর্ত্তি দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার পাণ্ডিত্য যেমন অনন্যসাধারণ ছিল, সেইরূপ দারিদ্র্যেও তিনি অসামান্য ছিলেন। তাঁহার সুযশে আকৃষ্ট বিদেশাগত বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত; কিন্তু তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন অতি কষ্টেই নির্ব্বাহিত হইত। অবন্তিপুরের তাৎকালিক অধিপতি অতিশয় ধার্ম্মিক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পণ্ডিতগণের পক্ষে তিনি কল্পতরু স্বরূপ ছিলেন। কৈয়টোপাধ্যায় কখনও এই নৃপতির নিকট উপস্থিত হন নাই। তিনি সর্ব্বদা নিজ গৃহে বিদ্যাচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। অবন্তিপুরের রাজা কৈয়টের অনন্য-সামান্য পাণ্ডিত্য-খ্যাতির সহিত পরিচিত ছিলেন; যখন তাঁহার সেই অসামান্য দারিদ্র্যের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কৈয়টের পাণ্ডিত্য দারিদ্র্য এবং সর্ব্বোপরি অন্য-দুর্লভ নিস্পৃহতা, তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া কৈয়টের কুটীর-দ্বারে উপস্থিত করিল। অধ্যাপনায় নিমগ্নচিত্ত উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যথারীতি শিষ্টাচারাদির পরে রাজা যখন তাঁহাকে সবিনয়ে পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন উপাধ্যায় উত্তর করিলেন, তিনি নিজে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। সাংসারিক সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহার পত্নীই করিয়া থাকেন। রাজা তখন উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তথায় এক নিরাভরণা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গৌরবে ও মহনীয়তায় নত হইয়া গেল। শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূত-হৃদয়ে প্রণাম করিয়া, তিনি যখন তাঁহার সাধ্যানুসারে সেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন এই মহীয়সী মহিলা রাজাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যানে গমন করিলেন। বঙ্গদেশের ন্যায় কাশ্মীরেও প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই গৃহ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যান থাকে। সেই উদ্যানে নানা প্রকার সাময়িক শাক ও তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন করা হয়। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া উপাধ্যায়-পত্নী রাজাকে বলিলেন,

মহারাজ, এখনও আমাদের বাগানে দুইটী "কুষ্ম" (লাউ) অবশিষ্ট আছে; অতএব এখনও আমাদের অন্যের সহায়তা গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় নাই। এই স্থলে রাজা অনেক অনুরোধ করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই; তাঁহাকে নিরাশ-চিত্তে ফিরিতে হইয়াছিল।

এই গল্পটী আমি লাহোর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ কৌল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। আমাদের বঙ্গদেশের একটী গল্পের সহিত এই গল্পের অত্যন্ত সাদৃশ্য কিছুমাত্র বিস্ময়াবহ নহে। আমাদের প্রাচীনকালের মণীষিগণ বিদ্যাচর্চ্চায় এইরূপ তন্ময় ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে অসীম পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য নিস্পৃহতা বিদ্যমান ছিল; এই সকল মহাত্মার পবিত্র-প্রভাবে ইহাঁদের পত্নীগণও এইরূপ অসামান্য প্রভাবে ও গৌরবে মহনীয়া হইয়াছিলেন। ভারতের সেই অতুলনীয় জ্ঞানচর্চ্চার গৌরবময় অতীত যুগ আর ফিরিবে কি না, কে বলিতে পারে?

কথিত আছে, কৈয়টোপাধ্যায় এক সময় পবিত্র বারাণসী পুরীতে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করেন। তিনি যথাশাস্ত্র তীর্থকৃত্য নিস্পাদন করিয়া, পণ্ডিতগণের দর্শনের অভিলাষী হন। সেই দিন একস্থানে পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ-সভা ছিল। তথায় গেলে একত্র সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হইবে মনে করিয়া উপাধ্যায় মহাশয় সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার কাশ্মীরদেশোচিত পরিচ্ছদ দেখিয়া, সকলেই তাঁহাকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতগণ আশ্বস্ত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়গণ, প্রথমে সভায় যে বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল, উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তাহা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন, পরে সেই সম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয়ের নিজের মন্তব্য জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রত্যুত্তরে উপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া কাশীর পণ্ডিতগণ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গেলেন; তাঁহার প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে, এবং প্রতিপাদন কৌশলে সকলে বিমুগ্ধ হইয়া নম্রহৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং মহাভাষ্যের এক খানি টীকা রচনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের ফলেই পরে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক মহাভাষ্যের টীকা "মহাভাষ্য-প্রদীপ" রচিত হইয়াছিল।

এই প্রবাদটী পূজ্যপাদ গুরুবর মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। পরবর্ত্তী গল্পটী ডাক্তার কৌল মহাশয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছে;—

কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কতিপয় ছাত্র কাশী হইতে উপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। তাঁহারা উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেন; উপাধ্যায় অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও ছাত্রগণকে বিদ্যা ও অন্ন দুইই দান করিতেন। এই ছাত্রগণ উপাধ্যায় মহাশয়ের অতিমাত্র দারিদ্র্যের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অবন্তিপুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত অনুযোগ করেন। এইরূপ একজন অলৌকিক প্রতিভাশালী পণ্ডিতের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচাইবার জন্য রাজার কিছুমাত্র মনোযোগ নাই, ইহা যে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের বিষয়, ইহাও এই ছাত্রটী রাজাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রত্যুত্তরে রাজা বলিলেন, তিনি উপাধ্যায়ের যথাসাধ্য সেবা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন; কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় সে সেবা যদি গ্রহণ না করেন, তবে তিনি কি করিতে পারেন? এই কথা শুনিয়া ছাত্রটী বলিলেন, আপনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন; আপনার প্রদত্ত বস্তু যেরূপে হউক, আমি উপাধ্যায়কে গ্রহণ করাইতে পারিব, আশা করি। রাজা তাঁহার কথানুসারে কয়েক খানি গ্রাম উপাধ্যায়কে দান করিয়া এক খানি দান-পত্র ছাত্রটীর হস্তে দিলেন। ছাত্রটী এই দানপত্র আনিয়া উপাধ্যায়ের হস্তে দিলে, তিনি ইহা পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; ছাত্রকে অনেক প্রকার অনুযোগ করিয়া, তিনি কিছুতেই যে ঐ দান লইতে পারেন না, তাহা বুঝাইয়া দিলেন; অবশেষে উপাধ্যায়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া সেই ছাত্রটী রাজার নিকট দানপত্র খানি ফেরত দিতে গেলে রাজা বলিলেন, তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহা কোন মতে ফিরাইয়া লইতে পারেন না; কারণ, এরূপ করিলে তিনি (রাজা) ধর্ম্মে পতিত হইবেন। ছাত্রটী অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িলেন; তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় উপাধ্যায়কে সেই দান গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না; এইবার উপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট গেলেন। তিনি ছাত্রের নিকট সমুদায় জ্ঞাত হইয়া এবং তাহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া নিজে দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিরুদ্বেগ করিলেন। যখন উপাধ্যায় জানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র ঐ দান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এইবার তাঁহার গৃহে অর্থ প্রবেশ করায় সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-লিপ্সা ও বিলাস প্রবেশ করিয়া পবিত্র আশ্রম কলঙ্কিত করিবে; নিষ্ঠা ও ত্যাগ দূরে যাইয়া শাস্ত্রচর্চ্চার সেই পবিত্র ব্রত নষ্ট করিয়া ফেলিবে,—এই চিন্তায় কৈয়টোপাধ্যায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এই ক্ষোভে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া

কাশীবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার শেষ জীবন কাশীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা জগতে একান্ত দুর্লভ। বিদ্যার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠা ও ত্যাগশীলতা জগতে অন্যত্র দুর্লভ হইলেও আমাদের পবিত্র জন্মভূমি ভারতবর্ষে দুর্লভ নহে; অধিক নহে, যাঁহারা এই বঙ্গদেশেরই ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই জানেন, এ দেশের পণ্ডিতেরা কিরূপ নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহিত শিষ্যগণকে বিদ্যা দান করিতেন। অত্যধিক দারিদ্র্যের দ্বারা পরিপীড়িত হইয়াও অন্য স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই ভিক্ষান্ন দ্বারা ছাত্রগণকে সন্তানাধিক স্নেহে পোষণ করিতেন; বিদ্যাদানে সেই উৎসাহ, সেই একাগ্রতা, সেই আত্মবিস্মৃত ভাব, মনে করিলেও হৃদয় আনন্দে ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। এক একজন পণ্ডিত-পত্নী প্রতি বেলায় অন্যূন ৩০।৩৫ জন ছাত্রের রন্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে সানন্দে মাতৃস্নেহে ভোজন করাইতেন; আবার এই মাতৃগণ পীড়িত ছাত্রগণকে কোলে বসাইয়া নিজ হাতে একটী একটী করিয়া ধীরে ধীরে খাওয়াইয়া দিতেন। এই ছাত্রসেবা ছাত্রগণের দুঃখমোচন এবং বিদ্যাদানই এই সকল দম্পতীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া প্রতিভাত হইত। এখন দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক উন্নতি হইবে; কিন্তু যদি এক একটী নগরে চারিটী অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও সেই ছাত্রপ্রীতি, ছাত্রের প্রতি সেই পিতৃমাতৃ স্নেহ, বিদ্যাদানে সেই নিষ্ঠা, সেই পবিত্র ত্যাগ, কখনই ফিরিয়া আসিবে না। ইংলণ্ডে ডাক্তার জনসন্ একজন জন্মিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বস্ওয়েল জন্মগ্রহণ করায়, ডাক্তার জন্সনের নিষ্ঠা ও ত্যাগ পৃথিবীর সকলেই জানিতে পারিয়াছে। আমাদের এই ভারতভূমিতে নিষ্ঠা ও ত্যাগের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, অনেক জন্সন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই; কিন্তু বস্ওয়েল একজনও জন্মেন নাই বলিয়া তাঁহাদের সেই লোকোত্তর ত্যাগ ও নিষ্ঠা পৃথিবীর জনসমাজে অল্পই প্রচারিত হইয়াছে।

পাগলা মাষ্টার।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

বাটীর সম্মুখে ছোট বাগানে বসিয়া প্রফেসার সেন ও বন্ধু প্রফেসার রায় একটা সাঁওতালের সঙ্গে কথা কহিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সেন আনন্দ প্রকাশ করিল। আমি দিগ্বিজয় ও বসুদামকে দেখাইয়া বলিলাম—কি প্রফুল্ল? এঁদের চিন্‌তে পার?

সে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—হাঁ্যা, খুব পারি। সেই সময় বসুদাম বাবু একটু তৎপর হ'লে—

বসুদাম আমার নিকট সে অপবাদ শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিল, আবার সেই কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া একটু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল—কেন, মশায়ও ত মনে করলে চোর ধরতে পার্‌তেন। কাপুরুষ যে কেবল আমি একেলা—

প্রফুল্ল তাহার ভ্রমটা বুঝিল। অন্যত্র হইলে সে তর্কে পরাজয় স্বীকার করিত না। এ ক্ষেত্রে বসুদাম তাহার অতিথি, তাই সে আত্ম-সংযম করিয়া বেশ একটু মোলায়েম হাসি হাসিয়া বলিল—এক ভস্ম আর-ছার, দোষ গুণ কব কার? বসুন বসুন। ওরে বেটা ভোমা চেয়ার আগুইমে। দাঃ ইউমিউ আগুইমে। (চেয়ার নিয়ে আয়! জলখাবার নিয়ে আয়)

আমি বলিলাম—বাঃ তুমি তো বেশ সাঁওতালি শিখেছ।

সে বলিল—ভোমা বেটা আমার বাড়িওয়ালা সুরেশ মিত্তিরের বাগানের মালি। আমার মাষ্টার। ভোমা উনিদো আপেলো হড়্ রড়্ শেঁড়া হোচোয় রাম? (এঁকে তোদের সাঁওতালি ভাষা শেখাবি?)

ভোমা ভাবিল, অধ্যাপক তাহাকে পরিহাস করিতেছে। সে বলিল—আম্ মুক্তিয়াকাপা? (ঠাট্টা করছ?)

আমি তাহাকে বিস্মিত করিবার জন্য বলিলাম—ইন্ মাছে নাছে শেঁড়াই কেদাই। (আমি কিছু কিছু শিখেছি।)

ভোমার বড় আনন্দ। সে বলিল,—বাং বাং আম্মঃতঃ রড়্দো শেঁড়ায়া কেদাম্। (না না, তুই সব কথা শিখেছিস্)

সে চেয়ার আনিতে ছুটিল। প্রফুল্ল বলিল,—তুমি যেমন সাঁওতালী কথা

ব'লে আমাকে বিস্মিত করলে, আমিও তোমাকে একটা সংবাদ দিয়ে বিস্মিত করব।

আমি বিষয়টি জানিতে চাহিলাম। সে বলিল—আজ কাগজে পড়লাম, এই রেলে আর একটা চুরী হ'য়েছে। কাশিম করিম ব্যাপারীর—

"বিশ হাজার টাকা।"

সে বলিল—হাঁ! বর্ণনা পড়ে যে রকম মনে হল, তাতে বোধ হয় তার গাড়ীর দ্বিতীয় আরোহীটি এই অধীন। তবে লোকটাকে দেখলে—

আমি বলিলাম,—তুমি? তুমি গালুডিতে নেমে গিয়েছিলে? হাতে একটা মাত্র হ্যাণ্ড ব্যাগ?

সে বলিল—হ্যাঁ, সমস্ত বর্ণনাটা পড়েছি। আমার মনে হচ্চে লোকটা আমারই গাড়ীতে বাম্‌ড়া ষ্টেসনে উঠে ছিল। নিশ্চয়ই সে। লোকটা ফর্সা, কালো ট্রাঙ্ক—

আমি বিস্ময়ে অধীর হইতেছিলাম। কাশিম করিমের সহযাত্রী যে প্রফুল্ল, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। আমি বলিলাম—তুমি গালুডিতে নেমেছিলে কেন?

সে বলিল—ঘাটশিলায় ট্রেণ থামে না। রাত্রি হ'লে এলারাম শিগ্‌নাল টেনে আস্তে আস্তে নেমে পড়া যায়—

সকলে হাসিল। আমরা পরস্পরকে আরও কতকগুলা প্রশ্ন করিয়া নিঃসন্দেহে জানিলাম যে, প্রফুল্ল সে রাত্রে কাশিম করিমের সহযাত্রী ছিল। তাই বলিতেছিলাম, পোদ্দারদের চুরীর সহিত কাশিম করিমের চুরীটি একাধিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। সকলে বিস্মিত হইলাম। এমন যোগাযোগ তো সহজে ঘটে না।

আমি বলিলাম—তুমি জান না এ ব্যাপারে আরও একটু রহস্য আছে। কাশিম করিম সে রাত্রে একবার সেই কাফ্রিটাকে দেখেছিল।

সকলে বিস্মিত হইল। রায় প্রফুল্লর মুখের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল। প্রফুল্ল একটু যেন অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। শেষে বলিল,—কই আমি তো কাফ্রি দেখিনি।

আমি তাহার অশান্তির কারণটুকু উপলব্ধি করিলাম। কাফ্রিটা যে ছদ্মবেশধারী তস্কর, এ ধারণা সে বর্জ্জন করিতে একেবারে অসম্মত। আমি তাহাকে বলিলাম—হয়ত এ কাফ্রিটাও ছদ্মবেশ করেছিল।

সে উপহাসটুকু সহ্য করিল না। বিরক্ত হইয়া বলিল,—তা হ'তে পারে—হ'তে পারে কেন? সেইটাই নিশ্চিত। কিন্তু ছদ্মবেশী কাফ্রি—

আমি বলিলাম—এ বিষয়ে আমরা এক মত হ'তে পারব না।

সে বলিল—মোটেই না। কারণ সে কাফ্রিটা তোমার মানস-পুত্র। তার লালনপালনের ভার তোমার নিজের।

আমি মনে মনে হাসিলাম। সেই আসল বা ছদ্মবেশধারী কাফ্রিকে ধরিতে পারিলে দুইটা চুরীরই সন্ধান হয়, তাহা সে স্বীকার করিল না। আমার মনে কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। আমি তাহাকে আমাদের সদলবলে আগমনের উদ্দেশ্যটা বলিলাম। তাহাকে কল্যই আমাদিগের সহিত চক্রধরপুরে যাত্রা করিতে হইবে। সে স্বীকৃত হইল। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে তাহার সম্মতিই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া অন্য কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম।

(১০)

চক্রধরপুরের কোনও রেল কর্ম্মচারীকে আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করি নাই। কেবল আমার সবইন্‌স্পেক্টর রেলের সন্নিকটে একখানা বাঙ্‌লা সংগ্রহ করিয়াছিল। আমরা সদলবলে বাঙ্‌লা দখল করিলাম। সকলের পান ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া আমি সহরে জ্যাকবার্লির সন্ধান করিতে গেলাম। শুনিলাম সন্ধ্যার পর বোম্বাই মেলে সে চক্রধরপুরে আসিবে।

চক্রধরপুরে তাহার বিষয় কতকগুলা সন্ধান পাইলাম। লোকটা খুব বেশী মাত্রায় মদ্যপান করে। রেল কর্ম্মচারীদের ক্লবে সে জুয়া খেলে। তাহার জীবনের প্রধান উপাস্য আপাততঃ একজন ফিরিঙ্গি রমণী, মিসেস্ বার্ক। মিসেস্ বার্ক একজন গার্ডের বিধবা। বয়স আন্দাজ ৩২ বৎসর, কিন্তু দেখিলে তাহাকে অষ্টাদশী বলিয়া ভ্রম হয়। পোষাক পরিচ্ছদ হাবভাব খুব নূতন ধরণের। শুনিলাম চক্রধরপুর রেলওয়ে ডিষ্ট্রীক্টের ছোট বড় সকল ফিরিঙ্গি সাহেব তাহার প্রসাদ লাভে লালায়িত, কিন্তু দুর্নিবার মন্মথের এমন বিচার শক্তি যে কালো মুক্সো জ্যাকবার্লি ব্যতীত কেহ তাহার প্রণয় লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। সত্যই কবি বলিয়াছেন,—

রূপে মানাহারিণি যৌবনে চ
বৃথৈব পুংসামভিমান বৃদ্ধিঃ।
নতজ্ঞবাং চেতসি চিত্তজন্মা
প্রভুর্য্যদেবেচ্ছতি তৎ করোতি॥

তাহার বাটীর আশে পাশে ঘুরিলাম। বাঙ্‌লার সম্মুখে বাগান; নানা প্রকার মরসুমি ফুল হাসিতেছে, বাগান হইতে বাঙ্‌লায় উঠিতে বড় বড় সিঁড়ি।

সেই সোপানে দুইজন মানুষ যাইতে পারে, দুই স্থলে এমন স্থান রাখিয়া মাটির টবে মেমসাহেব অনেক বিলাতী তালবৃক্ষ সাজাইয়া রাখিয়াছে। বারান্দার ঝিলিমিলিতে অর্কিড্ ঝুলিতেছে, বারান্দায় প্রবেশ করিবার দুইটি পথ জাপানী চিক্ দিয়া বন্ধ। মাঝের গমনাগমনের পথে ফাঁপা কাঁচের চিক মৃদুমন্দ মলয়স্পর্শে দুলিতেছে, আর অতি মৃদু শব্দ করিতেছে। আপনারা ক্ষমা করিবেন, আমি কবিত্ব-শক্তিহীন পুলিস কর্ম্মচারী, বর্ণনা বিদ্যায় একেবারে আমি অজ্ঞ। কিন্তু এমন কি পুলিসের লোকেরও মনের নিভৃত অন্তস্তলে একটা কবিতার সুরে বাঁধা তার আছে—বাহিরের কবিতার ঝঙ্কার শুনিলেই সাড়া পাইয়া সে সুর বাজিয়া উঠে। এ ক্ষেত্রে বার্ক মেমের শান্ত শ্যামল কুটীরের পারিপাট্য দেখিয়া আমার প্রাণে প্রথমে সেই তার বাজিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই খুব মোটা সুরে বাঁধা আর একটা যন্ত্র বাজিয়া উঠিল—সেটা ঢাকের মত। সন্দেহ এবং মানব প্রকৃতির উপর ঘৃণায় সে বাদ্য যন্ত্রটা গঠিত, আমাদের শ্রেণীর লোকের প্রায় সারা প্রকৃতি জুড়িয়া সেই সুরের যন্ত্র বিরাজিত। সেই ঢাক বাজিয়া উঠিল—হুঁ! সামান্য গার্ডের বিধবা, সামান্য জুয়াড়ি মাতাল কাফ্রির প্রণয়িনী আইভি বার্কের এমন বিলাসিতা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় কে? এ স্বাচ্ছন্দ্য চুরী না করিলে উপভোগ করিতে পারা যায় না। তাহার সেই শান্ত আশ্রম খানাতল্লাসী করিলে যে অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে, সে ধারণাও আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল।

গৃহে বসিয়া আইভি পিয়ানো বাজাইতেছিল। তাহার গৃহের সাজসরঞ্জাম যে বড় উচ্চদরের তাহা আমি কল্পনা করিতেছিলাম। বাঙ্গালার পিছনে শ্যামল টেনিস-ক্ষেত্র যেন হরিত বর্ণের বহুমূল্য কার্পেট বিস্তৃত। একজন বড় যোদ্ধা লণ্ডনের পায়রার খোঁপের মত অসংখ্য অট্টালিকা দেখিয়া বলিয়াছিল—অবরোধ করিয়া গোলা ছুঁড়িবার কি আদর্শ নগর। আমারও তেমনি আসুরিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, খানাতল্লাসী করিবার কি আদর্শ কুটীর। আমি টেবিল, চেয়ার, খাট বিছানা, আলমারি, ডেস্ক, ছবি, পরদা, কার্পেট, তেপায়া উল্টাপাল্টা নাড়া চাড়া করিবার কল্পিত আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম—আর যদি অপহৃত সম্পত্তির কোনও অংশ তাহার বাক্স সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে তো আনন্দের সীমা থাকিবে না। হয়ত তাহার নিজের চারু-হস্ত রচিত পুষ্প বাটিকার কৃত্রিম পাহাড়ের পাথরের নীচে সুবর্ণ ইষ্টক লুক্কায়িত আছে।

কিন্তু আমার প্রধান সাক্ষ্য ও পরামর্শদাতার নিকট যখন আমি এ সকল কথা বলিলাম, সে পুলিসের উপর একটা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল—আমি ত "ঘোটকীর নীড়" আবিষ্কার করিয়াছি। আমরা যাহাকে বাঙ্গালায় "ঘোড়ার ডিম" বলি, ইংরাজিতে তাহাকে "ঘোটকীর নীড়" বলে। আমি তাহাকে বলিলাম—আমি যে স্বচক্ষে এ সব দেখে এসেছি।

সে বলিল—ক'টা গাছ পুঁতেছে আর ফুল ফুটিয়েছে ব'লে কি তার কুবেরের ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক হ'য়েছে নাকি?

আমি বলিলাম—তোমার সঙ্গে তর্ক করা—

সে বলিল—তর্ক কেন? সোজা হিসাব। সখ আছে, বাগান করেছে, একটু একটু করে খেটে এক একটা ক'রে গাছ জোগাড় করেছে। পিয়ানো আগে কিনেছে। এটা জান কি, যে বাবুদের পক্ষে সাহেবিয়ানা করতে যত খরচ হয়, সাহেবদের পক্ষে সেই রকম সাহেবিয়ানা অনেক কম্ খরচে হয়।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, কিন্তু কতকটা টাকা না থাক্‌লে কি আর—

এবার তাহার মুখ উজ্জ্বল হইল, চক্ষে জ্যোতিঃ আসিল, সে সত্য আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল, সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—হ্যাঁ! আসল কথাটা এতক্ষণ কারও মনে পড়েনি। বার্ক-গার্ড ছিল না?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ!

সে বলিল—তবে! প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাগুলা কি হ'ল। রেল কর্ম্মচারী মরিলে তার ওয়ারিসন্ যে টাকা পায়, সেই টাকা নিয়ে আইভি সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে।

আমি একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম,—তোমার বুদ্ধি ভাল না। তা' হ'লে সে কালো কাফ্রিটার সঙ্গে প্রেম—

প্রফেসার হাসিয়া বলিল—ওদিকে পুলিসের বুদ্ধি চালিয়ো না। সে বিষয়ে অনেক নজীর আছে—আমাদের দেশের "কিবা হাড়ি কিবা ডোমের" ছড়া থেকে সেক্সপিয়রের ওথেলো-ডেস্‌ডিমোনা অবধি হাজার হাজার নজীর আছে।

আমি বলিলাম—সাহিত্য পড়লে যদি চোর ধরা যেত তা'হলে ভাবনা থাকৃত না। ক্রমশঃ।

তুলসী

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে ।]

শুনেছি তোমার কথা পবিত্রা তুলসী
পুরাণে পুরাণে—
শুনেছি সখীত্ব তব সেই জনমের
কৃষ্ণ-প্রিয়া সনে ।
শুনিয়াছি শ্রীরাধার রুষ্ট অভিশাপ
তোমার উপর
মর্ত্যধামে এসেছিলে ধর্ম্মধ্বজ সুতা
জানি তার পর ।
শুনেছি সে জন্ম তব দেহ-ভস্ম হ'তে
অয়ি শুচিস্মিতে !
এখনো অনেক শুনি মহিমা তোমার
পুঁথিতে পুঁথিতে ।
প্রতি লোকালয়ে তুমি প্রত্যেক অঙ্গনে
গৃহস্থের ঘরে

পূজা-হোম-যাগ-যজ্ঞে প্রতি ধর্ম্মকর্ম্মে—
মঙ্গল বাসরে ;—
মাল্যরূপে কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তের হৃদয়ে
—শালগ্রাম শীরে
আরতির স্বর্ণথালে—কুশ-গঙ্গোদকে
মন্দিরে মন্দিরে ।
রোগে-শোকে-স্বস্ত্যয়নে জীবনে মরণে
তোমার মহিমা—
বিশ্বের মঙ্গল ধাত্রী—তুলসী তোমার
নাহি বুঝি সীমা ।
তব পূত স্পর্শে যায় অনন্ত অশুচি
সুপত্রা রূপসি ।
লহ মোর প্রণিপাত বিশ্বের বন্দিতা
সুধন্যা তুলসি ।

সঙ্গীতের অভিব্যক্তি ।

[লেখক—শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ ।]

আজ কয় মাস ধ'রে "সবুজপত্রে" হিন্দু সঙ্গীতের ধারা, পদ্ধতি ও তত্ত্ব নিয়ে নানা রকমের গবেষণা চল্‌ছে, এটা নেহাৎ মন্দ নয় । মত-পার্থক্যের সৃজন হ'তে হ'তে যদি মীমাংসার একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যায় সেটা ভালই ।

চার বৎসর পূর্ব্বে, যেবার টাউনহলে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়, আমার মনে পড়ে, আমিই প্রথমে আমাদের উপেক্ষিতা সঙ্গীতের কথা নিয়ে আলোচনা করি ও বলি যে, "আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যাঙ্গে অন্য সকল বিভাগের ক্রমোন্নতি সাধন সন্তোষদায়ক হইলেও সঙ্গীত-বিভাগটী বড় আশাপ্রদ নহে ।"

আমি যোগ্যতমের আলোচনা-বাহুল্যের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। তবে আজও পর্য্যন্ত সে রকম যোগ্যতর একটা কোন সরেশ বা মাঝারি রকমের আলোচনা, শাদা কাল বা সবুজে বিলোকন করা গেল না, অথবা সরেশ মাঝারি গোছের গবেষণা চোখে পড়্‌ল না। "সবুজপত্র" গবেষণায় গাঁটছড়া বেঁধে সঙ্গীত-সমাজের জাতে ওঠ্‌বার চেষ্টায় আছে, কিন্তু হ'লে হবে কি, সেখানে ত' অনাদি কালের কুশণ্ডিকার হোমের হ্যাপা নেই।

কথার ওড়ন পাড়ন (যাকে বলে play upon words) কর্‌লে, অস্পষ্ট শৈথিল্য ও অল্প প্রাণাক্ষয় দোষে দুষ্ট হ'য়ে প্রসাদগুণ বর্জ্জিত কথার সমাবেশ হবেই। তখন মাধুর্য্য, সমতা, প্রসাদ, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি, সমাধি ও শ্লেষ এই দশ রকমের মধ্যে শুধু একটার বাহুল্য দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তাতে করে একটী বিশিষ্টতারই প্রমাণ পেলেও পেতে পারা যায়। লঘু বাক্যাড়ম্বরময় প্রবন্ধ অনেক স্থলে বৈষম্য সৃষ্টি করে। সমস্যার মীমাংসা করতে হ'লে আলোচনাকে নিদ্ধারত্বের গণ্ডীভুক্ত জ্ঞান গবেষণার বিষয়ীভূত কর্‌তে হবে। তবে সেটা প্রাঞ্জল, উদার ও প্রাণবান হবে। সেখানে দ্বিগু ও দ্বন্দের প্রবেশ নিষেধ।

কলরব, কোলাহল, হলধ্বনি, হুলুধ্বনি, হন্ বা হস্ নিয়ে অনধিকার চর্চ্চা সুরু হ'লে, হলাহলই উঠ্‌বে, তা থেকে শুধু "উল্‌টা বুঝিলি রাম" হবে!

শ্রুতিকেই যদি সকল শাস্ত্রের মূল ধর, তাহ'লে সঙ্গীত শাস্ত্র যে শ্রুতির কথা নিয়ে এত মাথা ঘামিয়ে গেছেন, তাকে "পদ্মরায়ের" দল মেহেব বাণী করে এতটা হেনস্থা করবার বেয়াদবী না করলেই ভাল হয়। হিন্দুধর্ম্মের তেত্রিশ কোটী দেবতার বিধি নিষেধকে বাঁচিয়ে যদি সে ধর্ম্ম আজও বজায় থাকৃতে পারে, তাহ'লে সঙ্গীত ধর্ম্মের শ্রুতি ও স্মৃতিকারেরা অর্থাৎ রত্নাকর, বিরোধ, দামোদর, পারিজাত, চিন্তামণি, কলাধর বিরোধ ইত্যাদি সঙ্কলন ও প্রণয়নকর্ত্তাদের, জ্ঞান, গবেষণায় চূড়ান্ত মীমাংসার বিধি নিষেধ ইত্যাদিকে বজায় রেখে হিন্দু সঙ্গীতে নিরাকার বা নৈরেকারের এলাকায় কখনই পৌছাবে না, সেটী ঠিক। শ্রুতি বুঝ্‌তে গেলে পারিজাতের আইন ও রত্নাকরের কানুন বুঝ্‌তে হবে, আবার দক্ষিণী সঙ্গীতের আড়ংছাঁটা প্রকাশিকায় শ্লোক বুঝে পড়ে, শ্রুতির হিসাবের হাল মালুম কর্‌তে হবে। সেখানে বিদেশী বেহালাদারের "নামকি ওয়াস্তে" প্রবন্ধের সুরে তালে সাক্ষী দিলে চল্‌বে না।

শ্রুতি চিরকালই ছিল ও থাক্‌বে, তবে শুনে বোঝবার শক্তি, তন্ত্রকারদের

দয়া না হলে, উপায় নেই, যদি বুঝ্‌তে চাও। সাত আর পাঁচ ভেবে ভেবে, ঐ দ্বাদশ গোপাল নিয়ে যদি বসে থাক তাহ'লে আজকালকার মত দ্বাদশ গোপাল, তার মানে, Steamer party ও নৈরাকার।

জ্ঞানের বাইরে পা দিলে, বিজ্ঞান বোঝবার ক্ষমতা পৌঁছায় না। আগে ভেতরে দাঁড়াবার চেষ্টা কর, বা যাঁরা দাঁড়াতে শিখেছেন, তাঁদের কাছে আনাগোনা কর, তবে ত হাল মানুষ হবে। কথায়, কাজে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সবেতেই মিলে মিশে [illegible]বার চেষ্টা করা উচিত।

সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, এক এক সুর থেকে এক এক রাগ সৃষ্টি হ'য়েছে, কেবল নিখাদটী সৃষ্টিতে বাড়ন্ত। রাগাদির স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ পরিকল্পনা পরের মুখে শুনে, জলের 'অল্পনা' বুঝে দলীলে ঢেরা সই কর্‌লে চল্‌বে না। হিন্দু সঙ্গীতে জাতিভেদ আছে বলেই নৈরেকারকে বাঁচিয়ে, আজও মাথা তুলে 'হোম্‌রুল্' নিয়ে নাড়া চাড়া করে, ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। সকাল বেলার সাত্বিক রাগ রাগিণীরা যেন ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদির কথা আছে। এইটুকু বল্লেই চল্‌বে, সঙ্গীত রাজ্যের কার্য্যবিভাগই, জাতি-বিভাগের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। এ হোমরুলের বনেদ যে ভারতে কবে গাড়া হয়েছে, তার ইতিহাস ও তারিখ দেখ্‌লে মন্দ হয় কি? অনেকে দুঃখ করেন যে, "ওস্তাদেরা শেখায় না"। "তাদের বিদ্যে সঙ্গে সঙ্গে গোরে যায়"। দেড় টাকা, পৌনে দু টাকায়, বিদ্যের সেরা সঙ্গীত বিদ্যায় ওস্তাদ হওয়া যায় কি? ওস্তাদ কোকব খাঁ বেশ করে বাংলে সাগ্‌রেদ্ ক'রে গেছেন, তার সাক্ষী শ্রীযুক্ত করেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি। শুন্‌তে হয়, চিন্‌তে হয়, জান্‌তে হয়, শিখ্‌তে হয়। হামপদ্মরায় হ'য়ে বসে থাক্‌লে, এবং বিলিতী বিদ্যে ছড়ালে লোকে মান্‌বে কেন? মানাতে হ'লে, আগে মান্‌তে হবে, শিখ্‌তে হবে, তবে ত হবে?

"হালে পানি না পেলে" দাঁড়ি মাঝিরা যেমন নাটাঝাম্‌টা খেতে থাকে, সেইরূপ সফরী পন্থার পথিকরা যখন নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবী খুলে অনধিকার চর্চ্চার বস্তা আল্‌গা করে উঁকি মেরে দেখে, আর বাইরের যাচনদার, যারা বোমা মেরে মালের যাচাই করে, তাদের বোমামারার ভয়ে, ভাঁড়ারের বা গুদামের চারপাশে রাংচিত্তিরের বেড়া দিয়ে, একটু ভরসার বা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বাঁচে, সেইরূপ, জনকতক সবজান্তা সস্তা ওস্তাদজী আজকাল, হাতে কাজ না থাক্‌লে যেমন আত্মীয় বিশেষের ৺গঙ্গাযাত্রা করবার

অবসর পায়, আর সেইরূপ আত্মীয়ের যখন অস্তিত্ব লোপ পায়, তখন একটা কিছু না ক'রে যেমন বাঁচ্তে পারে না, তখন হাতে কাজটী গুছিয়ে মজুত রাখ্বার জন্যে সাম্নে যা পায়, তাই নিয়ে টেনে বুন্তে থাকে। বুন্তে না পেলে যে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গমন কর্‌তে হ'বে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

গুরুগোবিন্দ সিং—সচিত্র জীবন-চরিত। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

মনে পড়ে ২৩।২৪ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকার গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনচরিত কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া অধুনা-লুপ্ত মাসিকপত্র 'দারোগার দপ্তর'র সহিত প্রচার করেন। সেই সময়েই এই গ্রন্থখানি সাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থকার পাতিয়ালার মহারাজের নিকট আর্থিক সাহায্য পাইয়া 'গুরুগোবিন্দ সিংজীর বাঙ্গালা জীবন চরিত' সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সংস্করণে ১৯ খানি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। মহারাজ পাতিয়ালার সৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণে আমাদের দেশের অন্যান্য মহারাজা, জমিদার, ধনী সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এইরূপে সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্যপ্রদান করেন, তাহা হইলে সাহিত্য সহজ অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হয় না।

দশম গুরু গুরুগোবিন্দের জীবন-চরিত বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম হইতে নবম গুরুর জীবন চরিত আলোচনা না করিলে চলে না। সেইজন্য গ্রন্থকার সংক্ষেপে শিখদের প্রথম হইতে দশম গুরুর (গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ, গুরু অমরদাস গুরু রামদাস, গুরু অর্জ্জুন, গুরু হরগোবিন্দ, গুরু হররায়, গুরু হরকিষণ, গুরু তেগবাহাদুর ও গুরুগোবিন্দ সিং) জন্মকথা, ধর্ম্মভাব, শিক্ষা, ধৈর্য্য, সংযম, মাহাত্ম্য, লীলা প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম গুরু নানক হইতে শিখ-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। দ্বিতীয় হইতে নবম গুরুর জীবনচরিত আলোচনায় গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় শিখ সম্প্রদায়ের ক্রমঃবিকাশ, বিস্তৃতি প্রভৃতি নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পর বিশদভাবে দশম গুরুর জীবন-চরিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারই সময়ে শিখ জাতির প্রসার-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে স্থাপিত হয় এবং কতকগুলি যুদ্ধ করিতে করিতে শিখগণ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। এই গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্ত 'কোটেশন্' বাহুল্য নাই। শুধু কোনও লুপ্ত বা লুক্কায়িত পক্ষপাতী বা বিপক্ষীয় ঐতিহাসিকের রচনার উপর নির্ভর করিয়া

এই গ্রন্থখানি রচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহার গবেষণার ফল শিলালিপি ও কাষ্টফলকের ভারে দুর্ব্বহও হয় নাই। তথাপি, লেখক মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। উপরন্ত গ্রন্থখানি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। উপন্যাসের অপেক্ষাও পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক। পাঠ করিতে বসিলে ছাড়া যায় না। ধর্ম্ম ও সৎগ্রন্থ পাঠের জ্ঞানোন্মেষ, নীতি-গ্রন্থ পাঠের শিক্ষা, ইতিহাস পাঠের জাতীয় চরিত্র ও দেশের ও সমাজের পূর্ব্বাবস্থার অভিজ্ঞতালাভ ও উপন্যাসপাঠের মানব-চরিত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের আনন্দ এই গ্রন্থখানি মধ্যে একত্র সমন্বিত হইয়াছে। আশা করি এই সৎগ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইবে।

কমণ্ডলু—কবিতাগুচ্ছ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং লেখক কর্ত্তৃক কুড়মিঠা, বীরভূম হইতে প্রকাশিত ; মূল্য ছয় আনা।

আমরা 'কমণ্ডলু' পাইলাম কেন? কবি কি আমাদের রাজসিক গুণাধিক্য দর্শনে, করে কমণ্ডলু দিয়া আমাদের বানপ্রস্থের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহেন? মাভৈঃ! মাভৈঃ! তাহা ত নহে, কবির উদ্দেশ্য সাধু। 'কমণ্ডলু' মনের বিকৃত ভাবকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহে। সেইজন্য এই ক্ষুদ্র 'কমণ্ডলু'তে চল্লিশটী কবিতা এবং একটী 'উপহার' কবিতা স্থান পাইয়াছে। উপদেশগুলি অনুসরণ করিলে পাপীকেও সাধু হইতে হয়। কবি স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় কবি রজনীকান্তের 'অমৃতে'র আদর্শে পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন। তবে সুখের বিষয়, অন্ধ অনুকরণকারীর মোহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

'উপহারে'র প্রথম দুই চরণের মিল—'খ্যাতি'র সহিত 'বসতি'—দুষ্ট হইয়াছে। 'অসৎসঙ্গ' কবিতায়—'পিতৃসত্য পালিবারে—রাম গেলা বন,' এই ছত্রের মিলটী 'দুলাইয়া কাঁধে ঝুলি, পূর্ণ তাহে ধন' বা এইরূপ একটী অন্য কিছু লিখিলে হয়তঃ অধিক সুশোভন হইত। অন্যত্র নির্দ্দোষ।

এই পুস্তকের সুপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী সুকুমারমতি বালক-বালিকার বিশেষ উপযোগী। নীতি-শিক্ষায় কবিতাগুলি তাহাদের চিত্তে সাধুতার পবিত্রতা আনিয়া দিবে। আশা করি, বিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ ইহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া গুণের আদর করিবেন।

অর্চনা, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

নারাণ ঠাকুর।

[লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।]

ইঁহার ভাল নাম শ্রীরামনারায়ণ ঠাকুর। প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিল, এখনও ইঁহার নাম বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রাতঃস্মরণীয়রূপে কীর্ত্তিত হইতেছে। দেশের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাতি আজিও সমানই জাগরূক আছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ওরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাযোগী সিদ্ধপুরুষ কেহ জন্মিয়াছেন, শুনি নাই। কুম্ভকসাহায্যে আকাশপথে কেহ বিচরণ করিতে সক্ষম—এমন কেহ থাকিতে পারেন,—তাহা জানি না। সে প্রকার সিদ্ধপুরুষ যে জাতির মধ্যে জন্মে বিশ্বের সম্মুখে তাহাদের গর্ব্ব ও গৌরব করিবার দাবী আছে। আমরা দীনহীন অধঃপতিত হইয়াও বলিতে পারি, সারা পৃথিবীতে পরিচিত করিবার মত এরূপ লোক দুই একটি বাহির কর দেখি।

এ নারায়ণ ঠাকুর কে? কাচখণ্ডের মত ঐহিকসর্ব্বস্ব দুই চারি হাজার লোকের নাম মুখস্থ করিয়া এরূপ কোহিনূরের সন্ধান যিনি না রাখেন, তাঁহার দুর্ভাগ্য!

যাঁহার সাধনাক্ষেত্র ধূলিপুর নামক স্থান আজিও তীর্থক্ষেত্রের মত পূজিত হয়, সেখান দিয়া যাইবার সময়ে পথিকেরা ভক্তিভরে শির নত করে, যেখানে কত নরনারী প্রত্যহ নৈবেদ্য, ফলমূল ও দুগ্ধ দিয়া পূজা দেয়, কেহ কেহ তারকেশ্বর বৈদ্যনাথের মত হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তাঁহার সন্ধান দেশের লোক হইয়া আমাদের না রাখা কি লজ্জার কথা নহে? সে সমাধিক্ষেত্রে একটি বিল্ববৃক্ষ এবং আর একটি পরিষ্কৃত বেদী আছে।

যে নারাণ ঠাকুরের বংশধর বলিয়া পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠ বংশীয়েরা আজিও বাঙ্গালার বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙ্গলার গুরুর পদে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার পবিত্র নামের মাহাত্ম্যে ভাটপাড়ার ঠাকুরেরা আজি দেশগুরুর

আসনে থাকিয়া ঠাকুর আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই নারায়ণ ঠাকুরের কাহিনী আজ আমি আপনাদিগকে শুনাইব।

প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকটে বর্ত্তমান খুলনা জেলার কালীগঞ্জ নামক স্থানের ৫।৬ ক্রোশ দক্ষিণে ধূলিপুর নামক স্থান অবস্থিত। বসিরহাট হাসনাবাদ হইয়া নদীপথে কালীগঞ্জে যাইতে হয়।

নারাণ ঠাকুরের পিতামহ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাস করেন। পিতামহের নাম শ্রীগদাধর মিশ্র। জগন্নাথদেবকে দর্শনমানসে ইনি সস্ত্রীক পুরীধামে যাইবার জন্য হাঁটা-পথে কান্যকুব্জ হইতে যাত্রা করেন। সহধর্ম্মচারিণী পত্নী তখন অন্তঃসত্বা ছিলেন। পথিমধ্যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুর নামক স্থানে গদাধর-পত্নী একটি সন্তান প্রসব করেন। ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতী সেই সদ্যঃজাত সন্তানের মায়া কাটাইয়া সেই সন্তানকে এক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া পুরীধামে চলিয়া গেলেন। সে পুত্রের ধারা অদ্যাপিও সেই স্থানে বাস করিতেছেন। তবে নারায়ণ ঠাকুরের বংশধর নহেন বলিয়া ইঁহারা ঠাকুর-বংশীয়ের সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।

গদাধর ও তাঁহার পত্নী সেই জগন্নাথদেবের লীলাক্ষেত্রেই রহিয়া গেলেন। সে[illegible]নও একটি সন্তান জন্মিল। সে সন্তানের নামকরণ হইল জনার্দ্দন মিশ্র। কি সূত্রে যে ইঁহাদের প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে বাস হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। নারায়ণ ঠাকুর জনার্দ্দন মিশ্রের একমাত্র পুত্র। বাঙ্গালার ভট্টাচার্য্য উপাধি তখন ইঁহারা গ্রহণ করিলেন। নারাণ ঠাকুরের আমলের যে তায়পাদ আমাদের গৃহে আছে, তাহা আলিবর্দ্দী খাঁর আমলের তাহা বোঝা যায়। ইঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মসংস্কার মঞ্জরী' নামক একখানি উৎকৃষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ আমাদের বাটীতে আছে। যদি কেহ উহা ছাপাইতে চান, আমরা তাহা দান করিতে প্রস্তুত আছি। আর একখানি তাঁহার হাতে লেখা পুঁথি কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার-পুস্তকের টীকাও পাওয়া গিয়াছে। সে পুঁথিতে ১৫৫৩ শকাব্দ লিখিত আছে।

ঠাকুরের সাধনার কাহিনী বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে প্রবাদের মত ছড়াইয়া আছে। যে ঠাকুরের বংশের শিষ্য লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ—তাঁহার কাহিনী যে কিরূপ বঙ্গের মুখোজ্জ্বল, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? মনে কর দেখি—সেই দুই তিন শত বৎসরের কুলীন ব্রাহ্মণদের কথা! কল্পনা কর দেখি—তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা, তেজ, গর্ব্ব, অভিমান, যাঁহারা সভার মধ্যে মাল্যচন্দন পাইতেন,

তুলনায় নিকৃষ্ট স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিতেন না, সেই অভিমানী তেজস্বী কুলীন ব্রাহ্মণগণ দলে দলে আসিয়া যাঁহার চরণপ্রান্তে নত হইতে লাগিল, ইহ-পরকালের ত্রাতা গুরুর আসনে বসাইয়া দেবতার মত পূজা করিতে আরম্ভ করিল, পায়ের ধূলা নির্ম্মাল্যের মত মাথায় পাতিয়া লইয়া পাতের প্রসাদ অমৃতবোধে ভোজন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিল, ভাব দেখি তিনি কেমন ছিলেন ?

নারাণ ঠাকুর বড়ই সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন বাৎস্য গোত্র-সম্ভূত শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের একমাত্র কন্যা লক্ষ্মী দেবীকে। নারায়ণ ও লক্ষ্মীর মিলন! বশিষ্ঠ বংশে জাত বলিয়া লোকে ঠাকুর ও লক্ষ্মীদেবীকে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর মতই মান্য করিত।

রামভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপণ্ডিত, জ্বলদ্‌ব্রহ্মতেজা যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যখন সমাধিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞাতিরা থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া তাঁহাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। এক জেলের জালে আট-কাইয়া যাওয়ায় সেই জেলে তাঁহাকে জল হইতে টানিয়া তোলে। এখনও সেই বংশের অধস্তন পুরুষেরা আপনাদিগকে "খোলে পোরা বাৎস্য" বলিয়া গৌরবের সহিত পরিচিত করে।

নারাণ ঠাকুর শ্বশুরের কঠিন রোগ শুনিয়া সস্ত্রীক দেখিতে আসিলেন। রামভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এক সিদ্ধ মন্ত্র ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নিজ পুত্রকে সেই মন্ত্র দিবেন। কিন্তু পুত্র যোগ্য ছিলেন না বলিয়া সিদ্ধ-মন্ত্র যোগ্য পাত্রে না দিলে পাপশ্রুতি আছে মনে করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে দিতে ভরসা করেন নাই। আর না দিলে ত আর দেওয়া হইবে না বলিয়া ঠাকুর নারায়ণ নারায়ণ করিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করেন। পুত্রেরও নাম ছিল নারা-য়ণ। জামাতা নারায়ণ আমাকে ডাকিতেছেন মনে করিয়া মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে বসিলেন।

মন্ত্র দেওয়া হইল। ঠাকুরের বোধ হইল যেন আধ্যাত্মিক শক্তি তীব্র তড়িদ্‌বেগে তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। কি এক অলৌকিক জ্যোতিঃ ঠাকুরের মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল। জামাতা লজ্জাবনত মুখে যেমন কি একটি কথা কহিলেন, অমনি বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন, "মন্ত্র পুত্র পাইল না।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জামাতাকে কহিলেন, "তোমার দোষ কি ? আমিই পুত্র-স্নেহে অন্ধ হইয়া সিদ্ধ মন্ত্র যোগ্য নহে জানিয়াও পুত্রকে দিতে মনস্থ করিয়া-

ছিলাম। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, যাহা হইয়াছে ভালর জন্যই হইয়াছে। সে মন্ত্রের গুণে তুমি ত সিদ্ধ হইবেই, এমন কি সে মন্ত্রের শক্তিতে তোমার বংশও সম্মানিত হইবে।

ঠাকুর যৌবনেই সে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল-কাম হইতে পারেন নাই। শেষজীবনে অবশ্য সিদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যৌবনে তাঁহার কঠোর সাধনা জগদম্বা আসিয়া বিফল করেন। কেন তাহা তিনিই জানেন।

শ্মশানে ঠাকুর মন্ত্রসাধনায় ব্যাপৃত। তখন অন্ধকারময়ী গভীরা রাত্রি। চারিদিকে বিকট ভীতি সেই অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া আছে। শৃগালের দল অদূরে চীৎকার করিতেছে। ভয়াতুর ব্যক্তি সে বিজন শ্মশানে প্রেতের বিভীষিকা দেখে, অন্ধকারের চেয়ে মসিকৃষ্ণবর্ণ প্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের বিকট অট্টহাসি অন্ধকারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ঠাকুরের চিত্ত তখন নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের মত স্থির, নিষ্কম্প দীপশিখার মত নিশ্চল! ভয় তমোগুণ। সে ভয় যদি সাধকের মনে জাগে তবে তাঁহার সত্ত্বগুণ চলিয়া আসিবে, একাগ্রতা লোপ পাইবে, মন চঞ্চল হইবে; ফলে সাধনার বিঘ্ন ঘটিবে।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হয় না। ক্রমে মেঘের উপর মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। বজ্র কড় কড় ধ্বনিতে দিক্ কাঁপাইয়া তুলিল, তীব্র বাতাস হু হু করিয়া বহিল। ক্রমে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, প্রবল ঝড় বড় বড় বৃক্ষগুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা উন্মত্তার মত ছুটিয়া আসিলেন এবং জানাইলেন, তাঁহার গৃহে দস্যু পড়িয়াছে, এখনই গৃহদেবতার অপমান করিবে।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কোথায় তাঁহার মাতা। ঠাকুর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাটীতে আসিলেন। কোথায় দস্যু! জগদম্বার ছলনা বুঝিয়া ঠাকুর মনকে বুঝাইয়া রাখিলেন।

ঠাকুরের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ শিবরাম, মধ্যম রাঘবরাম, কনিষ্ঠ রামনাথ। "জ্যেষ্ঠঃ শিবরামস্ত্যাজ্যঃ" জ্যেষ্ঠ শিবরাম পিতা কর্ত্তৃক ত্যাজ্য হইয়া ত্যাজ্য বশিষ্ঠ আখ্যায় অভিহিত হইলেন। শিবরাম অপাত্র ছিলেন। "পিতার মৃত্যু হইয়াছে" বলিয়া গলায় কাছা দিয়া গুণধর পুত্র শিষ্যবাড়ীতে উপস্থিত। ঠাকুরও ঘটনাচক্রে তথায় উপনীত! ঠাকুর পুত্রের এ ঘৃণিত আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে

সেই ক্ষণেই ত্যজ্য পুত্র করিলেন। শিবরাম পতিত হইলেন, শ্রাদ্ধে অধিকার পাইলেন না, বিষয়সম্পত্তি, ভদ্রাসন ও শিষ্য প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইল। সে বংশের তিন চারি ঘর মাত্র এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সমাজে এখন একেবারে পড়িয়া না থাকিলেও খুব হীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

ঠাকুর ধুলিপুর হইতে প্রত্যহ কুম্ভকসাহায্যে আকাশপথে গঙ্গা স্নানের জন্য ভাটপাড়ার ঘাটে আসিতেন, আবার স্নানান্তে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই ফিরিয়া যাইতেন। এক্ষণে আমরা যোগের 'অ আ' জানি না, তাই শঙ্করাচার্য্যের "অমরক রাজা"র দেহে গমন ঠিক মন-প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি না, নারাণ ঠাকুরের যোগমার্গে আকাশপথ দিয়া গমনাগমন যে সত্য তাহাও মনের সহিত মানি না। এক্ষণে ব্যোমযানে উঠিয়া সাহেবেরা চলাফেরা করেন এ বিদ্যা যদি লুপ্ত হয়, তবে আমাদের ভবিষ্য বংশধরেরাও ইহাকে কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

একদিন একটি ঘটনা ঘটিল। ঠাকুর যখন উর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভাটপাড়ার জমীদার হালদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিকে ব্যাপৃত ছিলেন। পঞ্চপাত্রস্থ জলে কিসের ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখেন, "নারাণ ঠাকুর উর্দ্ধ হইতে দ্রুত নামিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘনভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা চাহিতে যাইবেন, এমন সময়ে সেই জমীদার ঠাকুরের পায়ে পড়িয়া নিবেদন করিলেন, "ঠাকুর উদ্ধার করুন।" আপনি এই গ্রামে বাস করুন, আমি ভূমি দিতেছি, আমার পুত্রদিগকে আপনার শিষ্য হইবার গৌরব দিন।"

ঠাকুর সপরিবারে হালদারদের প্রদত্ত ভূমিতে বাস করিলেন। ধুলিপুর বাস উঠিয়া গিয়া ভাটপাড়ায় স্থায়ী বাস হইল। এই বংশের দেড় শত ঘর ঠাকুরবংশীয়েরা ভাটপাড়া গ্রামে অদ্যাপিও বাস করিতেছেন। পাঁচ ঘর মাত্র কাঁটালপাড়ায়, ছয় সাত ঘর মাত্র হালিসহরে, আর সাত আট ঘর মাত্র এড়িয়াদহে বাস করিতেছেন। ঠাকুরবংশের প্রায় সমস্তই ভাটপাড়াবাসী আর ভাটপাড়াতেই নারায়ণ ঠাকুরের বাস, এ কারণ প্রধানতঃ ভাটপাড়ার ঠাকুর বলিয়াই সকলেই অভিহিত হন।

এখন আর কি আছে? তথাপি কি শীত, কি গ্রীষ্মে ভাটপাড়ার মুণ্ডিত-শির দীর্ঘশিখাধারী বৃদ্ধ ঠাকুরগণ কমণ্ডলু-করে প্রাতঃস্নানে চলিয়াছেন,—সে

দেখিতে মন্দ নয়! পুরাকালের ক্ষীণস্মৃতি মনে মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া উঠে। সন্ধ্যার সময়ে বলরাম সরকারের প্রশস্ত ঘাটে এখনও অনেক বালক, যুবক ও বৃদ্ধগণ বৈদিক মন্ত্রে গঙ্গার জল মুখরিত করে, তাহা দেখিলে একটি আশ্বাস জন্মে।

ঠাকুরের আকাশপথে ভ্রমণ বন্ধ হইল। গঙ্গাস্নানের গুরুতর অনুরোধেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যোগশক্তির পরিচয় দিতে হইত। প্রত্যহ কত নরনারী সেই আকাশপথ হইতে অবতরণ দেখিতে আসিত; দেখিয়া বিস্মিত ও কৃতার্থ হইত। সে দৃশ্য শেষ হইল।

পশ্চিম বাঙ্গালার গুরুবংশ বলিতে নারাণ ঠাকুরের বংশধরদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। শুনিয়াছি, আমাদের বংশে তিনটি ঘর আছে, কেহ দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইবে না, কুম্ভীরে কাহাকে খাইবে না, সর্পাঘাতে কেহ মরিবে না। অথচ ঠাকুর মহাশয়গণকে যেরূপ বিদেশে বেড়াইতে হয়, তাহাতে তাহাদের এ ভয়ের সম্ভাবনা খুবই বেশী। ঠাকুরের কৃপায় এখনও ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

গঙ্গার ঘাটে ঠাকুরকে যেদিন তীরস্থ করা হয় সেদিন কাহারও অগণিত সৈন্য নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইতেছিল। সে সৈন্য কাহার, কি উদ্দেশ্যে পার হইতেছিল জানি না। গঙ্গার ঘাটে অসম্ভব জনতা দেখিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ সংবাদ লইয়া যায়, এ স্থানে কেন এত জনতা? ঠাকুর নিজের নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রেত শুভ মুহূর্ত্তে দেহ ত্যাগ করিলেন। লোকে স্পষ্টই দেখিল যে, কি এক জ্যোতি বিদ্যুদ্বেগে ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া গেল।

বর্ত্তমান লেখক নারায়ণ ঠাকুরকে লইয়া বার পুরুষ হইবে। পিতৃপিতামহ-ক্রমে আমাদের বংশে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই আজ পাঠকগণকে উপহার দিলাম। বিশ্বাস করা বা না করা পাঠকের ইচ্ছা।

দাদা।

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

(১)

গ্রামের সবাই তাহাকে আদর করিয়া পাগল বলিত। কেহ তাহার আসল পরিচয় জানিত না। গ্রামেরই ধারে একটি জীর্ণ শিবমন্দিরের ভিতর সে কিছুকাল ধরিয়া বাস করিতেছে। সবাই জানিত, সংসারে তাহার আপনার বলিবার কেহই নাই।

তাহার তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তৈল ও স্নানাভাবে মলিন হইয়া গিয়াছে। কুঞ্চিত কেশরাশি রুক্ষ ও জটাজুটবদ্ধ। তাহার সুশ্রী বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের কালিমা মাখান রহিয়াছে। কেহ যদি তাহাকে বলিত, "আচ্ছা, তুমি এত সুপুরুষ, তোমার এমন সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর দেহের প্রতি নজর রাখ না? নিয়মমত স্নান-আহারাদির দ্বারা শরীরের বিশেষ যত্ন কর।" সে কথার সে বড় একটা উত্তর দিত না। উদাসভাবে বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কখনও বা এ সব কথা শুনিয়া নিজ মনে গান ধরিত,—

মিছে রূপের গুমর কর, ওরে আমার মন,
দেহ বড় পরিপাটী,— নয়ন মুদ্‌লে হবে মাটি,
মাটির দেহ হবে মাটি, মাটিতে পতন।
কোথায় রবে গাড়ী ঘোড়া, শালা দোসালা টাকার তোড়া,
মলে দেবে খালি গোবর ছড়া, কাঁদবে পরিজন।

কাহারও সহিত সে বড় একটা মিশিত না। অথচ গ্রামবাসীর আপদে বিপদে যথাসাধ্য বিপন্নকে সাহায্য করিত। এই জন্য সবাই তাহাকে ভালবাসিত। কিন্তু সে যে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার বংশপরিচয় আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে জানিতে পারে নাই। সে বিষয়ে কেহ কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, পাগল সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া অন্য কথা তুলিত। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইত।

ঝড় জল বৃষ্টি কিছুকেই সে গ্রাহ্য করিত না। গভীর রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে মৃত ব্যক্তির শ্মশানে সৎকার করিতে সেই প্রথম অগ্রসর হয়। এই প্রকার নানা লোকহিতকর কার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃত দেখিয়া সবাই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পরের হিতার্থে নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা এমন কি প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। কিন্তু এত অল্প বয়সে সংসারের প্রতি তাহার এরূপ কঠোর বৈরাগ্যের কারণ কেহই স্পষ্ট নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। তাহার কণ্ঠস্বর বড় সুমিষ্ট ছিল। মধ্যে মধ্যে সে এমন সুন্দর শ্যামা-বিষয়ক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিত যে, শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া তাহার মধুরোজ্জ্বল বদনমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া থাকিত, আর গভীর সম-বেদনার অশ্রুধারা বর্ষণ করিত। কখনও অমাবস্যার রাত্রে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধ-কারের মধ্য দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সে গ্রামপথ ধরিয়া যাইত,—

আঁধারেতে ভয় করি না,
আঁধার আমি বাসি ভাল,
আঁধার দেখলে মনে পড়ে,
শ্যামা মা মোর এমনি কাল;
ভয়ের আকার দেখলে পরে
ডাকি আমার শ্যামা মা রে,
ছায়াপথে দেখতে পাই
সে মায়ের রাঙা পায়ের আলো।

তাহার গলার স্বর শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিত, পাগল নিজের মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। আর এমন সচ্চরিত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবকের এরূপ করুণ অবস্থা দেখিয়া আন্তরিক সহানুভূতিতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

(২)

গত বৎসর পূজার সময় দেশে গিয়া এই পাগলের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের দিনই আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, এই তথা-কথিত পাগলের হৃদয় নিশ্চয়ই অতীতের কোনও গম্ভীর রহস্য বহন করিয়া আসিতেছে। এ ত যথার্থই পাগল নয়! ইহার যে বুদ্ধি ও জ্ঞান টন্‌টনে রহি-য়াছে। ইহার অন্তকরণের মধ্যে নিশ্চয়ই অতীতের কোন জ্বালাময়ী স্মৃতির অনল দিবানিশি দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত

হইয়া এমন কোন দারুণ আঘাত সে পাইয়াছে, যাহাতে এ কোমল বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া এই বিশ্বসংসারে নরনারায়ণের সেবায় মনের শান্তির অন্বেষণে ঘুরিতেছে।

সেদিন সপ্তমী। গ্রামের প্রত্যেক অণুপরমাণু যেন মায়ের অপার স্নেহের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। পূজাবাড়ীতে আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক, বালক সকলেই সেখানে সমবেত। অপরাহ্নে একাকীই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলাম। আবাল্য কতদিন নির্ণিমেষনয়নে গ্রাম্য প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়াই দামোদর কুলু কুলু তানে বহিয়া গিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন দিনের আলো প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর চক্রবালের পশ্চিম রেখাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া বিশ্রামের নিমিত্ত অস্তাচলচূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। কৃষকেরা মাঠ হইতে গাভীর দল লইয়া মনের সুখে গান গাহিতে গাহিতে শ্রান্তচরণে বাড়ী ফিরিতেছে। পাটনী সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া দিনের খেয়া শেষ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তীরস্থ দেবমন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণ আরতির উপকরণসমূহের বন্দোবস্ত করিতেছেন। আমি তন্ময় হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতেছি, হঠাৎ সান্ধ্যসমীরণে কাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়া "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।" একটু মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলাম, এই কণ্ঠস্বর যে আমাদের বিশেষ পরিচিত, এ নিশ্চয়ই সেই পাগলের গলা!

নদীতীরে আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমার অনুমান সত্যই হইয়াছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। তীরের উপর একখানি নৌকায় বসিয়া পাগল গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেছে। আহা কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! কাল ও পাত্রভেদে তাহা যেন আরও সুমিষ্ট বলিয়া কর্ণে বাজিতেছিল। তাহার আরও নিকটে গেলাম; কিন্তু সে নিজের ভাবে এতই তন্ময় যে, আমি যে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহা দেখিতেই পাইল না। নিজের মনেই গান গাহিয়া যাইতে লাগিল,—

মন তোর এত ভাবনা কেনে,
একবার "জয় কালী, জয় কালী" বলে বস দেখিরে ধ্যানে।

ইট পাটকেল পাষাণ মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে,
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না কো জগজ্জনে।
ছাগ মেষ মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে বলি দাও ষট্-রিপুগণে।

আমি বুঝিলাম, আজ পূজাবাড়ীর ধুমধাম ও জাঁকজমক দেখিয়া নিঃস্ব পাগলের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। তাই লোকালয়ের অন্তরালে নির্জ্জনে বসিয়া এই গানটি প্রাণ ভরিয়া সে গাহিতেছে। গানটি শেষ হইতেই আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। এবার তাহার চমক ভাঙ্গিল। এমন সময় আমাকে নিকটে দেখিয়া সে ঈষৎ হাসিল। আমাকে তাহার পাশে বসিতে বলিল। কেন জানি না, গ্রামের মধ্যে সবার অপেক্ষা আমাকে সে যেন একটু বেশী অনুগ্রহ করিত। পাশে বসিতেই সে কাতরনেত্রে একবার আমার দিকে তাকাইল। মনে হইল যেন আমার অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সেখানকার খবরটা সে একবার জানিতে চায়। আমি তাহাকে আর একটা গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে আমার কথায় সম্মত হইয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিল,—

হরি, দিন যে গেল, সন্ধ্যা হল,
পার কর হে আমারে,
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা,
তাই ডাকি হে তোমারে।

গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম যেন অনেক কষ্টে সে তাহার অশ্রু সংবরণ করিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, বোধ হয় অতীতের কোন দুঃখময়ী স্মৃতি হৃদয়মধ্যে জাগরিত হইয়া তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, এমন সুযোগ আর উপস্থিত হইবে না। পাগলের সহিত যতই আলাপ করিতে যাই, তাহার জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার কৌতূহল ততই প্রাণে জাগিয়া উঠে। তাহার দুঃখে আমারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি গভীর সমবেদনা জানাইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম,—"ভাই, তুমি কাঁদছ কেন? অতীতের কোন কথা কি হঠাৎ

মনে পড়ে গেল ?" আমার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে যেন একটু গলিয়া গেল। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"ভাই, আমার প্রাণে চিতার অনল দিবানিশি দাউ দাউ জ্বলছে। সে যে কি অন্তর্দাহ, তা একা অন্তর্য্যামীই জানেন। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। সে সব কথা যখনই মনে পড়ে, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হয়, আত্মহত্যা মহা-পাপ। সে সব কথা কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করবার নয়। সে সব শুনলে আমাকে ভালবাসা দূরে থাকুক আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে চাবে না, পশু বলে আমাকে ঘৃণা করবে।"

এই বলিয়া পাগল চুপ করিল। আমি তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, —"ভাই, তোমার যদি অন্য কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে সে কথা আমার কাছে অনায়াসে বলতে পার। মানুষমাত্রেরই জীবনে কিছু না কিছু ভুল-চুক হয়েই থাকে। যদিই বা মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ তুমি কোন গর্হিত অন্যায় করে থাক, তাহলে তোমার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে ঘৃণা করা মানুষের কাজ নহে। ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে তুমি সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার।"

সে তখন উত্তর করিল,—"ভাই, আপত্তি ? আমার বলতে কোনও আপত্তি নাই। এ কথা একজনকেও বলতে পারলে মনের আগুন বোধ হয় অনেকটা নিভে যায়। আমার এ মর্ম্মযন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে শোন ভাই, এই নিষ্ঠুর দুর্বৃত্তের অতীত কাহিনী শোন, কিন্তু পরে এ অধমকে ঘৃণা করো না। পার ত আমার দুঃখে এক ফোঁটা অশ্রু ফেলো; কিংবা সে কাহিনী শুনলে হয় ত এই পাষণ্ডের জন্য চোখের জল ফেলা দূরের কথা, তার দিকে চাইতেও তুমি ঘৃণা করবে। তার নিঃশ্বাসের ভরও সহ্য করতে পারবে না।

"আমার বাবা প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। আমরা দুই ভাই। বাবা বাল্যকাল হইতেই আমাদের পড়াশুনার যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সুযোগ্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রায়ই বিদেশে বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিতে যাইতে হইত। তবুও সময় পাইলেই আমাদের দু' ভায়ের লেখাপড়া ও স্বভাব-চরিত্রবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিতেন। বড় ভাই বেশ মন দিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। শিক্ষকেরা ও পাড়ার লোকেরা তাহার খুব সুখ্যাতি করিত। বলিত, বাপের যোগ্য পুত্রই বটে! আমার বাবা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন।

বাপ ভাল হইলেও ছেলে যে ভাল হয় না, এক বৃক্ষে বিষ ও অমৃত দুই ফল ফলে, এ কথা ধ্রুব সত্য। আমার জীবনী তার জলন্ত নিদর্শন।

"ছেলেবেলায় আমার লেখাপড়ায় কম মনোযোগ ছিল না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার সব কুসঙ্গী জুটিতে লাগিল। আমি ঘোর বিলাসী বাবু হইয়া উঠিলাম। সাবান না হইলে একদিন স্নান চলিত না, মুখে পাউডার ও রং না মাখিয়া বাড়ীর বাহির হইতে পারিতাম না। সর্ব্বদাই মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিতাম। রুমালে গন্ধ, মাথায় টেরী, ছোট বড় চুল ছাঁটা প্রভৃতি নানা প্রকার বিলাসিতা আমার দুর্ব্বল চিত্তের উপর ক্রমেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। বাবা, মা, দাদা প্রথম প্রথম আমাকে খুব শাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। হায়! তখন কেন তাঁহাদের কথায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই! তাহলে আজ আর এই অসহ্য নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।" বলিতে বলিতে সে চুপ করিল। তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"ভাই, সে সব কথা বলতে তোমার যদি কষ্ট হয়, তাহলে আর বলে কাজ নেই।" সে বলিল, "না, না, একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম মাত্র। আমার আবার কষ্টের মূল্য কি? যে এ সব কাজ অনায়াসে সাধন করতে পারে, পিতামাতা দাদার প্রাণে অকারণ নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে পারে, তার আবার বলতে কষ্ট কি?

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার অনেক সঙ্গী আসিয়া জুটিল। আজ তাহাদের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখিতে, কাল থিয়েটার দেখিতে, পরদিন ম্যাজিক ও সার্কাস দেখিতে যাইতে লাগিলাম। অসৎ সঙ্গের ফলে যাহা ঘটে, আমার পক্ষেও তাহাই ঘটিল। আমি সিগারেট খাইতে ধরিলাম; পরে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা সব নেশাই বেশ জমিয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যেই আবকারী বিভাগ প্রায় একচেটে করিয়া তুলিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার তত অধঃপতন হয় নাই। যেদিন থেকে মদের গেলাস ধরিতে শিখি, সেদিন হইতে আমার মধ্যে যেটুকু পদার্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা একেবারে দূর হইয়া গেল। ভাই সব রকম নেশাই করিয়াছি, কিন্তু মদের মতন সর্ব্বনেশে নেশা দুনিয়ায় আর নাই। মদের নেশার ঝোঁকে মানুষ পশু হইয়া যায়। অন্য নেশা কর, রোজই তোমার নেশার মাত্রা কমাইয়া আনিতে অন্ততঃ ইচ্ছা করিবে, কাজে পার আর না পার, সুরার এমনি মহিমা যে, যতই পান করিবে ততই পানের ইচ্ছা আরও বলবতী

হইবে। অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ক্রমেই উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

প্রথম প্রথম মনে একটু আধটু ধিক্কার জন্মিত, পরে সে সব আর কিছুই রহিল না। স্বভাবচরিত্র সর্ব্বপ্রকারে খারাপ হইতে লাগিল। বাবা, মা, দাদা আমার অবনতির কথা কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। তাঁহারা মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া আমাকে সৎপথে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মা ছেলের মতিগতি ফিরাইবার আশায় শিবপূজা, দেবদেবীর নিকট কত মানত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। আমার মেজাজও ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। কেহ কোন সৎ যুক্তি দিতে আসিলে তাহাকে দু কথা শুনাইয়া দিতাম। একদিন বাবা বকায় রাগে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। অনেক দিন বাড়ী ফিরি নাই। শুনিলাম মা আমার কাঁদিন মুখে জলও দেন নাই; দিনরাত আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। দাদা অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে মায়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ দিলেন। মায়ের অসুখ শুনিয়া কেন জানি না প্রাণটা একটু ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। মা তখন আমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমাকে দেখিয়া তাঁহার পাংশু ওষ্ঠাধারে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি আমাদের সবাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমার মাথার উপর তাঁহার দুর্ব্বল হাতখানি রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কথা বলিতে পারিলেন না। মৃত্যুর ক্ষণপূর্ব্বেও অবোধ সন্তানের জন্য মায়ের কত ভাবনা, কত চিন্তা তাহা স্পষ্ট তাঁহার মুখের ভাবে ব্যক্ত হইল। পরে দাদা ও বৌদিকে অনেক করিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখিস বাবা, দেখো বৌমা, তোমাদের হাতেই আমার পাগল ছেলেকে দিয়ে গেলাম; তোমরা দেখো।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। সতী সাধ্বী স্বামীর চরণধূলি মস্তকে লইয়া চোখ বুঝিলেন। জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুটো মিষ্ট কথা কহিয়া মাকে সুখী করিতে পারি নাই, আমার জন্যই মা আমার সুখেও মরিতে পারিলেন না, আমার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, এমন পাষণ্ড কি আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে!

মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলাম। যখন ফল বাহির হইল, দেখিলাম ফেল হইয়াছি। তাহার কয়েক দিন পরে বাবাও হঠাৎ

বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তখন আর আমার ইচ্ছামত সুখভোগে বাধা দিবার কেহ রহিল না। আমার ষ্ফূর্ত্তি দেখে কে? ইয়ার্কির মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দাদা আবার পরীক্ষা দিবার জন্য আমাকে পড়িতে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু তখন শনি আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে, সদ্‌যুক্তি শুনে কে? আমি পড়াশুনা ত্যাগ করিলাম। চাকুরির অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে হাতখরচ দরকার হইলে মায়ের নিকট হইতে গোপনে আদায় করিতাম, এখন যখন যা দরকার হয়, দাদা ও বৌদিদির নিকট পাইলেও তাহাতে নিজের মানের লাঘব হইতেছে বলিয়া মনে হইল। বৌদিদি স্নেহে, যত্নে ও আদরে মায়ের স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন, দাদা কখনও কোন দিন আমাকে জানিতে দেন নাই যে, আমি পিতৃহীন। বিবাহ দিলে আমার স্বভাবচরিত্রের পরিবর্ত্তন হইতে পারে ভাবিয়া দাদা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি স্পষ্টই বিবাহে অসম্মতি জানাইলাম। বৌদিদিও অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু আমার কথার নড়চড় হইল না। তখন সখের পায়রা, বিবাহ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকা আমার পোষাইবে কেন? সংসারী হইয়া এমন স্বাধীন জীবনের সুখভোগ কি নষ্ট করিতে পারি! দাদা ইহার জন্য আমাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করিলেন, কিন্তু বৌদিদি দাদাকে প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দিতেন, "দেখ ওকে কিছু বলো না, ছেলেমানুষ, জ্ঞান হলেই সব শুধরে যাবে। মায়ের শেষ কথা মনে থাকে যেন। মা যে ওকে আপনার হাতেই সঁপে দিয়ে গেছেন।" দাদাও সেই ভাবিয়া আমাকে তিরস্কার করা ছাড়িয়া দিলেন; তবে আমি কিসে ভাল হইব, সৎপথে আসিব, তাহাই কেবল ভাবিতেন। পাড়ার লোকে আমার নিন্দা করিলে তাঁহার কোমল প্রাণে বড়ই বাজিত। বংশের কুলাঙ্গার আমি, সমাজে সকলেই আমার অখ্যাতি করিত, তাঁহার সহ্য হইত না। মানসিক দুশ্চিন্তাভারে তিনি ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার তখন সুখের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। দাদার শারীরিক বা মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। আমার সঙ্গীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে; অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনাও প্রবলতম হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই তাড়নার স্রোতে আমি গা ভাসাইয়া দিয়াছি। লুকাইয়া লুকাইয়া হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলাম। অনেক লোভী কুসীদজীবীরই আমাদের পৈতৃক বসতবাটীর অর্দ্ধাংশের উপর লোভ পড়িয়াছিল। আমার প্রতি সহানু-

ভূতি জানাইয়া আমাকে টাকা ধার দিবার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। একদিন এক অসৎসংসর্গে পড়িয়া চৌর্য্য অপরাধে পুলিসে ধৃত হইলাম। তাহাতে কারাবাসের খুবই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দাদা আমার বিস্তর টাকা ধার করিয়া ভাল কৌন্সিলি দিয়া আমাকে আদালতে নির্দ্দোষ প্রমাণ করাইয়া কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন। সেদিন তিনি আমার গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহমাখা স্বরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কত বুঝাইলেন, এমন কি শেষে ভয় দেখাইলেন, আমি যদি সৎপথে না আসি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন। হায়, তখনও যদি সাবধান হইতাম, তাহাতেও যদি আমার চক্ষু ফুটিত! দাদার এ একটা কৌশল ভাবিয়া আমি হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলাম।

একবার আমার কিছু বেশী টাকার দরকার হইল। বাবা নগদ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে একখানা বাড়ী ও কিছু জমিজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমার বন্ধুরা বুঝাইয়া দিল, দাদাকে বলিয়া পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে। তাহার কিছু অংশ বিক্রয় করিলেই আমার টাকা উঠিবে, সব দেনাও শোধ যাইবে, এবং বাকি অর্থের দ্বারা আমি একলা মানুষ, আমার অবশিষ্ট জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইবে। আমার আয় হইতে দাদার সংসারে সাহায্য হইতেছে। আমি কেন তাহাদের ভার বহন করি? তাহারা আরও বুঝাইয়া দিল, এই যে দাদা ও বৌদিদি আমাকে এখন বাহ্যিক এত আদর-যত্ন করিতেছে, এ সম্পূর্ণ কৃত্রিম; তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য আমার বিষয়সম্পত্তির অংশটুকু হস্তগত করা। বন্ধুদের সুপরামর্শে আমার চোখ খুলিয়া গেল। এতদিন তাহলে আমি ত এটা বুঝিতে পারি নাই! নিজেকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া তাহাদের পরামর্শ-অনুযায়ী কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলাম। সেইদিনই বাড়ী গিয়া বৌদিদিকে দিয়া দাদাকে বাড়ী ও বিষয়সম্পত্তি ভাগের কথা বলাইলাম। হায়, এত বড় নির্লজ্জ আমি যে, সে কথা তাঁহাদের সম্মুখে উত্থাপনা করিতে আমি বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিলাম না। দাদা এ প্রস্তাব শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি বেঁচে থাকতে তোকে কিছুতেই পৃথক হতে দেব না।" বৌদিদিও চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় আমাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ আমার চাই-ই। দাদাও কিছুতেই রাজি হইলেন না। বন্ধুদের সতর্কবাণী স্মরণ করিয়া দাদাকে

তখন চোর, বাটপাড়, ঠক ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিলাম। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র রাগান্বিত না হইয়া কেবল বলিলেন,—"আগে আমাকে মেরে ফেল্, তার পর তুই পৃথক হবি।" "আচ্ছা, দেখে নেব। কোম্পানীর রাজত্বে কা'কেও ঠকিয়ে নেবার আর যো নেই" বলিয়া ঝড়ের ন্যায় বেগে সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। যে মুখে দাদাকে এ সব পাপ কথা বলেছিলাম, সে মুখে এখনও এত কথা বলিতে পারিতেছি, এখনও আমার জিহ্বা খসিয়া যাইতেছে না, এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। তাই মধ্যে মধ্যে ভাবি, ভগবানের পুণ্য রাজ্য হইতে কি পাপীর শাস্তি উঠিয়া গেল!

আমার সহায়গণ তখন উপদেশ দিল, আদালতে বিষয় ভাগের জন্য নালিশ করিতে। একজন উকিলও বরাতজোরে জুটিয়া গেল। সে নিজের খরচে এখন মকদ্দমা চালাইতে রাজি হইল, পরে জিতিলে তাহাকে বিষয়ের খানিকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি ঝোঁকের মাথায় তাহাতেই রাজি হইলাম। দু' চার দিন পরেই আদালতে ভাগবাটোয়ারার আর্জ্জি পেশ করিলাম। যথাসময়ে দাদার নামে শমন বাহির হইল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। এবার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ করুক। আমাকে বোকা বলে ফাঁকি দেবার চেষ্টা, কিন্তু আইনের ফলে চোখে ধুলি দিবার যো নাই, বাবা! শমন পাইবার দিন রাত্রেই দাদা প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ক্রমেই তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া স্নেহের তরল ধারা দিবারাত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। আর বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কেবল প্রলাপ বকিতেছেন,—"ভাই, ভাই, ভাগ কেন? তুই সব নে। মা, তোমার অন্তিমকালের আদেশ যে পালন করতে পারলাম না!"

আদালতে জবাব দিবার দিন তিনি হাজিরও হইলেন না বা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকিলও নিযুক্ত করিলেন না। হাকিম তখন আমার উকিলের কথা শুনিয়া দাদাকে যথার্থই প্রতারক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি মীমাংসা করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ভাগের জন্য আদালত হইতে লোক পাঠাইবার হুকুম দিলেন। তখন আনন্দে আমার প্রাণ মেঘগর্জ্জনে ময়ূরের ন্যায় নাচিয়া উঠিল। আমি ইয়ার-বন্ধু লইয়া জোর মজলিস লাগাইয়া দিলাম। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সুরাপানে মত্ত থাকিয়া মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীর কাছে আসিয়া শুনি, আমাদের বাড়ী হইতে উচ্চ ক্রন্দন রোল আসিতেছে। আমার ছোট ভাইঝির করুণস্বরে "বাবা

গো" চীৎকার-ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার পা আর নড়িল না। মনে হইল কে যেন আমার পৃষ্ঠে সজোরে শঙ্কর মাছের চাবুক মারিল। আমি জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে সেখানে বসিয়া পড়িলাম। নেশার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখ হইতে আজ পর্দ্দার আবরণ সরাইয়া দিল। ছেলেবেলার জ্ঞান হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত একে একে সব ঘটনা আমার স্মৃতিসমুদ্র মথিত করিয়া তুলিল। তবে কি আমিই পিতার মনে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছি? মায়ের মৃত্যুর কারণ কি আমিই? দাদা আজ যে স্নেহের অভিমানভরে সুখদুঃখের অতীত কোন স্থানে চলিয়া গেলেন, আমিই কি সেই ভ্রাতৃহন্তা? না, না, তাও কি সম্ভব? একজন মানুষের দ্বারা কি এত পৈশাচিক ঘটনা সম্পন্ন হইতে পারে? কাছ দিয়া একটা কুকুর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, যেন অতি সাবধানেই সে আমার পাশ কাটাইয়া গেল, পাছে আমার অপবিত্র দেহ স্পর্শ করিলে তাহার পাপ হয়। মনে হইল যেন ঘৃণাভরে আমার দিকে মুখ বাঁকাইয়াই সে চলিয়া গেল। তবে কি আমি ঘৃণিত কুকুরেরও অধম, তাহারও অবজ্ঞার পাত্র?

পাড়ার লোকেরা সব হায় হায় করিতেছে। পাড়ার অতি বড় অসজ্জনও দাদাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। আমিই কেবল সে মহৎ হৃদয়ের উচ্চতা অনুভব করিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর দরজায় এক খাট আসিল। জনকতক লোক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। অমনি কান্নার রোল আরও জোরে উঠিতে লাগিল। একবার মনে হইল, বাড়ীর ভিতর দৌড়িয়া যাই। অমনি অতীতের স্মৃতি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় হৃদয়ে আসিয়া বিঁধিল। যে মাতৃকল্পা সীমন্তিনীর অগাধ স্নেহ ও ভালবাসার প্রতিদানে তাহার সিঁথার সিন্দুরবিন্দু নিজ হস্তে মুছাইয়াছি, যে স্নেহশীলা শিশু বালিকার "বাবা" বলা জন্মের মত ঘুচাইয়াছি, কোন প্রাণে এখন তাহাদের সম্মুখীন হইব? পাড়ার লোকেরা "বল হরি" বলিয়া খাট উঠাইল। তাহারা শ্মশানাভিমুখে চলিল। আমিও উঠিয়া তাহাদের অলক্ষিতে তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। শ্মশানে গিয়া শব নামাইয়া তাহারা সৎকারের যথারীতি অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিল। পরে চিতাকাষ্ঠের উপর শব চড়াইয়া একজন প্রশ্ন করিল,—"লোক ডাকতে গেল, সে হতভাগা এখনও এলো না! যে আজীবন দাদার প্রাণে অশান্তির আগুণ জ্বালিয়ে এসেছে, আজ শেষ একবার মুখ-অগ্নিটাও করে যাক্।" আমি আর নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারিলাম না। কে যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্তল

হইতে বলিয়া উঠিল,—"জীবনে যাকে একদিনও একটা মিষ্ট কথা কহিয়াও সুখী করিতে পারি নাই, আজ তাহার শেষ কাজটা সম্পন্ন ক'রে তার আত্মার সদ্গতির উপায় কর, যদি তাতে পাপের বোঝা কিঞ্চিৎ লাঘব হয়!"

আমি দৌড়িয়া শবের সম্মুখীন হইলাম। আমাকে দেখিয়া সবাই একটু পিছাইয়া গেল। কেহই কিছু বলিল না। একবার দাদার মুখের দিকে, একবার তাঁহার পায়ের দিকে চাহিলাম। ইচ্ছা হইল, একবার দাদার পা দুখানি ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লই। কিন্তু সে পবিত্র দেহ এই পাপ হস্তে স্পর্শ করিতে ভয় হইল। বাল্যকালে যে মুখে "দাদা" বলিয়া আদরে কত চুমু খাইয়াছি, আজ ধীরে ধীরে কম্পিতহস্তে সেই মুখে অগ্নি জ্বালিয়া দিলাম। দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে, সকলে যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। তাহারা যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য কেহই কিছু বলিল না। আমার মনের ভিতর তখন যে কি তীব্র হাহাকার উঠিতেছিল, তাহা যদি তাহারা ঘুণাক্ষরেও টের পাইত, তাহা হইলে আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া তাহারা কিছুতেই থাকিতে পারিত না। আমি শ্মশানের এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিলাম। এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নয়নে অশ্রুর বন্যা বহিল। আমি ভূমিতে লুটাইয়া কাতরভাবে ফুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

একবার ভাবিলাম বাড়ী ফিরিয়া যাই; বৌদিদির পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিইগে। এ সময় তাহাদের শান্ত করিবার আর কেহই নাই যে! কিন্তু সাহস হইল না। সেইদিন আমি প্রথম গৃহত্যাগ করি। গ্রামের আশে পাশেই ঘুরিতাম, লোকমুখে বৌদিদির ও শিশু পুত্র-কন্যার সংবাদ লইতাম; কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের সম্মুখীন হইয়া ভাইঝি ও ভাইপোকে বুকে ধরিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে ভরসা হইল না। শেষে একদিন একজনের নিকট শুনিলাম, "বৌদিদির বাবা তাহাদের পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনেক সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও তিনি স্বামীর ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃতা হন নাই। দাদার নাকি বৌদিদির প্রতি শেষ আদেশ, আমি অবোধ, পিতৃমাতৃহারা, আমার যেন কোনও কষ্ট বা অযত্ন না হয়! ইহা শুনিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে মান, অপমান, চক্ষুলজ্জার ভয় সবই মন হইতে দূরে হইয়া গেল। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে বৌদিদির চরণতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্ষমাময়ী

স্নেহশীলা বৌদিদি তৎক্ষণাৎ আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—"ভাই, তোমার জন্যই আমি এখানে এখনও আছি! শেষমুহূর্ত্তে তোমাকে দেখবার জন্য তিনি বড়ই কাতর হয়েছিলেন। তোমার নাম করতে করতেই তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়।" আমি অধীর হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম। ছোট ভাইঝিটি আমার কোলের উপর আসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কোলের ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হায়, আমিই তোদের পিতৃহন্তা, মনুষ্যাকারে পিশাচ, কাকা নয় রাক্ষস! এই আমার জীবনকাহিনী। একথা অপরিচিত আর কাহা-কেও বলিতে সাহস করি নাই। ভাই এমন দাদা কি আর কাহারও ভাগ্যে জুটে! জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্যফলে তাঁহাকে পেয়েছিলাম, কিন্তু মূর্খ আমি, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই! আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার চোখের কোণে কি এক বিন্দুও জল আসবে না! আমাকে পশু ব'লে ঘৃণা করবে না তো?"

এই বলিয়া সে চুপ করিল। তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। গাছের ডালের ফাঁক দিয়া সন্ধ্যাতারা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। প্রকৃতিদেবী এক উদার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! পাগল আমার বুকের ভিতর মাথা লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, হতভাগ্য জীব যেন মনে বিন্দুমাত্রও শান্তি লাভ করে! সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ভাই, দাদার ঋণের কথা এক মুখে কত বলব। একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি! এই দ্বিতীয় বার গৃহত্যাগের কারণই হচ্ছে ভাই। বৌদিদির সেবা করা, ভাইপো, ভাইঝিকে মানুষ করাই আমার তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। বৌদিদি আমাকে বিবাহ করবার জন্য অনেক অনু-রোধ করিলেন, কিন্তু পাছে বিবাহ করিলে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই এই ভয়ে সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলাম না। জমিজমা কিছু বিক্রয় করিয়া বাজারের ঋণ সব শোধ করিলাম। উকিলবাবুকেও আদালতের খরচের টাকা ও তাহার পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু দিলাম। এ কার্য্যে বৌদিদি নিজে আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আমি গ্রামের মধ্যেই কাপড়ের এক কারবার খুলিলাম। আমার স্বভাব-চরিত্রেরও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কুসঙ্গ ছাড়িলাম, নেশা করা ত্যাগ করিলাম। অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের সহিত ব্যবসা

চালাইতে লাগিলাম। কাপড়ের ব্যবসা হইতে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই আমাদের সংসার এক প্রকার সচ্ছলে চলিয়া যাইত। কার্য্যের মধ্যে যেটুকু অবসর পাইতাম, ভাইপো ও ভাইঝিকে লইয়া আদর-যত্ন করিতাম, ভাইঝিটিকে মধ্যে মধ্যে অল্প স্বল্প পড়াইতাম। এই রকমে দিন এক প্রকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিন দাদার ক্যাসবাক্সের মধ্যে পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একখানি দলিল আমার নজরে পড়িল। দলিলখানি খুলিয়া পড়িয়া দেখি, এ যে বাবার উইল! এ উইলে যে বাবা আমাকে ত্যজ্য পুত্র করিয়া দাদাকেই সব বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী করে গেছেন। তা সত্বেও আমি ভাগবাটোয়ারার নালিশ করিলে দাদা আদালতে হাজির হন নাই। এ কথা দাদা এমন কি বৌদিদির নিকট ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই। ভাই, আমার আর মাথার ঠিক রহিল না। আমি সেই দিনই কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার গৃহত্যাগ করিলাম। এক মাস হইল এখানে রয়েছি তাহাদের দেখবার জন্য প্রাণ আবার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অতীতের চিন্তা এত চেষ্টা করেও বিস্মৃতি সাগরে ডুবাতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় স্মৃতিটাকে বাহিরে টানিয়া নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলি; কিন্তু যতই চেষ্টা করি, ততই যেন সেটা ভীষণকায় দৈত্যের মত ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে। ভাই এর হাত হ'তে কিছুতেই নিস্তার নাই?"

আমি তখন তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক বুঝাইলাম। বৌদিদি ও ছেলেমেয়েদের সংশ্রবে থাকিলে তাহার মনের অশান্তি অনেকটা দূর হইয়া যাইবে। রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। পাগল পথে যাইতে যাইতে মনের আবেগে একটি গান ধরিল,—

পাতকী বলিয়া কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়!
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয়,
করিতে এ ধুলাখেলা, অবসান হলো বেলা,
খেলার সাথী ছিল যারা, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়া লাভে মূলে মরণের সিন্ধুকূলে,
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখনও আমি, ডাকিনি হৃদয়স্বামী,
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

নিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে এ স্বর উত্থিত হইয়াছে। বড়ই প্রাণস্পর্শী, বড়ই করুণ শুনাইতেছিল!

পরদিন সকালে তাহার সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলাম, পাগল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সকলেই ভাবিল, পাগল নিজের খেয়ালের বশেই হঠাৎ এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। কিন্তু আমি তাহার স্থানত্যাগের দুটি কারণ স্থির করিলাম। প্রথমটি হয় ত লজ্জায় আমার নিকট আর মুখ দেখাইতে পারিবে না বলিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, কিম্বা বাড়ীর জন্য তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে। শেষোক্ত কারণটাই আমার বেশী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গত রাত্রে তাহার নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইবার তাহা যে প্রধান অস্ত্র! কিন্তু সে জন্য তাহার নিকট আমার ত কৃতজ্ঞতা জানান হয় নাই! তাহার নামধাম সে ত কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। ভদ্রতার খাতিরে সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতেও পারি নাই। তাই যখনই বিদেশে যাই, পথে ঘাটে বিশেষ নজর রাখি যদি হঠাৎ তাহার সন্ধান পাই। তাহ'লে একবার তাহার হাত ধরিয়া বলিব,—"ভাই তোমার কাছে আমি বড় কৃতজ্ঞ। নিজের জীবনে অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে, যে অমূল্য উপদেশ আমাদের জন্য সঞ্চিত ক'রে রেখে গেছ, তার সাহায্যে আমরা অবাধে এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যাব!" জীবনে আর কি একবারও তাহার দেখা পাইব না?

ঘূর্ণাবর্ত্ত। *

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল্।]

১

ভাদ্র মাসের ভরা পদ্মায় ঘুরিছে ঘূর্ণ জল,
ছুটিছে তীব্র বর্ত্তুল স্রোত গর্জ্জিয়া অবিরল;
উর্দ্ধগুণ্ড গজযূথসম বিটপী-গুল্ম বুকে
তরঙ্গ 'পরে তরঙ্গদল ধাইছে ঘূর্ণীমুখে!

---

* সিলারের Whirlpoolএর অনুকরণে।

২

কত দূর হ'তে আসে কত লোক দেখিতে ঘূর্ণ জল,
আপনি নবাব এসেছে সেথায়—কত না কৌতূহল!
সঙ্গে সিপাহী আমির-ওমরা আত্মীয়-পরিজন,
দেখিতে এসেছে নবাবজাদীও সাথে করি সখীগণ।

৩

সূর্য্য তখন বসিছেন পাটে রক্ত মেঘের আড়ে,
কলরব তুলি উড়িছে বিহগ আম্রকুঞ্জধারে;
ঝাউ বনে মৃদু ঝঙ্কার দিয়া বায়ু ধীরে ব'য়ে যায়;
কাননের শিরে দিনের আলোক সরিতেছে পায় পায়।

৪

উচ্চ আসনে বসিয়া নবাব দেখিছে ঘূর্ণ বারি,
দাঁড়াইয়া তীরে আমির-ওমরা সিপাহীরা দিয়া সারি।

৫

সহসা নবাব গভীর কণ্ঠে কহিল সকলে ডাকি
আমির ওমরা কে বীর এমন ফিরাও এ দিকে আঁখি,
আনিবে তুলিয়া পুষ্পস্তবক অই আবর্ত্ত হ'তে—
পারিবে যে বীর বাঞ্ছা তাহার রাখিব সাধ্যমতে।

৬

তখন নবাব ক্ষিপ্রহস্তে পুষ্পস্তবক ধরি
ছুড়িয়া ফেলিল পদ্মাগর্ভে; খরস্রোত মুখে পড়ি
স্তবক চলিল রঙ্গে নাচিয়া তরঙ্গ 'পরে উঠি
ত্বরায় পড়িল ঘূর্ণাবর্ত্ত-গহ্বর-মাঝে লুটি'।

৭

নবাবের ডাকে আমির-ওমরা এল না অগ্র সরি—
জনেক তরুণ সিপাহী আসিয়া দাঁড়াল সেলাম করি;
তেয়াগি কুর্ত্তা নিমেষে পড়িল ঝাঁপায়ে পদ্মা-বুকে
দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া চলিল ভয়াল ঘূর্ণীমুখে।
স্তম্ভিত যত আমির-ওমরা বিস্মিত জনদল,
কানাতে কাঁপিল নবাবজাদীর হৃদের অন্তঃতল।

৮

ক্ষণে ডুবে যুবা ক্ষণে উঠে ভাসি—আবর্ত্তমাঝে পড়ি,
ক্রমশঃ চলিছে অতল মধ্যে স্রোতের চক্র ধরি,

নাহি যায় দেখা—বীর সুপুরুষ উঠিবে না বুঝি আর,
শুধু অনন্তা সলিল-বক্ষ দেখিতেছে বার বার।
আঁখি নাহি ফিরে নবাব-দুহিতা চেয়ে রহে জলপানে
নয়নের কোণে জাগিছে অশ্রু—হিয়া মানা নাহি মানে।

৯

সহসা কূলের আলোড়িয়া নীর—কি যে অই যায় দেখা,
প্রতীচি-প্রান্তে তখনো ফুটিয়া গোধূলি স্বর্ণরেখা
করে শোভিতেছে সিক্ত স্তবক তরুণ উঠিল ধীরে
ধ্বনিল গভীরে ঘন জয়নাদ পদ্মার বালু-তীরে।
খোজা আসি দিল নবাবজাদীর কঙ্কন উপহার,
হৃষ্ট যুবক কানাতের পানে ফিরাইল আঁখি তার।

১০

কুঞ্চিত ভ্রূ কহিল নবাব, "সিপাহী ধন্য তুমি,
এনাম তোমার পদ সুবাদার দু' হাজার বিঘা ভূমি!
শোন কাপুরুষ আমির-ওমরা, শোন সমাগত জন
এবার যে বীর আনিবে স্তবক আমার রহিল পণ,
'মন সুবাদারি' নবাব-দুহিতা পাইবে সে উপহার"—
পদ্মার নীরে কুসুমগুচ্ছ দিল ফেলি আরবার।

১১

কানাতের পানে চাহিয়া যুবক ঝাঁপায়ে পড়িল নীচে,
নির্ব্বাক সবে মর্ম্মরসম দাঁড়ায়ে রহিল তীরে।
তরঙ্গসহ যুঝিছে তরুণ, বাহুতে কাটিছে জল;
কাননের মাঝে থামিয়া আসিছে বিহগের কোলাহল!

১২

দেখিতে দেখিতে নাহি যায় দেখা পদ্মার পরপার,
ধীরে ধীরে হ'ল ধূসর মলিন—নামিছে অন্ধকার।
গরজে পদ্মা মত্ত ভীষণা শত বজ্রের রোল
দৈত্যের মত আছাড়ি ঊর্ম্মি বেলায় দিতেছে দোল।

১৩

চেয়ে আছে সবে সলিলের পানে আর না দৃষ্টি চলে,
ঘনাইয়া আসে সাঁঝের আঁধার আকাশে ভূমিতে জলে।
কোথা যুবা কোথা? জ্বালায়ে আলোক ছুটে লোক তীরে তীরে,
কেহ বা ডাকিছে—বন-পাশ হ'তে প্রতিধ্বনি আসে ফিরে!

১৪

কানাতের মাঝে দাসী এসে দেখে রয়েছে ধূলায় পড়ি
নবনী-কোমল নবাব-দুহিতা নয়নে অশ্রু ভরি।
গৃহ-অভিমুখে ফিরিছে নবাব বড়ই উদাস মন,
তখনো ধ্বনিছে কর্ণে তাহার পদ্মার গরজন।

পোষা কুকুর। *

[লেখক—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্-এ।]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবদুল কাদেরের বাড়ী হালিসহর নিজ চাটিগাঁ হইতে প্রায় মাইল তিন দূরে অবস্থিত। গ্রাম পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে বটে, কিন্তু নগরোপকণ্ঠস্থ পল্লীর অন্যান্য অসুবিধার ন্যায় জলজ 'হিয়াসিন্থে' ভরা অস্বাস্থ্যকর ডোবা প্রভৃতিরও অভাব নাই। গ্রামে সাধারণ লোকের তরজার ঘরই অধিক, কিন্তু যাহারা জাহাজে সারেং সুকানীর কার্য্য করিয়া দু পয়সা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদের "কোঠা" ঘরগুলি দূর হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাদের মিঞাকে জাহাজের কার্য্য করিতে দেশ বিদেশে যথেষ্ট ঘুরিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু শৈশবের লীলা-নিকেতনের মধুর স্মৃতি তাঁহার চিত্তপট হইতে কখনও মুছিয়া যায় নাই। এমন কি সুবর্ণভূমি ব্রহ্মদেশের রত্নসম্ভার ও ব্রহ্মরমণীমনোবিমোহন সৌন্দর্য্যও শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সে ঔজ্জ্বল্য মলিন করিতে পারে নাই। ইংরাজের বাষ্পপোত বাহিয়া কত নদ, কত নদী অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে; কত স্থানে কত চিত্তাপহারী দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইয়াছে। বাল্যের প্রমোদ-স্থান কর্ণফুলীর সে বাঁকটির ন্যায় এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-উদ্ভাসিত অপর কোনও স্থান কদাপি তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আর হইলেই বা তেমন ভাল লাগিবে কেন? মানবশিশু সংসারে আসিয়া মহাদ্যুতির বিমলালোকে হাস্যময়ী বসুন্ধরার যে ক্ষুদ্রতর অংশটুকু প্রথম দেখিয়া থাকে, সে তাহা কখনও জীবনাবধি বিস্মৃত হইতে পারে না। চাকরীতে ঢুকিয়া অবধি আবদুল মিঞা

---

* Louis Enault-প্রণীত ফরাসী গল্প-অবলম্বনে।

প্রায়ই বলিত 'ইন্‌সল্লা' নসীবে যদি কখনও সুখ লেখা থাকে তাহলে কষ্টে স্বষ্টে দু পয়সা বাঁচিবে, দেশে ফিরে একখানা কুঁড়ে বাঁধব। যাহারা সারাজীবন কেবল বিদেশে খাটিয়া মরে তারা শেষ বয়সে দেশে ফিরিয়া মাথা ঢাকিবার মত আশ্রয় পাইলে নিজেকে কৃতার্থমন্য বলিয়া মনে করে। বার্দ্ধক্যে আপন ঘরে বসিয়া মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান হইলেই তাহাদের সকল আকিঞ্চন মিটিয়া যায়। মানবের সুখ-আশা কদাচিৎ ফলবতী হইয়া থাকে; কিন্তু আবদুল কাদেরের ভাগ্যক্রমে তাহার যৌবনের সুখস্বপ্ন সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। সহর হইতে বাঁধান গ্রাম্য রাস্তা ধরিয়া প্রায় আধাআধি পথ চলিয়া গেলেই ডান হাতে মসজিদ ও বাঁ হাতে পাঁচপির বদরের আস্তানা। গ্রামবাসিগণের মধ্যে যে সকল লোক জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বাধ্য হইয়া জাহাজে বা নৌকায় কাজ করে তাহাদের আত্মীয়স্বজন পীরের নিকট প্রায়ই সীর্ণি দিয়া থাকে। দরগার সান-বাঁধান আস্তানার উপর বিশ্বাসী জনের ভক্তির কত যে চিহ্ন পড়িয়া আছে তাহা আর বলিবার নহে। এই স্থানেরই প্রায় রশি দুই দূরে আবদুল কাদেরের আবাসগৃহ। বাড়ীখানি ছোট হইলেও বেশ ছিম্‌ছাম্; দেখিলেই দুদণ্ড দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা করে। এক পার্শ্বে একখানি ছোট বাগান, অপর দিকে খোলা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। হালি-সহর হইতে দরিয়ার প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। যাহারা বাল্যকাল হইতেই নদী ও সঙ্গমের তরঙ্গভঙ্গে অভ্যস্ত, বারিধির বিশাল বক্ষে যাহাদের জীবনের অধিকাংশই যাপিত হইয়াছে এইরূপ মুক্ত প্রান্তরের নিকটে না থাকিলে তাহাদের প্রাণ যেন আপনা হইতেই হাঁপাইয়া উঠে। আবদুল কাদের এই মাত্র ছয় মাস হইল দেশে আসিয়া বসিয়াছেন। গৃহখানির প্রতি নব আসক্তি এখনও তাঁহার কাটিয়া যায় নাই। কাদের মিঞার বাগানের বড় সখ; তাই গৃহপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র উদ্যানের একাংশে এক সারি গোলাপ গাছ ও কয়েকটী লিচু ও গোলাপ জামের কলম এবং অপর দিকে পালং, কনকনটিয়া, লাউ, বিলাতি কুমড়া প্রভৃতি শাক-সবজী লাগাইয়াছেন। এই বাগানখানির জমি তৈয়ার করা, আগাছা উদ্ভিদ নিড়ান এবং বৃক্ষলতাদিতে জল দেওয়া তাহার একটি বিশেষ দৈনন্দিন কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাকি সময়টুকু কাটিত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একখানি দৈনিক সংবাদপত্র পড়িয়া। সারেং যুদ্ধের খবরের জন্য এত ব্যগ্র থাকিতেন যে, যথাসময়ে খবরের কাগজখানি না পড়িতে পাইলে তাঁহার আর সেদিন ভালরূপ অন্ন জীর্ণ হইত না। মাকুনীর

কৃপায় হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইত না। মাকুনী মনিবকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত; তাহার সেবার ক্রটী ছিল না। দেশী প্রথায় রাঁধা তরকারী ভালরূপ কাদেরের পছন্দ হইত না বলিয়া সে তাহার নির্দ্দেশ মত উগ্র ঝাল মসলা প্রভৃতির সংযোগে নাবিকগণের মুখরোচক বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে শিখিয়াছিল।

সারেং মিয়ার কুকুর সঙ্গে করিয়া ফিরিতে আজ বড় দেরী হইয়াছে, মাকুনীর স্বভাবতঃ চটা মেজাজ, তাই আরও উগ্র হইয়া রহিয়াছে। একেই সে বড় মিঠা কথার ধার ধারে না, রাগিলে ত একেবারেই নহে।

কাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে না করিতেই মাকুনী ঝঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিল, "বাপজান তোমার আক্কেলখানা কি! বেলা তিন পহর হতে চল্লো তবুও মানুষের দেখা নাই, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল বলে ফের আবার চাপিয়ে দিলাম, তাও কি এখন যদি ধরে টরে গিয়ে থাকে ত আমি জানি না! ফের নতুন করে রান্না টান্না করতে আমি আর পারব না বলে দিচ্ছি। একবার মানুষের শরীরের দিকে ত তাকাতে হয়। সারেং রাধুনীর স্বভাব জানিত তাই তাহার সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "তুই মা মিছামিছি রাগ করছিস্ কেন? ভাত যদি ঠাণ্ডা হয়ে বা ধরে গিয়া থাকে সে ত আমার দোষেই হয়েছে সেজন্য ভুগতে হয় আমি ভুগবো যা আছে বেড়ে ফ্যাল আমি তাই খাব এখন। দেরী হয়েছে বলে আমিও দৌড়াতে দৌড়াতে আস্‌ছি আর এই দেখ এক খোদার জীব এটা ত না খেতে পেয়ে মরবার যোগাড় হয়েছে।

মাকুনী সারেংএর পশ্চাৎস্থিত কুকুরটিকে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, তাই দুয়ারের পাশ হইতে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিল "এ আল্লা পাগল হলে নাকি বাপজান এ আবার কি একটা নোংরা জানোয়ার—চাদরে বেঁধে টেনে আন্‌ছ।"

ওরে দুপুরের অতিথরে অমন করে বকিস্‌নে, আজ ওর এই বাড়ীতে জেয়াকৎ। মোদের পেটের পাইলে যে জোর খিদের হাওয়া লেগেছে আর দুয়োরে দাঁড়িয়ে গোলমাল করলে চলবে না, ঘরে কি আছে আনগে যা। পাচিকা দুয়ার ছাড়িয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল—আবদুল কাদের শুনিলেন যে রান্নাঘর হইতেই বলিতেছে, "আ হা হা কি আমার অতিথরে! এনেছেন ত এক নেড়ি কুত্তা ধরে তার সকল সুরত দেখলেই ভক্তি চটে যায়।"

ওরে সকলেই কি আর দেখ্‌তে ভাল হয়, চেহারায় কি করে ও যে বুদ্ধিতে পাকা, অমন হুঁসিয়ার জানোয়ার পাবি কোথায়? বেচারা সত্যি সত্যিই দু দিন খেতে পায়নি ঘরে যদি—

মাকুনীর কথাগুলি কর্কশ হইলেও তাহার হৃদয়খানি মমতাপূর্ণ। কাহারও কষ্ট দেখিলে সে নিজের ক্ষুদ্র সাধ্যমত প্রাণপণে উহা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিত না। শীর্ণ কর্দ্দমাক্ত কুকুরটি দেখিয়া তাহার রমণীহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ভুলিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "তাই ত বাছারে আমার—পেটটা একেবারে যে পাতখোলার মত হয়ে গিয়াছে, দাঁড়াও কালকের চারটা ভাত আছে আর দেখি যদি গোস্তর দুই একখানা হাড়টাড় পাই।" দেখিতে দেখিতে নবাগত চতুষ্পদ অতিথির আহারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্য্যুষিত অন্ন যে কিরূপে এত মধুর হইতে পারে, ক্ষুধাহীন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত আজকালিকার বাবু লোকেরা তাহা বুঝিবেন কি করিয়া।

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটার নামকরণ হইয়া গেল "ভুলো"। ইতিহাসশাস্ত্রে সারেং বা তাহার পাচিকার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, নতুবা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলিতে গেলে তাহার নাম ভুলো দি সেকেণ্ড বা দ্বিতীয় ভুলো হওয়া উচিত ছিল, যেহেতু পরলোকগত প্রথম ভুলোর স্থান অধিকার করার সঙ্গে তাহার নামটিও তাহাতেই বর্ত্তিয়াছিল। গলায় এক গাছ দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে গোয়ালের বাহিরের দাওয়ায় বাঁধিয়া রাখা হইল। ভুলোর মনে তখন কি হইতেছিল তাহা কে বলিবে? তাহার মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও হৃদয়ে ভালবাসার অভাব ছিল না বটে কিন্তু একবার যে মানুষের নিকট দাগা পাইয়াছে, সে কি সহজে আত্মপ্রকাশ করে? কিন্তু যে বড়ই গম্ভীরপ্রকৃতির হউক না কেন, আজিকালিকার দিনে এক মুটা অন্ন পাইলে তাহা কি সহজে ছাড়িয়া যাওয়া যায়? তাহার গলদেশের বন্ধনরজ্জু না থাকিলেও সে যে এরূপ দয়াশীল গৃহস্থের বাটী ছাড়িয়া পথে পথে বেড়াইত না তাহা নিঃসন্দেহ। দুই চারি দিনের মধ্যেই "ভুলো"চন্দ্রের ভাবগোপন রাখা সম্ভব হইল না। যে মনিব তাহাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার স্থান যদি কোনও আদর-আপ্যায়ন-পরায়ণ উদারহৃদয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অধিকার করে তাঁহার নিকট কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায়? যে খাইতে দেয়, থাকিতে দেয়, আদরযত্ন করে, তাহার সে স্নেহের প্রতিদান না করা মানুষের সম্ভব বটে; কিন্তু সামান্য একটা কুকুর তাহা পারিয়া উঠিবে কি করিয়া? তাই মানব-

চরিত্রের অনুকরণ করিতে না গিয়া ভুলো কুকুর সারেংকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে লাগিল। মগ মনিবের প্রতি তাহার যেরূপ ভালবাসা ছিল ইহা তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। নিঃসঙ্গ আবদুল কাদেরের ভুলো ছিল চাকরকে চাকর, দোস্তকে দোস্ত। সারেং বাটীর বাহির হইয়াছেন আর অমনি ভুলো তাহার সঙ্গ লইয়াছে। বেড়াইবার সময় সর্ব্বদা পিছনে পিছনে আর শয়নকালে খাটের নীচে পায়ের তলার দিকে থাকিত। মনিবকে সে মুহূর্ত্তের জন্যও কাছছাড়া হইতে দিত না। সর্ব্বদা চখে চখে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লওয়ার চেষ্টা করিত। এরূপ সদা-সতর্ক শরীররক্ষী বোধ হয় রাজা-রাজড়ার ভাগ্যেও কম জুটিয়া থাকে। মনিবের কাছে আছি বলিয়াই তাহার মাথা কিনিয়া রাখিয়াছি, এমন কুবুদ্ধি একদিনের তরেও ভুলোর মস্তকে প্রবেশ করে নাই। প্রভুর উপকারের জন্য কি প্রকারে নিজেকে নিয়োজিত করা যায় এই চিন্তাতেই যেন সে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। কাদের মিঞার মনের ভুলে ছাতা, চাদর, রুমাল প্রভৃতি এখানে সেখানে ফেলিয়া আসিতেন, ভুলোর কাজ ছিল সেগুলি মুখে করিয়া বাড়ী বহিয়া আনা। সদর দরজা খোলা থাকিলে পাছে চোর-বদমায়েস বাটীর ভিতর প্রবেশ করে এই ভয়ে মাকুনী সর্ব্বদা অর্গল বন্ধ করিয়া রাখিত। ভুলোও মাকুনীর দেখাদেখি সাবধান হইতে শিখিয়াছিল। মনিবের সহিত বাটী ফিরিয়াই সে পাচিকার অনুকরণে সর্ব্বাগ্রে অর্গলটি লাগাইয়া দিত। ইহার জন্য পিছনের পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে কত ধস্তাধস্তি করিতে হইত; কিন্তু সে সকল কষ্টের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিত না। খবরের কাগজখানি সকাল সকাল পাইবার জন্য কাদের মিঞা প্রায়ই ডাকপিয়ন আসিবার পথে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। পথে পোষ্টম্যানের সহিত দেখা হইলেই কোন গাছের তলায়, কোনও পরিচিত লোকের দাওয়ায় বসিয়া "যুদ্ধবার্ত্তা" পড়িতে সুরু করিয়া দিত। ক্রমে সংবাদপত্রের প্রতি প্রভুর অত্যধিক আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া ভুলো একলাই সেই পথে ছুটিয়া যাইত এবং ডাক পিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া নেজ নাড়িয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করাইত। এই কুড়ানো কুকুরের বুদ্ধির কথা ক্রমেই গ্রামের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং প্রায়ই সারেংয়ের ভ্রম-পরিত্যক্ত জিনিসগুলি সাবধানে বহিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া সকলেই জানিত যে, ভুলোর কাছে কোন জিনিস হারাইবার সম্ভাবনা নাই, তাই ডাকপিয়নও বিশ্বাস করিয়া "আখবর"খানি ভুলোকে

ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিত না। ভুলো কাগজখানি পাইলেই মুখে করিয়া তিন লম্ফে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিত এবং মনিবের পায়ের নিকট উহা রাখিয়া দিয়া নিজের অর্দ্ধ-কর্ত্তিত লেজটি নাড়িয়া আপনার কার্য্যকুশলতার আপনিই তারিফ করিতে থাকিত। প্রভুর সম্মানরক্ষার প্রতিও ভুলোর বড় কম দৃষ্টি ছিল না। তাই কাদেরের স্বগ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল "ভুলো জমাদার"। সারেং মিঞা হয় তো গ্রাম্য সরু পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, সম্মুখে পল্লীবালকেরা জটলা করিয়া মার্ব্বেল বা দাঁড়াগুলি খেলিতেছে, সারেংকে দেখিয়াও খেলার ঝোঁকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে না; এইরূপ আদব-কায়দার অভাবের জন্য ভুলো তাহা-দিগকে এইরূপ দাঁত খিচাইয়া চীৎকার করিয়া তাড়া করিত যে, তাহারা তৎ-ক্ষণাৎ রাস্তা ছাড়িয়া পলাইবার পথ পাইত না।

ভুলোর ব্যবহারে সারেংএর অনুরাগও তাহার প্রতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে-ছিল। নিজের মনস্তুষ্টির জন্য অপর কাহাকেও এরূপ ব্যস্ত হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হইয়া থাকে! সুতরাং সারেং-গৃহে ভুলো ক্রমশঃ অপত্যের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। এরূপ ভাল মনিব, খাওয়া-দাওয়ার যত্ন, এমন সুন্দর খটখটে সুপরিচ্ছন্ন থাকিবার স্থান—কুকুরের অদৃষ্টে ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে! এমন সুদিন যে তাহার জীবনে কখনও আসিবে ভুলো তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু কুকুরেরই বল আর মানুষেরই বল, চিরদিন সমান যায় না। আবদুল কাদেরের শূন্য গৃহে গৃহলক্ষ্মী শুভাগমন করিলেন। মনিবের হৃদয়ের সদর জায়গায় যে স্থানটুকু ভুলো কুড়ে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমেই তাহাকে পিছনে হটিয়া যাইতে হইল।

পাগলা মাষ্টার।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

(১০)

তখন প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়াছিল। আমি প্রফেসর সেনের সহিত দাবা খেলিতেছিলাম। পোদ্দারদ্বয় ভোজনান্তে নিদ্রা যাইতেছিল। সন্ধ্যার

সময় বোম্বাই মেলে গুজরাটী বণিক কাশিম করিমও আসিয়া জুটিয়াছিল। সেও বারাণ্ডায় একখানা চারপাই বিস্তার করিয়া নিদ্রাদেবীর শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। রায় সাহেব কোথায় ছিল জানি না। সে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইবার অনুমতি পাইয়াছিল। দুইটি বন্ধুর বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনেকটা এক প্রকারের, তাই উভয়ের এত ঘনিষ্ঠতা।

সেন আমার কালো ঘরের গজটিকে তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় মাঠ হাসিতেছিল। সে এক একটা ভাল চাল দিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত হরিতক্ষেত্রের দিকে তাকাইতেছিল। আমার গজ ধরিবার জন্য ঘোটককে আড়াই পদ চালিয়াই সে সগর্ব্বে মাঠের দিকে তাকাইল—তাহার পর আমার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া আমাকে ময়দানের দিকে দেখিতে বলিল। আমাদের বাঙ্গালার বাহিরে দশ বার হাত দূরে একটা কাফ্রি দাঁড়াইয়া চুরুট ধরাইতেছিল। আমার হৃৎকম্প হইল। দেহের মধ্যে শোণিত-প্রবাহ বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বালি´!

সে বলিল,—চুপ্! গোল ক'র না। আমি বাহিরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা কই। তুমি সাক্ষীদের ডেকে দেখাও। আমার কোনও সন্দেহ নাই, ঐ লোকটা সোণা চুরি করেছে।

কি আনন্দ! চোর ধরা পড়িয়াছে! ধারণা ঠিক হইয়াছে! হিসাবে কোনও ভুল নাই। বাঃ! বড় গর্ব্বিত হইলাম; বন্ধুকে বলিলাম—"ও আর যাবে কোথা? সন্দেহ হ'লে পালাবে, তুমি কাছে যেও না।"

সে বলিল—ননসেন্স! তাতে কি হয়েছে?

আমি বলিলাম—যদি তোমায় চিনতে পারে?

সে বলিল—তার সম্ভাবনা নেই।

সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া লোকটার সঙ্গে বাস্তবিক কথা কহিতে লাগিল। আমি পোদ্দার দুই জনকে ডাকিলাম, তাহারা দেখিয়াই চিনিল। দিগ্‌বিজয় কাঁপিতেছিল। বসুদামের ততোধিক উত্তেজনা। কাশিম করিমকে ধীরে ধীরে তুলিলাম। সে বলিল—হ্যাঁ ঐ রকমের কাফ্রি একটা দেখেছিলাম—হ্যাঁ ঐ বটে—না—হ্যাঁ। ঠিক ঐ বেশ মনে পড়েছে।

সেন যখন বুঝিল যে, আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তখন সে গুড্‌নাইট বলিয়া লোকটাকে বিদায় দিল। আমার কাছে আসিয়া বলিল—কি এখনই ধরবে নাকি?

আমি বলিলাম—কি দরকার? কাল সকালে ষ্টেসন থেকে সাক্ষী রেখে পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে তোমাদের দিয়ে চেনাব। আমার মামলা শক্ত হ'বে।

সে বলিল—সে বিচারের ভার তোমার উপর, আমি ও সব বুঝি না। তবে আন্দাজী আসামীটা দেখতে পেয়েছ।

আমি বলিলাম—আন্দাজী কি? সমস্ত হিসাব করে করেছি। তুমি ত গোড়া থেকে উড়িয়ে দিয়েছিলে।

সে বলিল—যাক্। তবে ঐ লোকটা যে পোদ্দারদের সোনা নিয়ে পালিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমি বলিলাম—নামটা জিজ্ঞাসা করেছ?

সে বলিল—হ্যাঁ। জ্যাক বার্লি। তবে ও সত্যি জ্যাক বার্লি কি প্রফেসার রায়—

শেষ পরিহাসটা হইল রায়কে দেখিয়া। ঠিক সেই সময় রায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার নাম উচ্চারণ হইতে শুনিয়া বলিল—কেন প্রফেসর রায় কি করেছে?

আমি তাহাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। রে আনন্দে বালকের মত হাসিতে লাগিল। অভিনন্দন করিয়া, করমর্দ্দন করিয়া আমার হাতে ব্যথা করিয়া দিল। সেনের একটা ভদ্রতা দেখিলাম। সেটা শিক্ষিত লোকের নিকট সুলভ। সে অকপটচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করিল, আমার নিকট বুদ্ধিতে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া কোনও প্রকার গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিল না। প্রভাতে কিরূপে তাহাকে ধরিব সে সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়া পদ্মনাভকে স্মরণ করিল কি না জানি না, কিন্তু শয়ন করিয়া অচিরে নিদ্রামগ্ন হইল। আমার পুলিস-কর্ম্ম-কলুষিত মনে নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল।

(১১)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জ্যাক বার্লির সন্ধান পাইলাম না। বিরক্ত হইলাম কিন্তু হতাশ হইলাম না। আরও দুইদিন চক্রধরপুরে অপেক্ষা করিলাম, শুনিলাম সে রেলের কার্য্যে বোম্বাই গিয়াছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে। যে রাত্রে তাহাকে দেখিয়াছিলাম সেই রাত্রেই নাকি তাহার উপর বোম্বাই যাইবার আদেশ হইয়াছে—কিন্তু সে রাত্রে কেহ তাহাকে চক্রধরপুরে দেখে নাই। যে সময় আমরা তাহাকে দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই সময় একখানা মালগাড়ি আসিয়াছিল; সম্ভবতঃ সে সেই মালগাড়িতে আসিয়াছিল—মিসেস বার্লির সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইবার জন্য। যাহা হউক আর সেখানে সদলবলে থাকিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম না। সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলাম।

সেনের কলেজ খুলিয়াছিল। প্রায় পনের দিন হইল, সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে। পোদ্দারদ্বয়কে চুঁচুড়া হইতে সংবাদ দিয়া আনাইলাম। কাশিম করিমকেও আমড়াতলায় পাইলাম। রেলওয়ে পুলিস জ্যাক বার্লিকে ধরিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। হাওড়া ষ্টেসনে তাহার মত আরও নয় জন ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান জোগাড় করিয়া সকলগুলিকে এক লাইনে দাঁড় করাইলাম। ষ্টেসন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি তিন চারি জন সাহেবকে সাক্ষী করিবার জন্য সে স্থলে বসাইলাম। আমার সাক্ষীদের প্রথমে একটা ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম।

প্রথমে সেনকে ডাকিলাম। সাহেবদের সম্মুখে বলিলাম—যে ব্যক্তি ট্রেণে সোণার থান চুরি করিয়াছিল সে ব্যক্তি এখানে আছে কি না দেখুন।

পাগলা মাষ্টার সেই দশজন কৃষ্ণকায় সাহেবের মুখের দিকে একে একে চাহিল। তাহার পর লাইনের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত চলিল, আবার ফিরিল। মুখে একটা নির্ব্বোধের মত ভাব—শেষে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"না।" এ উত্তেজনায় আমি অধৈর্য্য হইতেছিলাম—কাফ্রিগুলা ও আমার ফিরিঙ্গি সাক্ষীগুলা পরিহাস করিয়া হাসিতেছিল, ক্রোধে আমার সর্ব্ব-শরীর জ্বলিতেছিল। কি পাগল! বোধ হয় আমার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া সে এরূপ আচরণ করিতেছে। আমি তাহাকে আবার দেখিতে বলিলাম—সে এবার বলিল—"সে লোক এখানে নাই"; সকলে হাসিল। আমি জ্যাক বার্লিকে দেখাইয়া বলিলাম—"দেখুন ত এ লোককে কখন দেখেছেন কি?"

সে বলিল—জীবনে কখনও ইহাকে দেখি নাই।

বার্লি তাহাকে মাথা নীচু করিয়া সম্মান করিল বলিল—মহাশয় ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

তাহাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া বসুদাম পোদ্দারকে ডাকিলাম। সেন পাগলামি করিয়াছে; ইঁহার সম্পত্তি চুরি গিয়াছে ইনি আমার প্রতি ঈর্ষাপ্রযুক্ত আমার মোকদ্দমা নষ্ট করিবেন না। তাঁহাকে বলিলাম—যে লোক আপনার সুবর্ণ চুরি করিয়াছে সে এ স্থলে আছে কি না দেখুন।

আঃ! কি নির্ব্বোধ! ছিঃ! ছিঃ! আমাদের ব্যবসাদারগুলা এইরূপ অকর্ম্মণ্য বলিয়া বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এত মন্দ! এ লোকটাও কি পাগল নাকি। আঃ! ঠিক বার্লির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ দেখিয়া পাশের লোকটার দিকে চাহিল! আরেঃ গেল! লাইনের শেষে গেল। আবার ফিরিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না এখানে নাই।

কি বিড়ম্বনা! সকলে হাসিল, যার চুরি গিয়াছে সে যদি নিজের স্বার্থ না বোঝে আমার কি? যাহা হউক একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। আমি তাহাকে জ্যাক বার্লির সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম—দেখুন দেখি ইহাকে জানেন?

সে বলিল—না।

"চক্রধরপুরে আমাকে দেখাইয়াছিলেন কাকে? মাঠের উপর জ্যোৎস্না-রাত্রে।"

"সে সেই চোরটাকে; এ অপর লোক।"

মনে মনে বলিলাম—তোমার মাথা।

সে বার্লির ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া বসিল। বসুদামও 'বাঁশ বনে ডোম কানা' হইল। কাশিম করিমও তদবস্থ!

ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। কাক্রিটা ধিক্কার দিতেছিল। আমার ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর, জমাদারগুলা আমার প্রতি চাহিয়াছিল। এমন দুর্গতি কখনও হয় নাই। নিশ্চয় আমাকে অপমান করিবার জন্য সকলে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

আমি জ্যাক বার্লিকে মুক্তি দিলাম। রিপোর্ট লিখিলাম—এ মামলার সাক্ষীগণ আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। এ তদন্তে আর কোনও ফল হইবে না। তদন্ত বন্ধ হউক।

(ক্রমশঃ)

কালিদাসের বহুদর্শিতা ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

জানি না প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি কি আবেগভরে মহাকবি সেক্ষপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতের কালিদাস জগতের তুমি"; কিন্তু কেন কালিদাস জগতের কবি হইতে পারেন নাই তাহার কারণ নির্ণয় করিতে অনেককে অনেক কথা বলিতে শুনিয়াছি। অবশ্য এ সমস্যার জবাব মাত্র এক কথায় দেওয়া যায়—কালিদাস যে জাতির কবি, সে জাতি কোন দিন বুদ্ধিবলে বা বাহুবলে জগতের ছয় ভাগের এক ভাগের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারে নাই; তাই বেচারা কালিদাস অনেকগুলি মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াও ভুবনবিখ্যাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যের গোঁড়ারা বলিয়া থাকেন যে, কালিদাস জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন নাই কারণ কালিদাস সত্যই কবি ছিলেন, কাব্যের মধ্যে কেবল আদর্শ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন, সেক্ষপীয়রের মত তাঁহার চরিত্র-বিশ্লেষণের শক্তি ছিল না বা সেক্ষপীয়রের মত তাঁহার বস্তুতন্ত্রতা ছিল না। হিন্দু জাতি কেবল সকল শক্তি আদর্শের দিকে নিয়োজিত করিয়াছেন, যে সকল পদার্থের সঙ্গে ধর্ম্মের সংশ্রব নাই বা যে সকল বৃত্তি বা চিত্র মুক্তিলাভের পরিপন্থী, তাঁহারা সে সকল ব্যাপারে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করেন নাই। বলা বাহুল্য, চৌর শাস্ত্র, বাৎস্যায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের এই অপযশ বা সুযশের বিপক্ষের প্রবল সাক্ষী। অবশ্য সেক্ষপীয়রের বিষয়-হিসাবে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণের সুযোগ অধিক ছিল বলিয়া তাঁহার মানব-চরিত্র-অঙ্কন খুব বিশাল ও মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু চারু-সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের মহাকবি মনোবৃত্তি বা বস্তুতন্ত্রতার পরিচয় দেন নাই, এ কথা বলিয়া কেবল তাঁহারাই তর্ক বাধান যাঁহারা মোটেই তাঁহার গ্রন্থ পড়েন নাই।

জীবজন্তু

আধুনিক "টুলো পণ্ডিত" মহাশয়দের মত মহাকবি জীবজন্তুগুলার চলাফেরা লক্ষ্য না করিয়া কেবল শাস্ত্রপাঠ করিতেন না বা কেবল প্রকৃতি সতীর মুখের দিকে তাকাইয়া

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়ং

দেখিতেন না। অবশ্য প্রেমের কবি যে কালিদাস, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না ; কারণ যে কবি বলিতে পারেন—

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন,
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন
অঙ্গানি চম্পক-দলৈঃ স বিধায় বেধাঃ
কান্তে কথং ঘটিতাম্নুপলেন চেতাঃ।

তাঁহাকে অপ্রেমিক বা শুধুই কল্পনা রাজ্যের প্রজা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু এই কবি যে আবার একটা পলায়নতৎপর হরিণকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত চিত্র আঁকিতে পারেন, তাহা ভাবিলে মনে হয়, কালিদাসের বস্তুতন্ত্রতা খুব উচ্চ-দরের ছিল। রাজা দুষ্মন্তের মুখে মহাকবি বলিয়াছেন,

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপতত্তি স্যন্দানে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চাদর্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোক মুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।

রথ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কি না তাহা বারম্বার দেখিবার জন্য মৃগটি গ্রীবা বাঁকাইয়া পশ্চাদ্দৃষ্টি করিতেছে ; তাহাতে তাহাকে বড় মনোহর দেখিতে হইয়াছে। শরপতনভয়ে পশ্চাদ্দেশের অনেকাংশ পূর্ব্ব অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তাহার দৈর্ঘ্যটা যেন কমিয়া গিয়াছে। ক্লান্তিহেতু তাহার মুখ হইতে অর্দ্ধভুক্ত তৃণ পড়িয়া তাহার নিজের পথ আকীর্ণ করিতেছে—দেখ, দেখ, অতি বেগে দীর্ঘলম্ফনহেতু সে শূন্যেই অধিক পথ এবং ভূতলে সামান্য পথই যাইতেছে।

এই হরিণকে বধ করিবার জন্য রাজা দুষ্মন্ত কিরূপ অশ্বচালনা করিয়া-ছিলেন, সে বর্ণনাও সাহিত্যানুরাগী অনেকেই পড়িয়াছেন। মহাকবি সেক্ষ-পীয়র Venus and Adonis নামক কাব্যে একটা কামোন্মত্ত অশ্বের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু ভারতের মহাকবি একটি মাত্র শ্লোকে যে ভীত কুরঙ্গের চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্রের রেখাগুলা কি স্পষ্ট! কি জীবন্ত! "জগতের মহাকবি"র বস্তুতন্ত্রতা কালিদাসের পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতাকে এ বিষয়ে মোটেই পরাজিত করিতে পারে নাই।

কালিদাসের কাব্যসমুদ্র ছানিয়া তাঁহার বহুদর্শিতার সকল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব এ দুরাশা আমার নাই। তিনি কোন্ কোন্ জীবজন্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা অপর প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। কেবল তাঁহার অতি সামান্য গ্রন্থ 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' হইতে আজ তাঁহার বহুদর্শিতার গোটাকতক উদাহরণ দিব। 'অর্চ্চনা'র পাঠকদিগের কেবল এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এ বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' নীতিকথায় পূর্ণ। প্রত্যেক গল্পটি মহানুভব মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্বের এক একটি দৃষ্টান্ত। এই কথা-সাহিত্যকে সরস করিবার জন্য মহাকবি যে সকল শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সে সমস্তগুলি তাঁহার স্ব-রচিত নহে। কারণ অনেকগুলি শ্লোক অন্যত্র পড়িয়াছি।

নিস্ফল কার্য্য।

এই ধরুন, নিষ্ফল কার্য্যের তালিকা। কবি বলিতেছেন যে, মন্ত্রী বিনা রাজ্য, ধান্যাদি বিনা গৃহ, তারুণ্য বিনা সৌভাগ্য, আর জ্ঞান না থাকিলে বৈরাগ্যে কোনও ফল নাই। বাস্তবিক সৌভাগ্য যদি তরুণ বয়সে না আসিয়া বার্দ্ধক্যে উদয় হয় তাহা হইলে আর সে সৌভাগ্যে ফল কি? তাহার পর মহাকবি বলিতেছেন—"দুর্জ্জনের শান্তি, পাষণ্ডের বুদ্ধি, বেশ্যার প্রীতি, খলের মৈত্রী, পরাধীনের স্থিতি, নির্ধনের রোষ, সেবকের কোপ, প্রভুর স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারিণীর পুরুষভক্তি, চোরের যুক্তি, মূর্খের সম্মতি এই প্রকার সকল কার্য্যই নিষ্ফল জানিবে"।

প্রত্যেক কথাটি কতটা বহুদর্শিতা ও সাংসারিক জ্ঞানের পরিচায়ক, তাহা অল্প চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কবিবরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যগুলির 'আওতা'য় পড়িয়াছে বলিয়াই তাঁহার এ সকল সাংসারিক জ্ঞানের কথা লইয়া কেহ নাড়াচাড়া করে না, কারণ লোকে সমুদ্রে উত্তালতরঙ্গরাশিরই খেলা দেখে, সমুদ্র-বেলার উপলখণ্ডের শৈবাল কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। 'জলের শিহালা' খুঁজিতে লোকে 'পানা পুকুরেই' গমন করে। মহাকবি কালিদাস জগৎকে যে অমৃত দান করিয়াছেন তাহার উপর 'ফাউ'স্বরূপ সাংসারিক জ্ঞানটুকু না দিলেও যে তাঁহার কবিত্বখ্যাতি ম্লান হইত, এ ভাবনা কেহ ভাবেন না। তবে যাঁহারা বলেন, কবিবরের পাশ্চাত্য কবির মত বহুদর্শিতা ছিল না, তাঁহাদের জন্য গোটাকতক কথা বলা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

অর্চ্চনা, ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

কালিদাসের বহুদর্শিতা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

(২)

বিরুদ্ধ সম্বন্ধ

বিষয়ক নিম্নলিখিত নীতিও মহাকবি জানিতেন। সারদানন্দের মুখে তিনি বলিয়াছেন—

> কাকে শৌচং দ্যূতকারে চ সত্যং
> ক্লীবে শৌর্য্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা।
> সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ
> রাজ্ঞা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা।

তিনি এ বিষয়ে আরও বলিয়াছেন—

> সদ্ভাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নাস্তি সম্পদাম্।
> বিবেকো নাস্তি মূর্খাণাম্ বিনাশো নাস্তি কর্ম্মণাম্।

ক্ষেত্রমাহাত্ম্য

বা বিশেষ পদার্থের বিশেষ শক্তি সম্বন্ধে মহাকবি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি (বোধ হয়) উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> জলে তৈলং খলে গুহ্যং পাত্রে দানমনাগপি
> প্রাজ্ঞে শাস্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তুশক্তিতঃ।

বাস্তবিকই জলের উপর তৈলবিন্দু পড়িলে তাহা বিস্তারিত হয়। খলের নিকট গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে সে যথাসাধ্য "ঢাক পিটিয়া" সে কথা দেশে দেশে প্রচার করিতে যত্নবান হয়। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সামান্য দান করিলে সে দাতার মহিমা কীর্ত্তন করে, আর প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রজ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। অন্যত্র বলিয়াছেন—

> পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ভজতি বিত্তং তদ্দাতুঃ।
> জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাং ফলতি পয়োদস্য॥

নিম্নলিখিত শ্লোকটিও দেখিতে পাওয়া যায়—

ন্যগ্রোধস্য যথা বীজং স্তোকং সুক্ষেত্রভূমিগম্
বহুবিস্তীর্ণতাং যাতি তদ্বদ্দানং সুপাত্রগম্।

স্ত্রৈণ

পুরুষের দুর্দ্দশাটা কালিদাস বড় তীব্র ভাষায় আঁকিয়াছেন। তিনি কমলাস্য ললনাকুলের সুন্দর মোহিনী মূর্ত্তি আঁকিতেন বলিয়া কেহ ভাবিবেন না যে, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" এ নীতির তিনি মর্ম্ম জানিতেন না।

শ্রুতং সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানং তত্ত্বমুত্তমম্
ইন্ধনীকুরুতে মূঢ় প্রবিশ্য বনিতানলে।

আহা! মূঢ়জন বনিতারূপ অনলে প্রবেশ করিয়া শ্রুত, সত্য, তপস্যা প্রভৃতি জ্বালানি কাষ্ঠে পরিণত করিয়া ফেলে—সে হুতাশনে সব ভস্মীভূত হইয়া যায়। এমন কি

তাসাং বাক্যানি স্বল্পানি তথ্যানি সুগুরুণ্যপি
করোতি যঃ কৃতী লোকে লঘুত্বং তস্য নিশ্চিতম।

তাহাদের বাক্যাবলী স্বল্প, সত্য ও নিতান্ত গৌরববিশিষ্ট হইলেও যে কৃতী সেগুলি পালন করে, তাঁহাকে নিশ্চিতই লঘু হইতে হয়। অবশ্য কথাটা একটু রূঢ় বটে, তবে পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন—ইহা প্রজ্ঞাবর্জ্জিত তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? শুধু তাহাই নয়—

অলক্তকো যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা
অবলাভির্ব্বলাক্রক্তঃ পাদমূলে নিপদাতে।

অর্থাৎ রক্তবর্ণ অলক্তের ন্যায় অনুরক্ত পুরুষকে নিষ্পীড়িত করিয়া ইহারা পাদমূলে নিপাতিত করিয়া থাকে। হরি! হরি! আর যে মূঢ় মোহবশতঃ মনে করে যে, এই কামিনী আমার প্রতি অনুরক্ত সে তাহার নৃত্যক্রীড়াশীল পক্ষীর মত বশীভূত হয়। যখন এই কবিরই অমৃতময়ী কবিতায় পড়ি—

এই বালা ব্যাধ, ইহার ভ্রূ কার্ম্মুক, ইহার কটাক্ষ শর আর আমার মনটি হরিণ—

অথবা—

দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে কমলায়তলোচনে
শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম!

হে বালে কমলায়তলোচনে আর একবার দৃষ্টি দাও। কারণ শুনিয়াছি,

যে বিষই বিষের ঔষধ—তখন তিলার্দ্ধ সন্দেহ হয় না যে এই আত্মহারা প্রেমিক কবির মনের মধ্যে এত কুটিল সাংসারিক প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল।

স্ত্রীচরিত্র।

যে কবি স্ত্রীচরিত্রের ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্য প্রিয়ার একনিষ্ঠাকে উচ্চাসনে বসাইয়া রামগিরির "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" যক্ষের মুখে অত সুললিত বিলাপ-গীতি উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, সেই কবি যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলা ধারণার কথা জানিতেন না তাহা নহে। বলা বাহুল্য, সেই সকল উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, কালিদাসের মতে বা তদানীন্তন কালের প্রচলিত নীতিতে স্ত্রীচরিত্র হীন বলিয়াই বিবেচিত হইত। হীনচরিত্রা স্ত্রীলোক সর্ব্বযুগে বিদ্যমান ছিল আর সর্ব্বদেশে এক শ্রেণীর লোকও স্ত্রীচরিত্রে চিরকাল সন্দিহান।

বাস্তবিক স্ত্রীলোকের দোষান্বেষণে দুর্জ্জনের সদাই প্রীতি। তাই মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে বলিয়াছেন—

> সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতো হ্যবচনীয়তা।
> যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।

নিন্দা হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব। জনসাধারণ স্ত্রীলোকের সাধ্বীত্ব সম্বন্ধে যেরূপ দোষানুসন্ধিৎসু, বাক্য ও প্রবন্ধাদির বিশুদ্ধিবিষয়ে সেইরূপ দৌর্জ্জন্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি

> দেব্যামপি হি বৈদেহ্যাং সাপবাদো যতো জনঃ।
> রক্ষোগৃহস্থিতিমূলমগ্নিশুদ্ধৌ ত্বনিশ্চয়ঃ॥

উক্তি ও আখ্যায়িকার সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্যই মহাকবি 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'য় ঐ সকল উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। গল্পের আরম্ভেই হীনচরিত্রা রাজ্ঞীর অবতারণা। কাজেই রাজাও "পরমবিষাদং গত্বা" বলিয়াছিলেন—"মনোহারী রূপে বা যৌবনে পুরুষদিগের অভিমানবৃদ্ধি বৃথা, কারণ রমণীদিগের চিত্তে মনোজই প্রভু। তাঁহার যখন যা ইচ্ছা তখন তাহাই ঘটাইয়া থাকেন। এ কথাও উক্ত আছে যে, অশ্বের গতি, মাধবগর্জ্জন, স্ত্রীচরিত্র, পুরুষের ভাগ্য, অবর্ষণ ও অতিবর্ষণ দেবতারাও জানেন না, মানুষের কথা আর কি বলিব! অরণ্যের মধ্যে ব্যাধেরা উড্ডীয়মান পক্ষীকেও ধরিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের চপলগতি কেহ ধারণ করিতে পারে না।" ইত্যাদি। তাহার পর রাজা যে কুৎসিত নারী-নীতি বলিতেছেন, তাহা কখ ই মহা-

কবির নিজের মত হইতে পারে না। কল্পিত পাত্রের চরিত্রের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য বলিতেছেন—

স্মরোৎসর্গমনুপ্রাপ্ত বাঞ্ছন্তি পুরুষান্তরম্
নার্য্যঃ সর্ব্বাঃ স্বভাবেন বদন্তীত্যমলাশয়াঃ।

এবং

গৌরবেষু প্রতিষ্ঠাসু গুণেষু সাধুগোষ্টিষু
ধৃতানাপি বিসৃজ্যন্তি দোষমঙ্কে স্বয়ং স্ত্রীয়ঃ।

তাহার পর রাজা বলিয়াছেন যে, শ্মশান-কুসুমের ন্যায় নারীগণ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় এবং

ন বৈরাগ্যাৎ পরং ভাগ্যং নাবোধাৎ পরমং সখা
ন হরে রপরস্ত্রাতা ন সংসারাৎ পরো রিপুঃ।

এই কথা বলিয়া রাজা বিক্রমার্ক 'বনং জগাম'।

সুতরাং এই গল্পটির আলোচনা করিলে বুঝিতে হইবে যে, এ সকল শ্লোক রাজা মহাশয়ের মুখে না দিলে কবিবরের রচনা ব্যর্থ হইত। তিনি স্রষ্টা—অমোঘ কল্পনার সাহায্যে এরূপ একটা চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন মাত্র।

ঐ গ্রন্থে কবিবর স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন, তাহার আরও একটি উদাহরণ দিব। কিন্তু তাহাও ঐরূপ এক সন্দিগ্ধচিত্ত রাজার মুখে বলিয়াছেন। সে রাজা রাজ্ঞী ভানুমতীকে বড় ভালবাসিতেন। নূরজাহান বেগমের মত রাজ্ঞী ভানুমতী সভাস্থলে বসিতেন, কারণ তাঁহাকে না দেখিলে রাজার পক্ষে প্রাণ ধারণ করা সম্ভবপর হইত না। মন্ত্রী কিন্তু রাজ্ঞীর সভাস্থলে আসার পক্ষপাতী নহেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, রাজ্ঞী অসূর্য্যম্পশ্যা, তাঁহার স্থান অন্তঃপুরে। জল্পনা চলিল, বাদানুবাদ হইল। শেষে সিদ্ধান্ত হইল, রাজসভায় সিংহাসনের সম্মুখে রাণীর আলেখ্য থাকিবে। চিত্রকর ভানুমতীর চিত্র আঁকিলেন। সকলে মুগ্ধ হইল; কিন্তু রাজগুরু বলিলেন—"তস্যা বামজঘন স্থলে তিলকসদৃশো মৎস্যোঽস্তি।"—সর্ব্বনাশ! প্রেমিক রাজার মাথা ঘুরিল—এ ব্রাহ্মণ রাজ্ঞীর গুপ্ত স্থলের তিলের সন্ধান পাইল কিসে? তবে নিশ্চয়ই—

জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ
হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং ন স্ত্রীণামেকতো রতিঃ।

স্ত্রীগণ একই কালে একজনের সঙ্গে বাক্যালাপ করে, বিভ্রমসহকারে

অন্যকে দেখিয়া লয় এবং অন্য একজনের কথা হৃদয়ে চিন্তা করে। স্ত্রীলোক কখনও একের প্রতি অনুরাগিণী হয় না। অপিচ

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠৌঘৈর্নাপগাভির্মহোদধিঃ
নান্তকঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ ন পুম্ভির্বামলোচনা।

রাশি রাশি কাষ্ঠ অর্ঘ্য পাইয়াও অগ্নির তৃপ্তি হয় না, সমুদ্রের অনেক নদীর জল খাইয়াও তৃপ্তি হয় না, সর্ব্বভূতের দ্বারা যমেরও যেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি স্ত্রীলোকেরও বহু পুরুষের দ্বারা তৃপ্তি হয় না। কি আর বলিব—

স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা জনঃ
ইত্থং নারদ নারীণাং পাতিব্রত্য হি কল্পতে।

নারদ নারীদিগের পাতিব্রত্য সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সুবিধামত স্থান-অভাবে কোন স্ত্রীলোক সতী, কেহ বা অভিসারের সময় পায় না বলিয়া সতী, আর কেহ কেহ সতী, ঠিক মনের মত প্রেমিকের অভাবে।

এই প্রকারের অনেক উক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এই ভানুমতীর গল্পের শেষেই কবি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভানুমতী সাধ্বী এবং রাজগুরু সারদানন্দ তাঁহার জঘনস্থিত তিলের সন্ধান পাইয়াছিলেন—

দেবদ্বিজপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী
তেনাহমবগচ্ছামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা।

তাই বলিতেছিলাম, স্ত্রীচরিত্রসম্বন্ধে কুটিল ও কুৎসিৎ তত্ত্ব, কল্পিত পাত্রের মুখে প্রকাশ করিলেও, তাঁহার মনে স্ত্রীজাতির উচ্চ আদর্শের অভাব ছিল না। 'রঘুবংশে' তিনিই আবার রাজ্ঞী সুদর্শনা প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন—রাজার সহিত বনে গমন করিয়া সাধ্বী সূর্য্যবংশীয় ভূপতির সহিত ঋষিবর বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সামান্যা রমণীর মত গো-সেবা করিতেন।

সারাদিন নন্দিনীর অনুগমন করিয়া দিনান্তে যখন রাজা আশ্রমে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেন, তখন সাধ্বী রাজমহিষী রাজ্যেশ্বরের রূপ

পপৌ নিমেষালসপক্ষ্ম পংক্তি-
রূপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্

উপষিত লোচনের দ্বারা পান করিতেন—চক্ষে পলক পড়িত না। একনিষ্ঠ সাধ্বী সতীর এমন চিত্র বিশ্ব-সাহিত্যে এক আর্য্য কবিই আঁকিতে পারিয়াছেন।

শকুন্তলার রূপ সম্বন্ধে এই কবিই বলিয়াছেন, "অখণ্ডং পুণ্যাণাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘম্"। এরূপ উদাহরণ রাশি রাশি দেওয়া যাইতে পারে।

নারীনীতি ও বৈধব্য

সম্বন্ধে যে উচ্চ আদর্শ মহাকবি কালিদাসের মনে ছিল তাহা এই গ্রন্থেরই ত্রিংশোপাধ্যানম্ পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তিনি স্ত্রীলোককে এ গল্পে বড় উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং নারীনীতি সম্বন্ধে অনেক ভাল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয় ত তাহাদের দুই একটি তাঁহার নিজেরও রচনা। সে কথা পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন।

এই গল্পের নায়িকা—"প্রমদাঃ পতিমার্গগা" এই নীতি সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—"কৌমুদী চন্দ্রের সহিত গমন করে, সৌদামিনী মেঘেতেই লীন হয়, আর প্রমদা যে পতির পথের অনুসারিণী—এ কথা চেতন-রহিত ব্যক্তিদিগেরও নিকট প্রতিপন্ন। স্মৃতিও বলিয়াছেন—ভর্ত্তার মৃত্যুতে যে নারী হুতাশনে আরোহণ করেন, সে নারী স্বর্গলোকে নিরন্তর অরুন্ধতী দেবীর মত পূজিতা হন। পতির মৃত্যুর পর রমণী আপনাকে যতদিন না অগ্নিতে দগ্ধ করেন ততদিন তিনি নরক হইতে কদাচ মুক্তিলাভ করেন না। এমন কি যে রমণী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন তিনি মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল তিন কুল উদ্ধার করেন। মানবের শরীরে যে সাড়ে তিন কোটি রোম আছে, ভর্ত্তার অনুগামিনী রমণী সেই সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গে বাস করেন।"

পতিব্রতা রমণী স্বামীরও পাপক্ষয় করিয়া দেন। সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সর্পগ্রাহী (সাপুড়ে) যেমন বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্পকে টানিয়া বাহির করে তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত বিহার করেন। তথাহি

> দুর্বৃত্তং বা সুবৃত্তং বা সর্ব্বপাপরতং তথা
> ভর্ত্তারং তারয়ত্যেষা ভার্য্যা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতা।

ভার্য্যা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলে, দুর্ব্বৃত্ত বা সুবৃত্ত অথবা পাপরত স্বামীকে উদ্ধার করে। স্বামীই স্ত্রীজাতির সহায় ও মিত্র, এ সম্বন্ধে কালিদাসের নায়িকা বলিতেছেন—

> মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
> অমিতস্য চ দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ।

পিতা, ভ্রাতা এবং পুত্র রমণীকে পরিমিত দান করে। কিন্তু স্বামী যে দান করেন তাহার পরিমাণ নাই। এমন যে স্বামী তাহাকে কোন নারী পূজা না করিবে! অপিচ

না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রী বর্ত্ততেঃ রথঃ
না পতি সুখমাপ্নোতি নারী বন্ধু পতৈরপি।

ছিন্নতন্ত্রী বীণা বা চক্রহীন রথের মত পতিহীনা স্ত্রী শত বন্ধু থাকিলেও সুখী হইতে পারে না। আরও

দরিদ্রো ব্যসনী বৃদ্ধো ব্যাধিত বিকলস্তথা
পতিতঃ কৃপণো চাপি স্ত্রীণাং ভর্ত্তা পরাগতিঃ
নাস্তি ভর্তৃসমো বন্ধুর্নাস্তি ভর্তৃসমা গতিঃ।

আর হিন্দু রমণীর যাহা জীবনের ব্রত, যে কামনা সে নিশিদিন মনোমধ্যে পোষণ করে, যে আশায় সে দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়া হিন্দুর গৃহ সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে, সে আশার শ্লোকও তাঁহার গল্পের নায়িকার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

বৈধব্যসদৃশং দুঃখং স্ত্রীণাং অন্যৎ ন বিদ্যতে
ধন্যা সা যোষিতাং মধ্যে ভর্ত্তগ্রে ম্রিয়তে হি যা।

নারীজীবনের আদর্শ-কর্ত্তব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার সকল গ্রন্থে। সে আদর্শ কেবল আদর্শবাদীর খেয়াল নহে। তাহার ভিতর যে সাংসারিক জ্ঞান আছে তাহা কবিকল্পনা মাত্র নয়। সে সকল কথা বিচার করিবার স্থান বা সামর্থ আমাদের নাই। কেবল নিম্নলিখিত শ্লোক স্মরণ করিয়া শ্লোকচতুষ্টয়-বর্ণিত নীতির আভাষ মাত্র দিব।

কালিদাসস্য সর্ব্বস্যমভিজ্ঞান-শকুন্তলা
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক তত্র শ্লোক চতুষ্টয়ম।

সেই শ্লোক-চতুষ্টয়ের প্রথমটি এই—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্ট মুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্ব্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

অদ্য শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে, তজ্জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত। আমার কথা অন্তরের অশ্রুভারে প্রতিবন্ধক পাইয়া (রুদ্ধপ্রায়)। চিন্তা দ্বারা আমার চক্ষুর্দ্বয় জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আরণ্যক ঋষি। স্নেহবশতঃ আমার যখন এমন বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, না জানি গৃহস্থেরা নবপরিণীতা কন্যাকে শ্বশ্রূগৃহে পাঠাইবার বিচ্ছেদদুঃখে কিরূপ পীড়িত হইয়া থাকে!

এই যে পীড়ার কথা ইহা কি কেবল ভারতের বেদনার বাণী, না ইহা বিশ্ব-বাণী? ইহা কবিকল্পনা, না বহুদর্শী বিজ্ঞ গৃহীর গৃহস্থালীর কথা?

দ্বিতীয় শ্লোকটি এইরূপ—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।

স্নেহে পালিতা কন্যা শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। কণ্ব মুনি তপোবন-তরুগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন—যে শকুন্তলা তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া নিজে জল পান করে না, যে শকুন্তলা অলঙ্কার পরিধান করিতে ভালবাসিলেও অঙ্গভূষণের জন্য স্নেহবশতঃ তোমাদের নব কিসলয় গ্রহণ করে না, তোমাদের পুষ্পোদ্গমের সময় উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে যাহার পরমানন্দ হয়, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে, তোমরা অনুমতি দাও।

এ শ্লোকে কণ্ব মুনির স্নেহ যেমন ফুটিয়াছে শকুন্তলার চরিত্রও তেমনি বিকসিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত কি মেশামিশি—কি সহৃদয়তা, কি স্নেহ, কি পরসুখে সুখ! এ যুবতী-চিত্র কেবল কালিদাসই আঁকিতে পারেন। তৃতীয় শ্লোকে কণ্বমুনি খুব হিসাবী বাপের মত আশা করিতেছেন যে, মহারাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অন্যান্য মহিষীদের মধ্যে সমান স্থান দিবেন, কারণ—

ভাগ্যাধীনমতঃপরং ন খলু তৎ স্ত্রীবন্ধুভির্যাচতে।

ইহার পর আর যাহা কিছু তাহা শকুন্তলার ভাগ্যাধীন। স্ত্রীলোকের বন্ধুজনেরা তজ্জন্য অপর কিছু প্রার্থনা করেন না। যাহারা সংসার করিয়াছে তাহারা জানে, এই উক্তির ভিতর কি সাংসারিক বিজ্ঞতা লুক্কায়িত আছে। এই স্ত্রীবন্ধু—বাপ মা, মাসি পিসি, বিধবা ভগ্নী প্রভৃতির অন্যরূপ আকাঙ্ক্ষার ফলে, গৃহে গৃহে কিরূপ দাম্পত্য-কলহের দুন্দুভি, দামামা ও রণভেরী বাজিয়া উঠে—বিশেষ মহাকবি সেক্ষপীয়রের দেশে ও সমগ্র ইউরোপে—তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহারই নাম বিশ্ববাণী—এ সকল সত্য জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া বিকীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কেন বিকীর্ণ হয় নাই সে দোষ কালিদাসের নয়, তাঁহার হীনবল স্বজাতির ও স্বধর্ম্মীর।

চতুর্থ শ্লোকটিতে প্রবর্ত্তিত আদর্শ হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি একাধিক-

দার-রত জাতির ঘরে ঘরে লিখিয়া রাখিলে অনেক দুঃখ নিরাকৃত হইতে পারে। মুনি কন্যাকে বলিতেছেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়োবামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।

গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীগণের সহিত প্রিয় সখীর মত ব্যবহার করিবে। স্বামী অপমান করিলেও তাহার প্রতিকূলাচারিণী হইও না। পরিজনের প্রতিও অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিও। সুখে গর্ব্বিতা হইও না। এইরূপ করিলে যুবতীরা গৃহিণীপদ পায়, আর অন্যরূপ ব্যবহার করিলে পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হয়।

বিরহ-কাতরা সাধ্বী স্ত্রীর

চিত্র দেখিয়াছি মাগধী সুদক্ষিণা রাজ্ঞীর। কামী যক্ষ তাহার বিধুরা বিকলা পত্নীর যে চিত্র দিয়াছিল সাহিত্যানুরাগীমাত্রেই সে চিত্রের সহিত পরিচিত। আমি এ স্থলে মহাকবির দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।

কামী যক্ষ মেঘের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—ভাই তুমি অবিহতগতিতে গমন করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দর্শন করিবে। তিনি পতিব্রতা, আমা বই কাহাকেও জানেন না, কবে আমি শাপ-মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিব তিনি সেই দিবস গণনা করিতে তৎপর। কারণ অবলাগণের হৃদয় স্বভাবতঃ প্রণয়-প্রবণ, কুসুমের ন্যায় সুকুমার বিরহে, সদ্যো-ভ্রংশনশীল। কিন্তু একমাত্র আশাই কর্ত্তৃত্ব করিয়া বৃন্তের ন্যায় তাহাকে পতিত হইতে দেয় না।

অলকাপুরীতে গমন করিয়া তাহার প্রিয়াকে কিরূপ দেখিবে সে সম্বন্ধে বিরহী যক্ষ বলিতেছেন—

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা

তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ-
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী।

হে সৌম্য! না হয় দেখিবে আমার বিরহে তাঁহার বসন মলিন হইয়াছে, উরুদেশে বীণা রাখিয়া আমার নামাঙ্কিত পদরচনাপূর্ব্বক গান করিতে যেমন উদ্যত হইয়াছেন, অমনি নয়নসলিলে তন্ত্রী ভিজিয়া গেল। পুনরায় কোন রূপে তাহা সারিয়া লইয়া বারংবার আপনার কৃত মূর্চ্ছনাও ভুলিয়া যাইতেছেন।

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার এ চিত্রের পার্শ্বে পূর্ব্বের সেই নারীচরিত্রের হীনতা সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলা আপনিই ম্লান হইয়া যায়—যেমন কৌস্তভের পার্শ্বে কাচ। একনিষ্ঠার মহত্ত্ব ভারতবর্ষের কবির মত আর কে আঁকিতে পারে?

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাই বলিতেছিলাম, উপবন সাজাইবার জন্য ধারে ধারে কাঁটা গাছ পুঁতিলেও মহাকবি কালিদাসের সাহিত্য-কানন অমোঘ সুবাস-কুসুমে পূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

বিলাতী ভাষা ও দেশী বুলি।

[লেখক—স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

বিস্তর বিলাতী কথা যেমন দেশী ভাষায় মিলিয়া গিয়াছে, দেশী কথাও তেমনি অনেক বিলাতী ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা গিয়াছে; হিন্দি গিয়াছে; দেবভাষা সংস্কৃত গিয়াছে; এ দেশ হইতে শত শত যাবনিক শব্দও ইংরাজী ভাষার শরীরে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। এখনকার ইংরেজী ভাষা বহুভাষার শব্দসমষ্টি। বহু দেশীয় বহু জাতীয় ধাতুপ্রত্যয় ইংরেজীর অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছে। ইংরেজী ভাষা "অষ্টধাতুর মাদুলী" বিশেষ। কিন্তু তাহা বলিলেও সব বলা হয় না। ইংরেজীকে "সাড়ে সাঁইত্রিশ ভাজা" বলিলেও তাহার মিশ্রপ্রকৃতির পূরণ হয় না। কারণ ইংরাজীতে অনেক রকমের মালমশলা আছে; রঙ-বিরঙের খাটা, মিঠা, কটু, কষায়, কড়া করকোচা কথা আছে; এবং সে সব কথার সেরা অংশ ইংরেজের নিজের নিজস্ব নয়—পরের ঘর হইতে জড় করা। ইংরেজজাতি পর ভাষাকে কোন ক্রমেই আপন করিতে

পারেন না ; কিন্তু পর ভাষার শব্দে নিজ ভাষায় শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লইতে তাঁহারা খুব সুপারগ,—অতীব ক্ষিপ্রহস্ত। ইংরেজের ভূমি, ইংরেজের বাণিজ্য-পণ্য যেমন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র আছে, ইংরেজী ভাষায় তেমনি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বজাতীয় পুরাতন ও নূতন শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরেজীতে লাটিন শব্দ আছে ; গ্রিক, হিব্রু, জরমন ও ফরাসী শব্দ আছে ; ইতালীয় আছে ; স্যাক্সন শব্দ ত আছেই ; সুইচ, ডচ, স্পেনিস, প্রভৃতি ধাতুমূলক শব্দ আছে ; ঐ সকল ভাষার অখণ্ড গোটা গোটা শব্দও আছে ; চীন আছে ; জাপানী আছে ; মৈশরী আছে, নাই কি ? তাহার উপর আবার হিন্দি, পারসী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, উর্দ্দূ, আফগানী, ও আণ্ডামানী যাইয়া জুটিয়াছে ও জুটিতেছে। ইংরেজের কাছে জোর করিয়া কাহারও জুটিবার যো নাই ; তাঁহারা জয় করিয়াই শব্দসম্পত্তি গ্রহণ করেন।

কে গণিবে, এদেশ হইতে কত কথা বিলাতে গিয়াছে এবং আরও কত কথা এদেশপ্রবাসী সাহেব ও মেমদের মুখে অষ্টপ্রহর ইংরেজীর বুকনী হইয়া ঘোরা ফেরা করিতেছে। তবে সাহেবেরা আমাদের মত আলগা লোক নহেন, ছোট বড় সব দ্রব্যই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। তিমি তিমিঙ্গল হইতে তিত পুঁটীটীও তাঁদের বেড়াজালে এড়ায় না। ভারতে বৃটিশাধিকারের মানচিত্রের মত ভারতীয় শব্দাধিকারের নূতন নূতন অভিধান প্রস্তুত হইতেছে। এক দফা বিলাতী অভিধানে বিদেশীয় শব্দের সহিত এ দেশীয় শব্দ কলমবন্ধ হইতেছে ; আর এক দফা এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদের উপকারার্থ এদেশীয় শব্দের স্বতন্ত্র "অমরকোষ" রচিত হইতেছে।

কিন্তু এ দেশীয় শব্দসংগ্রহে সাহেবরা যে খুব সৌভাগ্যবান, একথা বলা যায় না। আমাদের উচ্চ অঙ্গের শব্দ গভীর ও গূঢ় অর্থবাচক শব্দ ; দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পারমার্থিক শব্দ অথবা কাব্যরাজ্যের কোমল মধুর শব্দ সুবিধামত সংগ্রহ ও স্বকার্য্যোপযোগী করিতে পারেন নাই ; যে দুই একটী পারিয়াছেন, তাহাও সু-অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন না। মোকদ্দমা মামলা ও বিষয়-কর্ম্মের ব্যবহারিক শব্দ ব্যতীত সাহেবেরা দেশীয় আর যত শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্রায় আমাদের আদাড়-আঁস্তাকুড়ের ইতর কথা। সে সব কথা, বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মশালচী, মেহতর ও তাহাদের সমশ্রেণীর ইতর লোকেই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশপ্রবাসী সাহেব ও মেমসাহেবদের পারিবারিক সংস্রব ও সহবাস এই ইতর শ্রেণীর লোকের

সঙ্গেই সাধারণতঃ ঘটে ; কাজেই ইতর কথাই তাঁহাদের কাণে যায় ; ইতর কথাই শুনেন, শিখেন এবং সংগ্রহ করিয়া ইংরেজীর অঙ্গীভূত করেন। উচ্চ ও ভদ্র শ্রেণীর লোকের সহিত সাহেবদের যতটুকু দেখা সাক্ষাৎ তাহা আপিসে ও আদালতে। তথাকার কার্য্য বিষয়কার্য্য ; সে কার্য্য এবং তাহার কথাবার্ত্তা হয় ইংরাজীতে ; বিশেষতঃ আপিসে আদালতে সাহেবদের সবিশেষ বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। তথায় তাঁহারা শাসনই করেন, শিক্ষা বা সংগ্রহ করিবার সময়ও সুযোগ পান না। তবে বই পড়িয়া যতটা আদায় হয়। কিন্তু অধ্যয়নের অভিমান সত্বেও সাহেবদের যেমন সংস্কৃত জ্ঞান, ততোধিক বাঙ্গালা বিদ্যা। পুস্তক পড়িয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মে, কিন্তু এ দেশীয় ভাব ও ভাষা-জ্ঞানটা প্রায়ই জন্মে জন্মে না। কাজেই শব্দসংগ্রহে তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

প্রাচ্য জ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্য প্রফেসর এবং পাদ্রীরাই বোধ করি সংস্কৃত "অবতার" শব্দ ইংরেজিতে টানিয়াছেন ; সংস্কৃত "পণ্ডিত" শব্দও ইদানীং ইংরেজীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু এ উভয় শব্দই ইংরেজি রচনায় প্রায়ই বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। থিয়সফিষ্টরা আমাদের "কর্ম্ম" (Karma) ও আরও কতকগুলি উচ্চ অর্থবোধক শব্দ ইংরাজীতে গ্রহণ করিয়াছেন।

নবাব ও সেলাম শব্দ বহুকাল হইতে বিলাতে বিরাজ করিতেছে। পাখা (Punka), কারী (তরকারী) ও জঙ্গল শব্দ ইংরজীতে "আম" ব্যবহার হইয়া গিয়াছে, ও অতি ক্ষুদ্র অভিধানেও স্থান পাইয়াছে ; লুট, দরবার, পাকা, কাঁচা, লঙ্কর, বাজার শব্দের খাস বিলাতেও বিস্তৃত ব্যবহার।

আর্য্য (Aryan), আতর, বখসিস, যোগী, বালা, বাঁধো, ভিস্তি, ভাঙ্ (Bhang), গাঁজা (Ganja), অহিফেন, চরস, চণ্ডু, চুরুট, চাটনা, চারপাই (Charpay খাট), ধুতুরা, নিম, বেল, চিরতা, গাষার, গপ্ (Gup, গল্প) হাওলাত, হাবিলদার, হুকা, হুকুম, মহারাজা, মাহুত, মসজিদ, মালি (Molly), মৌজা (গ্রাম), মালিকানা, মকররি, নাজির, নাজিম, পরদা-নিসিন, পাল্কি, পাটয়ারি, পেসপহুন্দ, পেঁপে, পিসবানা, কাজিস, বাটওয়ারা, বিঘা, বণিয়া, কিস্তি, কবুলতি (Kabuliat), একরার, ডাকাইত, রসদ, রসদদার, খেলাত, খাকি, সরকার, সহিস, গাড়ী (Ghari), টাটু, তৌজী, (Touzi), তোসাখানা, তামাক, টুপী (Sola topi), ঘি, জমা, জমাদার, দফাদার, দপ্তর, দাঙ্গা ইত্যাদি এ দেশীয় শব্দ অল্পাধিক পরিমাণে এখন ইংরাজীর কথা হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদের অনেক কথা খাস বিলাতী অভিধানে স্থান পাইয়াছে।

কেবল বস্তুবাচক, গুণবাচক বা জাতিবাচক নাম ও সংজ্ঞা লইয়া সাহেবেরা ছাড়েন নাই, আস্ত আস্ত ক্রিয়াপদগুলাও কুড়াইয়া লইয়াছেন।

পাকড় লেও (Packer lo), সমঝাও, মারো, বাঁধো, ধমকাও প্রভৃতি অতি পবিত্র ও সুমিষ্ট শব্দগুলি এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবদের ইংরেজির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ও অভিধানে উঠিয়াছে।

ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সাহেবেরা এদেশীয় শব্দের সন্ধি, সমাস করিতেও ছাড়েন না। "তাকিদ" হইতে "তাকিদেদ" (Tukided) করা হয়; "বন্দোবস্ত" হইতে "বন্দোবস্তেদ" (Bundobosted) লেখা হয়। অনেক সাহেব আমাদের "রাতারাতি" (Rata-Rati) কথাটা ইংরেজীস্বরূপ ব্যবহার করেন।

একটা চলিত কথা আছে যে, "টেরা ক'রে বলিলেই ইংরেজী হয় আর সোজা করে বলিলে বাঙ্গালা হয়।" কথাটা গাঁজাখুরী; কিন্তু ষোল আনা অসত্য নয়। সাহেবেরা বাঙ্গালা কথাটা বাঁকাইয়া ইংরেজী করিয়া লয়েন; আমরা ইংরেজী কথাটাকে সোজাইয়া বাঙ্গালা করিয়া লই। সাহেবেরা আমাদের "বালী"কে বাঁকাইয়া করিয়াছেন "ব—অ—লী"; আমরা তাঁদের "প্যাটার্ণ" সোজাইয়া করিয়াছি "প্যাটন"; সাহেবেরা আমাদের "গাড়ী" বাঁকাইয়া তাহার ইংরেজী করিয়াছেন,—"ঘ্যারী"; আমরা তাঁদের "বিলিষ্টার" সোজাইয়া তাহার বাঙ্গালা করিয়াছি "বেলেস্তারা" ইত্যাদি।

বিলাতী দেশীতে মিশিয়া কতকগুলি সঙ্কর শব্দও দেখা দিয়াছে, যেমন;— ব্রাণ্ডি-পানী, সোডার-জল, মেমসাহেব; মাষ্টার-মহাশয়, স্কুল-ঘর; মিশি-বাবা; পরদা-লেডী; ডেপুটী-বাবু; ডায়মন-কাটা; বার্ণিস-করা; এলবার্ট-সিঁতি; ফেরি-ওয়ালা; কম্পিটিসন-ওয়ালা ইত্যাদি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

দেউলিয়া—গল্পপুস্তক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা "অন্নদা বুক ষ্টল" হইতে প্রকাশিত।

'দেউলিয়া' অন্নদা বুক ষ্টলের 'আট আনা সংস্করণ'ভুক্ত ১০ম গ্রন্থ। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, সুপরিচিত। তাঁহার গল্পগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ হইল।

১ম গল্প 'দেউলিয়া'......চরিত্র কয়টীই বেশ ফুটিয়াছে ; রাধু, সরোজিনী ও হরিদাসের চরিত্র হিন্দু সমাজের নব্যশিক্ষিত উন্মার্গগামী যুবকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারে।

২য় গল্প 'অনাহুত'—আমরা বায়স্কোপে Father নামক যে চিত্রটী দেখি, 'অনাহুত' তাহাই, তবে Fatherএর মহত্ত্বটুকু 'অনাহুতে'র অভাব।

৩য় গল্প......'গদাধরের সাহিত্যচর্চ্চা'—স্বার্থপর ও চ্যাংড়া সাহিত্যসেবীর অবশ্যপাঠ্য ও শিক্ষণীয়।

৪র্থ গল্প......'নিয়তির নিক্তি'—Aristocracy ও Democracyর তারতম্য যে বিধাতার বিধানে নাই, লেখক তাহাই সুচিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

৫ম গল্প......'নীলুর লীলা'—পরপদলেহী চাটুকারের দুর্গতি এবং একটী সাধারণ সমাজ-চিত্র নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ গল্প......'বিশুদ্ধ কুইনিন্'—মন্দ নহে ; উপভোগ্য।

৭ম ও ৮ম গল্প......'বিশ্বম্ভরের মতিভ্রম' ও 'ব্যবধান' এই গল্পদ্বয়ে লেখক নিপুণভাবে অতি স্বার্থপর ও ঘৃণিত কৃপণদ্বয়ের দুইটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ক্রমঃবিকাশে 'বিশ্বম্ভরের' চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিন্তু কিষণচাঁদ 'পাষাণচাঁদ' হইয়াই রহিলেন।

সমাজের নানা খুঁটিনাটি ও ত্রুটী লইয়া লেখক এই ক্ষুদ্র গল্পসমষ্টি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া নিপুণ চিত্রকরের মত পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আধুনিক সাধারণ গল্পের মত ইহা অপাঠ্য নহে ; উপরন্তু শিক্ষাপ্রদ ও উন্মার্গগামীর পক্ষে নীতি-কথা বিশেষ। আশা করি, পুস্তকখানি গল্পপাঠক ও সর্ব্বসাধারণে বিশেষ আদৃত হইবে।

পঞ্চভূত।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

(৫)

জলের বিষয়—নদী, সমুদ্র, হিম, করকা (বরফ) প্রভৃতি। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ লিখিয়াছেন,—"বিষয়স্তু সরিৎসমুদ্রহিমকরকাদিঃ।" এখন শঙ্কা হইতে পারে, করকায় যখন কাঠিন্য আছে, তখন তাহা পৃথিবী, জলে কখনও কাঠিন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং "করকা পৃথিবী, কাঠিন্যাৎ, ঘটবৎ"—এই অনুমানের দ্বারা করকার পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তর এই যে,

এই অনুমানে 'উপাধি' আছে (১)। অনুষ্ণাশীতস্পর্শ ই 'উপাধি'। যেখানে যেখানে পৃথিবীত্ব আছে, সেখানে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ আছেই, সুতরাং 'উপাধি' সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে; কিন্তু উহা হেতুর অব্যাপক, কেন না, হেতু 'কাঠিন্য' করকাতে আছে, সেখানে 'উপাধি' অনুষ্ণাশীতস্পর্শ নাই। যদি বল যে 'কাঠিন্য' করকাতে নাই, সুতরাং 'উপাধি' হেতুর অব্যাপক হইল না। তাহা হইলে 'স্বরূপাসিদ্ধি'দোষনিবন্ধনই উক্ত হেতু করকাতে পৃথিবীত্বের সাধক হইতে পারিবে না। পক্ষে যদি হেতু না থাকে, তাহা হইলে সেই হেতুকে 'স্বরূপাসিদ্ধ' বলা হয়। করকাতে পৃথিবীত্বের অনুমান করিতে গেলে এই স্বরূপাসিদ্ধিই প্রকৃত দোষ। গলিয়া গেলে পর করকাতে যে জলত্ব আছে, তাহার প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। করকাতেও সংসিদ্ধিক দ্রবত্ব আছে কিন্তু তাহা প্রতিরুদ্ধ, এইজন্যই করকাতে দ্রবত্বের প্রত্যক্ষ হয় না।

৩। তেজঃ।

তেজের ১১টি গুণ,—রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ। তেজের রূপ শুক্ল ভাস্বর, ভাস্বরত্ব রূপগত জাতিবিশেষ। উদয়নাচার্য্য, "দ্রব্য কিরণাবলী"তে লিখিয়াছেন, "ভাস্বরত্বঞ্চ সামান্যবিশেষঃ। স চ রূপান্তর প্রকাশকত্বেন ব্যজ্যতে।" (৭৩ পৃঃ) পর-প্রকাশক রূপের নামই ভাস্বর রূপ। বহ্নি ও মরকত কিরণাদির রূপ, পার্থিব রূপের দ্বারা অভিভূত, এই জন্যই তাহার শুক্লত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল বহ্নির শুক্লরূপ যদি অভিভূত, তবে বহ্নির প্রত্যক্ষ হয় কেমন করিয়া? দ্রব্য-গত রূপের প্রত্যক্ষ না হইলে ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, অন্যদীয় রূপের প্রত্যক্ষ হইলেও দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। শুক্ল পটকে লাল রং দিয়া রঞ্জিত করিলেও তাহার প্রত্যক্ষের কোনও বাধা হয় না। সুতরাং বহ্নি প্রভৃতিতে যখন পার্থিব লোহিত রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তখন তাহাদিগের যে প্রত্যক্ষ হইবে, ইহাতে আর অনুপপত্তি কি আছে?

তেজের স্পর্শ উষ্ণ। মণিকাঞ্চনাদির উষ্ণস্পর্শ, পার্থিব স্পর্শের দ্বারা অভিভূত, এই জন্যই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। সুবর্ণাদিরূপ তেজে এই দ্রবত্বের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পৃথিবী ও জলের

---

(১) 'উপাধি' সম্বন্ধে ১৪শ বর্ষের, ৯ম সংখ্যার "অর্চ্চনা"র ৩০৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

ন্যায় তেজঃও দ্বিবিধ,—নিত্য ও অনিত্য। তৈজস পরমাণু নিত্য, তদ্ব্যতীত তেজঃ অনিত্য। অনিত্য তেজের অবয়ব আছে, নিত্য পরমাণু নিরবয়ব। অনিত্য তেজঃ আবার ত্রিবিধ,—শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়। তৈজস শরীর অযোনিজ। এই শরীরে পার্থিব অংশের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহার ভোগায়তনতার ব্যাঘাত হয় না। এই শরীর সূর্য্যলোকে প্রসিদ্ধ। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ লিখিয়াছেন,—"শরীরমযোনিজমেবাদিত্যলোকে পার্থিবাবয়বোপষ্টম্ভাচ্চোপভোগসমর্থম্।" ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই তৈজস ইন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় যে তৈজস, তাহা অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানের আকার এই :—'চক্ষুঃ তৈজসং স্পর্শাদ্যব্যঞ্জকত্বে পরকীয়রূপব্যঞ্জকত্বাৎ, প্রভাবৎ।'—চক্ষুঃ তৈজস, যে হেতু স্পর্শাদির অব্যঞ্জক হইয়া পরকীয় রূপের ব্যঞ্জক; দৃষ্টান্ত, প্রভা।

বহ্নি, সুবর্ণ প্রভৃতি তৈজস বিষয়। সুবর্ণ যে তৈজস, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ, অনুমান। অনুমানের আকার এই :—'সুবর্ণং তৈজসং, অসতি প্রতিবন্ধকে অত্যন্তানল সংযোগেঽপি অনুচ্ছিদ্যমানজন্য দ্রবত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং, যথা পৃথিবী। যদি কোনও প্রতিবন্ধকের যদি সদ্ভাব না থাকে, তবে অত্যন্ত অগ্নিসংযোগ হইলে পার্থিব বা জলীয় দ্রবত্বের উচ্ছেদ হইয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত অগ্নিসংযোগ হইলেও সুবর্ণগত দ্রবত্বের উচ্ছেদ হয় না। ব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত, পৃথিবী। যেখানে তৈজসত্বরূপ সাধ্য নাই, সেখানে অনুচ্ছিদ্যমান দ্রবত্বরূপ হেতুও নাই, যেমন পৃথিবী বা জল। সুবর্ণের তৈজসত্বসিদ্ধির এই অনুমান, প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শন করেন (২)। সুবর্ণের তৈজসত্বসিদ্ধির উদ্দেশে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি অন্যায় অনুমানও দেখাইয়াছেন। "অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং—" ইত্যাদি বেদ ও সুবর্ণের তৈজসত্বসাধক। তাই 'কন্দলী'তে শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—"সুবর্ণাদীনাং তৈজসত্বে তাবদাগম প্রমাণম্।" (৪০ পৃঃ)

কেহ কেহ সুবর্ণের পার্থিবত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমান করিয়া থাকেন যে,—'সুবর্ণং পার্থিবং গুরুত্বাধিকরণত্বাৎ পীতিমাধিকরণত্বা'—সুবর্ণ পার্থিব, যে হেতু তাহাতে গুরুত্ব আছে ও পীতরূপ আছে। যাহাতে গুরুত্ব বা পীতরূপ থাকে, তাহা পৃথিবী, দৃষ্টান্ত ঘটাদি। কিন্তু এ অনুমান প্রমাণ নহে। কারণ,

---

(২) "অতএব সুবর্ণাদিকমপি পার্থিবমেবেতি কস্যচিৎ প্রবাদোঽপি প্রযুক্তঃ পার্থিবত্বে সতি সর্পিরাদিবদত্যন্তবহ্নিসংযোগেন দ্রবত্বোচ্ছেদ প্রসঙ্গাৎ।"—ন্যায়কন্দলী, ২৬ পৃঃ।

গুরুত্বাধিকরণত্ব বা পীতিমাধিকরণত্ব, পক্ষ সুবর্ণে নাই। কাজেই হেতু স্বরূপাসিদ্ধ। সুবর্ণের মধ্যে যে পার্থিব অংশ আছে, তাহারই গুরুত্ব ও পীত বর্ণের অনুভব হইয়া থাকে। সেই পার্থিব অংশের রূপের দ্বারে অভিভূত বলিয়াই সুবর্ণের শুক্ল ভাস্বর রূপের উপলব্ধি হয় না। বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

ভূসংসর্গবশাচ্চাস্য রূপং নৈব প্রতীয়তে।
স্ফটিকস্য রূপাযোগাদ্ যথা রূপং ন ভাসতে॥*

(ন্যায় লীলাবতী, ১৩ পৃঃ, বোম্বাই সং)

৪। বায়ু।

বায়ুর ৯টী গুণ—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ। বায়ুর স্পর্শ, অনুষ্ণাশীত। পৃথিব্যাদির ন্যায় বায়ুও দ্বিবিধ,—নিত্য ও অনিত্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্য, তদ্‌ভিন্ন বায়ু অনিত্য। অনিত্য বায়ু ত্রিবিধ,—শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়। বায়বীয় শরীর অযোনিজ। এই শরীর বায়ুলোকে আছে। পিশাচাদির শরীরও বায়বীয়। বায়বীয় ইন্দ্রিয়, ত্বক্। ত্বগিন্দ্রিয় যে বায়বীয়, এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র, অনুমান-প্রমাণ দেখাইয়াছেন,—'বায়বীয়ং ত্বগিন্দ্রিয়ং গন্ধাদিষু মধ্যে স্পর্শস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ স্বেদোদবিন্দুশীতস্পর্শব্যঞ্জক ব্যজনপবনবৎ।' (তাৎপর্য্য টীকা, ৩৭২ পৃঃ)—ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয়, যেহেতু তাহা গন্ধাদির মধ্যে স্পর্শেরই ব্যঞ্জক; দৃষ্টান্ত, ঘর্ম্মজল বিন্দুর শীতস্পর্শ ব্যঞ্জক, ব্যজন-বায়ু। নিশ্বাস, ফুৎকার, ঝটিকা প্রভৃতি বায়বীয় বিষয়।

বৈশেষিক-মতে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না। স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্পের দ্বারা বায়ুর অনুমান হয়। মহর্ষি কণাদ, সূত্র করিয়াছেন,—

"স্পর্শশ্চ বায়োঃ।"—(২।১।৯) স্পর্শ এবং অনুক্ত সমুচ্চায়ক চকারের দ্বারা প্রাপ্ত শব্দ, ধৃতি, কম্প, বায়ুর অনুমাপক। বিজাতীয় স্পর্শ, বিলক্ষণ শব্দ, তৃণাদির ধারণ ও শাখাদির কম্পনের দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। অনুমানের আকার এই,—'যোঽয়ং রূপবদ্ দ্রব্যাসমবেত স্পর্শঃ, স ক্বচিদাশ্রিতঃ স্পর্শত্বাৎ, পৃথিব্যাদিস্পর্শবৎ।'—রূপবদ্ দ্রব্যে অসমবেত এই যে বিজাতীয় স্পর্শ, ইহা কোথায়ও আশ্রিত, যেহেতু ইহাতে স্পর্শত্ব আছে; দৃষ্টান্ত পৃথিব্যাদির স্পর্শ। এই বিজাতীয় স্পর্শের আশ্রয়রূপে বায়ু সিদ্ধ হয়। এই ভাবে বিলক্ষণ শব্দাদির দ্বারাও বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে। এই বৈশেষিক-মতে বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ। সুতরাং বায়ুতে যখন রূপ নাই, তখন ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না।

নৈয়ায়িকেরা বায়ুর স্পার্শন প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতিই রূপের কারণতা স্বীকার করা হয়, স্পার্শন প্রত্যক্ষে উদ্ভূত স্পর্শই কারণ। "ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ।"—(৩।১।৬৭) এই ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—"এবং তৈজসবায়ব্যয়ো র্দ্রব্যয়োঃ প্রত্যক্ষাত্বাদ্—"। বায়ুর প্রত্যক্ষ যে নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন, তাহা ন্যায় মতানুযায়ী "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থের মল্লিনাথ কৃত 'নিষ্কণ্টকা' ব্যাখ্যা দেখিলেও জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—"স্বমতে বায়োঃ স্পার্শনত্বেঽপি বৈশেষিকো ভূত্বাহ। অপ্রত্যক্ষস্তেতি।" (১৩৬ পৃঃ) বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি সামান্যতঃ রূপের কারণতা স্বীকার করিলে লাঘব হয়, এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। বায়ুর প্রত্যক্ষ নাই-ই হইল, ইহা যদি বলিতে চাও, তবে লাঘবতঃ বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শই কেন হেতু হউক না? তুমি প্রভায় অপ্রত্যক্ষের আপত্তি দেখাইবে। তাহাও ত ইষ্টাপত্তি হইতে পারে। সুতরাং 'প্রভাং পশ্যামি' এই প্রতীতির ন্যায় 'বায়ুং স্পৃশামি' এই প্রতীতি আছে বলিয়া বায়ুরও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইবে।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ উভয়েরই কারণতা স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহার মতে প্রভা বা বায়ু কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। বাচস্পতি মিশ্রের এই সিদ্ধান্ত, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শঙ্কর মিশ্রও স্বকৃত 'উপস্কার' ও 'কণাদরহস্যে' উল্লেখ করিয়াছেন (৩)।

পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই চারি প্রকার ভূতই নিত্যানিত্য ভেদে দ্বিবিধ। এই চারি প্রকার ভূতেরই পরমাণুগুলি নিত্য, তদ্‌ভিন্ন অনিত্য। এই অনিত্য চতুর্ব্বিধ ভূতের মধ্যে বায়ুর সৃষ্টিই সর্ব্ব প্রথমে হইয়াছিল, ইহা বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার প্রশস্তপদে লিখিয়াছেন,—

---

(৩) "উদ্ভূতরূপস্পর্শৌ মিলিতাবেব বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষত্বে তন্ত্রে, প্রভায়া নয়নগৃহীতদ্রব্যস্ত চন্দ্রমহসশ্চ স্পর্শানুদ্ভবাদ প্রত্যক্ষত্বং নিদাঘোষ্মণোর্বিভক্তাবয়বাপ্যদ্রব্যাণাঞ্চ রূপানুদ্ভবাদ প্রত্যক্ষত্ব-মিতি ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকাকৃত।"—২।১।৯ সূত্রের উপস্কার।

"উদ্ভূতরূপবত্বং উদ্ভূতস্পর্শবত্বঞ্চ মিলিতং তন্ত্রমিতি তাৎপর্য্যাচার্য্যাঃ। তন্মতে চান্দ্রং তেজো নয়নগতপিত্ত দ্রব্যং পরমাণাদি প্রভাদিকঞ্চ কিমপি ন প্রত্যক্ষম্। তথাচোদ্ভূতরূপবত্বস্তোদ্ভূত-স্পর্শবত্ত্বসহকৃতস্য বা তস্য প্রয়োজকত্বে বায়ুর প্রত্যক্ষ এবেতি।"—কণাদরহস্য, ২০ পৃঃ।

"ততঃ পুনঃ প্রাণিনাং ভোগভূতায় মহেশ্বর সিমৃক্ষানন্তরং সর্ব্বাত্মগতবৃত্তি-লব্ধাদৃষ্টাপেক্ষেভ্যস্তৎ সংযোগেভ্যঃ পবনপরমাণুষু কর্ম্মোৎপত্তৌ তেষাং পরস্পর-সংযোগেভ্যো দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণ মহান্ বায়ুঃ সমুৎপন্নো নভসি দোধূয়মান স্তিষ্ঠতি।" (৪৮ পৃঃ)

পৃথিব্যাদির পূর্ব্বে যে বায়ুর সৃষ্টি, তাহা উপনিষদাদি দেখিলেও জানিতে পারা যায়।

ক্রমশঃ।

বন্ধুর স্থান।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

(১)

বাল্যকাল হইতে একত্র লালিত পালিত হওয়ায়, বদন মণ্ডল এবং হারাধন ঘোষের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল উভয়কে পবিত্র ভাবে বন্ধন করিয়াছিল। কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত উভয়ের ধ্যান-জ্ঞান-লক্ষ্য একই দিকে ছিল; তাহারা এক বৃন্তের দুইটী ফুলের মত [illegible]য়াছিল।

জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্নমুখে প্রবাহিত করিবার শক্তি লইয়া যিনি অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার একমাত্র অঙ্গুলি-সঞ্চালনে বদন মণ্ডলের মাথার উপর পাহাড় ধসিয়া পড়িল; সে পিতৃহীন হইল। দরিদ্র পরিবারবর্গের গুরুভার তাহার মাথার উপর পড়িলে সে বাণীদেবীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া কমলার সাধনায় মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইল। বালক হারু প্রমাদ গণিল। একি হইল! এক পথের যাত্রী একপ্রাণ অন্তরঙ্গকে ভিন্নমুখে যাইতে দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল! একত্র বিদ্যার্জ্জন করিয়া যে জ্ঞান-গরিমা লাভ করিবার আশা উভয়ের হৃদয়ে চিরবদ্ধমূল ছিল, কোন অভিশাপে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

(২)

[illegible] জমিদারীতে ১২৲ টাকা বেতনের এক চাকুরী-লাভ করিল এবং হারু [illegible]মে পাঠে মনোনিবেশ করিল।

বদনের সংসারের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা, এবং অবিবাহিতা ভগিনী। পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে পাঁচ বিঘা ধানজমী এবং ছোট [illegible]ভিটা। এই দারুণ দুর্দ্দিনে

শুধু পাঁচ বিঘা জমীর উপর নির্ভর করিলে দিন গুজরাণ হয় না, সুতরাং উদরান্নের জন্ত বদনকে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইল।

হারুর সংসারও খুব বৃহৎ ছিল না, তবে তাহার অবস্থা বদনের মত অস্বচ্ছল ছিল না। সে লেখাপড়া করিত, বদন অবসর সময়ে তাহার কাছে আসিয়া বসিত। দুই বন্ধুতে একত্র আহারবিহার, গল্পগুজব সবই চলিত, চলিত না শুধু একত্র বিদ্যালয়ে গমন ও পাঠাভ্যাস। বদন মণ্ডল বলিত—"হারু! তুমি খুব মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হও, অর্থার্জ্জন করিয়া পাঁচজনের একজন হও, তা'হলেই আমার আনন্দ।"

হারু বলিত, "আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলে তো'র যে তা'তে সমান ভাগ রে। দু'জনের অদৃষ্ট যে এক সুতোয় গাঁথা!" এই সান্ত্বনা-সহানুভূতি-মাখান কথায় বদনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত!

(৩)

সাত বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, হারু ক্যাম্বেল হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিয়া গ্রামে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, এবং বদন মণ্ডলেরও জমিদারী-সরকারে পদবৃদ্ধি হইয়া বেতন মাসিক ১৮৲ টাকা হইয়াছে। তাহার চাকুরী-জীবনের বিশেষত্ব এই যে, জমিদারীর কাজ করিয়া বদন একটী পয়সাও কখন কাহার নিকট উৎকোচস্বরূপ গ্রহণ করে নাই, চিরদিনই সে নির্ভীক অপক্ষপাতে জমিদার ও প্রজার কাজ করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য প্রজাবৃন্দের নিকট বদন মণ্ডল বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারও তাহাকে সু-নজরে দেখিতেন। এই জন্য তিনকড়ি নায়েব হইতে ক্ষুদ্র আমলাটী পর্য্যন্ত জমিদারের কাছে বদনের নামে নানা ছলে অভিযোগ করিত। তাহাদের ভয়, বদন কোন্ দিন তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে। দলভুক্ত না হওয়ায় তাহারা প্রকারান্তরে বদনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল!

(৪)

বিবাহ ব্যাপারটা কি, বিবাহিত পত্নীর প্রেম, অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভালবাসার অপেক্ষা উচ্চ কি না, এই সব গুরুতর বিষয় লইয়া বদন ও হারুতে প্রায় আলোচনা হইত। অনেক বড় লোকের রচনার 'কোটেশন' করিয়া এবং নিজেদের দিয়া বিচার করিয়া তাহারা স্থির করিল, বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা অমূল্য। তার কাছে পত্নীর প্রেম তুচ্ছ। তাহাদের বন্ধু প্রেমের সংজ্ঞা বিজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতার ফল, তাহা বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য।

বন্ধুর উপার্জ্জনের অনেক টাকা বদনের সংসারে এবং বদনের উদ্বৃত্ত অর্থও হারুর সংসারে ব্যয়িত হইত। হারু ও বদন যাহার যেদিন ইচ্ছা পরস্পরের বাটীতে একত্র আহার গল্প ও রাত্রিযাপন করিত। কাহারও মনকে কোনও দিন কোন সঙ্কোচের খোঁচা বিদ্ধ করিতে পারে নাই।

লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকুরী-জীবন আরম্ভ করিলেও বদন বিবাহ করে নাই। তাহার বন্ধুর বিবাহের অপেক্ষা করিতেছিল। এখন বন্ধু হারুও সংসারে প্রবেশ করায়, উভয়ের বিবাহ একই মাসে সম্পন্ন হইল। কিন্তু বিবাহ-অন্তে উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহাঁদের পত্নী সংসারে অন্যের মত একজন হইয়া থাকিবে, তাহাদের হৃদয়ে পত্নীদের জন্য সূচ্যগ্র অধিকারটুকুও থাকিবে না।

(৫)

বদন মণ্ডলকে চাকুরী হইতে তাড়াইবার জন্য তিনকড়ি নায়েব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। প্রতাপশালী নায়েবের সহিত মনোমালিন্য রাখিয়া তাহারই অধীনে চাকুরী করা বদনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। জমিদার সমস্ত ব্যাপার বুঝিত, কিন্তু কোনও ক্রমেই নায়েবের বিপক্ষে কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেন না। কারণ সে তাঁহার পিতার আমলের পুরাতন লোক এবং বিষয়সম্পত্তি সমস্ত তাহার নখ-দর্পণে ছিল। নায়েব বদনকে শিক্ষা দিবার জন্য শুধু ছল খুঁজিত।

একদিন বদনের একটী ক্ষুদ্র ত্রুটীতে নায়েব ক্রোধান্ধ হইয়া বদনকে বলিল—'তুমি একটী আস্ত গাধা'। বদন নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার ইচ্ছা দমন করিয়া বলিল—'ভদ্রলোকের মত কথা বলতে শিখ্‌লেন না?'

ক্রোধান্ধ তিনকড়ি নায়েব বদনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। বদন তিনকড়ি নায়েবের মুখে নিমেষের মধ্যে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিল। তাহার দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল।

যখন নায়েব মুখের উপর কাপড় চাপিয়া বসিয়া পড়িল, তখন তাঁহার দল-ভুক্ত আমলাবর্গ আসিয়া বদনকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং চড়, ঘুষা, লাথি, জুতা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। বলিষ্ঠ বদন মহাবিক্রমে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু দশের বিরুদ্ধে একে কতক্ষণ যুঝিতে পারে?

কাছারী বাড়ী হইতে যখন একটা মহা কোলাহল জমিদারের অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল, তখন জমিদার ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য স্বয়ং ছুটিয়া কাছারী বাড়ীতে আসিলেন।

জমিদার নলিনীবাবুকে দেখিয়াই কাছারীর বৃদ্ধতম আমলা নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকট আসিল। নলিনীর পিতামহের সময়ে ১৫ বৎসর বয়স হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইখানে কার্য্য করিতেছেন, এবং ৭৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া মাথার কাল চুলগুলি সাদা করিয়া ফেলিয়াছেন। নলিনীর পিতা বা পিতামহ তাহাকে বিশেষ সম্মান না করিলেও নলিনী মুখে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান দেখাইত। পিতামহের আমলের লোক বলিয়া তাহাকে পিতামহের ন্যায়ই আদর-আপ্যায়ন করিত এবং 'ভশ্চায্যি দা' বলিয়া সম্ভাষণ করিত। এবং তাহার কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিত।

নলিনীর প্রশ্নের উত্তরে নীলকণ্ঠ বলিল—"দাদা, ঢের ঢের ছেলে দেখেছি; আমরাও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলুম, কিন্তু বদনের মত এরূপ বদ ছেলে কখনও দেখিনি।"

বদন মণ্ডল শুধু একবার ভট্টাচার্য্যের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাহিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও প্রয়াসই সে করিল না।

ভট্টাচার্য্য তাহার মুখের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই শান্ত ধীর ভাবে পরামর্শদাতার স্থল অধিকার করিয়া কহিল—"এমন ছোটলোককে—"

"সাবধান ভশ্চার্য্যি মহাশয়, অনর্থক গালাগালি করবেন না, মরবার বয়স হয়েছে, সত্য বলতে চেষ্টা করুন" বলিয়া, বদন তাঁহার মুখের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাহিল। ভট্টাচার্য্য তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্মিতমুখে বলিল—"দেখ্‌লে ছোঁড়াটার আক্কেল। মানী লোকের মান রেখে কথা বল্‌তে জানে না। কাজে গোল করেছিল বলে নায়েব মহাশয় তাকে ধমক দেন, আর গোঁয়ার ছোঁড়াটা ওঁর মুখে চার পাঁচটা ঘুষা মারে।"

নলিনী—বটে, বটে! বদন তোমাকে এতদিন ভালমানুষ বলে আমার ভুল ধারণা ছিল। এখন দেখ্‌ছি তুমি একটা গোঁয়ার গোবিন্দ জানোয়ার।

বদন কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল—"অনর্থক গালি দিবেন না। আপনি অন্নদাতা, নইলে—"

নলিনী—নহিলে তুমি আমাকেও মারিতে নাকি? পাজি, বদমায়েস্।

অনর্থক জমিদারের নিকট গালি খাওয়ায় বদন নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না; তাহাকে ক্রোধের বশে আরও ২।১টা কটু কথা বলিল।

বদনকে থানায় চালান দিতে হুকুম দিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে জমিদার প্রস্থান করিলেন।

তিনকড়ি নায়েব ও ভট্টাচার্য্য উভয়ে নয়নে নয়নে কি কথা কহিয়া মৃদু হাসিল। জমিদারের চার জন বিশস্ত পাইক বদনকে পিছ্‌মোড়া করিয়া বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেল।

(৬)

আহিরপুরের জমিদারের একমাত্র কন্যা নিস্তারিণী। সহর হইতে বহু দূরে অবস্থিত পল্লীভবনে বাস করিয়াও জমিদার মহাশয় তাঁহার কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে, নিস্তারিণী মোটামুটি রকমের ইংরাজী, বাঙ্গালা শিখিয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও বিখ্যাত নাটক উপন্যাসের চরিত্রাবলির বিশ্লেষণ সে দক্ষতার সহিত করিতে পারিত। উচ্চশিক্ষার ফলে সে নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা হইয়াছিল। লোকজনের সহিত আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, লোক-লৌকিকতায় তাহার সমতুল্যা নারী তাহার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয়ের গ্রামে কেহ ছিল না বলিলেও চলে। ক্ষুদ্র উপকারকে সে বিশেষ বড় রকম করিয়া দেখিতে পারিত। বড় লোকের কন্যা বলিয়া তাহার সামান্য একটু অভিমানও ছিল না। সে সমান ভাবে শাশুড়ী, ননদিনীর সহিত গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম করিত। সুতরাং এমন গুণশালিনী রমণীর সংস্পর্শে যে কেহ আসিত, সেই নিজেকে ছোট করিয়া দেখিতে বাধ্য হইত। তাহার এত গুণ কিন্তু হারুর মাতা ও বিধবা ভগ্নীর নিকট বিসদৃশ ঠেকিত। তাহারা নিস্তারিণীর পাঠস্পৃহা ও কার্য্যের সুখ্যাতি সহিতে পারিত না। কিন্তু উপযুক্ত পুত্রের ভয়ে তাহারা প্রকাশ্যে কলহ করিতে সাহস করিত না; গোপনে ২।১টী 'চিপটানি' কাটিয়াই গাত্রদাহ মিটাইত।

অনেক গুণ থাকিলেও নিস্তারিণীর যে দোষ ছিল না তাহা নহে। বদন মণ্ডলের সহিত তাহার স্বামীর এতটা মাখামাখি সে পছন্দ করিত না। স্বামীর ভালবাসার ষোল আনা অংশটুকু সে একাকী নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল করিতে চাহিত। এজন্য স্বামীর সহিত মধ্যে মধ্যে তাহার যথেষ্ট খুঁটিনাটিও হইত।

যখন বদন মণ্ডলকে জমিদারের পাইক থানায় চালান দিতেছিল, সেই সময়ে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নিস্তারিণীর সহিত হারুর একটা প্রেমের মানাভিমানের পালার অভিনয় হইতেছিল। এমন সময় ঝড়ের মত বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বদনের মাতা থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হারু নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল—"কি হয়েছে মা, ব্যাপার কি ?"

বদনের মাতা হাঁকাইতে হাঁকাইতে বলিল—"বাবা সর্ব্বনাশ হয়েছে! জমিদার বদনকে থানায় চালান দিয়েছে।"

"এঁ্যা, কেন! কি জন্য?" এই বলিতে বলিতে হারু দৌড়িয়া বাটীর বাহির হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য নিস্তারিণীও উৎকণ্ঠিতা হইয়া রহিল।

(৭)

হারুর প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এক দিকে প্রবল প্রতাপান্বিত বিশেষ সম্পত্তিপন্ন জমিদার ও তৎসহায় তিনকড়ি নায়েব ও ভট্টাচার্য্যি এবং অন্য দিকে দরিদ্র নিরীহ প্রকৃতির পল্লী চিকিৎসক স্বীয় বন্ধুর উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর। জোগাড়ের জয়, অর্থের জয় সর্ব্বত্রই, সুতরাং বিচারালয়ে বদনের তিন শত টাকা অর্থদণ্ড বা তৎপরিবর্ত্তে তিন মাস কারাবাসের আদেশ হইবে বিচিত্র কি! এই দণ্ডাদেশ শুনিয়া বদনের বদনমণ্ডল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমেয়, কিন্তু তাহাকে টাকার জন্য জেল খাটিতে হইবে না, এ ভরসা সে অনেক আশা করিয়া হারুর উপর রাখিয়াছিল।

হারুর যে সামান্য পসারটুকু হইয়াছিল, তাহাতেই সে ইতিমধ্যে চৌদ্দ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ করিতে পারিয়াছিল, এ সংবাদ বদনের অগোচর ছিল না। হারুও বন্ধুর জামিন হইয়া আসিয়া ঐ টাকাটা কোম্পানীর কাগজ বন্ধক দিয়া সংগ্রহ করিবে, এইরূপ স্থির করিতেছিল। নিস্তারিণী বলিল—'তা' কিছুতেই হইতে পারে না। বন্ধুর কি টাকাকড়ির অভাব আছে যে, তুমি দিতে যাবে?' হারুর চক্ষে জল আসিবার মত হইল। বলিল—"দেখ্‌ছি পৃথিবীর মধ্যে আমার বন্ধুর উপর তুমি বড় বিরূপ।" হারু এর চেয়ে শক্ত কথা পত্নীকে বলিতে পারিত না; দুষ্ট লোকে বলিত, বড় লোকের মেয়ে বলিয়া সাহস করিত না। কূট তর্কশাস্ত্র ছাড়িয়া শিক্ষিতা মহিলা নিস্তারিণীও অশিক্ষিতা রমণীদের আদর্শে ক্রন্দন ও অশ্রুর আশ্রয় লইল। বিগলিত প্রাণ হারু বলিল—"থাক্, আমি কিছু নেব না। বদন দোষ করেছে, জেল খাট্‌বে তা'তে আমার কি!"

"না গো না, দোষ সব আমার। তোমার জিনিস্ তুমি দেবে তা'তে আমার বলবার কি অধিকার আছে!"—এই বলিয়া নিস্তারিণী ক্যাশবাক্স খুলিয়া কোম্পানীর কাগজের তাড়া ও সেই সঙ্গে তার 'তোলা গহনাগুলি' হারুর পদতলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

হারু গহনাগুলির দিকে ও পত্নীর মুখপানে চাহিয়া কি একটা সামঞ্জস্য

করিয়া লইল, এবং তাহাতে আদৌ হস্তক্ষেপ না করিয়া চিন্তাক্লিষ্ট বদন আরও গম্ভীর করিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

জমিদারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া বদন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পৈত্রিক পাঁচ বিঘা জমি আধা কড়িতে তিন শত টাকায় বেচিতে হইয়াছিল, বাস্তু ভিটাটুকু মহাজনের হাতে বাঁধা পড়িয়াছিল, এবং পত্নী কমলার গায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহনা হইতে আরম্ভ করিয়া পিতল কাঁসার বাসন অবধি তাহাকে বেচিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সে একবারের নিমিত্তও দমিয়া পড়ে নাই। বন্ধুর মুখ চাহিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়াছিল।

(৮)

বন্ধু হারুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া বদনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কি একটা অশুভ কথা শুনিবার ভয়ে বদন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছিল না; দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ মৌন ভাবে থাকিবার পর হারু বলিল—"দেখ বন্ধু, তুমি না হয় দিন কত জেল হ'তে ফিরে এস। এ তো আর চুরী ডাকাতী নয় যে, এই জেল খাটায় তোমার চরিত্রে একটা কলঙ্কের ছাপ পড়বে।"

বদন বিস্মিত হইয়া হারুর মুখের দিকে চাহিল। বুঝিল, পত্নী-অন্তপ্রাণ নিস্তারিণীর প্রভাবে হারু মোহাবিষ্ট হইয়াছে। বৃথা কথায় তাহার মনোকষ্ট না বাড়াইয়া সে সংক্ষেপে 'কাষ্ঠহাসি' হাসিয়া বলিল—"সে তো নিশ্চয়।"

উৎসাহিত হইয়া সরলপ্রাণ হারু বলিল—"আরও এক কথা দেখ, তুমি কিছু আর তিন মাস ঘরে বসে তিন শ' টাকা উপায় কর্‌তে পারবে না, তুমি ফিরে এসে বরঞ্চ তিন শ' টাকা মূলধন পেলে তোমার জীবনের একটা কিনারা হয়ে যেতে পার্‌বে।"

বদন গম্ভীর ভাবে বলিল—"তবে তাই হোক্ ভাই!"

বদনের গতি নির্ণীত হইয়া গেল। তিন মাসের জন্য তাহাকে শ্রীঘর-দর্শন করিতে হইল; বৃদ্ধা মাতা, পতিপ্রাণা কমলা, কনিষ্ঠা ভগ্নীর অনশন চিত্র কল্পনায় আনিতে তাহার প্রাণটা গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হয়তঃ বদনের কণ্ঠনালীর বিকৃতি হেতু তাহার মর্ম্মন্তুদ হাহাস্বর হারুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

বদনের মাতা উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘরের বাহির হইতে দুই বন্ধুর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি বড় আশা করিয়াছিলেন যে হারু তাহার পুত্রের উদ্ধারসাধন করিবে। এখন তিনি উন্মত্তপ্রায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া

হারুর হাত দু'টী ধরিয়া বলিল,—"এই শেষ ঠিক কল্লে বাবা! বদন জেলে যাবে!"

ভীতি-বিহ্বল শুষ্ক কণ্ঠে হারু কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না।

(৯)

নলিনী কাছারী বাটী সংলগ্ন ক্ষুদ্র কাননে বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ বদনের নাম শুনিয়া তিনি একটু আত্মগোপন করিয়া বসিলেন। তিনি উৎকর্ণ হইয়া কাছারীর গৃহমধ্যে তিনকড়ি নায়েব ও ভট্টাচার্য্যের কথা অনেকক্ষণ শুনিতেছিলেন ও শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

"তুমি নায়েব, এত বড় জমিদারীটা তোমার করতলগত, তোমার একটু শক্ত হওয়া চাই। মনটা অত নরম কর্‌লে জমিদারীর কাজ চল্‌বে কেন?"—মৃদু মৃদু তামাক টানিতে টানিতে কাছারী বাটীতে বসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিনকড়ি নায়েবকে উক্তরূপে নীতি-কথা শুনাইতেছিলেন।

একটুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনকড়ি বলিল—"যাই বলুন ভট্টাচার্য্যি মশাই, লোকটার অনর্থক সর্ব্বনাশ করবার আমার ইচ্ছে ছিল না। বাবু রেগে গেলেন, তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে অতটা কর্‌তে হ'ল।"

হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এই কাজে চুল্ পাকালুম, একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া চোখ রাঙ্গিয়ে যাবে? তা'কে যে প্রাণে মেরে—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নলিনী আর গোপনে না থাকিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল—"তবে আপনাদেরই বীরত্বে বদনকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে। পাপ, সয়তান—"

ভট্টাচার্য্য—তুমি রাগ কর্‌ছ কেন? কটু কথা বল ক্ষতি নেই, কিন্তু ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা—

তিনকড়ি ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে বলিল—"আমার কি দোষ—"

"না, দোষ, আমার!" ব্যঙ্গস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে জমিদার প্রস্থান করিলেন। তিনকড়ি ও ভট্টাচার্য্য স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

জমিদার নলিনীবাবু বড় লোকের মত কাণ-পাতলা এবং সহজে রাগিয়া যাওয়া তাঁহার স্বভাব হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, তিনি হৃদয়বান্ ছিলেন।

যখন বুঝিলেন তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের চক্রান্তে বদন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে,

এবং মাসাধিক কাল জেলে পচিতেছে, তখন তাঁহার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। কি উপায়ে বদনকে উদ্ধার করিয়া তাহার ক্ষতি পূরণ করিবে, তখন এই ভাবনাটাই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল।

(১০)

প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও হারু ঘোষ বদনের মাতাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিলেন না। বিনাদোষে একমাত্র পুত্রের কারাবাস-দণ্ডের সহিত তাহাদের সর্ব্বনাশ বৃদ্ধাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

বদন যে কারাবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে, শত প্রমাণ যুক্তির সহিত নানা লোকের মুখে একই কথা, তাহাকে আশ্বস্ত করিতে পারিল না। এক মুহূর্ত্তের জন্য যে বদন তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, না বসিয়া খাওয়াইলে যাহার পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না, তাহার সেই নয়নের মণি তিন মাস তাহাকে ছাড়িয়া যে বাঁচিতে পারে না, এই ধারণা তাহার হৃদয়ের মধ্যস্থল তোলপাড় করিয়া ঝড় তুলিল। বিষম প্রলাপের সহিত তাহার জ্বর হইল। হারু ঘোষ প্রথমতঃ স্বয়ং চিকিৎসা-ভার লইয়াছিল. কিন্তু রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে গ্রামান্তর হইতে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া দেখাইতে লাগিল।

নলিনী স্বয়ং হারু ঘোষের বাটীতে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; খবর পাইলেন, সে বদনের বাটীতে গিয়াছে।

কালবিলম্ব না করিয়া নলিনী বদন ঘোষের বাটীতে গিয়া ডাকিলেন, "হারু বাবু, হারাধন বাবু।"

উত্তরে বামাকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বদনের ছোট ভগ্নী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে নলিনীকে দেখিতে পাইল। এবং সাগ্রহে বলিল—"আপনি একবার দেখুন্ না, মা কেমন কচ্ছেন!"

"চল মা," বলিয়া নলিনী তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল। নলিনী ভাবিয়াছিল বৃদ্ধার মৃত্যু-শয্যায় যদি একবার তাহার নিকট সে ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া লইতে পারে, তাহার বিষয়-সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিও করিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই আশায় সে গৃহমধ্যে গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া হারু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু মুখে কোনও কথা বলিল না। বৃদ্ধা তখন মৃত্যুর শীতল কর-স্পর্শে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

(১১)

জেলের মধ্যে থাকিয়া বদন তাহার মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পাগলের মত

হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ভাবনা ভাবিয়াই যে তাহার মাতা মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে, তাহার পত্নীকে যে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করিতে হইতেছে, এ সব ভাবনায় সে উন্মত্তের মত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রবল জ্বরে সে 'মা-মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

যাহার উপর ভালবাসা যতটা অধিক থাকে, তাহার ক্ষুদ্র ত্রুটীও প্রাণে দারুণ আঘাত করে। হারাধনের ব্যবহার বদনের প্রাণটাকে মুচ্ড়াইয়া দিয়াছিল; সে হারাধনের উপর অনেক আশা রাখিত। স্বপ্নেও মনে করিতে পারিত না, তুচ্ছ টাকার মায়ায় হারাধন তাহাকে জেলে যাইতে পরামর্শ দিবে। জেলের হাঁসপাতালে এই সব চিন্তা তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিত। একদিন প্রাতে এইরূপ চিন্তায় যখন সে মগ্ন, সে দেখিল, জেলার হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট আসিয়া হাকিমের হুকুম শুনাইল; সে খালাস পাইয়াছে। তিন মাস জেলের এক মাস অতিবাহিত না হইতেই মুক্তির আদেশ শুনিয়া বদন বিস্মিত হইল; হারু ত টাকা দিবে না, যদি দিত তাহা হইলে ত তাহাকে জেলে আসিতে হইত না, তাহার শোকে তাহার মাতার মৃত্যুও হইত না। তাহার জন্য তিন শত টাকা জলে ফেলিবে এমন আত্মীয়ও ত তাহার কেহ নাই!

জেলার বদনকে সাধারণ কয়েদীর অপেক্ষা যত্ন করিতেন। তাহার মুক্তিতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন; বদনও তাহাকে যথেষ্ট সম্মানসূচক অভিনন্দন করিয়া বাটী ফিরিল।

নানা চিন্তার ভার লইয়া বদন বাটী ফিরিয়া দেখিল, তাহার বাস্তুভিটার শ্রীটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পত্নী ভূমিতে অঞ্চল বিছাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে ছোট ভগ্নী বসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছে। অতি সন্তর্পণে বদন কমলার নিকট গিয়া বসিল। চির-পরিচিত দ্রুত নিশ্বাসের বাতাস গায়ে লাগায় কমলা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার আরাধ্য দেবতা মূর্ত্তিমান হইয়া সম্মুখে আসীন। সে ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া, করুণ ক্রন্দনে গৃহের ঘন নিস্তব্ধতাকে সজাগ করিয়া তুলিল।

(১৫)

গ্রামের সকল লোকেই বদনকে ভালবাসিত। তাহার এই অসময়ে সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিল। বিস্মিত হইবার কথা, তিনকড়ি নায়েব ও নীলকান্ত ইহারা দুইজনেও আসিয়াছিলেন। বদন তাঁহাদের দুইজনকেও খুব সম্মান করিয়া বসাইয়াছিল। অতি বড় শত্রুও বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিলে তাহার উপর বিদ্বেষ ভাব আর থাকে না।

মৌনভঙ্গ করিয়া তিনকড়ি বলিল, "বদনবাবু, আমি আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

বদন জল-ভরা চোখে উত্তর করিল, 'অদৃষ্টের চেয়ে বড় কেউ নেই; আমার অদৃষ্ট-চক্র যেমন ঘুরেছিল, আমি সেই মতই ফল পেয়েছি। আপনি কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন?"

ভট্টাচার্য্য বলিল—"বাবা, এই ছেলে বয়সে তুমি যে মহাপ্রাণ হয়েছ, আমি জীবনে ত তা'র এক কণাও পেলেম না।"

তিনকড়ি বলিল—"আমাদের জমিদারবাবু আপনার বাস্তুভিটা ও জমি কয় বিঘা দায়মুক্ত করে আপনার হাতে দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চান্।"

খুব বিনয়ের সহিত বদন বলিল—"ঈশ্বর তাঁ'র মঙ্গল বিধান করুন। আমি যখন তাঁ'র চাকুরী করেছি, তখন আমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অনেক অর্থ পেয়েছি। সেই পুরস্কারটাকে আমার পারিশ্রমিক মনে করে গ্রহণ কর্‌তে পেরেছিলুম। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় বজায় থাক্‌তে কোন্ মুখে দান গ্রহণ করবো। আমি অক্ষম, আমায় ক্ষমা কর্‌তে বল্‌বেন।"

অধিক কিছু বলা বা তর্ক করা অসঙ্গত মনে করিয়া তিনকড়ি ও ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য, বদনের চরিত্র দেখিয়া তাহারা নিজেদের পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিল।

(১৩)

শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে নিস্তারিণীর আর ভাল লাগিতেছিল না। না লাগিবারই কথা। চির-আদরে পালিত, দাসদাসী পরিবেষ্টিত রাণীর মত দিন-যাপন করার পরিবর্ত্তে সুদূর পল্লীতে কলহ-পূরিত শ্বশুরগৃহে বসবাস যে দারুণ কষ্টের, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে শ্বশুরগৃহে চাহিত শুধু স্বামীকে। যদি সেই অমূল্য নিধিকে কোন রকমে সে অঞ্চলে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিত, তাহা হইলে সে এতদিন কোনকালে পিত্রালয়ে মনোসুখে কালযাপন করিত। তাহার সে ইচ্ছাটুকুর প্রধান অন্তরায় ছিল বদন। সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ সে অনেক চেষ্টায় কতকটা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিয়াছিল। বদন জেলে যাইবার পর সে পূর্ণরূপেই স্বামীকে পাইয়াছিল, এবং নানা প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সর্ব্বদাই তাহার আশঙ্কা ছিল, বদন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার স্বামীকে পুনরায় কাড়িয়া

লইবে। একদিন হারুকে সে বলিল—"দেখ, আমার মা আমাকে প্রায়ই নেবার জন্য লোক পাঠান, তোমারও মন খারাপ, আমারও শরীরটা ভাল নয়, চল না, সেখানে গিয়ে দিন কত কাটিয়ে আসি।"

হারু। কাজকর্ম্ম ছেড়ে কি করে যাই?

নিস্তারিণী। আগে প্রাণ তা'র পর পয়সা। আর পয়সার কথা, তাও তোমার অভাব কিসের? মা তো সেই খানেই আমাদের থাক্‌তে বলেন।

হারু। ছিঃ নিস্তার, কি বল্‌ছ! আমি তোমার বাপের পয়সা নিয়ে—

"না—না" হারুকে তাহার কথায় বাধা দিয়া, কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া নিস্তারিণী বলিল,—"আমি কি আর তোমাকে সেই অন্যায় কথাই বল্‌ছি। শ্বশুরবাটীতে দু' দশ দিন থাক্‌লে ত আর লোকে মুখে চুণকালী দেবে না!"

হারু। তা'তে এমন আপত্তি আমি দেখি না। শুধু কাজকর্ম্ম আর বদনের সংসার—"

মনোভাব চাপিয়া নিস্তারিণী বলিল—"তাই বল, বদনের সংসার দেখ্‌তে হ'বে। কাজকর্ম্মের দোহাই দাও কেন?"

হারু। লোকে কি বল্‌বে; এরূপ অবস্থায় তা'র স্ত্রীকে একেলা ফেলে যাওয়া যে অধর্ম্ম!

নিস্তারিণী। তবে তুমি আমাকে রেখে আস্‌বে চল—আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তা'তে আমায় একবার না যাত্রা বদলালে আমি পাগল হয়ে যাব।

কোন্ স্থানে তাহার স্বামীর দুর্ব্বলতা নিস্তারিণী তাহা ভাল রকমই জানিত। তাহার বিশ্বাস ছিল, বদনের সংস্রব হ'তে তা'কে একটু দূরে নিয়ে যেতে পার্‌লে তাহাকে আয়ত্ত করা শক্ত হইবে না।

হারু। মা'র একবার অনুমতি নেওয়া ত দরকার।

চেষ্টা করিয়া মৃদু হাসিয়া নিস্তারিণী বলিল—'সে ভার ত তোমার।'

(১৪)

কারাবাস হইতে বদন যে দিন প্রত্যাগমন করিল, তৎপূর্ব্ব দিন হারু শ্বশুর-বাটীতে গমন করিয়াছিল। বদনের প্রাণটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার অসহায়া পত্নীকে একাকিনী ফেলিয়া তাহার কোনও ব্যবস্থা না করিয়া হারু কি করিয়া শ্বশুরবাটীতে গমন করিল! হারুর শ্বশুরবাড়ী তাহার বাটী হইতে আট ক্রোশ দূরে। মাথার উপর মাতৃদায়, মানসিক বিকৃতি ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া এতটা পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়া একান্ত অসম্ভব দেখিয়া সে দুই

দিন হারুর জন্য অপেক্ষা করিল। যখন সে বুঝিল, তাহার শীঘ্র প্রত্যাগমনের আশা অল্প, তখন হারুকে একখানি পত্র লিখিল—

"প্রিয়বরেষু—

আমি কারামুক্ত হইয়া বাটী ফিরিয়াছি। বোধ হয় তুমি মনে করিতে পার নাই যে, তোমার চেষ্টা এত শীঘ্র সফল হইবে, আমি এত শীঘ্র বাটী ফিরিব। নহিলে নিশ্চয়ই তুমি আমার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে। এখন আমার মাথার উপর মাতৃদায়। আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী আছে। তুমি আমার এই পত্র পাইলে নিশ্চয়ই আসিবে, এবং নিজে দাঁড়াইয়া আমায় দায়মুক্ত করিবে। সাক্ষাতে অনেক কথা বলিব। ইতি—তোমার—বদন।"

(১৫)

"ছিঃ ছিঃ! এই রকম করে শ্লেষভরা চিঠি লেখে!" বলিয়া নিস্তারিণী মুখ বিকৃত করিল।

হারু। শ্লেষ আবার কোথায় দেখ্‌লে!

নিস্তারিণী। তুমি ত আর তা'কে জেল থেকে মুক্ত করনি। দেখ না, সেইজন্য শ্লেষ করে চিঠি লিখেছেন।

হারু। ঠিক কথা বলেছ নিস্তার। বন্ধু হয়ে প্রাণে এরূপ আঘাত করলে সহ্য হয় না।

নিস্তারিণী। আমি ত চিরদিনই এ কথা তোমাকে ইঙ্গিত-ইসারায় বুঝিয়ে এসেছি।

হারু। আমি বড় ভুল বুঝেছিলাম!

বিজয়ী বীরের মত নিস্তারিণী গর্ব্বভরে উঠিয়া বসিল।

* * *

হারুর সহিত বদনের যাহাতে একটা স্থায়ী মনোমালিন্য হয়, নিস্তারিণী প্রাণপণে সেই চেষ্টাকেই তখনকার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। হারুর নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া, আবদার-অভিমান করিয়া, সে বদনের নিকট ১২১৷৵৹ দাবী করিয়া এক পত্র পাঠাইল। ঐ টাকাটা কতক মোকদ্দমার ব্যয়ে, কতক বদনের মাতার চিকিৎসা ও পথ্যে, এবং কতক তাহাদের সংসার খরচায় ব্যয়িত হইয়াছিল। এই পত্রখানি বদনের হাতে পড়িল তাহার মাতৃশ্রাদ্ধের পর দিবস। বদন ক্রমান্বয়ে ২।৩ খানি পত্র দিয়াও কোনও কথার উত্তর পায় নাই। শুধু এই তাগিদ-পত্রখানি পাইয়াছে। অতি বড় শত্রুও বোধ হয় এ সময়ে টাকার তাগাদা করিতে পারিত না।

পত্র পড়িয়া বদন প্রশান্তভাবে বসিল। মনে মনে সে একটা মতলব আঁটিয়া লইল। বাস্তুভিটাটুকু সামান্ত টাকায় বাঁধা দিয়া সে ইতিপূর্ব্বে মোকদ্দমার ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াছিল, এখন সেটী বিক্রয় করিয়া হারুর ঋণ পরিশোধ করিবে ; বাকী সামান্ত যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা লইয়া দেশান্তরে যাইবে সঙ্কল্প করিল।

নলিনীবাবু ইতিমধ্যে উপযাচক বদনকে নানা প্রকারে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন. এবং প্রতিবারেই সে সম্মানের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এখন হারুর পত্র পাইয়া সে নলিনীবাবুর নিকট গমন করিল।

বদনকে দেখিয়া নলিনীবাবু একটু হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, মানুষ লোভের দাস। সাময়িক উত্তেজনায় সে তেজ দর্প দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক, খদ্যোতিকার আলোকের মত। প্রকাশ্যে বলিলেন—'কি বদন-বাবু যে, আসুন।' তিনকড়ি নায়েব, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিরও মনের ভাব ঠিক এক প্রকার, কিন্তু কেহই প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

বদন করযোড়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"আপনি আমাকে অনেকবার সাহায্য কর্‌তে চেয়েছিলেন, সেই সাহসেই আপনার কাছে এসেছি !"

গম্ভীরভাবে নলিনীবাবু বলিলেন—"বলুন !"

বদন বলিল—"আপনি অনুগ্রহ করে আমার ভিটেটা বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করিয়ে দিন, তা' হ'লে বিশেষ অনুগৃহীত হ'ব।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই বদনের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে লাগিল। বদন কিন্তু নিরুত্তর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অনেক তর্কবিতর্ক অনুনয়বিনয়ের সহিত নলিনীবাবুকে রাজী করিয়া, বদন গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

(১৬)

জমিদারের সাহায্যে বদন দুই এক দিনেই বাস্তুভিটা বিক্রয় করিয়া হারু ঘোষের প্রাপ্য গণ্ডা মণি-অর্ডারে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এইবার তাহাকে সস্ত্রীক ভিটা ত্যাগ করিয়া জন্মভূমির মায়া চিরদিনের জন্য কাটাইয়া দেশান্তরে যাইতে হইবে। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে চিন্তারাশি বিদ্রোহ করিয়া প্রবল ঝড় তুলিল। এক ব্যক্তি কয় দিক সামলাইবে ! বদন জ্বরে আক্রান্ত হইল। তাহার স্ত্রী প্রাণ-পাত করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। চিকিৎসা বা পথ্যের অর্থ নাই। নলিনীবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে গেলে, বদন তাহাকে নিষেধ করিয়া

বলিতেন—"আমার মত দুর্ভাগা মরবে না, আপনি নিশ্চিন্ত হো'ন্। ভগবান আমার চিকিৎসা ভার স্বহস্তে নিয়েছেন।"

নলিনীবাবু ঔষধ খাওয়াইতে জোর করিলে বদন তাহা গলাধঃকরণ করিত না। নলিনীবাবু অকৃতকার্য্য ও বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেন।

কমলা ও সুশীলা বদনের কাছে বসিয়া কাঁদিত, বদন তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি-প্রদর্শন করিয়া বলিত, 'এমন এক জনের কাছে তোমাদের ভার দিয়ে যাব, যিনি তোমাদের আর কোনও কষ্ট দেবেন না!' এক একবার পত্নীকে বলিত—"কখনও ভিক্ষা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিও না, কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না।"

*　　*　　*　　*

শুধু পত্নীর অনুরোধ-রক্ষা করিয়া বদনকে একটু জব্দ করিবার জন্যই হারু পত্র লিখিয়াছিল। সে বদনের নিকট টাকা পাইবার আশা আদৌ করে নাই। তাহার আন্তরিক ইচ্ছাও তাহা ছিল না, কিন্তু যখন দেখিল বদন তাহার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় পাঠাইয়াছে, তখন বদনকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যে বদনের সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র জানিত। নিস্তারিণীর শত বাধা উপেক্ষা করিয়া সে বাটী ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প করিল। পাছে স্বামীকে পুনরায় হারাইয়া বসে, এই আশঙ্কায় নিস্তারিণীও তাহার সঙ্গ লইল।

যখন তাহারা গ্রাম্যপ্রান্তে প্রবেশ করিতেছে তখন দেখিল, এক কুলবধূ আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে এবং কয়জন রমণী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া তুলিয়া একটী শবদেহ প্রদক্ষিণ করাইয়া কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে, এবং ব্রাহ্মণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাকে মন্ত্রোচ্চারণ করাইতেছে।

হারু গো-শকট হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পাগলের মত শ্মশানের দিকে ছুটিয়া মৃতদেহটী বক্ষে জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"বন্ধু, এমনি কঠিন শাস্তি, কঠিন শাস্তি! ক্ষমা চাইতে পেলুম না!"

পুরাণে প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত মর্ম্ম।

[লেখক—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ।]

সাধারণতঃ প্রায়শ্চিত্তের যেরূপ বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায়, তাহাতে ইহার প্রকৃত সফলতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ না হইতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু পুরাণে প্রায়শ্চিত্তের যেরূপ প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের সেরূপ কারণ নাই। যেহেতু বাহিক ক্রিয়া ইহাতে অতি অল্প মাত্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে; মানসিক ক্রিয়াই অধিক লক্ষিত হয়। পুরাণে প্রায়শ্চিত্তের দ্বিবিধ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, কৃত দুষ্কার্য্যের জন্য মনে মনে অনুতাপ; দ্বিতীয়, তাহার বিষয় গোপন না রাখিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করা। আমরা অগ্রে অনুতাপ সম্বন্ধে পুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মোহাদধর্ম্মং যঃ কৃত্বা পুনঃ সমনুতাপ্যতে।
মনঃ সমাধিসংযুক্তো ন সেবেত দুষ্কৃতম্ ॥
যথাযথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্মগর্হতে।
তথা তথা শরীরন্তু তেনাধর্ম্মেণমুচ্যতে ॥"

ব্রহ্মপুরাণ ১১৮শ অধ্যায়।

"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করিয়া পুনরায় সংযত চিত্তে তজ্জন্য অনুতাপ করে, তাহার আর নরকে যাইতে হয় না। তাহার মন যেমন নিজকৃত দুষ্কর্ম্মকে গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার শরীরও তেমনই অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়।"

এস্থলে অনুতাপের দ্বারা মনের পরিশুদ্ধতাই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনুতাপের দ্বারা মনের পরিশুদ্ধতার ইহাই বিশেষ লক্ষণ জানিতে হইবে যে, পাপ কর্ম্মের প্রতি তখন ঘৃণার ভাব সঞ্জাত হইবে। এই ঘৃণার ভাবের দ্বারাই পাপ বিষয়ে আমাদের প্রবৃত্তি দমিত হইবে। অনুতাপ এই প্রকারেই আমাদের চিত্তের সংযম সাধন করিবে। তখন আমরা আর সহজে পাপের দ্বারা প্রলোভিত হইব না।

এক্ষণে আমরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা উদ্ধৃত করিব :—

"যদি বিপ্রাঃ কথয়তে বিপ্রাণানাং ধর্ম্মবাদিনাম্।
ততোঽধর্ম্মকৃতাৎ ক্ষিপ্রমপরাধাৎ প্রমুচ্যতে।
যথাযথা নরঃ সম্যগধর্ম্মমনুভাষতে।
সমাহিতেন মনসা বিমুচ্যতি তথাতথা ॥
ভুজঙ্গইব নির্ম্মোকাৎ পূর্ব্বমুক্তাৎ জহাত্তিতাৎ ॥"

ব্রহ্মপুরাণ ১১৮শ অধ্যায়।

"হে বিপ্রগণ! পাপী যদি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে নিজ দুষ্কর্ম্মের কীর্ত্তন করে, তবে অতি অল্পকালেই উক্ত অধর্ম্ম হেতু অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। নরগণ কর্ত্তৃক সমাহিত মনে যেমন যেমন স্বকৃত অধর্ম্ম কীর্ত্তিত হয়, ভুজঙ্গের পুরাতন নির্ম্মোক ত্যাগের ন্যায়, তেমনি তেমনি উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।"

এখানে আমরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ফলোপধায়কতা এইরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের নিকট নিজের দুষ্কর্ম্মের বিষয় স্বীকার করার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা যেমন সাধুলোকের পবিত্র সান্নিধ্যের সুযোগ সঙ্ঘটিত হইতে পারে, তেমনই তাঁহার সদুপদেশের সুযোগও সঙ্ঘটিত হইতে পারে। পাপ স্বীকারের দ্বারা পক্ষান্তরে সত্যবাদিতা ও সরলতারও, অনুশীলন হইবে। সত্যবাদিতা ও সরলতা এইরূপে যখন প্রকৃতিকে নবভাবে গঠিত করিতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রকৃতির পূর্ব্ব অসদ্ভাব আপনা হইতেই অপসৃত হইতে থাকিবে। এই প্রকারেই সর্প নূতন উজ্জ্বল ত্বক্ প্রাপ্ত হইয়া, পুরাতন মলিন ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়। সুতরাং সর্পত্বক্ মোচনের উপমাটী যে সবিশেষ উপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সর্প, পুরাতন ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়াই উজ্জ্বল ত্বক্ ও নবতেজ ধারণ করে; পাপীও, ধার্ম্মিক ব্যক্তির সান্নিধ্যবশতঃ সংযতচিত্ত হইয়া মনের নির্ম্মলতা ও নব বল সঞ্চার করিতে করিতেই পূর্ব্বের অসৎ প্রকৃতি পরিহার করিয়া থাকে।

আত্মপাপ প্রকাশের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের প্রক্রিয়া বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশেষানুষ্ঠান রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। পুরাণে যেস্থলে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের নিকট আত্মপাপ প্রখ্যাপনের কথা পাওয়া যায়; তৎস্থলে তত্তৎ ধর্ম্মে নিজের নিজের ধর্ম্মযাজকের নিকট আত্মপাপ প্রখ্যাপনের নিয়ম দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মযাজকেরই জাতি। সুতরাং বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টের পাপ-প্রখ্যাপন প্রথা এবং পুরাণের পাপ-প্রখ্যাপনের বিধানের মধ্যে বিশেষ সৌসাদৃশ্যই যে বর্ত্তমান, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই সৌসাদৃশ্য হইতে এবং পুরাণের এতৎ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ হইতে পুরাণের পাপ-প্রখ্যাপন বিধানই যে মূল এবং ইহাই যে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণই দেখিতে পাইতেছি।

ভিখারী।
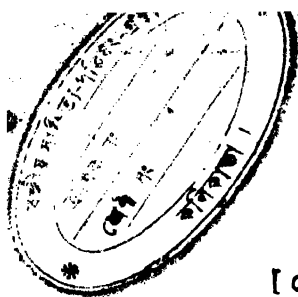
[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

নদীর ধারে গাঁয়ের বাঁকে লতা পাতায় ঢাকা
ছোট্ট তাহার কুটির খানি চারিদিকে ফাঁকা।
ভোরের বেলা কনক-রেখা লুটায় শিরে তা'র
মাতদুপুরে চাঁদের আলো নাশে অন্ধকার।
হাজার তালি ঝুলি তাহার জীর্ণ কাঁথা অতি
বিত্ত যে তা'র নাইক মোটেই বৃদ্ধ সরল মতি।
ধনুর মত বক্র দেহ পক্ক 'ভুরু' কেশ
যষ্টি-হাতে একা একা ঘুরে সারা দেশ।
ফুলের গন্ধে আকুল হ'য়ে নদীর কুলতানে
পাখীর ডাকে বেরিয়ে পড়ে স্মরি' ভগবানে।
ভিক্ষা করে গাঁয়ের ভেতর প্রতি দ্বারে দ্বারে
যে যাহা দেয় তা'তেই খুসি ধন্য বলে তা'রে।
আপন মনে উদাস সুরে গুণগুনিয়ে গায়
কতই সে যে প্রাণের কথা মাখা আছে তায়।
সন্ধ্যা হ'লে ফিরে আসে আপন কুটিরেতে
গভীর ঘুমে কাটায় নিশা ছেঁড়া কাঁথা পেতে।
বড় হ'তে চায় না সে যে সবার কাছেই দীন
রাজার মত চিন্তা তা'রে পায় না কোন দিন।
খাজনা তাহার হয় না দিতে নাইকো আদালত্
দিন মজুরি নিত্য করে নাইকো 'ভবিষ্যৎ'।
শত্রু মিত্র নাইক তাহার নাইকো হিংসা দ্বেষ
দলাদলির ধার ধারে না নাইকো ভাবনা লেশ।
ভাবনা শুধু ছুটোর তরে, 'ভুলো' কুকুরটার—
'হরিদাসী' রেখে গেছে বিড়ালটা যে তা'র।

কাশ্মীরে শাস্ত্র-চর্চ্চা।

(৫)

[লেখক—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, কাহারও কাহারও মতে শ্রীনগরের সন্নিহিত 'বিচারনাগ' গ্রামেই কৈয়টের নিবাস ছিল। আমরা এই 'বিচারনাগে'ও গিয়াছিলাম। কাশ্মীরী ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ কুণ্ড। বিচারনাগ শব্দের অর্থ বিচারকুণ্ড। এই গ্রামের মধ্যস্থলে একটী কুণ্ড বর্ত্তমান; তাহাকেই বিচারনাগ বলে; এই কুণ্ডের নাম হইতেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে কয়েকটী সুবৃহৎ প্রাচীন 'চনার' বৃক্ষ আছে; আমাদের দেশে চনার গাছ হয় না; উষ্ণ দেশ এই বৃক্ষের উপযোগী নহে; আবার কাশ্মীরে অশ্বত্থ বৃক্ষ হয় না; কারণ অশ্বত্থ বৃক্ষ অত্যধিক শীতপ্রধান স্থানে হইতে পারে না। কাশ্মীরের চনার বৃক্ষ আমাদের দেশের অশ্বত্থস্থানীয় মনে করিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রাচীন সুবৃহৎ চনার বৃক্ষ আছে, তাহাদের সুশীতল ছায়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে; এই বিচারনাগ নামক কুণ্ডে গ্রামের সমীপবর্ত্তী একটী পাহাড় হইতে নির্গত ক্ষুদ্র একটী তটিনী আসিয়া পড়িয়া, কুণ্ডের অপর দিক দিয়া বহির্গত হইয়া কলনাদে কোন এক অজ্ঞাত উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদীর তীর বহুদূর পর্য্যন্ত বেতসবনের ছায়ায় আচ্ছাদিত (১)। স্থানটী অতি মনোরম, দেখিলেই মনে শান্ত ভাবের উদয় হয়। এই গ্রাম যে এক কালে কাশ্মীরে বিদ্যাপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহা আমরা প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিছু-দিন পূর্ব্বেও আমরা দেখিয়াছি, কাশীতে গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাবন্দনার্থ সমাগত পণ্ডিতগণের বিবিধ শাস্ত্রালাপে জিজ্ঞাসু ছাত্র ও দেশান্তর হইতে সমাগত পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হইতেন; কাল-প্রভাবে কাশীর এই রীতিও এখন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মনে হয়,

---

(১) বেতস বলিতে কেহ যেন আমাদের কণ্টকাকীর্ণ বেত মনে না করেন। কাশ্মীরে জলাভূমিতে 'বেদ' নামে এক প্রকার সুন্দর বৃক্ষ দেখা যায়; এই বৃক্ষের এক একটীকে এক এক কুঞ্জ বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই বেতসেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের এই বিচারনাগ গ্রামের কুণ্ডের তটভূমিও এক সময় সন্ধ্যাবন্দনাগত পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় বিচারের কলরবে মুখরিত ছিল, তাই এই কুণ্ডের নাম 'বিচারনাগ' অর্থাৎ 'বিচারকুণ্ড' হইয়াছে। এখন আর বিচারনাগের সেদিন নাই; আর সেখানে শাস্ত্ররসমুগ্ধ পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালাপ শুনিতে পাওয়া যায় না, এখন তাহার অবস্থা দেখিলে কালের সর্ব্বসংহারক কঠোর প্রভাবের কথাই মনে পড়ে।

কাশ্মীরের প্রচলিত জনশ্রুতি অবন্তিপুরের সান্নিধ্যেই কৈয়টের আবাস নির্দ্দেশ করিতেছে। 'বিচারনাগ' পণ্ডিত প্রধান স্থান ছিল, ইহা ব্যতীত কৈয়টের তথায় অবস্থিতি বিষয়ে আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শাস্ত্রী মহাশয় কি কারণে বিচারনাগকে কৈয়টের আবাসভূমি বলিয়া মনে করেন, তাহা তিনি আমাদিগকে তেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলেন নাই; তবে তিনি কোন প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থে কাশ্মীরের প্রাচীন কৃতীপুরুষগণের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, এবং তদনুসারেই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন, বলিয়া মনে পড়িতেছে। মহাভাষ্যের টীকা 'মহাভাষ্য প্রদীপ' ভিন্ন কৈয়ট-রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই "মহাভাষ্য প্রদীপ" পাণিনীয় ব্যাকরণের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পতঞ্জলি প্রণীত "ব্যাকরণ মহাভাষ্য" পাণিনীয় ব্যাকরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। অন্য কোন ভাষায় ব্যাকরণ সম্বন্ধে মহাভাষ্যের ন্যায় বিস্তৃত ও গম্ভীর-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থ, এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। কৈয়টের টীকা না থাকিলে এই মহাভাষ্য আধুনিক পণ্ডিতগণের বোধগম্য হইত না। কৈয়ট ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত মহাভাষ্য-টীকা অবলম্বন করিয়া, মহাভাষ্য-প্রদীপ রচনা করিয়াছিলেন. মহাভাষ্য-প্রদীপের উপক্রম পাঠে জানা যায়, কৈয়টের গুরুর নাম "মহেশ্বর" ছিল (২)। কৈয়টের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এই গ্রন্থে কেবল ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের বহু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া, অতি নিপুণতার সহিত বিবৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সমীচীন পাণ্ডিত্য লাভ না করিলে, কেহ প্রকৃত বৈয়াকরণ বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইতে পারেন না, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

---

(২) "গুরোর্ম্মহেশ্বরস্যাপি কৃত্বা চরণবন্দনম্।"

সর্ব্বপ্রথমে ভর্ত্তৃহরিই মহাভাষ্যের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত Bombay Sanskrit Series নামক গ্রন্থমালাতে মুদ্রিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ডাক্তার কীলহর্ণ লিখিয়াছেন, ভর্ত্তৃহরির এই টীকার খণ্ডিত প্রথম আহ্নিক মাত্র বার্লিন লাইব্রেরীতে আছে। তাহার প্রথম দুই পত্র নাই; ইহার নাম "মহাভাষ্যদীপিকা", ইহা কেবল "ভর্ত্তৃহরি টীকা" নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। এই টীকার বিলুপ্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কাশীর প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে একটী কিম্বদন্তী পূর্ব্বপরম্পরা হইতে চলিয়া আসিতেছে; আমরা আমাদের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সেই কিম্বদন্তী শুনিয়াছিলাম;—

ভর্ত্তৃহরি মহাভাষ্যের টীকা রচনা করিয়া সেই গ্রন্থের অন্তিম ভাগে মহাভাষ্যের ও নিজের প্রশংসাসূচক এই শ্লোকটী সংযোজিত করেন;—

"অহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো বয়মহো বয়ম্।
নামদৃষ্ট্বা গতঃ স্বর্গমকৃতার্থঃ পতঞ্জলিঃ॥"

ভাষ্য অতীব আশ্চর্য্য গ্রন্থ, আমরাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য পুরুষ। পতঞ্জলি আমাকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাই অকৃতার্থ হইয়াই স্বর্গে গিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরির এই সাহঙ্কার উক্তিতে তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহার অহঙ্কার-খণ্ডনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হন। তাঁহারা সকলে একযোগে ভর্ত্তৃহরিকে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহারা কিছুতেই ভর্ত্তৃহরির কোন গ্রন্থ পঠন-পাঠনে প্রচলিত করিবেন না। সেই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না; এই জন্য পঠন-পাঠন ভিন্ন গ্রন্থকে উজ্জীবিত রাখিবার অন্য উপায়ও ছিল না। পণ্ডিতমণ্ডলীর এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া ভর্ত্তৃহরি অত্যন্ত বিপন্ন হইলেন; তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; ইহাতেও পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার মহাভাষ্য-টীকা প্রচলিত করিতে স্বীকার করিলেন না, তবে তাঁহারা ভর্ত্তৃহরির অন্য গ্রন্থ "বাক্যপদীয়"র পাঠনা করিতে সম্মত হইলেন। অসামান্য প্রতিভার ফল হইলেও, এইরূপে ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে অসীম কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাভাষ্যের টীকা রচনায় কৈয়টোপাধ্যায় ভর্ত্তৃহরির টীকার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী গ্রন্থ অধিক-তথ্য-পরিপূর্ণ হয়, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী গ্রন্থে

পূর্ব্বপ্রচলিত সমস্ত কথাই থাকে; ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের নিজের প্রতিভা-প্রসূত অনেক নূতন তথ্য নবীন গ্রন্থে সংযোজিত হয়; এই জন্য প্রাচীন গ্রন্থ অপেক্ষা নবীন গ্রন্থ সমধিক আদরণীয় হইয়া থাকে। যে সময়ে সমস্ত পুস্তক হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত, সেই সময়ে অধিকতর তথ্যপূর্ণ কৈয়টের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া, কেহ আর ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থের অনুলিপি রাখিত না। এই জন্য কালক্রমে ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়ার ইহাই যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আমরা অনুমান করি। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কৈয়টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গৌরব অতীব অলৌকিক। কৈয়টের ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও কয়েকখানি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এক খানিও সম্পূর্ণ নহে। যেমন পাণিনি-ব্যাকরণের চর্চায় কাশ্মীরকগণ অনন্য-সাধারণ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ কলাপ ব্যাকরণের আলোচনাতেও তাঁহারা অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই কাশ্মীর দেশে কাতন্ত্রের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় কাশ্মীরে টীকা পঞ্জী কবিরাজ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল না। কাশ্মীরের কাতন্ত্র-সম্প্রদায় আমাদের বঙ্গদেশের কাতন্ত্র-সম্প্রদায় অপেক্ষা একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণও কলাপ ব্যাকরণ সম্বন্ধে অল্প গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কলাপ ব্যাকরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি কাশ্মীরে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল;—

১। কাতন্ত্র লঘুবৃত্তি—সূত্রকার শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য এই বৃত্তি প্রণয়ন করেন। "কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকম্"—দুর্গসিংহের এই উক্তি হইতে শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যকৃত একখানি ব্যাখ্যা ছিল, ইহা অনুমিত হয়।

২। কাতন্ত্র লঘুপঞ্জিকা
৩। কাতন্ত্র লঘুললিত বৃত্তি
} এই দুই খানি গ্রন্থের প্রণেতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ জানিতে পারা যায় নাই।

৪। কাতন্ত্রকৌমুদী—এই গ্রন্থের প্রণেতার নাম ভট্ট গোবর্দ্ধন কোকিল। ইনি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৫। বালবোধিনী—ইহাও একখানি কাতন্ত্র সূত্রের বৃত্তি। ইহার প্রণেতা জগদ্ধর ভট্ট অসাধারণ কবি ছিলেন। ইহার প্রণীত "স্তুতিকুসুমাঞ্জলি" নামক সুললিত স্তোত্র গ্রন্থ টীকার সহিত বোম্বাইতে "কাব্যমালা" গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

৬। বালবোধিনী ন্যাস—ইহা পূর্ব্বোক্ত "বালবোধিনী"র টীকা। ইহার লেখকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই।

৭। শিষ্যহিতা বৃত্তি—ইহাও সূত্র-বৃত্তি। ইহার প্রণেতা শিতিকণ্ঠ ভট্ট প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেকেন্দর নামক পাঠান বংশীয় কাশ্মীর নরপতির সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই নরপতি কাশ্মীর দেশের সমস্ত দেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া, "বুৎশীকেন" অর্থাৎ "আদর্শ ধ্বংসকারী" নামে কাশ্মীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি একটী মন্দির ধ্বংস করিবার সময় অনবধানতাবশতঃ তাহারই আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

৮। শিষ্যহিতা বৃত্তি ন্যাস—ইহা পূর্ব্বোক্ত শিষ্যহিতা বৃত্তির টীকা,—কমলাকর ভট্ট প্রণীত।

৯। কাতন্ত্রদুর্গবৃত্তি—দুর্গসিংহ প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ কাশ্মীর দেশে প্রচলিত বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত দুর্গসিংহের বৃত্তি হইতে অভিন্ন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, ইচ্ছা থাকিলেও আমরা এই "কাতন্ত্র দুর্গবৃত্তি"র পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১০। কাতন্ত্রদুর্গসিংহাটবী—ইহা "কাতন্ত্রদুর্গবৃত্তি"র টীকা; প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য্য বা মম্মট ভট্ট ইহার প্রণেতা। মম্মট ভট্ট কলাপ ব্যাকরণের টীকা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কাব্য-প্রকাশের কোন স্থলেই কলাপ ব্যাকরণের নাম করেন নাই, কিংবা কাব্যপ্রকাশে কলাপ ব্যাকরণের কোন সূত্রও উদ্ধৃত করেন নাই; তিনি একাধিক স্থলে পাণিনির সূত্র এবং বার্ত্তিকই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠকগণ দশম উল্লাসে উপমালঙ্কারের প্রকরণ দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মম্মট শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে কাশ্মীরে বিদ্যমান ছিলেন।

১১। কাতন্ত্রশব্দরূপাবলী—ইহার গ্রন্থকারের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে কাশ্মীরে কলাপ ব্যাকরণের পঠন-পাঠন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কলাপ ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি অধিকাংশই এখন কাশ্মীরে নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকই পুনার ডেকান কলেজের গ্রন্থসংগ্রাহকগণের হস্তে পতিত হইয়া, সেইখানে নীত হইয়াছে। কেবল

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কাশ্মীরে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাবল্য হইয়াছিল; সেই সময়ে মহাযান বৌদ্ধগণের বহু গ্রন্থ কাশ্মীরে রচিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থও কাশ্মীরের জ্ঞানালোচনার বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে বিদ্যমান আছে। "নীলপুরাণ" নামে কাশ্মীরে এক পুরাণ প্রচলিত আছে; কাশ্মীরমণ্ডলের অমরনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য সেই পুরাণে বর্ণিত আছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা যজুর্ব্বেদের কঠশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, কিছুদিন পূর্ব্বে এই কঠশাখা পাশ্চাত্য দেশে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কাশ্মীরকগণের শ্রৌতসূত্রও প্রচলিত শ্রৌত-সূত্রগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাশ্মীর দেশে জ্যোতিঃ শাস্ত্রেরও সবিশেষ আলোচনা ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, কাশ্মীরে সংস্কৃত বিদ্যার সকল শাখারই সবিশেষ অনুশীলন ও উন্নতি হইয়াছিল।

কাশ্মীরের ন্যায় প্রতিভা-প্রধান দেশের শাস্ত্রচর্চ্চার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কারণ, এইরূপ বিবরণ প্রদান করিতে হইলে যেরূপ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করা আবশ্যক, নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে ততখানি পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে হিমালয়ের অধিত্যকায় বসিয়া, আমাদেরই জাতীয় পরিবারের একটী বিশিষ্ট প্রতিভাশালী অঙ্গ, কতদূর বুদ্ধিচমৎকার প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গীয় পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কাজেই আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণের কৌতূহল মাত্র উদ্রিক্ত করিয়াই এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

আমাদের মনে হয়, বঙ্গীয়গণের প্রতিভা অপেক্ষা কাশ্মীরকগণের প্রতিভা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বঙ্গীয়গণের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশ্মীরকগণের সংশ্রব ছিল, ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে বর্ণিত ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনন্দ বিরচিত "কাদম্বরী কথাসারে"র উপক্রম পাঠে জানিতে পারা যায়, জয়ন্তভট্টের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশ হইতে কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। যিনি গ্রাম কামনা করেন, তিনি সাংগ্রহণী যাগ করিবেন— "সাংগ্রহণ্যা যজেত গ্রামকামঃ"—বেদে এইরূপ বিধি আছে। জয়ন্ত ভট্টের পিতামহ এই সাংগ্রহণী যাগ করিয়া কাশ্মীরে "গৌরমূলক" নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ন্যায়মঞ্জরী পাঠে জানা যায়।

প্রথম প্রবন্ধে বর্ণিত রাজা জয়াপীড়ের অন্য নাম জয়ন্তপীড় ছিল। কথিত আছে, এই জয়াপীড় বা জয়ন্তপীড় বঙ্গদেশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থানগড়ে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। এই মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত; এখনও পৌষ-নারায়ণী যোগ উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে ধর্ম্মলিপ্সু নরনারীগণ মহাস্থানগড়ে করতোয়ায় স্নান করিতে গমন করেন। মহাস্থানগড়ের দুই পার্শ্বে স্কন্দ ও গোবিন্দের দুইটী মন্দির ছিল। এই মহাস্থানগড়ে এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এক সময়ে ভীষণ নরঘাতক ব্যাঘ্রের উপদ্রবে নগরবাসিগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ব্যাঘ্র প্রত্যহ রাত্রিকালে নগরের মধ্যে আসিয়া অত্যন্ত অনিষ্ট করিত। একদিন প্রভাতে অকস্মাৎ নগরবাসিগণ দেখিতে পাইলেন, নগরের প্রধান চতুষ্পথে সেই ভীষণ নরঘাতক ব্যাঘ্র নিহত হইয়া পড়িয়া আছে; রাজপুরুষগণ ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেখানে একগাছি সুবর্ণবলয় প্রাপ্ত হইলেন। সেই বলয় রাজসভায় নীত হইলে দেখা গেল, তাহার উপর রাজা জয়ন্তপীড়ের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তৎকালে জয়ন্তপীড়ের নাম ও বিক্রম দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাস্থানগড়ের রাজা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত ও চকিত হইয়া গেলেন; তাঁহার মনে হইল, প্রবল পরাক্রমশালী রাজা জয়াপীড় গুপ্তভাবে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছেন এবং সুযোগ বুঝিলেই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া করতলগত করিবেন; রাজার আদেশানুসারে জয়াপীড়ের অনুসন্ধানের জন্য বিশিষ্ট গুপ্তচর সকল নিযুক্ত করা হইল; অবশেষে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, নগরমধ্যেই কমলানাম্নী নর্ত্তকীর গৃহে রাজা জয়াপীড় গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

ইহার পরে, মহাস্থানগড়ের অধিপতি রাজোচিত সম্মান ও সমারোহের সহিত জয়াপীড়কে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা প্রদান করেন। পরবর্ত্তীকালে কামরূপ আক্রমণ ও অধিকারের সময় মহারাজ জয়াপীড় শ্বশুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই প্রবাদটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতসম্রাট্ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

সমাপ্ত।

রাষ্ট্র-ভাষা।

ভারতের ভাব, ভাষা, শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ, উদ্দীপনা স্বতন্ত্র করিবার কঠোর সাধনায় আজ ভারতবাসী মন প্রাণ সঁপিতেছেন। দেশহিতৈষা বাঙ্গালা, বিহার, গুর্জ্জর, পঞ্জাবের প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিয়া এখন সমগ্র ভারতবর্ষের হিতের বাসনায় বদ্ধকাম। উহা আর বাঙ্গালী, মারাট্টির ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহে না—হিন্দুর হিন্দুয়ানী বাড়াইয়া, মুসলমানের ইমানকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিয়া তৃপ্ত হয় না। এখনকার দেশহিতৈষা চাহে সমগ্র ভারতকে এক সূত্রে বাঁধিতে, সমগ্র ভারতবাসীকে এক জাতীয়তার উদ্দীপক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিতে। তাই ভারতবাসীর এখন মূলমন্ত্র ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য, সে স্বাতন্ত্র্য কেবল ধর্ম্মে বা রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, সে স্বাতন্ত্র্যের আবশ্যক মানুষের সকল প্রকার শক্তির উন্মেষণার মূলে। বড় বড় উদার ইংরাজও তাহাই বলিতেছেন। স্বয়ং ইংলণ্ডের প্রধান সচীব লয়েড জর্জ্জ সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা প্রাপ্য আছে, প্রত্যেক মানুষ-সঙ্ঘের এক একটা আদর্শ আছে—এখন প্রত্যেক সভ্য জাতির কর্ত্তব্য যে যাহাতে প্রত্যেক জাতি সেই আদর্শকে আপনাদের সমাজে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, সে সাধু কার্য্যে সহায়তা করা। এই মন্ত্র সাধনের জন্যই তিনি মণ্টেগু সাহেবকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন, আর এই মন্ত্র সাধন করিবার জন্যই আমরা হোম-রুল চাহিতেছি, স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিতেছি।

এই স্বাতন্ত্র্য-নীতির প্ররোচনায় মহাপ্রাণ করমচাঁদ গান্ধী প্রভৃতি মনীষিগণ নিখিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের ভাব বিনিময়ের জন্য একটি সার্ব্বজনীন ভারতবর্ষীয় ভাষা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের ভাবের অভিব্যক্তি হউক, কিন্তু সমগ্র ভারতের আশা ও উদ্দীপনার ভাষা বিদেশী ইংরাজী না হইয়া হিন্দী ভাষা হউক—ইহাঁদের ইহাই শেষ বিচার ফল। কংগ্রেসের সময় কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, রাষ্ট্র-ভাষার উচ্চাসনে ইহারা হিন্দী ভাষাকেই বসাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

১৯০৯ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার একটী বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"ভাব দেখি একজন গুজরাটী আর একজন গুজরাটীকে ইংরাজিতে পত্র লিখিতেছে—

তুমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পার যে, সে ঐ ভাষা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিয়া শুদ্ধ ভাবে সে ভাষা লিখিতে পারে না। বাস্তবিক ইংরাজি বলিতে বা লিখিতে আমি যে সকল হাস্যাস্পদ ভুল করি, গুজরাটি লিখিতে আমি সে ভুল করিব না।" কিন্তু সেই পত্রে মহাত্মা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ হিতের পথ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব ও পশ্চিম সেই দিন মিশিতে পারে, যেদিন পশ্চিম সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতা বর্জ্জন করিতে পারিবে। আর এক উপায়েও তাহাদের মিলন, মনে হয়, সম্ভবপর হইবে, যেদিন প্রতীচ্য আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে মিলন—শস্ত্রীর সন্ধি হইবে মাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ গত পঞ্চাশ বৎসরে যাহা শিখিয়াছে তাহা না ভুলিলে আর ভারতবর্ষের মুক্তি নাই। রেল, টেলিগ্রাফ, হাঁসপাতাল, উকীল, ডাক্তার এই শ্রেণীর সমস্ত যাওয়া চাই। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোককে শিখিতে হইবে, জ্ঞানতঃ, ধর্ম্মতঃ এবং স্বেচ্ছায় চাষার জীবন যাপন করিতে—এই চাষার জীবনেই প্রকৃত সুখ ইহা জানিয়া।" সে সময় ইনি রাষ্ট্র-ভাষার কথা বলেন নাই। বোধ হয় হোমরূলের আন্দোলনের ফলে এই রাষ্ট্র-ভাষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাস্তবিক বাঙ্গালার সভায় বাঙ্গালী স্বদেশের অধিবাসীকে ইংরাজীতে সম্বোধন করেন বা বাঙ্গালী পুত্র পিতাকে ইংরাজিতে পত্র লেখে—এ দৃশ্য বড় মনোরম নয়। ভারতবাসীর সভাতেও একটা ভারতবর্ষের ভাষায় বক্তৃতা হইলে শুনায় ভাল, এ কথা অকাট্য। প্রাদেশিক ভাষার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে—অপর দেশের কথা বলিতে পারি না, বাঙ্গালা, মারাট্টি ও গুজরাটী যে সম্পূর্ণতা লাভ হইতেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাপ্রাণ গান্ধী যে ভাষাটিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিতে চাহেন, যত গোল সেই ভাষা লইয়া। যদি কোনও ভাষা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারে তাহা বাঙ্গালা, গুজরাটী, মারাঠী, টেলিগু, টামিল এমন কি ক্যানারিজ, মলয়ালম প্রভৃতি ভাষার একটী ভাষা, কারণ এ সকল ভাষা সম্পূর্ণ, সীমাবদ্ধ, ইহাদের এক একটা নির্দ্ধারিত রূপ আছে। কিন্তু যাহাকে আমরা হিন্দিভাষা বলি, সে ভাষা মোটে সসীম নয়। সে ভাষার দুইটা ধারা আছে, সে দুইটা ধারার একটী সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং অপরটির জীবন আরবী ও ফারসীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। হিন্দী ও উর্দ্দুকে লোকে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী ভাষা বলিয়া ভ্রম করে, কিন্তু এ দুটি প্রায় পৃথক ভাষা, দুইটির ব্যাকরণ, বাকধারা, লিপি প্রভৃতি প্রায়

স্বতন্ত্র। ভবিষ্যতে কি হইবে, বা অতীতকালে কি ছিল, তাহা জানি না। কিন্তু অধুনা হিন্দী ও উর্দ্দুর লিখিত ভাষায় যে বিষম প্রভেদ আছে, তাহা একখানি উর্দ্দু ও একখানি হিন্দী সংবাদ পত্র হাতে লইলেই বুঝিতে পারা যায়। যে প্রদেশের লোকের মাতৃ-ভাষা হিন্দী বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তাহাদের মাতৃ-ভাষা হিন্দু ও মুসলমান ভেদে বাস্তবিক দুই প্রকার—হিন্দী ও উর্দ্দু। "হিন্দী বঙ্গবাসী"র নিম্নলিখিত সংবাদটুকু পশ্চিমের "হিন্দী-বাদী" কয়জন শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুসলমান বুঝিতে পারিবেন—"স্থানীয়-শাসন-পদ্ধতিকে উপর এক সরকারী বোর্ড রহেগা। কিন্তু ইস্‌মে প্রাদেশিক মন্ত্রণা সভাকে কানুন দ্বারা স্পষ্টরূপমে কর্ম্ম করনেকী আবশ্যকতা হায়।"

আমি এ বিষয় চারুসাহিত্য হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ [illegible]তে চাহি না। আমার পুস্তকাগারে হাতের গোড়ায় দুইখানি একই বিষয়ের অতি সাধারণ পুস্তক রহিয়াছে—এক খানির নাম "রফিকে মুসাফেরাঁ" অবশ্য উর্দ্দু এবং অপর খানি "তীর্থাটন প্রদীপিকা"। উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। আমি আগ্রার বর্ণনা হইতে একই অর্থবাচক দুই একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব।

উর্দ্দু।	হিন্দী।
ইহ্ আজিমে আলিসন সহর ইত্যাদি।	ইহ্ বড়া আওর খুবসুরত সহর দরিয়ায়ে যমুনাকে দাহিনে কিনারে পর হৈ।

অবশ্য ভাল হিন্দী হইলে হইত 'বড়া আওর সুন্দর সহর'। আরও

সাহনসাহ আকবরনে আবাদ কিয়া আর সো সালসে ভি জিয়াদহ উস্কা আপনা জানসায়নান...কা পায়তখত রহা।	ইসকো আকবর বাদসাহ নে বসায়াথা আওর সো বরষ সে জিয়াদা তক্ মুগল বাদসাহোঁ কী রাজধানী রহী।

অবশ্য শুদ্ধ হিন্দী হইলে 'জয়াদা' শব্দের পরিবর্ত্তে অধিক' শব্দ ব্যবহার হইত। তাহার পর 'রফিক' বলিতেছেন—কদীমে সহর লোধী খানদানকে বাদসাহোঁ কা দার-উস্ সুলতানাত থা। আওর দরিয়া এ যমুনাকে বাঁয়ে ইয়া মশ্‌রকী কিনারাহ পর উস্ মকাম পর ওয়াকেহ থা যাঁহা অব্ জংসন ষ্টেসন হৈ।

প্রদীপিকায় এ কথা নাই, কিন্তু ইহার হিন্দী অনুবাদ হইবে—সহরকে সন্নিকটমে লোধী বংশীয় বাদসাহোঁকী রাজধানী রহী। আওর যমুনা নদীকে বাঁয়ে ইয়া পূর্ব্ব তীর পর উস্ স্থান বিদ্যমান থা অধুনা যাঁহা জংসন ষ্টেসন হৈ।

এই ত একই প্রদেশের হিন্দীর হিন্দু মুসলমানের ভাষার গোল। তাহার পর লক্ষ্ণৌর উর্দ্দু, দিল্লীর উর্দ্দু, প্রভৃতির পার্থক্য আছে। বরং বাঙ্গালা বা গুজরাটের হিন্দু মুসলমানের ভাষার কোন গোল নাই।

অষ্টম বর্ষের অর্চ্চনায় "হিন্দুস্থানী ভাষায় লিঙ্গ বিচার" নামক প্রবন্ধে আমি এ কথার আভাষ দিয়াছিলাম। তথায় বলিয়াছিলাম—"উর্দ্দূ হিন্দুস্থানী হিন্দী জমির উপর পারস্য-আরব্য-তুর্কী-সংস্কৃত প্রভৃতি কথার সমাবেশ। সুতরাং এ ভাষার অন্ত নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আরবী ও পারসী কথার বিভক্তি ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে হিন্দী ক্রিয়া পদ যোগ করিয়া দিলেই উর্দ্দূ হইয়া যায়।

খুলা দরোবাজা আজ বস মেরি দিল পর আওর আলম কা
না ইন্দেসাহ মুঝে সাদী কা না ফিকর হায় ঘমকা।

উপরোক্ত শ্লোকে 'মেরি' 'পর' 'আওর' 'কা' 'না' 'হায়' প্রভৃতি দুই চারিটি হিন্দী পদ ব্যতীত সকলগুলিই পারসী ও আরবী শব্দ। গত জুলাই মাসের "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামদাস গৌড় মহাশয় "হিন্দী পত্থ কী ভাষা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা হায়। ইহ্ কেবল উন্হী লোগোঁ কী ভাষা নহী হায় জো ইসে মাতৃভাষা কহনে কা গৌরব রাখতে হায়। পশ্চিমী পঞ্জাব, পশ্চিমী বংগাল, সিন্দ কা পূর্ব্বীয় ভাগ, উড়ীসে কা পশ্চিমী ভাগ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র তক্ কে লোগ হমারী হিন্দী কো থোড়া বহুৎ সমঝ লেতে হৈঁ আওর ব্যাপার ব্যবহার মে সারে ভারতবর্ষ মে বল্কি ইরাক কন্ধার আদি পশ্চিমী উপনিবেশ আওর অণ্ডমান নীকোবার ফীজি আফ্রিকা আদি অন্য উপনিবেশোঁ মে ভী জহাঁ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় রহতে হৈঁ ইসী হিন্দী ভাষা কা প্রয়োগ করতে হৈঁ। ইন্ সব রাষ্ট্র ভাষা ভক্তোঁ কো ভী কবিতা কা রসাস্বাদন করানা হামারা পরম কর্ত্তব্য হায়।" সাধু! পণ্ডিতজী! সাধু! কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার নিজের নগর মুরাদাবাদের সংস্কৃতানভিজ্ঞ মুসলমান অধিবাসীরা তাঁহারই ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত, নিম্নলিখিত কবিতাটির রসাস্বাদনে' সমর্থ হইয়াছেন কি?

রত্ন।

আও রত্ন। ইহা পর আও।
দেব-মূর্ত্তি য়া দেবালয় মে জা সার্থক হো জাও
স্বর্ণ-খচিত-নৃপ-মঞ্জু মুকুট পর য়া নিজ প্রভা দেখাও।
আও রত্ন। ইহা পর আও।
অথবা রুচির রাজ মহিষী কা কণ্ঠহার বন যাও,
য়া জা কিসী ধনীকে গৃহ মে উসে কৃতার্থ বনাও।" ইত্যাদি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথ জোশী মহাশয় এই কবিতাটীর দ্বারা "পরম কর্ত্তব্য" সাধন করিয়াছেন কি ?

যদি নিখিল ভারতের অধিবাসী কেবল দেশহিতৈষায় প্রবুদ্ধ হইয়া এক বৃহৎ জাতির সৃষ্টি করিবে—সে আদর্শের মন্দিরে আপনার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অতীত ইতিহাস সমস্ত বলি দিবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের একটী প্রাদেশিক ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সকলের প্রাণের ভাব প্রকাশ করিবার একটী চল্‌তি ভাষার সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু যে নীতির উপর নির্ভর করিয়া আমরা হোমরূলের দাবী করিতেছি, সেই নীতিই শিক্ষা দিতেছে যে, যেটুকু দেশী, যেটুকু এক সম্প্রদায়ের অস্থি, মজ্জা, শ্বাস, প্রশ্বাসের সহিত ওতঃ-প্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট, সেটুকুর গলা টিপিও না, উন্মত্তের মত সেই টুকুকে নির্ব্বাসন করিয়া, বিদেশী কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করিও না। যাহা সরল, যাহা সহজ, যাহা প্রাণের মাঝে গুঞ্জরিতেছে, কান পাতিয়া সেই অব্যক্তটুকুকে ধরিয়া তাহাকে ব্যক্ত কর। নীতি ঠিক ইহা হইলে কি সকল বিষয়ে আমরা মিলিয়া যাইতে পারি ? নিখিল ভারতের সেই অব্যক্ত আশা ও আদর্শ কি এক ?

আমরা যখন ভারতবর্ষে এক-জাতি গঠন করিবার কথা বলি, তখন আমরা এইটুকু মাত্র বলি যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের সকলের স্বার্থ এক, আর সেই মিলিত স্বার্থকে প্রবল ও বিস্তীর্ণ করিবার জন্য আমাদের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যাহা কু যাহার প্রতিষ্ঠা ঈর্ষা, দ্বেষ, অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির উপর, সেটুকুকে কাল-কীটের মত বর্জ্জন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই ছোট স্বার্থের বলি, দেশ-মাতৃকার পূজার প্রথম উপচার। পরে আরও বড় বলির আবশ্যক। মনের মধ্যে মধুর ভ্রাতৃভাব লইয়া জননীর আরতি করিতে হইবে। প্রেমের সুরে গলা মিলাইয়া মাতৃ-সঙ্গীত গাহিতে হইবে। কেবল সমগ্র ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র ইংরাজ সাম্রাজ্যের অনেক স্বার্থ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত। যতদূর অবধি স্বার্থ এক, ততদূর অবধি সাম্রাজ্যের সকল অঙ্গ এক। যেখানে স্বার্থ কেবল সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে আবদ্ধ, সেখানে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার সৃষ্টি হইবে। সেইরূপ প্রত্যেক প্রজা-সঙ্ঘ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আপনাদের রাষ্ট্র-শাসন করুক, যে পর্য্যন্ত না তাহাদের শাসনকার্য্য উচ্চ জাতীয়তার আদর্শের পরিপন্থী হয়। নীতি এই, ইহার ফলে আমরা দাবী করিতেছি যে, সমগ্র ব্রীটিস সাম্রাজ্য এক, জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সের সহিত সন্ধি বিগ্রহের সময় আমরা বড় জাতি। তাহার পর

আমরা ভারতবাসী। ক্যানাডা, আয়ারলণ্ড বা অষ্ট্রেলিয়ার স্বার্থ আমাদের স্বার্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং সেই সকল স্বার্থের জন্য আমাদের পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ সেই ব্যবস্থায় যেন আমরা তাহাদের স্বার্থের হানি না করি বা তাহাদের স্বায়ত্ব-শাসন আমাদের স্বার্থের পক্ষে হানিকর না হয়। আবার আর এক স্তর নামিয়া বাঙ্গালার স্বার্থ।

কেবল এই বাঙ্গালার স্বার্থসিদ্ধির কথার আলোচনা করিলেই আমরা দেখিব সমস্যাটা কত জটিল। আমরা ভাষার কথা বলিতে বসিয়া কেন এত কথা বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, ভাষা ভাবের ব্যঞ্জক এবং সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ভাবের পরিপোষক।

কেহ চাহেন না যে ইংরাজের সহিত আমাদের সম্পর্ক উঠিয়া যাক্। কেহ চাহেন না যে, ব্রীটিস সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হউক। এ সকল সম্পর্ক রাখিতে হইলে ভারতবর্ষে ইংরাজি ভাষার প্রচলন থাকিবে। প্রত্যেক ভারতবাসীকে আপন আপন মাতৃভাষা শিখিতেই হইবে এবং মাতৃভাষার কুশল কামনা করিতে হইবে। কিন্তু মাতৃভাষাও ইংরাজির উপর আর একটী রাষ্ট্র-ভাষার চাপ পড়িলে ভারতবাসীর কি স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে? সে ভাষা ইংরাজের দপ্তরে কিছুতেই চলিবে না, কারণ ইংরাজের সম্পর্ক আমরা ত্যাগ করিতে চাহি না। তাহার পর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীর পক্ষে ইংরাজি শিক্ষা করা অপেক্ষা বাঙ্গালা, গুজরাটি, মারাঠী বা তথাকথিত হিন্দী ভাষা শিক্ষা করা মোটেই সহজসাধ্য হইবে না। বাঙ্গালী সহজে গুজরাটি আয়ত্ত করিতে পারে, বা গুজরাটি বাঙ্গালা শিখিতে পারে, কারণ উভয় ভাষার শত-করা ৭০টি কথা এক। কিন্তু তেলেগু, তামিল. ক্যানারিজ, মলয়ালম প্রভৃতি দ্রাবীড়িয় ভাষার সহিত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষাগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। এ ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর বা লোকমান্য তিলকের আদর্শ যত উচ্চ হউক, তাহার সাধনা তত সহজ নহে। আর তাঁহাদের নির্ব্বাচিত হিন্দী ভাষা কোনও প্রকারে রাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারে না।

সংস্কৃতমূলক হিন্দী ভাষা ছাড়িয়া ফারসী আরবীমূলক উর্দ্দূ ভাষা হিন্দু জনসাধারণ শিখিবে না, বা শিখিতে পারে না। কারণ হিন্দুর বা জৈনের স্বধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সংস্কৃত শিখিতেই হইবে। আর ইমান বজায় রাখিতে হইলে মুসলমানকে আরবী শিখিতেই হইবে। ফার্সী না শিখিলেও চলে, কিন্তু আরবী ভাষা শিক্ষা করা ভারতবাসী মুসলমানের পক্ষে

আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কাজেই সে উপরন্তু সংস্কৃত পড়িবে না, এবং সংস্কৃত বহুল হিন্দীতে তাহার মন মজিবে না।

বন্ধুবর পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা সম্পাদিত "প্রতিভা" পত্রিকা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দী ও উর্দ্দূ এক। পণ্ডিতজী ও লেখক মহাশয়কে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, খুব সাধারণ ভাব প্রকাশ্য করিতে উভয় ভাষাকে এক বলা যাইতে পারে মাত্র। কিন্তু যেখানে উচ্চ ভাবের আবশ্যক, যেখানে ভাষার ঝঙ্কার না দিলে ভাবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় না, সেখানেই পণ্ডিতজীরা সংস্কৃত ভাষা চালাইয়া থাকেন এবং মৌলভী সাহেবেরা ফার্সীর ফোয়ারা ছুটাইতে পশ্চাদপদ হন না। মহামতি হাসান ইমাম সাহেবও সে দিন বাঁকীপুরে বলিয়াছেন যে, হিন্দী ও উর্দ্দূ এক। কিন্তু আমি এক দিন তাঁহার ভ্রাতা সার আলি ইমামের বাড়িতে বেহারাকে বলিয়াছিলাম—"জল্ লাও।" সার আলি ইমাম বলিয়াছিলেন—'কেশব, জল্ মানে পানি• না? আমাদের বেহারের পাড়াগাঁয়ে হিন্দুদের এ কথাটা বলিতে শুনিয়াছি।" মিঃ ইউসুফ আলি জজ সাহেব সেখানে ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার জজ—বাঙ্গালা ভাষা জানেন। তিনি বলেন—"বাঙ্গালীরা জল্ শব্দই ব্যবহার করে, কথাটা সংস্কৃত, তাই আমাদের দেশের হিন্দুরাও ও শব্দ ব্যবহার করেন।" অবশ্য যাঁহারা উভয় ভাষাকে এক বলেন, তাঁহাদের দেশহিতৈষার প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহারা দেশের অবস্থা ঠিক জানেন, এ কথা বলিতে পারি না।

তাই আমার বিশ্বাস যে, নিখিল ভারতের একটী ভাষাকে হিমালয় হইতে কুমারিকা অবধি রাষ্ট্র ভাষারূপে চালাইতে পারা সহজসাধ্য হইবে না। আর সে উচ্চাসন হিন্দী বা উর্দ্দূ পাইতে পারে না।

কয়েদীর পত্র।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল।]

পুলিস কর্ত্তৃক যখন ধৃত হই, আমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই। বিচারের সময়ও সত্য ঘটনা পুনর্ব্বার যথাযথ বর্ণনা করিয়াছিলাম, একটি কথাও অতিরঞ্জিত করিয়া বলি নাই, কিন্তু তাহার ফলে কি হইল? "আসামীর একটি

কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহার জবাব সমর্থন করিতে সে কিছুই প্রমাণ দিতে পারে নাই; আসামী সম্পূর্ণ দোষী" বলিয়া বিচারক মহাশয় আমার দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম দিলেন। তথাপি আমি স্বচক্ষে জমিদার হরিহর বাবুকে হত্যা করিতে দেখিয়াছি, অথচ বিচারক বা জুরিদিগের মতনই এ ব্যাপারে আমি সমান নির্দ্দোষ!

মহাশয়, শুনিয়াছি আপনার উপরই কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইয়াছে। আপনিই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা। আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আপনি অধীনের এই আবেদন পত্রখানি পড়িয়া হতভাগ্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া গোপনে জমিদার গৃহিণীর চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন, নিজের সময়ে বা সামর্থ্যে না কুলাইলে বিচক্ষণ গোয়েন্দাও নিযুক্ত করিতে পারেন। তাহা হইলেই আপনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। একবার ভেবে দেখুন, তখন সকলেই শতমুখে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিবে যে, আপনি কৃপাপরবশ হইয়া এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ-সহকারে রীতিমত তদন্ত না করিলে, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর কি এক ভয়ানক অবিচার সংঘটিত হইয়া যাইতেছিল। তাহাই আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার হইবে, কারণ আমি বড়ই দরিদ্র, আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দিবার আমার সামর্থ্য নাই। কিন্তু আপনি যদি এ আবেদন অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে যেন আর এক রাত্রিও আপনার সুখনিদ্রা না হয়! আপনারই কর্ত্তব্যের অবহেলা বশতঃ একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তি জেলে পচিয়া মরিতেছে, এই চিন্তাই যেন দিনরাত ভূতের ন্যায় আপনার ঘাড়ে চাপিয়া থাকে! একটু তদন্ত করিলেই আপনি আসল কথা সব জানিতে পারিবেন। আরও একটা কথা স্মরণ রাখিবেন, এই হত্যা কার্য্যের দ্বারা যদি কেহ উপকৃত হইয়া থাকে, তবে সে জমীদার-গৃহিণী ভিন্ন আর কেহ নহে, কারণ এই ঘটনাই তাহাকে এক অসুখী স্ত্রী হইতে ধনী যুবতী বিধবার অবস্থায় পরিণত করিয়াছে। আপনাকে এই খেই ধরাইয়া দিলাম, আপনি ইহা ধরিয়া অগ্রসর হইলেই ঠিক স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন।

দেখুন, চৌর্য্য অপরাধের বিরুদ্ধে আমি কোনও অভিযোগ করিতেছি না। সে বিষয়ে আমি যথার্থই অপরাধী; এই তিন বৎসর কারাগারে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহাই বোধ হয় সে-শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু

হত্যাকাণ্ডের কথা, যে অভিযোগে আমার দশ বৎসর কারাশ্রমের আদেশ হইয়াছে,—অন্য কোন বিচারক হইলে নিশ্চয়ই ফাঁসির হুকুম দিতেন,—সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এ কথা জোর করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি। এবার ১৩১০ সালের ১৪ই শ্রাবণ রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যথাযথভাবেই আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহার যদি একটি বর্ণও মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারেও যেন আমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

আমি জাতিতে সূত্রধর। নিজেদের দেশে জাত ব্যবসা চালাইবার তেমন সুবিধা না হওয়ায় আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। কিন্তু এখানে আসিয়াও জীবিকা-উপার্জ্জন করা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। নিয়মিত আহার না জুটায় আমি অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিতে লাগিলাম। "চুরি বিদ্যে-বড় বিদ্যে যদি না পড় ধরা!" দিনকতক আমিও লোকের চোখে ধূলি দিয়া বেশ নিরাপদে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধরা না পড়ায় আমার সাহস ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ঘটি বাটি চুরি হইতেই আরম্ভ করিয়া লোকের সিন্দুক বাক্স অবধি ভাঙ্গিতে বিন্দুমাত্র ভয় পাইতাম না। কোনও রকমে জীবনের দিনগুলো এই ভাবেই কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন বাদামী দীঘীতে বসিয়া আছি. পাশেই দুইজন লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল। একজনের বুকপকেটে একটা ঘড়ি ছিল। সেইটার উপরই আমার নজর, সুযোগ পাইলেই হস্তগত করিবার চেষ্টা। কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। আমি এক বড় শিকারের সন্ধান পাইলাম। একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল,—'ঐ যে রাস্তার মোড়ে বড় বাড়িটা, সুমুখে বাগান, ঐ বাড়িতেই জমিদার হরিহর বাবু থাকেন?"

"হাঁ, ঐ বাড়ীতেই, খুব বড় বড় থাম। অগাধ ধনসম্পত্তি, কিন্তু লোকটা গোড়া থেকেই বড় কৃপণ।"

"টাকা যদি খরচই না করলাম ত কেবল জমিয়ে আর লাভ কি?"

"এই টাকার জোরেই ইনি এক খুব সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেছেন। পঁয়-ত্রিশ বৎসর বয়সে এঁর প্রথম স্ত্রী মারা যায়। তার পর দশ বছর আর বে-থা কিছু করেন নি। হরিহর বাবুর ছেলে পিলে কেউ নেই। একবার অসুস্থ হয়ে বিদেশে হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে যান, সেখান থেকে ফিরবার সময় এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে করে আনেন, উনি বলেন, বিদেশেই এই

রমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু পাড়ার লোকেরা সে কথায় বিশ্বাস না ক'রে নানা গুজব রটিয়ে বেড়ায়। কেউ বলে মেয়েটা নটী, কেউ বলে বাইজি। যাহোক, ঐ বাড়ীতে যে ঝি ছিল, সে এখন আমাদের বাড়ীতে কাজ করছে। তা'র মুখেই আমার সব শুনা। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হলে ব্যাপার যেমন দাঁড়ায়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জমিদার বাবু স্ত্রীকে কোথাও যেতে দেন না, দিন রাত নজরবন্দী করে রাখেন। তার উপর লোকটা মহা কৃপণ, শুনি, দেরাজ সিন্দুক সব মোহর গিনিতে ভরা, কিন্তু এক পয়সা খরচ করতে প্রাণ ফেটে যায়। মেয়েটার বাপ মা বোধ হয় অর্থের লোভেই তাকে এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, বিয়ে যদি যথার্থ ই হয়ে থাকে। কিন্তু সে আশায় তার ছাই পড়েছে, মেয়েটার কষ্টের সীমা নেই। স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়া হয়। হরিহরবাবু দিনরাতই তাকে তিরস্কার করছেন, মধ্যে মধ্যে দু'এক ঘা প্রহারও করে থাকেন। ঝি ত বলে, মেয়েটারও স্বভাব চরিত্র ভাল নয়।"

আমি আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা করিলাম না। যাহা সংবাদ পাইয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহের কথা শুনিয়া আমার আর কি লাভ হইবে? সামান্য ঘড়ি চুরির কথা ভুলিয়া গিয়া মনে মনে উচ্চ আশা পোষণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আজ অদৃষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে হইল। আমি একেবারে জমিদার বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাড়ীখানি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিলাম, দেখিলাম এখানে চুরির বিশেষ সুবিধা। আমি সন্ধ্যার সময় চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার ঘরে ফিরিলাম। বিছানায় শুইয়া অনেক ভাবিলাম। প্রথম প্রথম একটু ভয়ও হইল, এত বড় অসমসাহসিক কাজ করিতে গিয়া যদি ধরা পড়ি! তাহার অপেক্ষা এ তো এক রকম দিন বেশ চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সুযোগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তির সম্মুখে আহার উপস্থিত, সে কেমন করিয়া তাহার লোভ সম্বরণ করে? তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র পাইলে কোন্ নির্ব্বোধ তাহা স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিবে না? আমি ত প্রথম সৎপথে থাকিয়াই জীবিকা-উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কত লোকের নিকট কাজের জন্য কত উমেদারি করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ত এ দীনের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করে নাই! তবেই ত পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া এ পথ অবলম্বন করিয়াছি। যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহাতে উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। আমি তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। মনস্থ করিলাম, আজ

রাতারাতি বড় লোক হইব, নয় জেলে পচিয়া মরিব। দুয়ের একটা,—এ কষ্ট আর সহ্য হয় না! হায়, তখন যদি আমার এ দুর্ম্মতি না ঘটিত!

মধ্য রাত্রে গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। সে সময় পথে লোকজন বড় চলাচল করিতেছিল না। আমি সোজা জমিদার বাবুর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাগানের লৌহ দরজা ভেজান ছিল, আমি তাহা খুলিয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে সব নিস্তব্ধ। এ রকম ভাবে দরজা খোলা রাখিয়া সকলে ঘুমাইতেছে দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। ইহাদের কি চোরের ভয় আদৌ নাই? চন্দ্রের কিরণে স্থানটি আমি বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া লইলাম। বাগানটা পার হইয়া আমি অট্টালিকার সম্মুখীন হইলাম। অদূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কোন্ ঘর দিয়া প্রবেশ করিলে সুবিধা হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে শেষ দিকের কোণের ঘরই স্থির করিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইলাম। জানালার নিকট আসিতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, ও তাহার শিকল ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিল। আমি ভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে কুকুরটা চুপ করিলে আমি অতি সাবধানে ধীর পদবিক্ষেপে সেই জানালার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, জানালা ভিতর হইতে বন্ধ। সঙ্গেই ছোরা ছিল। তাহা দিয়া জানালা খুলিয়া ঘরের ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম।

"এস, এস, তোমার জন্যেই নীচে নেমে এলাম।"

আকস্মিক বিস্ময়ে জীবনে অনেকবার চমকিয়া উঠিয়াছি, কিন্তু এরূপ অভিভূত কখনও হই নাই। ঘরের ভিতর অদূরেই এক সুন্দরী যুবতী হাতে বাতি লইয়া ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বুঝিলাম, ঘরে ঢুকিতেই ইনিই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যুবতী তন্বী ও ঋজু, তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল মর্ম্মরপ্রস্তর খোদিত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর্দ্বয় জ্বল জ্বল করিতেছে, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম আলুলায়িত। পরিধানে একখানি নীলবর্ণের সাড়ী, মনে হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমার সম্মুখেই স্বর্গের অপ্সরী দাঁড়াইয়া। আমি একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। অতি কষ্টে জানালায় ভর দিয়া নিজেকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করিলাম। আমার সামর্থ্য থাকিলে আমি তখনই সেখান হইতে পলাইয়া যাইতাম, কিন্তু হায়, আমার দেহের সমস্ত শক্তি কে যেন হরণ করিয়া

লইয়াছিল। আমি সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। যুবতীর কথায় আমার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, "ভয় কি? তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলে, আমি শোবার ঘরের জানালা থেকে তোমাকে দেখতে পাই। আমি চুপি চুপি নীচে নেমে এলাম, তুমি আর একটু অপেক্ষা করলে, আমি নিজেই স্বহস্তে জানলা খুলে দিতাম, আমি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তুমিও জানালা ভেঙ্গে ভেতরে লাফিয়ে পড়েছ।"

আমার হাতে তখনও সেই উন্মুক্ত ছোরা রহিয়াছে। বাড়ীর গৃহিণীকে চোরের সঙ্গে এরূপ ভাবে কথা কহিতে শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অতি অল্প পুরুষ মানুষই এত গভীর রাত্রে আমার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত! কিন্তু এ রমনী এরূপ নির্ভয়ে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, যেন আমি তাহার অতি নিকট আত্মীয়। তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিলেন।

আমি ছোরাটা তাঁহার চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলাম, "আপনার কথা ত আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে, এর ফল বড় বিষময় হবে।"

"আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করছি মনে করো না। বন্ধু ভাবেই আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।"

"কিন্তু আমার ত তা বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি আমাকে কেন সাহায্য করতে চান?"

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে শুনবে কেন তোমাকে সাহায্য করতে চাই? কারণ আমি তাকে ঘৃণা করি, বড় ঘৃণা করি। এবার কারণ বুঝতে পারলে?"

তখন দীঘীতে সেই অপরিচিত লোকদের কথোপকথন আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি রমণীর মুখপানে চাহিয়া বুঝিলাম, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। তিনি স্বামীর উপর প্রতিহিংসা লইতে চাহেন। তাই সংসারে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু যাহা, সেই ধনরত্ন, তাহা হইতে স্বামীকে বঞ্চিত করিয়া পরে তাহার দুরবস্থায় আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্যই তিনি চোরকে সাদরে গৃহে আহ্বান করিতেছেন! আমার দ্বারা যদি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়!

জীবনে অনেক লোককে ঘৃণা করিয়াছি, কিন্তু ঘৃণা জিনিষটা যে এত ভয়ঙ্কর হইতে পারে, তাহা এই প্রথম আলোতে জমিদার-গৃহিণীর মুখে লক্ষ্য করিলাম।

"তা'হ'লে এখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কে ?"

"আপনি যে বাড়ীর গিন্নী, তা আমি আগেই টের পেয়েছিলাম।"

"এ অঞ্চলের সকলেই আমার দুঃখের কাহিনী জানে। কিন্তু তা'র তা'তে ভ্রূক্ষেপই নেই। পৃথিবীতে কেবল একটা জিনিষেরই সে আদর করে, সেই জিনিষটাই তুমি আজ নিতে এসেছ। জানালাগুলো সব বন্ধ করে দাও, বাইরে থেকে কেউ ঘরের ভেতর আলো দেখতে পাবে। চাকরবাকরেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে এস। যে সিন্দুকে মহামূল্য অলঙ্কারাদি আছে তোমাকে দেখিয়ে দেব। তুমি সব ত আর নিয়ে যেতে পারবে না, বেছে বেছে দামী দামী জিনিষগুলো নেবে এখন।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত, ঠিক করিতে পারিলাম না। বাড়ীর গৃহিণী স্বয়ং আমাকে বাড়ী লুঠ করিতে সাহায্য করিতেছেন, এ যেন স্বপ্ন বলিয়াই আমার মনে হইতে লাগিল। এই কথা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে আমার খুব হাসিও পাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিতেই আমি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলাম। আমি তাঁহার অনুসরণ করিয়া এক ঘরের ভিতর ঢুকিলাম। তিনি এক লোহার সিন্দুকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "ইহার ভিতরই সব আছে। কিন্তু চাবি আমার কাছে নেই।"

"তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি খুলছি।" এই বলিয়া ছোরা দিয়া তালা কাটিয়া সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলাম। তিনি তখন আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, একটু থাম। দেখ, গয়না আর জিনিষ পত্র নিলে পরে ধরা পড়তে পার। তার চেয়ে গিনি মোহর নেওয়াই ভাল।"

"সেই কথাই ভাল। আপনি আমাকে যে এত সাহায্য করছেন, তার জন্যে আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। চলুন, সেই ঘরেই যাই।"

"এর ঠিক ওপরের ঘরেই সে থাকে। তার বিছানার নীচে এক ক্যাসবাক্স আছে, সেটা গিনি মোহরে ভর্ত্তি।"

"কিন্তু সে বাক্স নিতে গেলে তিনি ত জেগে উঠতে পারেন ?"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"জেগে উঠলেই বা ক্ষতি কি ? তার মুখ চেপে ধরে রাখতে পারবে না ?"

"না, মা, সে সব কিছু করতে পারবো না।"

"তবে যা ভাল বুঝ, তাই কর। তোমার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল, তুমি বড় সাহসী, কিন্তু দেখছি, তা নও। যদি একটা বুড়ো লোককে দেখে ভয় পাও, তাহ'লে মোহর গিনি তোমার বরাতে নেই। নিজের ভাল যাতে হবে তাই কর। কিন্তু যদি আমার বুদ্ধি শোন, তাহ'লে মোহর গিনি নেওয়াই নিরাপদ।"

জমিদার-গৃহিণী আমাকে ভীরু বিশেষণে বিভূষিত করিয়া ও অর্থের লোভ দেখাইয়া উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইল অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, তাঁহার কথামতই কাজ করি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চক্ষে প্রতিহিংসার একটা জ্বলন্ত ছবি প্রতিফলিত রহিয়াছে দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ ভয় ও সন্দেহের সঞ্চার হইল। তবে কি উঁহার মনে অন্য কোন গুরুতর অভিসন্ধি আছে? আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন? আমি ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলাম, "না, উপরে আর যাবো না। তাঁকে বিরক্ত করতে আর ইচ্ছা হচ্ছে না। দু'চার খানা গহনা পেলেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাব।"

রমণী ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু বোধ হয় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন ভাবিয়া, অনেকটা সংযত হইয়া শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—"বেশ, বেশ, তাই ভাল। দামী দামী দু'চার খানা গয়না বেছে নাও। সিন্দুকটা খোল দেখি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি সিন্দুক খুলিতেই তিনি গহনা বাছিতে লাগিলেন। এমন সময় অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া বলিলেন, "চুপ্, চুপ্, কে আসছে বোধ হয়!" আমি তাড়াতাড়ি সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া দিলাম। পদশব্দ ক্রমেই স্পষ্ট ও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমাকে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কর্ত্তা আসছেন! ভয় নেই, এই আলমারিটার পিছনে লুকিয়ে পড়। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।"

তিনি আমাকে আলমারির পিছনে ঠেলিয়া দিলেন। তার পর হাতে আলো লইয়া তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি আলমারির পিছন হইতে তাঁহার গতিবিধি সবই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দরজার নিকট গিয়া তিনি আগন্তুকের উদ্দেশে বলিলেন,—"কে গা? বাবু নাকি?"

জমিদারবাবু ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাটের উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

তাঁহার হাতে এক হ্যারিকেন আলো। তিনি স্ত্রীর দিকে সন্দিগ্ধ ও ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এত রাত্রে তুমি এ ঘরে কেন? কি হচ্ছে এখানে? চোখে ঘুম নেই যে!"

রমণী গভীর অবসাদের সহিত উত্তর করিলেন,—"ঘুম যে পোড়া চোখে আসে না!"

তাঁহাদের দুই জনের কথাবার্ত্তার ও মুখের ভাব দেখিয়া উভয়ের মধ্যে কতটা প্রীতি ও অনুরাগ বর্ত্তমান, তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

জমিদারবাবু বিদ্রূপ সহকারে উত্তর করিলেন,—"ঘুম আর হবে কোথা থেকে? যার মনে পাপ আছে, তার চোখে কি আর ঘুম আসে!"

"তা যদি সত্যি হতো, তাহ'লে তুমি রোজ রাতে অমন নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারতে না।"

রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জমিদারবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন. "জীবনে কেবল একটা অন্যায় কাজ করেছি, তা আর বোধ হয় তোমাকে খুলে বলতে হবে না। তারই শাস্তি আজ আমাকে ভুগতে হচ্ছে।"

"শাস্তি আমাকেও ভুগতে হচ্ছে, সেটাও মনে করে দেখ."

"তোমার দুঃখ করবার কোনও কারণই নেই। তোমার ত অবস্থার উন্নতিই হয়েছে, যত ক্ষতি আমারই ভাগ্যে।"

"আমার ভাল হয়েছে!"

"কুঁড়ে ঘর থেকে এ বাড়ীতে ঢুকতে পেয়েছ, ভাল হয় নি? আমি নির্ব্বোধ, তাই ঘুঁটেকুড়ুনিকে রাজরাণীর আসনে বসিয়েছিলাম।"

"তাই যদি মনে কর, তবে আমাকে ত্যাগ কর না কেন? সব গোল চুকে যাবে।"

"পারলে তোমাকে আর বলতে হ'ত না। এ কষ্ট বরং সহ্য হচ্ছে, কিন্তু তখন আর লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। নিজের দোষে নিজেই শাস্তি ভোগ করছি, সেটাকে আর সকলের নিকট স্বীকার করে কৃপা ও উপহাসের পাত্র হ'তে ইচ্ছা করি না। তা ছাড়াও তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখতে চাই। আমি ত্যাগ করলেই তুমি যে তার কাছে ফিরে যাবে, সেটি হ'তে দেব না।"

"মানুষ হ'লে কি আর আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারতে? তোমার মন পাষাণে গঠিত!"

"হাঁগো, হাঁ, তোমার মনের অভিলাষ আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তা পূরণ হবে না, বেশ জেন। ভাবছো, বুড়ো পটল তুল্লে আমার সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে শিশিরের সঙ্গে খুব স্ফূর্ত্তি চালাবে, তা হবে না, যাদু, আধ পয়সাও তোমাকে দিয়ে যাবো না। যেমন টেনা পরে এসেছিলে, তেমনি ভাবেই ফিরে যেতে হবে। তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছিলে?"

"কি আবার করবো? আমার মাথা আর মুণ্ডু!"

জমিদারবাবু স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীও তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার ছোরাটা গহনার সিন্দুকের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে! জমিদারবাবু এখনই ত উহা দেখিতে পাইবেন! আশু ধরা পড়িবার ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু জমিদারবাবু উহা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই, গৃহিণী তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার অলক্ষিতে বাম হস্তে ছোরাটা তুলিয়া লইয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া ফেলিলেন। আমি আরামের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

এবার যাহা বলিব, তাহা সম্পূর্ণ চোখে দেখিয়াছি বলিলে ঠিক বলা হইবে না, উহা এক প্রকার আমার শুনাই। কিন্তু আপনার কাছে শপথ করিয়াই বলিতেছি যে, সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। চোর হইলেও একদিন যে সেই সর্ব্বজ্ঞ পরম বিচারকের সম্মুখীন হইয়া আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে, তাহা আমি এখনও ভুলি নাই।

জমিদারবাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই লোহার সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইয়া উহার অবস্থা দেখিয়াই উনি হিংস্র পশুর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"চোর, মিথ্যাবাদী, তবে না কিছু কর নি?" বলিয়া তিনি সজোরে স্ত্রীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার সেই শিশিরের নাম উল্লেখ করিয়া স্ত্রীকে দু'চার ঘা প্রহার করিতেও ছাড়িলেন না।

জমিদার-গৃহিণী প্রথম প্রথম উত্তরস্বরূপ গোটাকতক রাগের কথা বলিলেও পরে একেবারে নীরব হইয়া এ অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। মৌনতাই দোষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ জ্ঞানে জমিদারবাবু তাঁহার ভৎর্সনা ও প্রহারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও

উৎপীড়িত করিয়া তুলিলেন। জমিদার-গৃহিণী যে নীরবে দাঁড়াইয়া কি প্রকারে এই পাশবিক অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে লাগিলেন, আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে সন্দেহ হইল, তবে কি উঁহার স্বভাবচরিত্র যথার্থই নিন্দনীয়?

জমিদারবাবু হাতে আলো লইয়া অবনত ভাবে সিন্দুকের ভিতরকার অলঙ্কার সমূহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কোনও জিনিষ অপহৃত হইয়াছে কি না, ইহা দেখাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য। আলোটা সিন্দুকের ভিতর ধরিতেই ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেল। আমি আমার লুক্কায়িত স্থান হইতে তাঁহাদের গতিবিধি আর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, জমীদারবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"গলা ছাড়, মারবি নাকি? আস্পর্দ্ধা কম নয়!" বলিতে না বলিতেই তিনি আবার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"শয়তানী, খুন করলি!" আর কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না। কেবল ঘরের মধ্যে একটা গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বেগে বাহির হইয়া আসিলাম। জমিদারবাবুর রক্তাক্ত দেহ মেজের উপর শায়িত দেখিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রাণবায়ু পূর্ব্বেই নির্গত হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ নাড়াচাড়া করিতে গিয়া আমার কাপড়েও রক্তের দাগ লাগিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, জমিদার-গৃহিণী সম্মুখেই আলো লইয়া দণ্ডায়মান। আলোর রশ্মি তাঁহার মুখের উপর প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পিষ্ট, গণ্ডস্থল রক্তাভ, চক্ষুর্দ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বল জ্বল জ্বলিতেছে! জীবনে এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইল না।

আমি বিরক্ত ভাবে বলিলাম,—"তাহলে কাজ শেষ করে ফেলেছেন!"

তিনি ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, আর কোনও ভাবনা নেই।"

"এখন কি করবেন মনে করছেন? আপনাকে ত খুনের অপরাধে এখনই ধরপাকড় করবে।"

"আমার জন্যে কিছু ভের্ব না। আমার জীবনের উপর কোনও মায়া নেই, বাঁচা মরা আমার পক্ষে দুই সমান। তুমি গহনা পত্র নিয়ে চলে যাও।"

"না, আমার আর ওসবে দরকার নেই। আমি যেতে পারলেই এখন বাঁচি। পূর্ব্বে এমন কাজ কখনও আমি করিনি।"

"নির্ব্বোধ! তুমি চুরী করতেই এসেছ, আর এমন সুবিধে পেয়েও শুধু হাতে চলে যাবে? কেন, গহনা নেবে না কেন? কেউ ত আর বাধা দিবে না।"

এই বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি আমার কাপড়ের খুঁটে দামী দামী গহনা সব বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া দিলেন। তাহা লইয়া আমি জানালার দিকে অগ্রসর হইলাম। আর এক তিল সেখানে থাকিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের বাতাস যেন বিষাক্ত বলিয়া আমার অনুভব হইল। জানালার নিকট আসিয়া একবার পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম। তাঁহার সেই দীর্ঘ উন্নত মূর্ত্তির উপর হস্তস্থিত আলোক রশ্মি পড়ায় তাহা বড়ই উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি স্মিতবদনে আমাকে বিদায় দিলেন। আমিও মুহূর্ত্ত মধ্যে জানালা টপ্‌কাইয়া বাহিরে বাগানে লাফাইয়া পড়িলাম।

আমার দ্বারা যে এ বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইল না, ইহা ভাবিয়া আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু তখন যদি জমিদার-গৃহিণীর মনের ভাব বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে ব্যাপার নিশ্চয়ই অন্যরূপ দাঁড়াইত। তাঁহার বিদায়কালীন হাসির নিগূঢ় অর্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, একটা মৃতদেহের পরিবর্ত্তে দুটা মৃতদেহ ঘরের মেজের উপর শায়িত থাকিত। কিন্তু তখন পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাই আমার মনে উদিত হয় নাই। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, শয়তানী ইচ্ছা করিলে আমার গলাতেই ফাঁসি পরাইতে পারে! জানালা হইতে লাফাইয়া বাগানে দু'পা অগ্রসর হইতে না হইতেই ভীষণ চীৎকারে সমস্ত স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন চীৎকারধ্বনি নৈশ সমীরণে আন্দোলিত হইতে লাগিল!

জমিদার-গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "খুন, খুন! কে কোথায় আছ, বেরিয়ে পড়।" রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে স্বর বাড়ীর সর্ব্বত্র প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে চীৎকারে নিস্তব্ধ পল্লীটাও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভয়ঙ্কর চীৎকার আমার বিকৃত মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা জানালা খোলার শব্দ শুনিতে পাইলাম, চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। আমি কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া বাগানের ভিতর একটা অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহা নিরাপদ নহে ভাবিয়া, সেই খানেই গহনাগুলা ফেলিয়া ফটকের দিকে দৌড়িলাম, কিন্তু তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই লোকজনেরা ফটক বন্ধ করিয়া দিল। আমি পুনর্ব্বার বাগানের ভিতর চলিয়া আসিলাম,-এবং প্রাচীর ডিঙ্গাইবার বন্দোবস্ত

করিতেছি, এমন সময় কুকুরটা ছাড়া পাইয়া আমার পা কামড়াইয়া ধরিল। বাড়ীর দরোয়ান আসিয়া কুকুরটাকে না ধরিলে, সে টুকরা টুকরা করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিত। পরে সকলে মিলিয়া আমাকে বন্দী করিয়া সেই ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে গিয়া দরোয়ান আমাকে দেখাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এই লোকটাই কি ?"

গৃহিণী তখন মৃত স্বামীর দেহের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতেছিলেন। দরোয়ানের কথা শুনিয়া রাগান্বিত ভাবে আমার দিতে তাকাইলেন। হায়, শয়তানী কত ছলই জানে !

তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, এই লোকটাই।" পরে আমার উদ্দেশে বলিলেন, "পিশাচ ! বুড়ো লোককে এই রকম ভাবেই খুন করতে হয় !"

এমন সময় পুলিশ আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি উন্মাদের ন্যায় চেঁচাইয়া উঠিলাম,— 'উনি নিজে এই কাজ করেছেন, আমি কিছুই জানি না।"

"যত বড় মুখ, তত বড় কথা" বলিয়া দরোয়ানটা আমার গালে দুই চাপড় বসাইয়া দিল। তথাপি আমি সজোরে বলিতে লাগিলাম, "উনিই ছোরা দিয়ে নিজের স্বামীকে খুন করেছেন। আমি স্বচক্ষে এ ব্যাপার দেখেছি। উনি প্রথম আমাকে চুরী করতে সাহায্য করেন, পরে জমিদারবাবু নেমে আসতে তাঁকে খুন করেন।" এই বলিয়া আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি নিরপরাধিনীর ন্যায় অবিচলিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দরোয়ানটা পুনর্ব্বার আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। গৃহিণী তখন কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "না, আর মেরে কাজ নেই। বিচারে যা শাস্তি হয় ভোগ করুক।"

পুলিশের লোক উত্তর করিল, "মাজি, আমি তাহ'লে একে বেঁধে থানায় নিয়ে যাই ? আপনি স্বচক্ষে একে খুন করতে দেখেছেন ত ?"

"নিশ্চয়ই, স্বচক্ষে দেখেছি। সে দৃশ্য মনে পড়লে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! নীচে শব্দ শুনে আমরা নেমে আসি। এই লোকটা তখন সিন্দুক খুলে গয়না চুরী করছিলো। কর্ত্তা এসে বাধা দিতেই, দু'জনে ঝটাপটি লেগে গেল। বুড়ো লোক,—ওর সঙ্গে পারবে কেন ? লোকটা কাপড়ের ভেতর

থেকে ছোরা বার করে কর্ত্তার পিঠে বসিয়ে দিল। ঐ দেখ, এখনও ওর হাতে রক্ত রয়েছে, আর ছোরাটা কর্ত্তার পিঠে বসান রয়েছে।"

আমিও উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বলিলাম,—"ঐ দেখ, ওঁর হাতেও রক্তের দাগ রয়েছে!"

দরোয়ানটা বলিয়া উঠিল,—"তা আর হবে না, কর্ত্তাবাবুকে ধরে বসে রয়েছেন, রক্ত হাতে লাগবে না?"

সত্য কথা বলিতেছি, আমি আর কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না। নির্ব্বাক হইয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি যেন আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে বলিলেন, "আমার ত সর্ব্বনাশ করেছ, তোমাকে জেলে দিয়ে আমার সে ক্ষতির একবিন্দুও পূরণ হবে না। অনুতাপই তোমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু পুলিসে ছাড়বে কেন?" ইনি যে রঙ্গালয়ে অভিনয় করিলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই স্থির করিল, আমার দ্বারাই নিশ্চয় এই পাপ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, নতুবা গৃহিণীর কথা শুনিয়া এরূপ মৌনভাব অবলম্বন করিবে কেন? তখন পুলিসের লোকে ও দরোয়ানটা আমাকে হাতকড়ি বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেল।

মহাশয়, নিজের স্ত্রী কর্ত্তৃক জমিদারবাবুর হত্যা কথা যথাযথ ভাবেই আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। পুলিসের লোকে বা বিচারপতি ইহা যেরূপ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল, আপনিও কি তাহাদেরই পন্থা অনুসরণ করিবেন? যদি ইহার মধ্যে এক তিলও সত্য নিহিত আছে বলিয়া আপনার ধারণা হয়, তাহা হইলে ইহার তদন্ত করুন। যাঁহারা ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য নিজেদের স্বার্থ অকাতরে বলি দিয়া পৃথিবীতে স্বনামধন্য হইয়া গিয়াছেন, আপনার নামও তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিবে। মহাশয়, আপনি ভিন্ন আর কাহার নিকট দুঃখের আবেদন জানাইব? আপনি যদি এই মিথ্যা অভিযোগ হইতে আমাকে মুক্ত করিতে পারেন, আমি আপনাকে আজীবন এরূপ ভক্তি ও পূজা করিব যে, মানুষ মানুষকে পূর্ব্বে কখনও ততটা করিতে পারে নাই। কিন্তু এ দীনের প্রার্থনা যদি আপনিও হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিবেন যে, আজ হইতে এক মাস পরে আমি যে প্রকারে পারি আত্মহত্যা করিব, এবং সম্ভবপর হইলে তদবধি প্রতি রাত্রে

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে আপনাকে দেখা দিয়া আপনার জীবনের সুখ শান্তি চিরতরে ভঙ্গ করিয়া দিব। আমার প্রার্থনা অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। জমিদার-গৃহিণীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করুন, তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করুন, তাঁহার অতীত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করুন, স্বামীর অগাধ ধন-সম্পত্তির তিনি এখন কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সন্ধান করুন, এবং আরও সন্ধান লউন, আমি যাহা বলিয়াছি, শিশির নামে তাঁহার কোনও প্রণয়াস্পদ আছে কি না। এই সব হইতে যদি তাঁহার প্রকৃত চরিত্র আপনি অবগত হন, আমি যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য বলিয়া আপনার স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আপনি যে হৃদয়ের মহত্ব দেখাইয়া এই নির্দ্দোষ ব্যক্তির উদ্ধার কল্পে চেষ্টা করিবেন, তাহা কি আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারি না? *

অলঙ্কারশাস্ত্রে শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি ও অর্থ।

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ শাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্।]

১। অভিধা ও বাচ্য অর্থ।

আলঙ্কারিকগণের মতে শব্দের অর্থ তিন প্রকার—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য। অভিধাবৃত্তির দ্বারা বাচ্য অর্থের, লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লাক্ষণিক অর্থের, এবং ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা ব্যঙ্গ্য অর্থের বোধ হয়। বৃত্তি শব্দের অর্থ শব্দের ব্যাপার বা শক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তির বলেই শব্দ ত্রিবিধ অর্থের বোধ জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু শক্তি শব্দ কখনও কখনও কেবল অভিধার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং বৃত্তি শব্দই আদরণীয়। যখন শব্দ অভিধার বলে বাচ্য অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন তাহাকে বাচক শব্দ বলে, লক্ষণার বলে লক্ষ্য অর্থ বুঝাইলে শব্দকে লাক্ষণিক, এবং ব্যঞ্জনার বলে ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝাইলে শব্দকে ব্যঞ্জক বলে।

"তত্র সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদ্ অগ্রিমাভিধা" যাহার বলে সঙ্কেতিত অর্থের বোধ হয় তাহাই শব্দের প্রথম শক্তি অভিধা। এইরূপ শব্দের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোধ হইবে, এতাদৃশ নিয়ম (understanding)কে সঙ্কেত বলে। যে অর্থে সঙ্কেত গৃহীত হয়, তাহাকে সঙ্কেতিত অর্থ বলে। সঙ্কেত দুই প্রকার—আজানিক (long standing) এবং আধুনিক (modern)। যে সঙ্কেত

* বিদেশী গল্পের ভাবাবলম্বনে লিখিত।

চিরকাল প্রচলিত তাহাকে আজানিক সঙ্কেত বলে, এবং যে সঙ্কেতের উৎপত্তি অধুনাতন তাহাকে আধুনিক সঙ্কেত বলে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সঙ্কেত কিসে গৃহীত হয়, জাতি (class)তে না ব্যক্তি (individual)তে? কেহ কেহ বলেন, ব্যক্তিতেই সঙ্কেত হওয়া উচিত, কারণ প্রথম যখন সঙ্কেত গৃহীত হয়, তখন ব্যক্তি (individual)কে ধরিয়াই গৃহীত হয়। বালককে যখন প্রথম বুঝাইয়া দেওয়া হয়, "অয়ং গৌঃ" তখন সে গো শব্দের দ্বারা গোজাতিকে বুঝে না, গোব্যক্তিকে বুঝে। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। গোশব্দের সঙ্কেত কি প্রত্যেক গোব্যক্তিতে গৃহীত হয়? না, যে কোনও একটী গোব্যক্তিতে গৃহীত হয়? প্রথমটী হইতে পারে না, কারণ গোব্যক্তি অনন্ত, সুতরাং প্রত্যেক গোব্যক্তিতে সঙ্কেত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়টীও হইতে পারে না। কারণ কোনও একটী গোব্যক্তিতে সঙ্কেত গৃহীত হইলে ব্যভিচার দোষের আশঙ্কা থাকে। একটী বিশেষ গোব্যক্তিতে সঙ্কেত গৃহীত হইয়াছে, অপর গোব্যক্তিতে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং গোশব্দের দ্বারা যদি সেই অপর গোব্যক্তির প্রতীতি হয়, তাহা হইলে ঘটের প্রতীতিই বা হইবে না কেন? গোশব্দের দ্বারা ঘটেও যেমন সঙ্কেত গৃহীত হয় নাই, অন্য গোব্যক্তিতেও সেইরূপ। অতএব ব্যক্তিতে সঙ্কেত গৃহীত হয় না, কিন্তু উপাধিতে। উপাধি বলিতে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম (The attributes of an individual) বুঝায়।

উপাধি (all attributes constituting individuality)

- বস্তুধর্ম্ম (material attribute)
  - সিদ্ধ (established)
    - পদার্থপ্রাণপ্রদ (জাতি) (essential) *i. e.* genus.
    - বিশেষাধানহেতু (গুণ) (imposing some distinction) *i. e.* differentia)
  - সাধ্য (ক্রিয়া) (To be established)
- বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিতধর্ম্মঃ (সংজ্ঞা) (attribute superimposed by the speaker at his pleasure *e. g.* names)
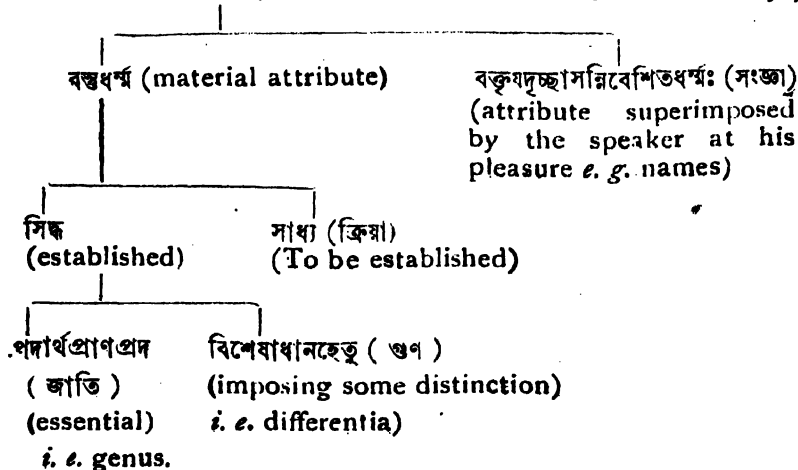
উপরি লিখিত তালিকাটী হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপাধি দুই প্রকার-

বস্তুধর্ম্ম ও বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিত ধর্ম্ম। বস্তুধর্ম্মও দুই প্রকার—সিদ্ধ ও সাধ্য। সিদ্ধ বস্তুধর্ম্মের আবার দুই ভেদ। পদার্থের প্রাণপ্রদ ও বিশেষাধানহেতু। জাতিই পদার্থের প্রাণপ্রদ সিদ্ধ বস্তুধর্ম্ম। বাক্যপদীয়কার বলিয়াছেন, "ন হি গৌঃ স্বরূপেণ গৌঃ নাপ্যগৌঃ, গোত্বাভিসম্বন্ধাত্তু গৌঃ" গোব্যক্তি স্বরূপতঃ (by itself) গোব্যবহারের বিষয়ও নহে, অবিষয়ও নহে। গোত্বজাতি বিশিষ্ট বলিয়াই গোরূপে ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয়। বিশেষাধানহেতু বলিতে গুণ বুঝায়। কারণ গোত্বজাতির দ্বারা সত্ত্বা (existence) লাভ করিয়া গো শুক্ল প্রভৃতি গুণের দ্বারা বিশেষত্ব লাভ করে। সাধ্য বস্তুধর্ম্ম বলিতে ক্রিয়া (action) বুঝায়। এবং বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিতধর্ম্ম বলিতে সংজ্ঞা (name) বুঝায়। সুতরাং "উপাধিতে সঙ্কেত গৃহীত হয়" বলিলে "জাতিতে, গুণে, ক্রিয়াতে ও সংজ্ঞাতে সঙ্কেত গৃহীত হয়" ইহাই বুঝায়। এই জন্য শব্দের চারি প্রকার ভেদ মহাভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন, "গৌঃ শুক্লশ্চলো ডিত্থঃ ইত্যাদৌ চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। গোশব্দে জাতিতে, শুক্লশব্দে গুণে, চলশব্দে ক্রিয়াতে এবং ডিত্থশব্দে সংজ্ঞাতে সঙ্কেত গৃহীত হয়। যদি বল গুণে সঙ্কেত গৃহীত হইলে ব্যক্তি কি দোষ করিল? কারণ ব্যক্তিও যেমন অনন্ত, শুক্লাদি গুণও অনন্ত। তুষারে এক প্রকার শুক্ল, দুগ্ধে আর এক প্রকার, শঙ্খে ভিন্ন প্রকার, এইরূপ শুক্লাদি গুণও ত অনন্ত! তাহার উত্তরে কাব্যপ্রকাশকার বলিতেছেন—

শুক্লাদি গুণ একই, কিন্তু আশ্রয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, যেমন একই মুখ শাণিত খড়্গে এক প্রকার, জলে আর এক প্রকার, দর্পণে ভিন্ন প্রকার দেখায় সেইরূপ।

অথবা, যদি তুমি বল শুক্লাদি গুণ বাস্তবিকই এক প্রকার নহে, পরমার্থতঃ ভেদ আছে, সেই জন্য কাব্যপ্রকাশকার বিকল্পে জাতিতেই সঙ্কেত স্বীকার করিয়াছেন। "সঙ্কেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদির্জাতিরেব বা"। তুষার শুক্ল, দুগ্ধও শুক্ল, শঙ্খও শুক্ল, এই সকল বিভিন্ন প্রকার শুক্লে একই শুক্লত্ব জাতি আছে। গুড়ের পাক, তণ্ডুলের পাক, ব্যঞ্জনের পাক, এই সকল পাকক্রিয়াতে একই পাকত্বজাতি আছে। বালককর্ত্তৃক উচ্চারিত ডিত্থসংজ্ঞা, বৃদ্ধকর্ত্তৃক উচ্চারিত ডিত্থসংজ্ঞা, শুকমুখে উচ্চারিত ডিত্থসংজ্ঞা—এই সকল ডিত্থসংজ্ঞাতে একই ডিত্থত্ব জাতি আছে। অতএব সর্ব্বত্রই জাতিতে সঙ্কেত গৃহীত হয়। যদি জাতিতে সঙ্কেত গৃহীত হয়, তাহা হইলে গো শব্দের দ্বারা গোত্বের বোধ

হওয়া উচিত, "গাম্ আনয়" এরূপ স্থলে গোব্যক্তির বোধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই, ব্যক্তি ভিন্ন জাতি থাকিতে পারে না, এইজন্য অবিনাভাবসম্বন্ধে (indispensable association) জাতির দ্বারা ব্যক্তি আক্ষিপ্ত (introduced) হয়। যেমন "ক্রিয়তাম্" বলিতে কর্ত্তার, "কুরু" বলিতে কর্ম্মের, "প্রবিশ" বলিতে গৃহের আক্ষেপ হয় সেইরূপ।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, কেবলমাত্র জাতিতে সঙ্কেত গৃহীত হয় না, কেবলমাত্র ব্যক্তিতেও নহে, কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে।

এই সঙ্কেতিত অর্থ যাহার দ্বারা সাক্ষাৎ (directly) বোধিত হয়, তাহাকেই শব্দের অভিধা বৃত্তি বলে। এই অভিধা আবার তিন প্রকার—কেবলসমুদায়শক্তি, কেবলাবয়বশক্তি, এবং সমুদায়াবয়বশক্তিসঙ্কর।

প্রকৃতিপ্রত্যয়নির্ব্বিচারে সমুদায় অখণ্ড শব্দটী যদি কোনও অর্থে সঙ্কেতিত হয়, তাহার শক্তিকে কেবলসমুদায়শক্তি বলে। যেমন যদি কাহারও নাম ডিথ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমুদায়শক্তিবলে ডিথ বলিতে তাহাকেই বুঝাইবে। যদি সমুদায় শব্দটীর অর্থ প্রকৃতির ও প্রত্যয়ের অর্থের সমষ্টি মাত্র হয়, তাহা হইলে সেই শব্দের শক্তির নাম কেবলাবয়বশক্তি। যেমন পাচক শব্দ পচ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ্বুল্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। পচ্ ধাতুর অর্থ পাকক্রিয়া এবং ণ্বুল্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা। পাচক শব্দের অর্থ পাককর্ত্তা, এখানে সমুদায় শব্দটীর কোনও শক্তিই নাই। যেখানে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের শক্তি সমুদায়ের শক্তির দ্বারা বিশেষিত হয়, সেখানে সমুদায়াবয়বশক্তিসঙ্কর। যেমন পঙ্কজ;—এখানে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের শক্তির দ্বারা পঙ্কে যাহা জন্মায় তাহাই বুঝাইতেছে, এবং সমুদায়ের শক্তির দ্বারা পদ্ম বুঝাইতেছে, অবয়ব বা প্রকৃতিপ্রত্যয়গত শক্তি সমুদায়ের শক্তির দ্বারা বিশেষিত হইতেছে। সকল পঙ্কে জাত পদার্থ বুঝাইতে পঙ্কজের শক্তি নাই, কিন্তু কেবলমাত্র পদ্মকেই বুঝাইতে শক্তি আছে। এবং পঙ্কে জন্মায় বলিয়াই পদ্ম পঙ্কজ। অভিধার দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকেই বাচ্য অর্থ (expressed meaning) বলে। পর সংখ্যায় লক্ষণা ও লাক্ষণিক অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

পাগলা মাষ্টার।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১২)

ছয় মাস প্রফেসার প্রফুল্ল সেনকে দেখি নাই, তবে মাঝে মাঝে তাহার কথা স্মরণ করিতাম, আর সেই চুরী দুইটার কথা মনে পড়িলে একটা কঠোর আত্মগ্লানিতে জ্বলিয়া মরিতাম। সে রাত্রে কেন কাফ্রিটাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিলাম না ? অধিক বিচার-বিতর্ক করিতে গিয়া এরূপ ভাবে হাতের শিকার পলাইয়াছিল। জ্যাকবার্লি যে সে লোক নয়, তাহা অস্বীকার করিবার আমার শক্তি নাই, কারণ উত্তেজনায় সে লোকটাকে উত্তমরূপে দেখি নাই। কিন্তু লোকটা গেল কোথা ? আমি শেষ রিপোর্ট দিয়া তদন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু একজন স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম যে, চক্রধরপুরে বা তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দ্বিতীয় কাফ্রি দেখিলে আমাকে সংবাদ দিবে। এতাবৎ কাল সে জ্যাকবার্লি ব্যতীত অন্য কাফ্রির সন্ধান পায় নাই।

যখন রাত্রে ভোজনের পর এই সব কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতেছি, তখন অকস্মাৎ মিঃ প্রফুল্ল সেন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের শেষ মিলনটা তত সুখের হয় নাই, তাই তাহার উদারতায় আমি একটু বিচলিত হইলাম। তাহাকে একটু অধিক প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কিন্তু কস্মিন-কালে নির্দ্বন্দ নয়। সে বলিল—কি হে, তদন্তটা একেবারে ছেড়ে দিলে ?

আমি জোড় হাত করিয়া বলিলাম, আর কেন ভাই, ও সব কথা ? যেতে দাও না।

সে বলিল—না না, আমি আজ তোমাকে যদি নিশ্চয় চোরের সন্ধান না দিই, তাহ'লে—

আমি বলিলাম —ক্ষমা কর না ভাই, আর কেন সে কথা—

সে বলিল—কি মুস্কিল !

আমি বুঝিলাম, এই ছয় মাসে সে একটা কিম্ভূদকিমাকার থিওরি সৃষ্টি করিয়াছে। সেই থিওরিটি আমার মস্তকে তর্কের দ্বারা প্রবেশ করাইবার জন্য আসিয়াছে। আমি বলিলাম,—ভাই বুঝেছি, নতখানেক থিওরি নিয়ে এসেছ।

সে বলিল—থিওরি কেন? চোর ধরে এনেছি। এখনি যদি চোর ধরিয়ে দিই? তা'হলে কি আর এমনি খুলা পায়ে বিদেয় দিবে। একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে দোষ কি?

আমি তাহার মুখের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। বাস্তবিকই পাগলা মাষ্টার। ভীষণ পাগল! চোর ধরিয়া আনিয়াছে? লোভে প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। উত্তেজনায় চক্ষু দুইটা জ্বালা করিতেছিল। বিধিমতে মনকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলাম। পাগলের প্রলাপে আশা করিয়া শেষে কি নিরাশ হইব?

সে বলিল—সত্যই আজ চোর ধরিয়ে দেব। একবার কিন্তু আমার কথা-গুলা স্মরণ কর। দেখবে আমার কথাগুলা সব সত্য, তোমার ধারণাগুলা সব ভুল।

আমি বলিলাম—বেশ, ভাল কথা। এখন দয়া করে অন্য কথা কও, আর যদি পকেটে বা ট্যাঁকে কোথাও চোর থাকে তাকে বার করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধ। কিন্তু আর থিওরি—

সে বাধা দিয়া বলিল—না, থিওরি না। সত্য। খাঁটি একের নম্বরের সত্য। এই প্রথমে পোদ্দারদের কেশ্‌টা ধর। আমি বলেছিলাম যে, চুরী হয়েছিল ছদ্মবেশী কাফ্রির দ্বারা—চোর গুলি মারিয়াছিল, মারিবার জন্য নয়, সে বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা করেছিল গাড়ীর এলারাম টানার জন্য এবং এলারাম সিগ্‌নাল টানার পর ধীরে ধীরে নামিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ছদ্মবেশ বদলে-ছিল—কেমন।

আমি কি করি? সে তো না শুনাইয়া ছাড়িবে না। কাজেই হতাশ ভাবে বলিলাম—বেশ।

সে বলিল—আচ্ছা। পাশেই একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী ছিল। বুঝতেই পার ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীর সাত খুন মাপ। কেহ তাকে সন্দেহ করতে সাহস করে না। বেশ! সেই যাত্রীর একটা কাফ্রির মুখোস আছে মাত্র। সে টানেলের আগের ষ্টেসনে আস্তে আস্তে অন্ধকার গাড়ীতে এসে ল্যাভেটারিতে লুকিয়া রহিল। টানেলের কাছে এসে আলো জেলে চুরী করিল, বন্দুক ছুঁড়িল, আলো নিভাইয়া গাড়ীর বাহিরে গেল। ট্রেণ থামিলে ধীরে ধীরে নিজের প্রকোষ্টে চলে গেল, মুখোসটা খুলে ফেললে আর সোনার ইটগুলা যেখানে সন্দেহ হবে না, খুব সাধারণ ভাবে একটা বিছানার মধ্যে গুঁজে রেখে

দিলে। সে যদি সাহেবী পোষাক পরে থাকে, কেহ তার বিছানা খুঁজবে না। আর যদি খোঁজ আরম্ভ হয় তো তার ঘর আগে খানাতল্লাস হ'বে না। বেগতিক বুঝে সে তালটাকে কমোডের ভিতর দিয়ে ফেলে দেবে। ধরা পড়লেও ভয় নেই, চোরে ফেলে গেছে। কেমন বুঝলে?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, জলের মত। এখন অনুগ্রহ ক'রে অন্য কথা কও।

সে বলিল—কেন? যে কথা বল্‌লাম, তাতে কোনও যুক্তির দোষ আছে?

আমি বলিলাম—না, বিশেষ না। তবে ফার্ষ্ট ক্লাসের লোকটার পক্ষে ঠিক জানা শক্ত যে, মালটা কি আছে, কোথা আছে, এবং গাড়ীতে ওঠবার সময় তিন জনের মধ্যে কেহ জেগে আছে কি না?

সে বলিল—হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছ। তোমার মাথা আছে। তবে কেন চোর ধরতে পার না? ঠিক্ কথা। আচ্ছা, যদি গাড়ীতে তার একজন বন্ধু থাকে?

আমি বলিলাম—এ ক্ষেত্রে সে রকম বন্ধু তো দেখিনি। পোদ্দার দু জন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্থ। তৃতীয় ব্যক্তি তুমি—

সে বলিল—আচ্ছা, আমি যদি বন্ধু হই, তা'হলে আমার থিওরি সম্ভবপর হ'তে পারে। আমার দিকে গুলি ছোঁড়ায় ঝিকে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়া হ'ল। আমারও লাগল না, পোদ্দাররাও ভয় পেলে। দ্বিতীয় কথা, আমি চেন টানায় তবে লোকটা পালাতে পারল কেমন?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, তুমি যদি চোরের সঙ্গী হও, তা' হ'লে হ'তে পারে।

সে বলিল—বেশ কথা। আচ্ছা দ্বিতীয় কেশ্‌টা নাও।

আমি কি করি? থিওরিটা না শুনিলে রক্ষা নাই। সে ছাড়িবার পাত্র নয়। আমি বলিলাম—নাও।

সে বলিল—আমি শুয়ে আছি। সঙ্গের বন্ধুটি কাফ্রি সেজে একবার হানা দিয়ে গেছে। লোকটা চাবি বন্ধ করতে ভুল করেছে। ধীরে ধীরে থলেটা বার ক'রে নিয়ে সেই বন্ধুর হাতে সুবিধা মত দিলাম। গালুডিতে নামবার আগে যদি সে চুরীর কথা জানতে পারত, তাহ'লে আমাকে ধরতে ছুঁতে পারত না। কেন বল দেখি?

আমি বলিলাম—বামাল তোমার কাছে নাই, আর তুমি পদস্থ ব্যক্তি।

সে বলিল—বেশ কথা। এখন বোঝ, পদস্থ ব্যক্তি যদি চুরী করে, আর লোকে যদি নিজের পদার্থ সম্বন্ধে সাবধান না হ'তে পারে, তাহ'লে কারও রক্ষা নাই। পুলিশের সুযশ সব বাজে।

আমি অগত্যা বলিলাম—নিশ্চয়।

সে বলিল—আর একটু কথা আছে। চুরীটা যত সোজাসুজি করবে, তত ধরা না পড়বার সুবিধা। চোর ধরা পড়ে পালাতে গিয়ে, হাঁকুপাঁকু ক'রে।

আমি বলিলাম—তাও জলের মত বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলাম না। পদস্থ লোক চুরী করবে কেন?

সে বলিল—আঃ! এই খানেই সমস্যা! পদস্থ লোক চুরী করবে কেন? হ্যাঁ! কেন পদস্থ লোক চুরী করবে?

আমি বুঝিলাম এ প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়াই বলিল—চুরী করিব কেন? দেশের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। চারিদিকে সোনা ছড়ান আছে। কিন্তু সে সোনা বিদেশীরা নিয়ে যাচ্চে কেন? আমাদের টাকা নেই বলে। আচ্ছা, যদি এমন একটা বাণিজ্য সমিতি হয়, যাদের সভ্যেরা এই রকমে অর্থ সংগ্রহ করবে, শেষে সেই অর্থ দিয়ে ব্যবসা খুলবে, তাহ'লে এরূপ চুরীতে দোষ আছে?

আমি বলিলাম—চুরীতে দোষ আছে কি না, সে কথার জবাব দিতে পারে তোমার মত নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। তবে যাদের যায়, তাদের অবস্থাটা—

সে বলিল—হ্যাঁ, এটা কথা বটে। কিন্তু যাদের যায় তারা যদি খুব ধনী হয়, আর তাদের দ্বারা যদি অর্থের সদ্ব্যবহার না হয়? এ ক্ষেত্রে ধর আমি জানি পোদ্দার দুজন আর কাশিম করিম—

আমি বলিলাম—ভায়া, যেতে দাও, এ কথায় লাভ কি? চোরকে তো চক্রধরপুরে দেখেছিলাম। সে চোর তুমিও নও, তোমার বাণিজ্য সমিতির অপর সভ্যও না।

সে বলিল—বেশ! যখন চোর এসেছিল, আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা কহেছিলাম? তারপর চোর কোথা গেল? জ্যাকবালিকে নিয়ে কতই কেলেঙ্কারী করলে?

আমি তাহার কথার ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার বক্তব্যটা কি? সে কি বাস্তবিকই বলিতে চাহে যে সে চোর? বেশ কথা, তাই বলুক তাহাকে ধরি। সে বলিল, চোরকে আনি?

একেবারে উন্মাদ! কি বিপদ! এ আসল পাগল! ধীরে ধীরে সে বাহিরে গেল! পরক্ষণে ফিরিয়া আসিল,—সঙ্গে চক্রধরপুরের সেই কাফ্রী।

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কি বিভীষিকা! সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে কাফ্রিটা তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিল। সমস্ত মুখটা যেন খসিয়া গেল। দেখিলাম প্রফেসার রায়।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই বাহির করিয়া মুখোসটাতে আগুন লাগাইয়া দিল। বোধ হয় তাহাতে কোনও রাসায়নিক পদার্থ লেপিত ছিল, নিমেষ মধ্যে সেটা পুড়িয়া গেল, আমার ঘরের কোণে কোণে কতকটা ছাই উড়িতে লাগিল। রায় হাসিয়া বলিল—প্রকৃতিস্থ হ'ন—বসুন।

সেন বলিল—কেন মুখোসটা পোড়ালাম বল দেখি? ওটা ভিন্ন আমাদের বিপক্ষে কোন সাক্ষী নাই। এখন আমাদের যদি তুমি ধর তো কিছু হ'বে না। অবশ্য সোনার ইট আছে। তা' সে সনাক্ত হ'বে না, আর কেহ খুঁজেও পাবে না। ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেচেছি।

রায় বলিল—বলুন দেখি কাজটা কেমন "নিটুলি" করেছি। চক্রধরপুরে যদি ছুটে এসে ধরতেন তো বলতাম ঠাট্টা করছিলাম।

পাগলা মাষ্টার বলিল—মাত্র ৬০ হাজার হ'য়েছে। অপরে আরও করবে। যাক্ দেশের জন্য চুরীও করছি।

দু'জনে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। হাত পা বাঁধা—তাহাদের তস্কর জানিয়াও ধরিবার উপায় নাই। রিপোর্ট করিয়াই বা লাভ কি? সাত পাঁচ ভাবিয়া বলিলাম—"চুলোয় যাক্।"

সমাপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

জীবনের পথে—(সামাজিক উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্, প্রণীত ও ৭৮।২ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা 'অন্নদা বুকষ্টল' হইতে শ্রীযুক্ত সতীপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। রেশমী কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই। ছাপা ও কাগজ পরিপাটী।

এই গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাধারণ উপন্যাসের মত মামুলী ঘটনার সমাবেশ নাই। পুস্তকখানি আগাগোড়া সুরাপানের বিরুদ্ধে অভিযান! সুরাপানে ভদ্র সন্তানের কিরূপ অধঃপতন ও অকালমৃত্যু হয়; তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে সমাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়, লেখক কয়েকটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ললিত' গ্রন্থকারের আদর্শ চরিত্র। তাঁহার 'ললিতে'র মত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সুরাপান-দোষ দেশ হইতে বিদূরিত হইবে। বিলাতের প্রসিদ্ধ 'লেখিকা মিসেস্ হেনরি উড্ এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করিয়া, নিজ সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন।' লেখক তাঁহারই আদর্শে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার আদর্শচ্যুত হন নাই, বরং তাঁহার প্রয়াস অনেকটা সফলতা-মণ্ডিত হইয়াছে। উপন্যাস পাঠে যাঁহারা বীতস্পৃহ, এই পুস্তকখানি তাঁহারাও নিঃসঙ্কোচে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, নূতন ভাবে পরিকল্পিত 'জীবনের পথে' পূজার উপহারে উচ্চস্থান অধিকার করিবে।
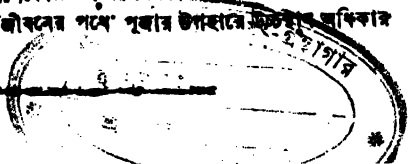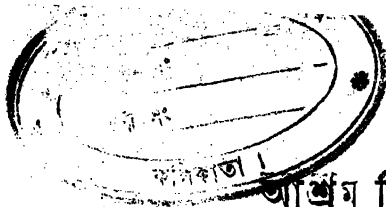
অর্চ্চনা, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

আশ্রম বিবেক।

[শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।]

'আশ্রম' শব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসু। ব্রহ্মচর্য্যাদিকে 'আশ্রম' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে কেন, 'আশ্রম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তাহা জানিতে পারা যায় কি ?

বক্তা। ব্রহ্মচর্য্যাদিকে 'আশ্রম' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে কেন, 'আশ্রম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু। 'আশ্রম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে কি শিক্ষালাভ হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা। 'আঙ্' পূর্ব্বক 'শ্রম্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'আশ্রম' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রম্' ধাতুর অর্থ তপঃ বা 'খেদ'। যাহাতে বা যদ্দারা স্ব স্ব তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, অথবা যাহাতে স্বধর্ম্মসাধনজনিত ক্লেশ নিবন্ধন সর্ব্বতো-ভাবে খিন্ন হইতে হয়, তাহার নাম 'আশ্রম'। * আশ্রম শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা বলিলাম। কিছু বুঝিতে পারিলে কি ?

জিজ্ঞাসু। বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা। 'আশ্রম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদিকে যে নিমিত্ত 'আশ্রম' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। 'আশ্রম' শব্দ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে পরমাত্মা বা বিষ্ণুর বাচকরূপে ধৃত হইয়াছে, তাহা তোমার জানা আছে কি ?

জিজ্ঞাসু। আজ্ঞে না। 'আশ্রম' শব্দ পরমাত্মা বা বিষ্ণুর বাচকরূপে ধৃত হইয়াছে কেন ?

বক্তা। বিষ্ণু-সহস্র-নামস্তোত্রের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, পরমাত্মাই সকলের আশ্রমের ন্যায় বিশ্রামস্থান, পরমাত্মাকে এই নিমিত্ত 'আশ্রম' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অরণ্যে পর্য্যটনশীল পুরুষদিগের

---

* "আশ্রাম্যন্ত্যত্র, অনেন বা। 'শ্রমু' তপসি ঘঞ্। যদ্বা আ সমন্তাৎ শ্রমোঽত্র স্বধর্ম্ম সাধনক্লেশাৎ।"

—অমরকোষ টীকা।

শ্রান্তিহর, ছায়াপ্রদ বৃক্ষাদি যেমন বিশ্রামস্থান, সেই প্রকার সংসার-অরণ্যে অবিরাম ভ্রমণশীল শ্রান্ত জীববৃন্দের সর্ব্বশ্রমহর, পরমাত্মাই আশ্রমবৎ বিশ্রামস্থল, বিষ্ণুর পরমপদের সর্ব্বসন্তাপনাশক আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই জীব চির-বিশ্রামসুখের উপভোগে সমর্থ হয়। তাহা হইলেই জীবের সংসার-ভ্রমণ বিনিবৃত্ত হয়। পরমাত্মা বা বিষ্ণুকে 'আশ্রম' বলিবার ইহাই কারণ। *

জিজ্ঞাসু। 'আশ্রম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদিকে যে নিমিত্ত 'আশ্রম' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা বলুন।

আশ্রম-চতুষ্টয় ব্রহ্মধামে গমনের চতুষ্পদী অধিরোহিণী।

বক্তা। জ্ঞাননিধি ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির চতুষ্পদী অধিরোহিণী (নিঃশ্রেণী—সোপান—সিঁড়ী)-স্বরূপ, ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুষ্পদী অধিরোহিণীতে আরোহণ করিয়া লোকে ব্রহ্মলোকে গমন করে, ব্রহ্মলোকে গমন করিবার আশ্রম-চতুষ্টয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য পন্থা নাই ("চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেষা প্রতিষ্ঠিতা। এতামাশ্রিত্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২৪৮ অধ্যায়)। আশ্রম-চতুষ্টয় দ্বারা আত্মাকে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম-চতুষ্টয় দেবযান পথরূপে প্রথিত আছে।

জিজ্ঞাসু। ভগবান বেদব্যাসের এই অমূল্য, এই অমৃতোপম উপদেশের যাহাতে যথাযথ ভাবে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি, কৃপাপূর্ব্বক ইহার সেইরূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলে, আমার পরমোপকার হইবে, আমি কৃতার্থ হইব।

বক্তা। আমি যথাজ্ঞান সংক্ষেপে ভগবান্ বেদব্যাসের এই মহামূল্য পরম হিতকর উপদেশের বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার চেষ্টা ফলবতী হইবে না।

---

* "আশ্রমঃ শ্রমণঃ ক্ষামঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ।"—বিষ্ণুসহস্র নাম।

"আশ্রমবত্তাং সর্ব্বেষাং সংসারারণ্যে ভ্রমতাং বিশ্রামস্থানাদাশ্রমঃ।"

—শঙ্করভাষ্য।

শব্দার্থ চিন্তামণিতে এইরূপ পাঠ ও নির্ব্বচন দৃষ্ট হয়—"আশ্রমবৎ সর্ব্বেষাং সংসারারণ্যে ভ্রমতাং বিশ্রামস্থানত্বাদাশ্রমঃ পরমাত্মা। স্পষ্টার্থঃ—আশ্রমবদাশ্রমঃ যথারণ্যে চরতামাশ্রমচ্ছায়া-দানাদিবিশ্রামস্থানং এবং সংসারারণ্যে ভ্রমতাং প্রাণিনাং সুষুপ্তে মোক্ষে চ বিশ্রামস্থানং ভবতি পরমেশ্বরঃ।"

জিজ্ঞাসু। এইরূপ কথা বলিলেন কেন? আমি অনধিকারী বলিয়া, আপনি কি এই কথা বলিলেন?

বক্তা। না, তাহা ভাবিয়া আমি এইরূপ কথা বলি নাই। ভগবান্ বেদব্যাসের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশের বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বহু কথা বলিতে হইবে আধুনিক দার্শনিকগণ যে সকল বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণার্থ বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, করিতেছেন; বহু পরিশ্রম করিয়াও, অবিদ্যাধ্বান্তারি সর্ব্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার অভাব নিবন্ধন তাঁহারা অদ্যাপি যে সকল বিষয়ের তত্ত্ববিনিশ্চয় করিতে সমর্থ হন নাই, ভগবান্ বেদব্যাস অল্প কথায় সেই সকল দুরবগাহ বিষয়ের তত্ত্বপ্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব আমাদ্বারা সংক্ষেপে ভগবান্ বেদব্যাসের উক্ত অমূল্যোপদেশের বিশদ ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ বেদব্যাসের "আশ্রম চতুষ্টয় ব্রহ্মধামে গমনের চতুষ্পদী অধিরোহিণী" এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশের গর্ভে জীবের চরম উন্নতি যে উপায়ে হইতে পারে, যেরূপ সাধনা দ্বারা কর্ম্মভূমি বা মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক জীব নিত্যানন্দময়, চিরবিশ্রামস্থান বা অমৃতধামে উপনীত হইতে পারে, ভগবান্ তাহা বলিয়া দিয়াছেন। অতএব, ভগবানের উক্ত উপদেশ কিরূপ দুরবগাহ তাহা আমিও কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি।

বক্তা। শাশ্বত ব্রহ্মধামই যে উন্নতি স্রোতস্বিনীর চরম লক্ষ্য, সুখবোধ্য না হইলেও, তাহা পরম সত্য, জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার-মরুভূমির পারে বিদ্যমান সদানন্দময় ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক চিরশান্তিসুধা পান করিবার নিমিত্তই জীব সদা চঞ্চল, জ্ঞানতঃ হোক্ অজ্ঞানতঃ হোক্, ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই পূর্ণ সুখে সুখী হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় যাইবার নিমিত্ত চলিতেছি, যাহাকে পাইবার জন্য চলিতেছি, তাহা কত দূরে অবস্থিত, কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, গন্তব্য দেশে উপনীত হইতে পারিব, সতত চলিষ্ণু শ্রান্ত মানব ইহাই জানিতে চায় ইহাই মনুষ্যমাত্রের প্রশ্ন। ভগবান্ বেদব্যাস অত্যল্প কথায় সর্ব্বজনের চিরদিনের এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন। "ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় শাশ্বত ব্রহ্মধামে উপনীত হইবার চতুষ্পদী অধিরোহিণী" ভগবান্ বেদব্যাস এতদ্দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছেন, আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতেছি, অন্য কোন দেশে, কোন ব্যক্তি এই ভাবে তাহা বুঝাইতে পারেন নাই।

ব্রহ্মচর্য্যাদি অভ্যুদয় ও মোক্ষসাধন তপঃ ভিন্ন আর কিছু নহে। তপস্তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে আমি তোমাকে বহুবার বলিয়াছি, মনুষ্য তপস্যা দ্বারাই মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, তপস্যা দ্বারাই দেবতারা দেবজন্ম লাভ করিয়াছেন, মহর্ষিগণ তপোবলেই বেদকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, যথাবিধি তপশ্চরণই সর্ব্বসিদ্ধির কারণ। তপ হইতে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের অশুদ্ধির ক্ষয় হয়; আবরণ মলের ক্ষয় হইলেই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি সুলভ হইয়া থাকে। তপস্যা ব্যতিরেকে কেহ কখনও উন্নত হইতে পারেন নাই। তপস্তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে বিস্তার পূর্ব্বক এই সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রম বা যত্ন করিলে যে সিদ্ধি হয়, এবং শ্রম বা যত্ন না করিলে যে সিদ্ধি হয় না, তাহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রম বা যত্ন করিলে সিদ্ধি হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু শ্রম বা যত্ন করিলে কেন সিদ্ধি হয়, সিদ্ধির স্বরূপ কি, শ্রম বা যত্নেরই বা তত্ত্ব কি, তাহা ব্যক্তিমাত্রের জানা নাই। সিদ্ধি এবং শ্রম বা যত্নের তত্ত্বাবলোকন হইলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, তপকে কেন সর্ব্বসিদ্ধির কারণ বলা হইয়াছে। তপস্যামাত্রেই ক্লেশজনক, সন্দেহ নাই। বাধা অতিক্রমই যখন ইষ্টসাধক কর্ম্মের রূপ, তখন কর্ম্ম শ্রমসাধ্য, কর্ম্মমাত্রেই ক্লেশজনক। যাহাতে স্ব স্ব তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে স্বধর্ম্মসাধনজনিত ক্লেশনিবন্ধন সর্ব্বতোভাবে খিন্ন হইতে হয়, তাহা 'আশ্রম', 'আশ্রম' শব্দের এই ব্যুৎপত্তির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ এখন অনেকতঃ সুসাধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যাদি তপশ্চরণ দ্বারা মানুষের সর্ব্বপ্রকার আবরণ মল বিদূরিত হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। যেরূপ সাধনা বা তপস্যা দ্বারা মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় সেইরূপ সাধনা বা তপস্যার বাচক। অতএব আশ্রম-চতুষ্টয় প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির সোপান পংক্তি, আশ্রম-চতুষ্টয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির চতুষ্পদী অধিরোহিণী।

জিজ্ঞাসু। পার্থিব উন্নতিরও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানই উপায়?

বক্তা। তোমার মনে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। য়ুরোপ, আমেরিকাদি দেশে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি এই সকল দেশের অভ্যুদয় হইবার কারণ কি, ইতঃপর তুমি আমাকে ইহাই ত জিজ্ঞাসা করিবে?

জিজ্ঞাসু। আপনি ত সকলই জানিতে পারেন।

বক্তা। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের স্বরূপ যখন তোমার বুদ্ধিদর্পণে ঠিক ভাবে পতিত হইবে, উন্নতি কাহাকে বলে, কিরূপে উন্নত হওয়া যায়, তাহা যখন তুমি চিন্তা করিবে, তপের তত্ত্ব যখন তুমি 'যথাভূত' ভাবে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারগ হইবে, তখন তোমার উপলব্ধি হইবে, যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যাদি তপশ্চরণ না করিলেও, অভ্যুদয়শীল মনুষ্যমাত্রের তপস্যাই উন্নতির মূল, বিনা তপস্যায় কোন্ কালে, কোন্ দেশে কাহার উন্নতি হয় নাই, হইতে পারে না। অন্যান্য দেশে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভব নহে, বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন পূর্ণ ভাবে ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন অন্য জাতির উপলব্ধি হইতে পারে না। পৃথিবী ছাড়া লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, বেদ-শাস্ত্রের সংস্কার বিনা উৎপন্ন হয় না; অতএব পার্থিব উন্নতিই অন্যান্য জাতির লক্ষ্য হইয়া থাকে, ব্রহ্মধামে উপনীত হইবার ইচ্ছা অন্যান্য জাতির হয় না। মোক্ষপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধিকে বৈদিক আর্য্য জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করিতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অসমর্থ হইয়া থাকেন। যাঁহার যাহার প্রয়োজন বোধ হয় না, তাহাকে পাইবার নিমিত্ত তিনি কোনরূপ যত্ন করিবেন কেন? অতএব অন্যান্য দেশে ব্রহ্মচর্য্যাদির যথাভূত ভাবে অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব। প্রকৃতিবেদের স্বরূপ যিনি পূর্ণভাবে অবলোকন করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটাই প্রকৃতির ধর্ম্ম, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির প্রান্তবিন্দু, শেষ সীমা, সকল প্রবৃত্তিকে যে একদিন নিবৃত্তি-বিন্দুতে উপনীত হইতে হইবে, প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণশীল বৈজ্ঞানিকগণও তাহা অস্বীকার করেন না। পরিণামের (Evolution) কি অন্ত আছে? জগৎ চিরদিনই কি এই প্রকার অনন্ত পরিণাম-স্রোতে অবশ ভাবে ভাসিয়া যাইবে? বিচারশীল হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, না, তাহা হইবে না, পরিণামের অন্ত আছে, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই নিখিল প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরমাবস্থা। * বেদ-শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ মার্গেরই বেদ-শাস্ত্রে পূর্ণ উপদেশ আছে, কিরূপে শক্তির উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে শক্তিকে জয় করিতে হয়, কিরূপে

* "And now towards what do these changes tend? Will they go on for ever? or will there be an end to them? * * *"

"In all cases there is a progress toward equilibration."

—*First Principles—H. Spencer*, 483-84.
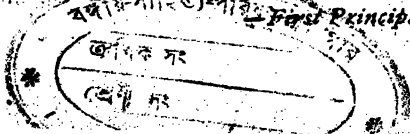
প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে বিকাশিত করিতে হয়, আমার বোধ হয় বেদই সর্ব্বাগ্রে জগৎকে তাহা শিখাইয়াছেন। যে দুর্দ্দমনীয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত, যে প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম অংশের অস্থায়ী আধিপত্য লাভ পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক গর্ব্বিত যে প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদার্থ বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক সদা ব্যস্ত, কিরূপে সেই প্রকৃতিকে নিদেশবর্ত্তিনী করিতে পারা যায়, কিরূপে সেই প্রকৃতির সমগ্রদেশে আধিপত্য করিতে পারগ হওয়া যায় কিরূপে ভবপারাবারের পারে অবস্থিত অমৃতধামে গমন করিতে পারা যায়, এক কথায়, কিরূপে পরমপুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা অবগত হইতে হইলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ মার্গেরই অনুসন্ধান করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যাদি তপশ্চরণ করিতে হইবে। মানুষ চিরদিন প্রবৃত্তি মার্গেই অবস্থান করুক, ইহা প্রকৃতির ইচ্ছা নহে। পণ্ডিত আগষ্ট্ কোমত (August Comte) বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রম-বিকাশই উন্নতি, নিখিল সম্ভাব্য উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়মগর্ভে বীজ ভাবে অবস্থিত থাকে, অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের প্রব্যক্ত অবস্থাকেই উন্নতি বলিতে হইবে। * আগষ্ট কোম্তের এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা কর, আগষ্ট্ কোম্ত্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে "ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় শাশ্বত ব্রহ্মধামে উপনীত হইবার চতুষ্পদী অধিরোহিণী" এই স্বল্প অক্ষরাত্মক অমূল্যোপদেশেরই ছায়া, তোমার তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় দ্বারা মনুষ্যের নিখিল সম্ভাব্য উন্নতি সম্যগ্‌রূপে সাধিত হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, যে কর্ম্ম প্রেতি-প্রকৃষ্ট গতি, যে কর্ম্ম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু, যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা মানব উন্নতির অভিমুখে গমন ও পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা ধর্ম্ম। মর্ত্ত্যধামে মনুষ্যকেই শ্রুতি ধর্ম্ম বলিয়াছেন ("প্রেতিরসি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মং জিন্বেত্যাহ মনুষ্যা বৈ ধর্ম্মঃ"—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ)। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় প্রেতির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধন ধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ সোপান পংক্তি। ব্রহ্মচর্য্যাদি

---

* "Order is the condition of all Progress ; Progress is always the object of Order. Or, to penetrate the question still more deeply, Progress may be regarded simply as the development of Order ; for the order of nature necessarily contains within itself the germ of all possible progress. * * * Progress then is in its essence identical with Order, and may be looked upon as Order made manifest."

—*System of Positive Polity,—Auguste Comte, Vol. I. pp. 83-4.*

প্রত্যেক আশ্রমের সমান প্রয়োজন আছে, চরমোন্নতি-প্রার্থী মনুষ্যমাত্রেরই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটী আশ্রমের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আমি তোমাকে ক্রমশঃ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারীর স্বরূপজিজ্ঞাসা আত্ম-পরহিতার্থি মনুষ্যমাত্রের হওয়া উচিত।

জিজ্ঞাসু। 'আশ্রম' শব্দের অর্থ অবগত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম, এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের স্বরূপদর্শনের কৌতূহল হইতেছে। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে প্রথমে প্রথমাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন. শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্রসমূহে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারীর তত্ত্ববিষয়ক যে সকল কথা আছে, সেই সকল কথার আশয় হৃদয়ঙ্গম করিতে আমি একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

বক্তা। ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা আত্ম-পরহিতার্থি মনুষ্যমাত্রের হওয়া উচিত, কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যবংশধরগণের নহে; আমার বিশ্বাস, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সমধিক সামর্থ্যের যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, স্বাস্থ্যসুখভোগে বঞ্চিত হইতে যাঁহাদের অনিচ্ছা হয়, নীরোগ, দীর্ঘজীবন, সদ্‌গুণভূষিত, মাতা-পিতার আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বজনের স্নেহাকর্ষক, সন্তানলাভে যাঁহাদের তীব্র ইচ্ছা আছে, দেশের উন্নতি যাঁহাদের প্রার্থনীয়, অমোঘ অপমাদি গুণার্জ্জনের প্রয়োজন যাঁহারা উপলব্ধি করেন, সুখময় শাশ্বত ব্রহ্মধামে চিরবাস করিতে যাঁহারা অভিলাষী, ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা এবং সর্ব্বদুঃখবীজ অব্রহ্মচর্য্য পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠার্থ যথাশক্তি চেষ্টা তাঁহাদের না হইয়া থাকিতে পারে না। শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক অখিল শাস্ত্রে যে তপের অতিমাত্র প্রশংসা আছে, আমি তাহা তোমাকে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা, দেখিতে পাইবে, তৎপর প্রশংসা হইতে বেদ শাস্ত্রে কম করা হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ তপঃ। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মচর্য্যকে উত্তম তপঃ বলিয়াছেন ("ন তপ স্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং") ছান্দোগ্যোপনিষদের উপদেশ,—ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি অসম্ভব, যজ্ঞাদি সর্ব্বধর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভূত, ব্রহ্মচর্য্যরহিত পুরুষের যজ্ঞাদিধর্ম্মানুষ্ঠান অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হয় না। অব্রহ্মচারীর যে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না, ব্রহ্মচর্য্যই যে আত্মদর্শনের প্রধান উপায়, শ্রুতিতে

তাহা বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ এবং ইহার প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে বিস্তর উপদেশ আছে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা (সিদ্ধি) হইলে বীর্য্যলাভ হয়, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের অত্যন্ত সামর্থ্য জন্মে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না, অব্রহ্মচারীর জ্ঞানোপদেশ বীর্য্যহীন, ইহা শিষ্যের হৃদয়ে আহিত হয় না। অতএব, আত্মপরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনার্থীর ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, কিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্যের শ্রুতি ও শাস্ত্রে যে এত প্রশংসা আছে, তাহার কারণ কি, তাঁহাদের তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।

জিজ্ঞাসু। ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারী এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হইতে কি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ক্রমশঃ।

শোণ নদী।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি, এল্।]

নাহি স্রোত, নাহি ক্ষোভ, জলের উল্লোল,
নৃত্য নাহি করে বক্ষে একখানি তরী ;
দিগন্ত ধ্বনিয়া আর উঠে না কল্লোল,
সারি গান নাহি ছুটে দুই কূল ভরি'।
শুষ্ক বেলা বালুময়, শুষ্ক নদীতল,
এক পার্শ্বে অতি মৃদু বহিতেছে বারি ;
গৈরিক কর্দ্দমাপ্লুত বালকের দল
ক্রীড়াবশে স্থানে স্থানে নদী দেয় পাড়ি।
জীর্ণ নৌকা উলটিয়া পড়িয়া চড়ায়
কর্ম্ম-জীবনের চিহ্ন ; ধু ধু করে বেলা ;
বন্ধুর দু'পার দীর্ণ ভাস্কর-প্রভায়,
বালকেরা উঠে যায় সাঙ্গ করি খেলা।
বৃদ্ধ আমি ; কার্ত্তিকের শোণ নদীসম
শীর্ণ দেহে বহিতেছে এ জীবন মম।

রায় গিন্নী।

[লেখক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি, এ।]

(১)

আমাদের গ্রামে রায়-গৃহিণীকে লোকে 'রায়বাঘিনী' বলিত, অবশ্য তাঁর অসাক্ষাতে। তাঁর সাক্ষাতে এমন কথা বলে, এ পরগণার মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এমন দুঃসাহস কাহারও ছিল না। তা' সে কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, অসাক্ষাতে লোকে রাজার মা'কেও ডা'ন বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। রায়-গিন্নীর এ হেন বিশেষণের অবশ্য কারণ ছিল।

শ্রীযুক্ত পতিতপাবন রায় ওরফে রায় মহাশয়ের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি স্থানীয় জমীদারের কাছারীতে সামান্য জমা সেরেস্তার মুহুরিগিরি করিয়া কোন মতে সংসার চালাইতেন। জমীদারের জমা-সেরেস্তায় চাকরী করিয়া সেকালে অনেকে বেশ দু'পয়সার সংস্থান করিত—কিন্তু পতিতের পিতা লোকটি ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু এবং সবল প্রকৃতির—প্রজারা ইচ্ছা করিয়া যে দু'একটা টাকা দিত, তা'ছাড়া তিনি অন্য 'উপরি পাওনা' আদায় করিতে পারিতেন না। কাজেই অতি কায়ক্লেশেই তাঁকে সংসার চালাইতে হইত। আসল কথা, সংসার চালাইতেম পতিতের মাতা; তিনি ছিলেন পাকা গৃহিণী। পতিতের যখন ১০।১২ বৎসর বয়স, তখন তা'র পিতৃবিয়োগ হইল—তারপর দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, একটা সামান্য বাগান ও পুকুর – এই ভূসম্পত্তি লইয়া পতিতের মা যে কেমন করিয়া তাকে জেলার কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন—লোকে বিস্মিত হইত; কেহ কেহ বা বলিত যে, পতিতের পিতার কিছু নগদ টাকা ঘরের ভিতর পোঁতা ছিল—তাহা কেবল বুড়ীই জানিত।

বুড়ীর গুণ ছিল অনেক, অমন 'চৌকস' গিন্নী আমাদের গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচ খানা গ্রামেও মিলিত না। কিন্তু প্রধান দোষ ছিল—বুড়ীর পুত্রবধূর সহিত দুর্ব্যবহার। পতিত যখন ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িত, সেই পাশের গ্রামেরই এক জন সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যার সহিত তার বিবাহ হইয়াছিল। পতিতের অবস্থা কাহারও অবিদিত ছিল না, কিন্তু 'এ-ফে'-পড়া পাত্র তখনকার দিনে আমাদের দেশে এক দুর্লভ পদার্থ ছিল—তাই কন্যার মাতার আপত্তি-সত্ত্বেও

এ বিবাহ ঘটিতে পারিয়াছিল। তা' ছাড়া পতিতের শ্বশুর তাঁর আদরের এক-মাত্র কন্যা নিকটেই থাকিবে—এই ওজুহাতে তাঁর গৃহিণীর মত পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

বিবাহ ত' হইল—কিন্তু বেয়ানের ব্যবহারে পতিতের মাতা প্রথম হইতেই কুটুম্বের উপর বিমুখ হইলেন, সে 'ঝাল' গিয়া পড়িল কিন্তু বধূর উপর। তার উপর বধূটি ছিল একগুঁয়ে, এবং বাপের আদরের মেয়ে বলিয়া গৃহকর্ম্মে অমনোযোগী। ক্রমে পতিতের ব্যবহারও এই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। অকৃতজ্ঞ পুত্র! যে মাতা তাকে এত কষ্টে, নিজে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া তাকে 'মানুষ' করিল, পুত্রের উন্নতি কামনায় যে কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম, গ্রাহ্য করে নাই, সেই ছেলে কি না, আজ বৌ'র হইয়া মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে! সে দুঃখ-দুর্দ্দিনে কোথায় ছিল তোর শ্বশুর-শাশুড়ী, কোথায় ছিল তোর বৌ! আজ তারা 'উড়ে এসে' পুত্রের হৃদয়ে 'জুড়ে বসিতেছে'—তাহা বুড়ীর কোন মতেই সহ্য হইত না। কাজেই বধূকে 'উঠ্‌তে বস্‌তে' গালি খাইতে হইত, এবং প্রতিদিন তাহার পিতৃপুরুষের কুলান্তের ব্যবস্থা না করিয়া পতিতের মা জল গ্রহণ করিত না। এমনি করিয়া অল্প দিনেই বুড়ীর 'বৌ-কাঁট্‌কী' সুনাম চারিদিকে রটিয়া গেল।

(২)

দুর্ম্মুখ শাশুড়ীর তাড়না-গঞ্জনার মধ্যে ভবিষ্যকালের 'রায়-গিন্নী'র বধূ-জীবন কাটিতেছিল। ক্রমে তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য্য শ্বশ্রূ আঁধার ভেদ করিয়া গৃহিণীপনার উদয়গিরিতে আরোহণ করিল। শ্রীমান্ পতিতপাবন দুই বার বি-এ ফেল করিয়া প্লিডারশিপ্ পাশ করিয়া মহকুমার উকীল শ্রেণীভুক্ত হইল। তাহার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় তাদের পরগণার জমীদারের পুরাতন নায়েবের মৃত্যু হইল, এবং পতিতের শ্বশুরের জামীন ও সুপারিসে জমীদার মহাশয় পতিতকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই দিন হইতে পতিতের কপাল ফিরিল। দরিদ্র সন্তান পতিত এখন প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব শ্রীযুক্ত পতিতপাবন রায় ওরফে রায় মহাশয়; পরগণার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, —সব একাধারে।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন চন্দ্রের অস্ত হয়, তেমনি বধূর অভ্যুদয়ের সঙ্গে শাশুড়ীর গৃহিণীপনার অস্ত—এ ক্ষেত্রেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। অবস্থাপন্ন পিতার কন্যা, নায়েবের ঘরণী, যোগমায়া যে চিরকাল

শাশুড়ীর 'মুখ-নাড়া' খাইয়া তাঁর 'হাত তোলায়' থাকিবে, এ আশা করা অন্যায় - তা হ'লেই বা শাশুড়ী পাকা গিন্নী! যতদিন চলিয়াছিল, তত দিন একাধিপত্যে সংসার চালাইয়াছিলেন —এখন তাঁর 'পেন্‌সেন্‌' হওয়া উচিত। এ বয়সে তিনি পূজা-আহ্নিক, হরিনামের মালা লইয়া থাকিবেন, যোগমায়া ত এই জানে। এখন তাঁর গিন্নীপনা করিতে যাওয়া কেন? রায় মহাশয়ও তাহাই বুঝিলেন। কাজেই ধীরে ধীরে বধূ যোগমায়া "রায় গিন্নী" পদে উন্নীত হইলেন—আর পতিতের মা, যিনি অত কষ্টে ছেলেকে মানুষ করিয়া এতদিন এই গৃহস্থলী মাথায় করিয়াছিলেন, তাঁকে তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করিয়া ঠাকুর-ঘরে আশ্রয় লইতে হইল। ইহা হইতে কেহ যেন না বুঝেন যে, গৃহস্থলীর কাজ কর্ম্ম করা তাঁর বন্ধ হইল। রাঁধা-বাড়া, ঠাকুর-সেবা, পতিতের একমাত্র পুত্রের লালন-পালন, এমনি সব ছোট খাট হাল্‌কা কাজ তাঁহার রহিল—আর টাকা-কড়ির ভার, ভাঁড়ারের জিম্মা ইত্যাদি ইত্যাদি ভারী ভারী কাজ পড়িল রায়-গৃহিণীর উপর। কিন্তু উপায় নাই, শাশুড়ী বুড়ো হয়েছেন, তিনি কি এখন আর এস সব 'ঝক্কী পোহাতে' পারেন?

এমনি করিয়া রায়-গিন্নীর রাজত্ব ঘর হইতে আরম্ভ হইল—কিন্তু এখানেই শেষ হইল না। ক্রমে গ্রামের লোক এমন কি পরগণার প্রজারাও এই উদীয়মান সূর্য্যের তাপ অনুভব করিতে লাগিল। কথায় বলে—

"মেঘ-ভাঙ্গা রোদ্দুর তার বড় চড়্‌চড়ানি
আর বৌ থেকে গিন্নী হয় তার বড় ফড়্‌ফড়ানি।"

সত্য কথা বলিতে গেলে, শুধু যে পতিতের মাতাই রায়-গিন্নীর প্রতাপে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিলেন, তাহা নহে—"বাহিরে সিংহ-বিক্রম" হইলেও স্বয়ং রায় মহাশয়ও "অন্দরমহলে মেষ প্রকৃতি" ধারণ করিতেন। যে নায়েব মহাশয়ের শাসনে পরগণায় 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত' এ হেন পতিতপাবন রায়-গৃহিণীর হাতে একবারে 'কাদার তাল', তাহা হইতে রায়-গিন্নী ইচ্ছামত ঠাকুরও গড়িতেন, আর মাঝে মাঝে বাঁদর যে না গড়িতেন, এমন নহে।

অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রিয় বলিয়া যে রায়-গিন্নী লোক মন্দ ছিলেন, এ কথা আমরা বলিতে পারিব না। গ্রামের লোকের আনন্দ-উৎসবে, বিপদে-আপদে, রায়-গিন্নী নানা প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। তিনি না হইলে গ্রামের কাহারও মাঙ্গলিক কার্য্য যেন সম্পূর্ণ হইত না - এক মাথা সিঁদুর দিয়া, চওড়া লাল পেড়ে সাড়ী পরিয়া, রায় গিন্নী তাঁর নধর দেহ লইয়া বর-কনে বরণ করিয়া

না লইলে, গৃহস্থ মনে করিত যেন বিবাহের একটা অঙ্গহানি হইয়া রহিল। ছোট ছোট ছেলেপুলেদের অসুখে রায়-গিন্নীর চিকিৎসাই গ্রামের লোকের পছন্দ ছিল. ডাক্তার কবিরাজ দেখাইতে হইলে তাঁর পরামর্শ না লইয়া কেহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত না, আর ডাক্তার কবিরাজেরাও রায়-গিন্নীর পরামর্শ লইতেন। আবার, নায়েব মহাশয়ের অত্যাচার-পীড়িত প্রজা, জমীদারের নিকট দরখাস্ত না করিয়া. রায়-গিন্নীর কাছে আপীল করিত—কেন না, এখানে অত্যাচারের প্রতিকার হাতে হাতে। রায়-গিন্নী শক্তের যম হইলেও, গরীবের মা, এ কথা প্রজারা বেশ জানিত।

(৩)

কত তন্ত্র-মন্ত্র, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন মানত করিয়া, কত ঔষধ-মাদুলী ধারণ করিয়া রায়-গিন্নীর অনেক বয়সে একটী মাত্র পুত্র হইয়াছিল। সাধ করিয়া রায়-গিন্নী তার বড় আদরের পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, ললিতমোহন। ললিত যে কেবল নায়েব মহাশয়ের আঁধার ঘরের একমাত্র আলো ছিল, তাহা নহে—সে তার বৃদ্ধা ঠাকুমা'র একমাত্র আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। সে তার গম্ভীর-প্রকৃতি পিতা এবং অতিরিক্ত শাসনপ্রিয় মাতার নিকট বড় একটা ঘেঁসিত না তার যত কিছু আদর-আব্দার সব ছিল ঠাকুমা'র কাছে। বৃদ্ধাই তাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁকে না হইলে ললিতের এক দণ্ড চলিত না। রায়-গিন্নী যে এটা খুব পছন্দ করিতেন, তাহা নহে, কিন্তু ছেলে সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা বিশেষ দৌর্ব্বল্য ছিল—কাজেই তিনি তাহাকে এ বিষয়ে বাধা দিতে পারিতেন না। ফলে. ললিত বৃদ্ধার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে বার্দ্ধক্যের সঙ্গে পতিতের মা'র গৃহস্থলীর অন্য কাজ কমিয়া গেল – রহিল কেবল পৌত্রের লালনপালন, আর হরিনামের মালা।

রায়-গৃহিণীর দ্বিতীয় এবং প্রধান দৌর্ব্বল্য ছিল, তাঁর শাশুড়ী সম্বন্ধে। বধু অবস্থায় তিনি শাশুড়ীর কাছে যে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, এখন বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া তিনি সে সব দিন ভুলিতে পারেন নাই। শাশুড়ীর উপর 'দাদ্ তোলার' কোন সামান্য সুযোগও তিনি অবহেলা করিতেন না। ফলে পতিতের মা'র যেমন 'বৌ-কাঁট্‌কী শাশুড়ী' নাম রটিয়াছিল—এখন রায়-গিন্নী 'শাশুড়ী কাঁট্‌কী বৌ' আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। এই শাশুড়ী-দলন কার্য্যে বাধা দিবার সাধ্য বা সাহস বাড়ীর কাহারও ছিল না—বরং উল্টা, গিন্নীর দেখা দেখি বাড়ীর অন্যান্য সকলে বৃদ্ধাকে 'হেনস্তা' করিত। কেবল ললিত

মাঝে মাঝে মা'র কার্য্যে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিত— তার ফল কিন্তু বিপরীত হইত, 'ডাইনী বুড়ী' নাকি দুধের ছেলে ললিতমোহনকে এখন হ'তেই তার মা'র বিরুদ্ধাচারী হইতে শিখাইতেছে। বৃদ্ধা শুনিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিত, আর আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। আবার ললিত যখন ঠাকুমা'র কোলে বসিয়া তাঁকে আদর করিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিত, তখন বৃদ্ধা নিজের সব দুঃখ ভুলিয়া যাইত।

(৪)

এমনি করিয়া বৃদ্ধার দিন কাটিতেছিল, কিন্তু এতদিন শরীরে সামর্থ্য ছিল বলিয়া তাঁর নিজের কাজের জন্য পরাধীন হইতে হয় নাই, এবং ললিতের কোন অযত্ন হইতে পায় নাই। কিন্তু এটুকু সুখও পরমেশ্বর বুঝি তাঁর অদৃষ্টে লেখেন নাই। তাই বার্দ্ধক্যের শেষ রোগ অতিসারের আক্রমণ তাঁর জরাজীর্ণ দেহকে জীর্ণতর করিয়া দিল। বুড়া হাড়—অত অসুখেও বৃদ্ধা নিজ হাতেই রাঁধিয়া খাইতেন—কিন্তু শেষে সে শক্তিও লোপ পাইল। রায় মহাশয় মা'র সেবার জন্য একজন দাসী রাখিবার প্রস্তাব সভয়ে গিন্নীর নিকট পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর সে দরখাস্ত না-মঞ্জুর হইয়াছিল--তিনিও গৃহে অশান্তির ভয়ে এ বিষয়ে আর চেষ্টা করেন নাই। রায়-গিন্নীর ব্যবস্থায় পাড়ার এক জন বিধবা আত্মীয় যে এক বেলা রাঁধিয়া দিয়া যাইত, ইহাই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। সংসারে অধিকাংশ লোকই 'হাওয়া দেখিয়া' চলে। আত্মীয়াটিও রায়-গিন্নীকে খুসী করিবার জন্য যা' তা' করিয়া রাঁধিয়া এক খানা পুরাণ পাথরে বৃদ্ধার ভাত বাড়িয়া রাখিয়া চলিয়া যাইত, বৃদ্ধার যখন ইচ্ছা হইত, অথবা যখন ললিত পাঠশালা হইতে ফিরিয়া বেশী পীড়াপীড়ি করিত, তখন আহার করিতেন। আহারের পর বৃদ্ধা নিজেই পাথরখানি ধুইয়া এক পাশে রাখিয়া দিতেন, সন্ধ্যার পর ললিত নিজ হাতে ঠাকুমা'র জন্য এক বাটী দুধ আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইত। বৃদ্ধা এই দুধটুকু বড় তৃপ্তির সহিত খাইতেন—এ যে তাঁর বড় আদরের 'সাত রাজার ধন এক মাণিকে'র স্নেহের দান। বুঝি এই স্নেহের অমৃতপানেই বৃদ্ধা এতদিন মৃত্যুকে দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন এই ভাবে কাটিতেছিল। একদিন জানি না কোন্ শুভ-ক্ষণে বৃদ্ধার দুর্ব্বল হাত হইতে তাঁর ভাত খাওয়ার পুরাণ পাথরখানি পড়িয়া গেল। পাথরখানি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিলেও 'কানা' ভাঙ্গিয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া গেল। আত্মীয়াটি দ্বিপ্রহরে ভাত বাড়িতে গিয়া পাথরখানির অবস্থা

দেখিয়া যথারীতি রায়-গিন্নীর নিকট রিপোর্ট করিলেন। এত বড় লোকসানের খবর পাইয়া রায়-গিন্নী 'তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া' উঠিলেন—"বুড়োমাগীর কি একটু আক্কেলও নেই, এই মাগ্‌গিগোণ্ডার দিনে কতকালের অমন পাথরখানা ভেঙ্গে ফেল্লে গা! এ হাড়-জ্বালানী বুড়ী মরবেও না—কেবল বসে বসে গেরস্তর লোকসান। তা' বেশ, নিজেই ভুগুন, খা'ন এখন কলাপাতে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। রায়-গিন্নীর মন্তব্য শুনিয়া বৃদ্ধা ও ললিত দু'জনের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

রায়-গিন্নী সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর হুকুম দিলেন, ভাঙ্গা পাথরখানা ফেলিয়া দেওয়া হো'ক। ললিত এতক্ষণ চুপ করিয়া মা'র বক্তৃতা শুনিতেছিল—পাথর খানা ফেলিয়া দেওয়ার হুকুম শুনিয়া, সে সেখানা কুড়াইয়া লইয়া ঠাকুরঘরের একটা কুলুঙ্গীতে রাখিয়া দিতে গেল।

ছেলের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া রায়-গিন্নী তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন রে, ললতে, ভাঙ্গা পাথরখানা বল্লাম ফেলে দিতে, তুই তুলে রাখতে গেলি যে? ভাঙ্গা পাথরে খেলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়! হতভাগা ছেলের যত অনাছিষ্টি।"

ললিত মা'র কথার কোন জবাব না দিয়া, ঠাকুমাকে বলিল—"বেশ হয়েছে, মা তোকে বকেছে, তুই যে পাথরটা ভাঙ্গলি, এখন আমার বৌ এসে মাকে কিসে ভাত দেবে?"

কথাটা শুনিয়া মুখরা রায়-গিন্নী স্তম্ভিত হইয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কি ভাবিতেছিলেন জানি না—বোধ হয় তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধাবস্থা ও পুত্রবধূর ভাবী শাসন কালের ছবি তাঁর মানস-চক্ষে উদয় হইতেছিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, রায়-গিন্নী ধীরে ধীরে গিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন।

সেই দিন হইতে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবার ভার রায়-গিন্নী নিজে লইলেন, বৃদ্ধার শেষ-দিন ক'টা বড় শান্তিতে কাটিল। তার পর যেদিন পুত্র-পৌত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পতিতের মা সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন—সেদিন রায়-গিন্নীও মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ীর স্নেহাশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হ'ন নাই। *

---

* এ গল্পের শেষ অংশ আমাদের দেশের একটা প্রচলিত গল্প হইতে লওয়া। এ ধরণের গল্প এখনকার লোকে ভুলিয়া যাইতেছে—অথচ, আমার বিশ্বাস, এই সকল গল্পের মধ্যে আমাদের সমাজের বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়, এবং সেই হিসাবে, সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ইহাই আমার কৈফিয়ত।—লেখক।

পঞ্চভূত।

[লেখক—অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

(৬)

৫। আকাশ।

আকাশের ছয়টী গুণ,—শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। আকাশ নামে যে কোনও বস্তু আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? আকাশের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এ কথা বলা যায় না; কারণ, আকাশ নীরূপ। যে দ্রব্যের রূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। নীরূপ দ্রব্যেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলিলে আত্মারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "অরূপতয়া চক্ষুষস্তত্রাপ্রবৃত্তেঃ। তস্য রূপযোগ্যতামুপাদায়ৈব দ্রব্যগ্রাহকত্বাৎ, অন্যথা আত্মনোঽপি চাক্ষুষত্বপ্রসঙ্গাৎ।" (কিরণাবলী, ১০৬ পৃঃ)

এখন শঙ্কা হইতে পারে, আকাশের যদি প্রত্যক্ষ না হয়, তবে 'ইহ পক্ষী' 'এখানে পাখী উড়িতেছে' এইরূপ প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, সেস্থলে আলোকমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে (১)।

আকাশের প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা অনুমাণ-প্রমাণ বলে সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ শব্দ যে গুণ, তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। "ন্যায়লীলাবতী" কার বল্লভাচার্য্য, শব্দের গুণত্বসাধক অনুমানের আকার দেখাইয়াছেন,—"শব্দো গুণো জাতিমত্ত্বে সতি অস্মদাদিবাহ্যাচাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বাৎ, গন্ধবৎ" (২৫ পৃঃ) শব্দ গুণ, যে হেতু তাহা জাতিমান্ এবং অস্মদাদির বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয়। দৃষ্টান্ত, গন্ধ। মনোভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নামই বহিরিন্দ্রিয়। উদয়ন লিখিয়াছেন,—"মনসোঽন্যদিন্দ্রিয়ং বাহ্যেন্দ্রিয়ং—" (কিরণাবলী, ১০০ পৃঃ) বৈশেষিক-মতে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না (২), নতুবা হেতু ব্যভিচারী হইত। কেন না, বায়ুতে জাতি আছে, এবং তাহা চাক্ষুষ

---

(১) "কথং তর্হীহ পক্ষী নেহ পক্ষীতি প্রত্যয় ইতি চেৎ। আলোকমণ্ডলমাশ্রিত্যেতি ক্রমঃ।"—কিরণাবলী, ১০৬ পৃঃ।

(২) বায়ু-প্রকরণে প্রশস্তপাদাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"তস্যাপ্রত্যক্ষস্যাপি নানাত্বং—" —ভাষ্য, ৪৪ পৃঃ।

প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়াও ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, কিন্তু তাহাতে 'সাধ্য' গুণত্ব নাই; যায়ু দ্রব্য। যাঁহারা বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে হেতুশরীরে 'নিরবয়ত্ব' প্রবেশ করিয়া লইলে কোনও দোষ হয় না। কারণ, স্থূল বায়ুরই প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে হেতুর অপরাংশ থাকিলেও নিরবয়বত্ব নাই। বায়বীয় পরমাণু, নিরবয়ব এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও তাহা বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। শব্দ যে বিশেষ গুণ, তাহাও সিদ্ধ করিতে হইবে। "মুক্তাবলী-প্রকাশে' মহাদেব ভট্ট, শব্দের বিশেষগুণত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমান প্রমাণ দেখাইয়াছেন (৩) যে, "শব্দ বিশেষগুণ, যেহেতু তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এবং তাহাতে গুণত্বের ব্যাপ্য জাতি আছে। প্রভার কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ও বায়ুর কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলেও তাহাতে গুণত্বব্যাপ্য জাতি নাই বলিয়া ব্যভিচার হইল না। গুরুত্বে ব্যভিচার বারণের জন্য 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি' এবং সংখ্যাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য 'দ্বীন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যতারাহিত্যে সতি' বলা হইয়াছে। শব্দে হেতু আছে; কেন না, তাহা কেবল কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং গুণত্বব্যাপ্য জাতিমান্, কাজেই তাহাতে বিশেষগুণত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি হইল।

এই শব্দ, যে দ্রব্যের স্পর্শ আছে, তাহাদিগের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ বা বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। যাঁহারা শব্দকে পৃথিব্যাদির গুণ বলিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতিই শব্দের সমবায়ী কারণ। কিন্তু শব্দ, শঙ্খাদির বিশেষ গুণ হইতে পারে না। কারণ, শঙ্খাদির যাহা বিশেষ গুণ, তাহা শঙ্খাদির অবয়বগত বিশেষ গুণ হইতে উৎপন্ন। শঙ্খ প্রভৃতিতে রূপ, রসাদি যে বিশেষ গুণ আছে, তাহা তদীয় অবয়বগত রূপ রসাদির সজাতীয়। কিন্তু শব্দ এরূপ নহে;—নিঃশব্দ অবয়ব হইতেও শঙ্খাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। নীরূপ তন্তু বা কপাল হইতে কদাচ পট বা ঘটের উৎপত্তি হয় না। শব্দ যখন শঙ্খাদির সমবায়ী কারণের যে গুণ, তাহার অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়, তখন তাহা পৃথিব্যাদির বিশেষ গুণ হইতে পারে না। উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"শব্দো ন স্পর্শবদ্বিশেষগুণঃ প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ। * * স্পর্শবতাং শঙ্খাদীনাং যানি সমবায়িকারণানি তেষাং যে গুণাস্তদনপেক্ষত্বাৎ।

---

(৩) "শব্দো বিশেষগুণঃ লৌকিকপ্রত্যাসত্ত্যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি লৌকিকপ্রত্যাসত্ত্যা দ্বীন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যতারাহিত্যে চ সতি গুণত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বাৎ।"—১৮৯—৯০ পৃঃ।

যে পুনঃ স্পর্শবদ্‌বিশেষগুণা ন তে তদনপেক্ষাঃ যথা রূপাদয় ইতি কেবল ব্যতিরেকী।”—(কিরণাবলী, ১০৬—৭ পৃঃ)

এখন শঙ্কা হইতে পারে, শব্দে স্পর্শবদ্ দ্রব্যের বিশেষগুণত্বাভাবসাধক যে হেতু করা হইয়াছে, তাহা ত ব্যভিচারী হইল। কারণ, শ্যাম ঘটে অগ্নি সংযোগাধীন যে রক্তরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, 'অকারণগুণপূর্ব্বকত্ব' রূপ হেতু, তাদৃশ রক্তরূপে আছে, কিন্তু তাহাতে 'স্পর্শবদ্‌বিশেষগুণত্বাভাব' রূপ সাধ্য নাই। কারণ, রক্তরূপ, স্পর্শবদ্ ঘটাদিরই বিশেষ গুণ। ইহার উত্তর এই যে, শ্যাম ঘটে অগ্নিসংযোগ করিলে যে রক্তরূপের উৎপত্তি হয়, বৈশেষিক দর্শনের মতে তাহাও কারণ-গুণপূর্ব্বক। ঘটাদিতে অগ্নিসংযোগ হইলে ঘটাদির আরম্ভক পরমাণুগুলির পরস্পর সংযোগ নাশানন্তর ঘটাদির নাশ হয়। তখন স্বতন্ত্র পরমাণুগুলিতে অগ্নিসংযোগ নিবন্ধন শ্যামরূপের নাশ এবং রক্তরূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তা'র পর, সেই রক্ত পরমাণু হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে ঘটাদির উৎপত্তি হয়। কাজেই ঘটাদির রক্তরূপ, ঘটাদির সমবায়ী কারণ কপালাদির রক্তরূপপূর্ব্বক। সুতরাং আর ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই। নৈয়ায়িকেরা ঘটাদিতেও পাক স্বীকার করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে অগ্নিসংযোগ হইলে ঘটাদির নাশ হয় না। ঘটগত শ্যামরূপের নাশানন্তর রক্তরূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিলে পূর্ব্বোক্ত হেতুর ব্যভিচারিতা বারণ করিবার জন্য "অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি" এই ভাবে হেতুতে নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপ নিবেশ করিলে রক্তরূপাদিতে আর ব্যভিচার হইবে না। কারণ, তাদৃশ রক্তরূপের প্রতি অগ্নিসংযোগ অসমবায়ী কারণ। জলীয় পরমাণুর রূপ, কারণ-গুণপূর্ব্বক নহে, এবং তাহার প্রতি অগ্নিসংযোগও অসমবায়ী কারণ হয় না; কারণ, তাহা নিত্য। এখন এই জলীয় পরমাণুর রূপে হেতু আছে, কিন্তু সাধ্য নাই; কাজেই ব্যভিচার হইতে পারে, এই জন্য হেতু শরীরে 'প্রত্যক্ষত্বে সতি' বলা হইয়াছে। জলীয় পরমাণুর রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। সম্পূর্ণ অনুমানটীর আকার এই,—"শব্দো ন স্পর্শবদ্ বিশেষগুণঃ অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ, সুখবৎ।"

"শব্দঃ প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণ গুণপূর্ব্বকত্বাৎ ...... ন স্পর্শবদ্‌বিশেষণং—" প্রশস্তপাদভাষ্যের এইরূপ পাঠ অনুসারে জগদীশ "সূক্তিতে" ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে (৪), শব্দ, পৃথিব্যাদি চারিটী দ্রব্যের গুণ নহে, যেহেতু তাহা প্রতিনিয়-

(৪) "শব্দো ন স্পর্শবদ্‌বিশেষণং পৃথিব্যাদিচতুর্ণাং গুণ ইতি সাধ্যার্থঃ। অত্র হেতুঃ

তেন্দ্রিয়গ্রাহ্য (অর্থাৎ নিয়মতঃ একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয়) এবং অকারণ-গুণপূর্ব্বক। জগদীশের মতে শব্দে বিশেষগুণত্বের সিদ্ধি না করিয়াও তাহা যে স্পর্শবদ্ দ্রব্যের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করা যায়। কারণ, তিনি 'প্রত্যক্ষত্বে সতি' ইহার অর্থ করিয়াছেন—"প্রতিনিয়তেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি।" জগদীশ, পাকজ রূপাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্ত হেতুতে 'অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি' এইরূপ বিশেষণও দেন নাই। কেন না, তিনি 'অকারণগুণপূর্ব্বকত্বে'র 'স্বাশ্রয়সমবায়িকারণবৃত্তিসজাতীয়গুণপূর্ব্বকজাতীয়ান্তত্ব' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ঘটাদির পাকজ রক্তরূপ, স্বাশ্রয়সমবায়িকারণবৃত্তিসজাতীয়-গুণপূর্ব্বক-জাতীয়, কাজেই ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই।

[ক্রমশঃ।

মোস্‌লেম সভ্যতার ইতিহাস
মোস্‌লেম জগতে বিদ্যাচর্চ্চা *

প্রথম খণ্ড ॥

আলোচনা।

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় বি, এ।]

মনস্বী কারলাইল বলিয়াছেন, "Allah Akbar, God is great."—and then also "Islam." That we must submit to God. That our whole strength lies in resigned submission to Him, whatever He do to us. For this world, and for the other ! The thing He sends to us, were it death and worse than death, shall be good, shall be best ; we resign ourselves to God. "If this be Islam", says Goethe, "do we not all live in Islam ?" Yes, all of us that have any moral life ; we all live so.' (১)। ইহাই

প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণগুণপূর্ব্বকত্বাদিতি। পরমাণুরূপয়োর্ব্যভিচারস্ত বারণায় সত্যন্তং প্রতিনিয়তেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতীত্যর্থকম্। তথাচ রূপরসাদৌ ব্যভিচার্য্যতো বিশেষ্যদলং স্বাশ্রয়-সমবায়িকারণবৃত্তিসজাতীয়গুণপূর্ব্বকজাতীয়ান্তত্বাদিতি তদর্থঃ।"—সূক্তি।

* মোহাম্মদ কে, চাঁদ প্রণীত। প্রকাশক মহীনউদ্দীন হুসান, নূর লাইব্রেরী ১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ২০৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১া০ টাকা।

(১) Lectures on Heroes (Chelsea edition) p. 226-227.

যখন হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ধর্ম্ম, তখন ইহা যে সার্ব্বভৌমিক সনাতন ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরবের মরুভূমে এই নবধর্ম্মের উন্মেষে, প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত হইয়াছিল এবং পরে লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠ হইতে সাগর-মেখলা-বেষ্টিত হিস্পানী দেশ পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় জনপদেই সে কম্পনের বেগ অনুভূত হইয়াছিল। মোহাম্মদের ধর্ম্মবল যে বিপুল ছিল, তাহার প্রমাণ ইউরোপে মূর ও তুরুকের প্রভাব। প্যাগম্বরের অমিত শক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মরুবাসী আরবগণ যে এক কালে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার জের ইউরোপ এখনও মিটাইতে পারে নাই। খ্রীষ্টান ইউরোপে অদ্যাপি প্লুতকণ্ঠে নিত্য কোরাণ পাঠ হইতেছে। গোয়াডাল কুইভার তীরে কোরাণ সূত্রাঙ্কিত সুন্দর প্রকোষ্ঠাদিসহ মোসলেম রাজপ্রাসাদ আজও উন্নতশীর্ষে ইসলামের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সহস্রাধিক বর্ষ পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া যে ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহার প্রসারণ কখনই পাশব বলে হইতে পারে না। নব ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতাই ইহার সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ।

যখন সমগ্র পৃথিবী শিল্প চর্চ্চা ও ব্যবহারিক শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে অবস্থিত ছিল, তখন মোসলেমগণই জগতে বিবিধ নূতন শিল্প দ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোসলেমগণের উন্নতি যুগে ইস্‌লাম জগতের সর্ব্বত্রই শিল্প বাণিজ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন প্রাচ্যে আসুর (Assyria), বভেরু (Babylon) আফ্রিকার মিস্রাইম (Egypt), পারস্য, ভারতবর্ষ এবং চীন, এবং প্রাচীন প্রতীচ্যে রোমক ও যবন সাম্রাজ্য অপেক্ষা ইস্‌লাম জগত সভ্যতায় অর্ব্বাচীন হইলেও মোসলেমগণের প্রাচীন ইতিহাস গৌরব-শ্রীমণ্ডিত। মধ্যযুগে সমগ্র মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ইসলাম সভ্যতার ইতিহাস ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সুতরাং মোস্‌লেম সভ্যতার ইতিহাস এবং মোস্‌লেম জগতের বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যের সম্যকরূপে আলোচনা না হইলে মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ লিখিত হইলেও বঙ্গ ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এক খানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয় নাই। মোসলেমগণের মধ্যে স্বজাতিপ্রেমিক, স্বধর্ম্মনিরত সুধীবর্গের অভাব নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দীনা বঙ্গভাষার এই অভাব বহু পূর্ব্বেই দূর করিতে সমর্থ হইতেন। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে,

মূলেখক মোহাম্মদ কে, চাঁদ কর্ত্তৃক এই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি সভ্যতার প্রথম সোপান মোসলেম বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া জননী বঙ্গভাষার চন্দনচর্চ্চিত পাদপদ্মে যে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গালী হিন্দু মোসলমান তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানচর্চ্চার জন্য যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা অমূল্য। তিনি বলিয়াছেন, "স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ও স্বদেশপ্রেমিকের পুণ্যশোণিত অপেক্ষা পণ্ডিতের ব্যবহার্য্য মসী অধিকতর পবিত্র ও মূল্যবান" (৩ পৃঃ)। "জ্ঞান স্বর্গপথে প্রদীপের, মরু-শ্মশানে বন্ধুর, নির্জ্জনতায় প্রিয় সহচরের ও নির্ব্বাসনে পরম সুহৃদের ন্যায় কার্য্য করে। ইহা সুখশান্তির পথপ্রদর্শক ; দুঃখ দারিদ্র্যের অবলম্বন ; বন্ধু সমাজের অলঙ্কার, শত্রুর মধ্যে রক্ষা কবচ" (৬ পৃঃ)। "হে আলি, জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অভাব অপেক্ষা কোন অভাবই, অধিকতর ভারবিশিষ্ট নহে" (৫ পৃঃ)। "কাহারো আরাধনা ও উপাসনা কিম্বা তাহার অত্যধিক উপবাস ব্রতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার বিজ্ঞতা কিরূপ তাহাই দেখিবে"। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানচর্চ্চা করিতে আপন শিষ্যমণ্ডলীকে কেবল উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও মকতবখানা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্যাবলীর উপর নির্ভর করিয়া মোসলমানেরা জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থে ইসলাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বিদ্যানুরাগ ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশবাণী, খলিফা ও অন্যান্য নৃপতিগণের বিদ্যোৎসাহ এবং মোসলেম জগতস্থ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যামন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ প্রবন্ধাকারে "ইসলাম প্রচারক", "কোহিনূর" "ভারতী", ও "সুপ্রভাতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় মোসলেম জগতের বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি যে সমুদয় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য প্রমাণ-পঞ্জী উপস্থাপিত করা হয় নাই। এই তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমুদয় যুক্তি-জালের অবতারণা করিতে হয়, বা প্রথম শ্রেণীর সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হয়, তাহাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্পেন দেশে মোসলেম শিক্ষার ব্যবস্থা ফলে তথায় বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ও তাঁহাদিগের স্বাধীন গবেষণা দ্বারা যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইউরোপের বুধমণ্ডলী তাহাই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে বিজ্ঞান শাস্ত্রে এক অভিনব যুগ উপস্থিত করিয়াছেন"। (১০ পৃঃ)। কিন্তু অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, "তৎকালীন গোঁড়া ধর্ম্মাচার্য্যগণ, এমন কি কোন কোন খলিফাও বিজ্ঞান শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, বিজ্ঞান শিক্ষা অঙ্কুরেই রহিয়া গেল। যাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শনানুশীলনে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।" (২৫ পৃঃ) "তৎকালে মুসলমানেরা যদিও যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করিতে সক্ষম হন নাই। তৎকালীন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" (২৫।২৬ পৃঃ)।

গ্রন্থকারের এই উভয়বিধ উক্তি পরস্পর বিরোধী। ইহার কোন্‌টীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক মোসায়েম (Moshem) এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধেই হউক, বা জ্যোতিষ, দর্শন অথবা গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধেই হউক, সমস্ত জ্ঞানের বিষয় যাহা দশম শতাব্দী হইতে ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা মূলতঃ আরবদিগের বিদ্যালয় হইতেই প্রচারিত হয়, এবং স্পেনদেশীয় সারাসেনদিগকে ইউরোপের দর্শনশাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া বিশেষ ভাবে সম্মান করা যাইতে পারে।" (১৫ পৃঃ)। আবার অন্যত্র এবনুল-কিফ্‌তীর 'তারিখ-উল-হোকমা'র লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, "তাঁহারা এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মবিধি (শরা) অজ্ঞতা হেতু কলুষিত এবং ভ্রান্তিজনক কার্য্য দ্বারা বিকৃত করা হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম বিশ্বাস ও গবেষণার সাহায্যে লব্ধজ্ঞানের মিলনকারী দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত ইহাকে পবিত্র ও নির্দ্দোষ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন যে, যদি গ্রীক দর্শন শাস্ত্র আরবীয় ধর্ম্মের সহিত মিলিত করা হয়, তবেই পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।" (৩৫ পৃঃ)।

"সাসানিদ বংশীয় 'খসরো-অন্-নৌশেরোয়ান' চুসিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত গোন্দেশাপুরে একটী বিদ্যামন্দির (একাডেমি) প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহা পারস্য

রাজ্যের পতন সত্বেও সাসানিদদিগের পরে তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত উন্নতিশীল অবস্থায় ছিল। এই একাডেমিতে (বা বিদ্যামন্দিরে) গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র পঠিত, ও চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদিত হইত।" (৪২ পৃঃ)। "সোলেমান বিন আব্দুল মালিকের অধীনে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁহার মিশর শাসন কর্ত্তৃত্বের সময় গ্রীক বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েন। এখানে তিনি এব্নে আবজার নামে এক জন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষকের পরিচয় লাভ করেন। বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল ব্যাপী ও স্থায়ী হওয়ায় ওমর বিন আব্দুল আজিজ খলিফা হইয়া এব্নে আবজারকে চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।" (৪১ পৃঃ)। এই প্রকার বিরুদ্ধভাবাপন্ন উক্তি এই গ্রন্থে অনেক আছে।

বোগ্দাদের প্রাচীন খলিফাগণের রাজত্ব কালে এবং ভারতে মোসলমান অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ও আরব্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালে মহম্মদ বিন্ মুসা একখানি সংস্কৃত বীজগণিত ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন (১)। এই সময়ে মিকা এবং ইব্ন্ দাহান্ সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে কতিপয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (২)। এই সময়ের বহু পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্র চরকসংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা আরব্য ভাষায় অনূদিত হওয়াতে আরবগণের মধ্যে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল (৩)। বিশ্ববিখ্যাত খলিফা হারুণ-অলরসিদের দেহ-চিকিৎসক মঙ্ক বিষ সম্বন্ধীয় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করেন (৪)।

ভারতে মোসলমান অধিকারের আদিযুগে মোহাম্মদ বিন্ ইস্রাইল আল তানুখি নামক জনৈক মনীষী জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এতদ্দেশের নানা স্থানে পর্য্যটন করেন (৫)। ইহারও পূর্ব্বে আবু মাজার নামক আর এক জন জ্ঞানপিপাসু মোসলমান সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থ বারাণসীতে গমন করেন (৬)।

---

(১) Colebrook, Miscellaneous Essays Vol. II. P. P. 444-500.
(২) Biographical Dictionary, L. U. K. Vol. II. P. 242.
(৩) Diez, Analecta Medica, P. P. 126-140.
(৪) Journal of Education, Vol. III. P. 176.
Antiquity of Hindu Medicine P. 64.
Elliot's—Historians, Vol. V. P. 572, foot note.
(৫) Michael Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialeusis, P. 439.
(৬) Ain-i-Akbari Vol. II. P. 288.

ইহার চারি শতাব্দী পরে ইব্‌ন্‌-আল্‌ বাতিহার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন (১)। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট ফিরোজশাহ তগলকের আদেশে মৌলানা ইজ্জুদ্দিন খালিদ্‌খানি নগরকোটের পুস্তকাগার হইতে দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহাকে 'দলাইল্‌-ই-ফিরোজশাহী' নাম প্রদান করেন (২)। গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদশাহ খিল্‌জীর আদেশে সংস্কৃত হইতে পারসীক ভাষায় অনূদিত পশু চিকিৎসা বিষয়ক এক খানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের নাম কুররুতউল্‌মুলক্‌ (৩)। এই গ্রন্থ অনূদিত হইবার বহু পূর্ব্বে বোগ্‌দাদ নগরীতে পশু চিকিৎসা বিষয়ক অপর এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরব্য ভাষায় 'কিতাব্‌-উল্‌ বাইতারাৎ' নামে ভাষান্তরিত হইয়াছিল (৪)। এই সমুদয় তথ্য আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

আরবগণকেই ভূগোল শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। যে সমুদয় মোসলমান গ্রন্থকার ভূগোল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে ইবন্‌ বতুতা এবং ইদ্রিসির নাম ব্যতীত অপরাপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম এই গ্রন্থ মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। জমখশরী, আবুল ফেদা প্রভৃতি গ্রন্থকারগণও প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ছিলেন। আরবের অনেক খ্যাতনামা "আলেম" একত্রিত হইয়া ভূগোল আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ৯০০ খৃষ্টাব্দে, এক দল এসিয়ার পূর্ব্বাংশের শেষ আবিষ্কারের জন্য, এবং অন্য দল ইউরোপের দিকে ধাবিত হন। শেষোক্ত দল পর্ত্তুগাল হইতে অর্ণবযান-যোগে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া ২৪ দিন পরে কোনও দ্বীপে উপনীত হন। আরবগণ যখন স্পেন জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহারা আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তথাকার গ্রীষ্মাধিক্য দেখিয়া, তাঁহারা সেই স্থানকে "কালকোরণ" (অর্থাৎ এই স্থানটী তাওয়ার ন্যায় অত্যধিক উষ্ণ) বলেন। জনসাধারণ এই নামের পরিবর্ত্তন করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার পশ্চিম ভাগকে 'কালিফর্ণিয়া' নামে অভিহিত করিতেছে (৫)।

---

(১) Modern University History Vol. II. P. 274.

(২) Elliot, History of India Vol. V. P. 573.

(৩) Elliot, History of India Vol. V. P. 574.

(৪) Ibid.

(৫) প্রবাসী ১৩২২, ভাদ্র ৬১৫ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার লিখেন নাই, কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, মোসলমানগণের উন্নতি যুগে সৈয়দা আজলিয়া নাম্নী একটী মহিলা তাৎকালীন প্রসিদ্ধ শিল্পাবিষ্কর্ত্তৃ-গণের অগ্রণী ছিলেন।

মোস্‌লেম সভ্যতার উন্নতিযুগে শিল্প বাণিজ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সিরিয়া প্রদেশের হেমছনগরের জুম্মা মসজেদের তোরণ দেশের গুম্বজে লৌহনির্ম্মিত স্তম্ভে একটী মনুষ্যের প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটির দুই হস্তই মুষ্টিবদ্ধ, কেবল উভয় হস্তের তর্জ্জনী মুক্ত এবং সরল ভাবে ঊর্দ্ধদিকে সংস্থাপিত ছিল। এই মূর্ত্তিটি বায়ুর গতি নির্ণয়ের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। বায়ুর গতি যখন যে দিকে ফিরিত, অঙ্গুলীদ্বয় সেই দিকেই চালিত হইত। এই যন্ত্রের নাম 'আবুরিয়াহ।'

খলিফা দ্বিতীয় আবদুর রহমান পাইপের সাহায্যে সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবু আবদুল্লা মস্তন্‌সারের উদ্যানস্থিত অত্যাশ্চর্য্য প্রমোদ-সরোবরে যে উপায়ে জল সরবরাহ করা হইত, তাহাকে আধুনিক জলের কলের পূর্ব্বসংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মোসলমানগণের উন্নতিযুগে বিভিন্ন প্রকারের ঘড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দমাস্ক নগরের ভুবনবিখ্যাত জুম্মা মসজিদের যে ঘড়িটী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা একটী বিস্ময়কর ব্যাপার। মসজেদের মিনারের গাত্রে একটী গবাক্ষ দ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বাদশটি পিত্তল নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বিরাজমান ছিল, আবার প্রত্যেক সোপানে দ্বাদশটী ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল। প্রথম ও শেষ সোপানে, পিত্তলের পাত্রোপরি দুইটী সুদৃশ্য বাজ পক্ষীর অবয়ব নির্ম্মিত ছিল। এক ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হইলে, উভয় বাজপক্ষী ঈষদ্ভাবে গ্রীবা লম্বা করিয়া স্ব স্ব চঞ্চুর সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত এক একটী পিত্তলের গুলি সজোরে তাহাদের সম্মুখস্থ পিত্তল গাত্রে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে যে শব্দ হইত, তদ্দ্বারা সময় নিরূপণ কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইত (১)। এইরূপ অনেক আবশ্যকীয় কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সালার্ণোর মেডিকেল কলেজ ইউরোপের আদি ও প্রাচীনতম এবং আদর্শ চিকিৎসা বিদ্যালয়" (১৩৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই।

---

(১) প্রবাসী ১৫শ ভাগ, প্রথম খণ্ড ৬১৫ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "মোসলমানগণ তাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক, পবিত্র "কোর আন্" পাঠ করিবার জন্য ও ইহার গূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য যে সকল বিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বোধ হয় যে. পৃথিবীর কোন সভ্যজাতি তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বোধ সৌকর্য্যার্থে তদ্রূপ বিদ্যার উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হন নাই।" এই সমুদয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার সময় গ্রন্থকার হিন্দুদিগের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

পতিতার পথ।

[লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।]

(১)

সেদিন গোপালনগরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। উপবাস-ক্লিষ্ট বহু নরনারী জীবনকে ধন্য করিবার আশায়, ও পুণ্যলাভ করিবার আগ্রহে সিংহাসন-স্থিত বিরাট পুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। সুবর্ণ-বিগ্রহের সম্মুখে, আশে-পাশে ঘৃত ও সুগন্ধি তৈলে শত শত প্রদীপ জ্বলিতেছে। পুষ্প, ধূপ, অগুরু ও চন্দনের গন্ধে সান্ধ্য-বায়ু আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে কাঁসর, ঘণ্টার শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া আরতি আরম্ভ হইল। আরতি দেখিবার নিমিত্ত সকলেই আগে যাইবার জন্য ভিড়টাকে জমাট বাঁধিয়া দিল। প্রধান পূজারী জনতাকে যথাসাধ্য শান্ত করিতে লাগিলেন। সেই সময় বহুমূল্য বস্ত্র-পরিহিতা, মানালঙ্কার-ভূষিতা, এক সুন্দরী রমণী দেবতা-দর্শন করিবার মানসে দাসীর সহিত শিবিকারোহণে উপস্থিত হইয়া ভিতরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা একটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া, সে একেবারে পূজারীর উপরে গিয়া পড়িল। তখন সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, অবনত মস্তকে তাঁহাকে বলিল—"ক্ষমা করুন, না জেনে অপরাধ করেছি।" পূজারী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"চুপ কর হতভাগিনী পতিতা। আমাকে স্পর্শ করিস্ তোর এত স্পর্দ্ধা! দূর হ এখান থেকে।" আঘাত পাইয়া চিত্রা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর পূজারীর দিকে স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সত্যই আমি হতভাগিনী পতিতা। কিন্তু আজ ঠাকুরের জন্মদিনে আপনি মানুষকে যে অপমান করলেন, এতে কি দেবতা সন্তুষ্ট হবেন? আপনি পাপকে ঘৃণা করতে পারেন, পাপীকে ঘৃণা করবার

অধিকার আপনার নাই।" এই বলিয়া সে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(২)

গভীর রাত্রি, নির্জ্জন কক্ষ। চিত্রা দেবালয় হইতে ফিরিয়া শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। পুজারীর শেষের কথা কয়টা তাহার বুকের মধ্যে সর্ব্বদা তীরের মত বিঁধিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দারুণ বেদনায় তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার বাল্যকালের কথা। যখন কোন চিন্তাই ছিল না, কেবল পিতামাতার আদর ও ভালবাসা, এবং সঙ্গিনীদের সহিত প্রাণ খুলিয়া হাসি ও আমোদ। সমস্ত দিন লুকোচুরি খেলা, গাছে উঠিয়া ফল পাড়া, দোল খাওয়া, পুকুরে সাঁতার কাটা; সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া শাঁখ বাজান, তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া, ঠাকুরঘরে প্রণাম করা, বাবার সঙ্গে আহার করিয়া, মার কোলে শুইয়া গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়া। এমনই কত মধুর স্মৃতি-মাখা কথা; সেই একদিন, আর এই একদিন। তারপর আট বৎসর বয়সের সময় পিতার সেই গৌরীদান—এক জন অজানিত নূতনের সহিত তাহার মাল্যবিনিময়। শেষে এক কাল রাত্রিতে সব শেষ। ছয় মাস না যাইতেই স্বামীরূপ অপূর্ব্ব পদার্থকে চিনিবার পূর্ব্বেই সকল সাধ, সকল আনন্দের বিসর্জ্জন! কন্যার বৈধব্য শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, জ্ঞাতিদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, পিতা মাতার সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ। তারপর যৌবন-মধ্যাহ্নে, যেদিন বিদ্রোহী হৃদয়ের বুভুক্ষিত লালসা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, দৃঢ়তা সমস্ত সবলে ঠেলিয়া দিয়া, কি এক হেয়, কলুষিত, বিষাক্ত দ্রব্যের আস্বাদনে ব্যাকুল হইয়া নিজেকে সর্ব্বনাশ সাধন করিল, কি ভীষণ সেই রাত্রি!!

চিত্রা আজ আত্মবিস্মৃতা! তাহার অন্তরাত্মা যেন তাহাকে বলিতে লাগিল —"ওরে পতিতা! তোর এই অভিশপ্ত জীবনের ওপর দিয়ে কত দিন কেটে গেছে; এখনও কি আশা মেটেনি!" চিত্রা শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর মাথার কেশ কর্ত্তন করিল। অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া অন্তরালে ছুঁড়িয়া ফেলিল। মূল্যবান বস্ত্র ছাড়িয়া সামান্য বসন পরিধান করিল।

(৩)

বন্যা-প্লাবিত গ্রাম। কত কুটীর পড়িয়া গিয়াছে, কত লোক আশ্রয়শূন্য হইয়া বৃক্ষের উপর বসিয়া আছে। কত মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুর দেহ জলে

ভাসিতেছে। চিত্রা নৌকারোহণে। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাগরিকদিগকে বলিতে লাগিল—"যারা এই কাল গ্রামের বাঁধ বেঁধে দেবে, আমি তাদের হাজার টাকা বক্‌শিস্ করব। তোমরা যদি রাজী থাক বল।" পুরস্কারের লোভে অনেকেই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল। সে তখন আরও নৌকা আনাইয়া লোকজন লইয়া, যে স্থান দিয়া সবেগে গ্রামের মধ্যে জল প্রবেশ করিতেছিল, সেখানে গেল, এবং সমস্ত দিন তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিল। তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বাঁধ বাঁধা হইয়া গেলে, গ্রাম হইতে জল সরিয়া গেল। যাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়াছিল, সে তাহাদের ঘর বাঁধিবার খরচ দিল; যাহারা অনাহারে ছিল, তাহাদের আহারের যোগাড় করিয়া দিল। সকলে দুই হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল—"বেঁচে থাক মা, এমনই করে সকলের উপকার করতে বেঁচে থাক।" বাড়ী ফিরিবার সময় চিত্রা দেখিল, এক কুটীর-দ্বারে একটী মুসলমানী তাহার শিশুকন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মরিয়া রহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে মাতার বাহুপাশ হইতে সন্তানটীকে মুক্ত করিল, এবং পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, তাহার দেহ শীতল, কিন্তু প্রাণ রহিয়াছে। তখন আগুন জ্বালিয়া সে শিশুর হাত পায়ে সেঁক দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে শিশু চেতনা পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—"মা।" চিত্রা চমকিয়া উঠিল—একি স্বপ্ন, না সত্য! কবে কোন্ সুদূর অতীতে এই স্নেহের ডাক শুনিয়া সে তাহার মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তারপর বহুদিন, বহুদিন, আর সে মিষ্ট আহ্বান সে শোনে নাই। শিশু আবার ডাকিল—"মা।" চিত্রা বলিল—"কেন মা?" আজ তাহার মৃত মাতৃত্ব কি অমৃত পানে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। জমাট অশ্রু স্নেহস্পর্শে ঝর ঝরে ঝরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে কত অজানিত মধুর ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, আনন্দের আবেগে পৃথিবী তাহার চক্ষে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, সে জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে। কি বলিয়া, কি করিয়া কন্যাটীকে আদর করিবে ভাবিয়া পাইল না। শুধু শিশুটীকে বুকে ধরিয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, শিশুটীর জন্য দুগ্ধ আনাইয়া তাহাকে পান করাইল। তারপর তাহার মাতার সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে লইয়া গৃহ-অভিমুখে যাত্রা করিল।

(৪)

চিত্রার অনেক কাজ। সে প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সন্ধান করে, কাহার

গৃহে অন্ন নাই, অর্থাভাবে কোন্ রোগীর চিকিৎসা হইতেছে না, কাহার শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, লোকের এই সমস্ত দুঃখ মোচনে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে, কার্য্যের অবসরে গ্রামস্থ বালক বালিকাদিগকে কোলে লইয়া আদর করে। সৎশিক্ষা দেয়, বড় হইয়া যাহাতে তাহারা প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। যে মুসলমান কন্যাটীকে সে গৃহে আনিয়াছিল, একণে সেই শিশু বড় হইয়াছে, এবং তাহাকে "মা" বলিয়া ডাকে। তাহার স্নেহ ও ভালবাসায় একদিনও সে নিজের মাতার অভাব বুঝিতে পারে নাই। এইরূপে চিত্রা তাহার দিনগুলি কাটাইতেছিল।

* *
*

একদিন চিত্রার নিজ গ্রাম রামপুরে প্রবল ভাবে মড়ক দেখা দিল। প্রত্যহ কত লোক মরিতে লাগিল. প্রাণের ভয়ে অনেকেই দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। চিত্রার বিশ্রামের অবসর নাই। জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া দিবারাত্রি রোগীর সেবাই তাহার কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। কার্য্য করিতে করিতে এক একদিন প্রাণের আনন্দে সে আবৃত্তি করিতে থাকে—"ঠাকুর! যতই এগোচ্ছি, ততই যেন তোমার পথের সন্ধান পাচ্ছি!" একদিন সে একটী কুটীরে গিয়া দেখে যে, এক জন ব্রাহ্মণ রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্রই সে চিনিল—সেই পূর্ব্বপরিচিত পূজারী। পূর্ব্বের সমস্ত অপমান ভুলিয়া গিয়া, সে তৎক্ষণাৎ দূর গ্রাম হইতে ভাল চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার চিকিৎসার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিল। পরম যত্নে স্বয়ং ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিল। কয়েক দিবস অক্লান্ত শুশ্রূষার পর সে তাঁহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে ফিরাইয়া আনিল। ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া, সে মরণাক্রান্ত অন্য রোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু তাহার শরীরের দুর্ব্বলতার জন্য সে পথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তখন সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে লইয়া গেল। এইবার ব্রাহ্মণের ব্যাধি প্রবল ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিল। চিকিৎসার কোন ফল হইল না। দিন দিন তাহার জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর একদিন অপরাহ্ণে তাহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পালিতা কন্যা এবং গ্রামস্থ বালক বালিকারা তাহার জন্য কাঁদিতে লাগিল। চিত্রা তাহাদিগকে

সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন মন্দিরের পূজারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং অনুতপ্ত কণ্ঠে তাহাকে বলিলেন —"মা, তোমাকে চিন্‌তে পারিনি, আমাকে ক্ষমা কর।" চিত্রা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমাকে দেবতা দর্শন করান। সেই দিন থেকে আর মন্দিরে যাইনি !" তখন সকলে তাহাকে লইয়া দেবালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

(৫)

সন্ধ্যা হইয়াছে। বহু দিন পূর্ব্বের ন্যায় আজও ঠাকুরের তেমনই আরতি হইতেছিল। তেমনই দীপ জ্বলিতেছিল। পুষ্প-গন্ধে তেমনই চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিয়াছিল। চিত্রা অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া দেবতাকে প্রণাম করিল। তারপর হাস্যমুখে বিনীত ভাবে পূজারীকে বলিল -"ঠাকুর, দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই একদিন, আর এই একদিন। সেদিন আপনার অবজ্ঞাই আমাকে নরকের পথ থেকে ফিরিয়েছিল, আমার জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় পথ নির্দ্দেশ করেছিল, আমাকে সত্যধর্ম্ম শিখিয়েছিল। আপনি আমার গুরু, আপনার চরণে এ জীবন দক্ষিণা দিলাম।"

চিত্রা পূজারীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"যাও মা শান্তির স্বর্গে। সে দ্বার তোমার রুদ্ধ নহে ! তোমার পাপ-কলুষিত চিত্ত এখন পুণ্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, নির্ম্মল, পবিত্র, ও নমস্য !"

এত আত্মহত্যার হেতু কি ?

[৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।]

আত্মহত্যা-সম্বন্ধে অতীতের সহিত তুলনা করিয়া, বর্ত্তমানের বিচার করিবার জন্য তদ্বিষয়ক কোনও হিসাবের অঙ্ক আপাততঃ যে আমাদের সম্মুখে আছে, তাহা নহে। অঙ্ক আদৌ নাই; পরন্তু সে অঙ্ক অধ্যয়নের জন্যও আমরা আগ্রহান্বিত নহি। কারণ, আমরা জানি যে, সরকারী রিপোর্টে উত্থিত এরূপ অঙ্কের মূল্য, তোমার আমার অনুমানের মূল্য অপেক্ষা বড় অধিক নহে। গণিতের আসল কলের অনুপাতে অনুমান ও এতাদৃশ অঙ্ক প্রায় তুল্যমূল্য; বরং অনুমানের মূল্য অধিকতর; কারণ অনুমান স্বতঃ অভিজ্ঞতামূলক। এখন

মূলে, আমরা অঙ্কের অভাবে অথবা তাহার আসলঙ্কের অভাবে, অনুমানের অনুসরণ করিতে আর অধিক কৈফিয়ৎ না দিলেও অন্যায় হইবে না। কিন্তু আত্মহত্যার ন্যূনাধিক্য সম্বন্ধে আমাদের কথা থাকিলেও সে কথা ততটা নহে, যতটা আত্মহত্যা সম্বন্ধে কথা; পরন্তু, আত্মহত্যা সাধারণভাবে এইক্ষণে আমাদের তাদৃশ আলোচ্য নহে, যাদৃশ আলোচ্য সধবা নারীদিগের কৃত আত্মহত্যা। যেহেতু এই কথাটা লইয়া বিগত কয়েক মাস হইতে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে এবং সে আন্দোলনে এ দেশীয় কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোক ও অজ্ঞাত-প্রকৃত-তথ্য এক-আধ জন এঙ্গোলো ইণ্ডিয়ান সম্পাদক স্ব স্ব মূর্খতা এবং শঠতা উন্মুক্ত হস্তে এতাধিক ব্যয় করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহাদের বাহাদুরীর জন্তও বারেক "বাহাবা" দেওয়া উচিত।

সে কাল অপেক্ষা এ কালে আত্মহত্যা অধিক কিম্বা অল্প সংখ্যায় সংঘটিত হইতেছে, এ অনুমান আমরা করিব না; করার প্রয়োজন নাই। তবে ইহা আমরা অত্যুচ্চ কণ্ঠে বলিব, আত্মহত্যার বাহ্য স্ফুরণের কোনও হিসাব না করিয়াই বলিব যে, এ যুগে যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ দীক্ষা, বায়ুর চলাচল যেরূপ, স্থান-কাল-পাত্র যেরূপ, তাহাতে নিত্যই ত দেখিতেছি—দিব্যচক্ষে নিয়তই আমরা দেখিতেছি যে,—প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক শতেকে অশীতিজন হিন্দু সন্তান অথবা তাহারও অধিক সংখ্যক নর নারী আত্মহত্যা করিতেছে। আত্ম-হত্যা কাহাকে বলে? স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া আত্মাকে অসংখ্যবার শয়তানের শ্রীপাদপদ্মে বলিপ্রদান অপেক্ষা অধিকতর প্রখর আত্মহত্যা আর কি আছে,—আর কি হইতে পারে,—আমরা জানি না। কিন্তু এরূপ আত্মহত্যার সুযোগ, সুবিধা ও শুভলগ্ন আজ কাল সর্ব্বত্র। এ যুগে আত্মহত্যার কোন্‌টা নয়? মাতৃ-স্তন্যের সহিত বিষাক্ত শিক্ষা শিশুর শোণিতে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যার বীজাণু বপন করে। বিদ্যামন্দিরে বীজাঙ্কুর বিকশিত ও বর্দ্ধিত হয়; পরন্তু, পরে পরে, স্তরে স্তরে আত্মহত্যা অসংখ্যবার অভিনীত হইয়া থাকে। এ যুগের জীবনই যেন কতকগুলি আত্মহত্যার সমষ্টি, আত্মহত্যাময়; প্রকাশ্য আত্মহত্যা আভ্যন্তরিক আত্মহত্যার একটা বাহ্য বিকাশমাত্র। আত্মঘাতীকে আত্মহত্যা একবারের অধিক দুই বার করিতে হয় না, একাধিকবার তবে যে তাহা হয়, সেটা কেবল প্রথম বারেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র।

সংগ্রাম-বিমুখ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষে চক্ষুমান্‌ করিয়া ভগবান বাসুদেব দেখাইয়াছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রে সমবেতা বাহিনী সমস্তই পূর্ব্বসূত্রে হত, মৃত,

গতাসু ; তাহাদের পরবর্ত্তী মৃত্যু কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীরই বাহ্য বিকাশমাত্র। এই ভগবদ্দৃষ্টান্ত উপস্থিত এই আত্মহত্যা প্রসঙ্গে সম্যকরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহারা মরিয়াই আছে, অঙ্কুরেই আত্মঘাতী হইয়াছে, তাহাদের আবার আত্মহত্যা কি ? আর এই প্রকার আন্তরিক আত্মঘাতীর সংখ্যা এই অভিশপ্ত অধঃপাতিত দেশে এখন এত অধিক যে, বাহ্য আত্মহত্যার আপেক্ষিক হিসাব দেখিতে বসারই বা আবশ্যক কি ?

এখন বলা বাহুল্য যে, আমরা আশ্চর্য্য নহি ; অস্বীকারও করি না যে, আত্মহত্যার সংখ্যা এখন অসংখ্য। অসংখ্য আত্মহত্যার মধ্যে বাহ্য আত্মহত্যা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় সংসাধিত হয়, নব্য পুরুষ ও নব্যা স্ত্রীদিগের কর্ত্তৃক ; ইহাও অসম্ভাবিত নহে ; প্রত্যুত সম্পূর্ণ সম্ভব। কারণ, নবীন এবং নবীনাগণে আগুন অধিক এবং টাটকা ; সে এত যে, আপনাকে আপনি পোড়াইয়া ভস্ম করে। অহিফেন, উদ্বন্ধন, আরসেনিক ও প্রুসায়িক এসিড ; এগুলা অবলম্বন বা উপকরণমাত্র। আসল কাজটা আগুনেই করে।

কিন্তু আগুন ছাড়া অন্যান্য কারণ কি ? "উদ্দীপন" "আলম্বন" এবং শব্দটা যদি অন্যায় না হয় ;—"সঞ্চারণ" কারণ কি ?

কারণ নির্ণয়কল্পে বাজারে বিস্তর লোক জুটিয়াছে। ইহারা হুজুগ-জীবন লোক। ইহাদের অস্তিত্ব এত অসার ও অকর্ম্মণ্য যে, প্রতিবেশীর গাত্রে ক্লেদ নিক্ষেপ করা ভিন্ন ইহাদের আর কিছুই ইহ সংসারে করিবার নাই। "সর্ব্বংসহ" হিন্দু সমাজের উদ্দেশে মূত্রপুরীষ উদ্গার করা ইহাদের "পেশা"। এ পেশা পরিত্যাগ ইহারা করিতে পারে না, কারণ তদ্দ্বারা ইহাদের অজা-কণ্ঠ-বিলম্বিত-অলাবুবৎ অস্তিত্বটুকু বিলুপ্ত হয়। ইহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান এত বড় বৃহৎ যে, উপরোক্ত কারণ নির্ণয়ার্থে ইহাদের কোন পণ্ডিত "বৌ-কটকী-বাদ" কোনও বৈজ্ঞানিক বিদ্যাসুন্দরের পুরাতত্ত্ববাদ, কোনও "ফিলজফর" ক্ষুদে ননদীয় গঞ্জনাবাদ ইত্যাদি বহুবিধ "বাদে" 'বাসকেট' পূর্ণ করিয়া বাজারে উপস্থিত হইয়াছে ; এই মহাজ্ঞানীদিগের কাহারও কাহারও বা যুক্তি এইরূপ যে, স্বামী মাতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তী, অতএব স্ত্রীর আত্মহত্যা অবশ্যম্ভাবী ! অর্থাৎ যুবক স্বামীর মাতৃভক্তি যুবতী ভার্য্যার আত্মহত্যার অব্যবহিত কারণ ! বৌ-কটকী শাশুড়ী আর ভাজ-জ্বালানী ননদীদের নিষ্ঠুরতায় সোণার বধূরা সংসার করিতে পারেন না ; কাজেই আত্মহত্যা করেন। বেশ ! অতি উত্তম কথা, আপত্ত নাই। নবীনা নববধূদিগের উপর শাশুড়ী ননদীর নিষ্ঠুরতা, অতএব তাঁহারা আত্মঘাতিনী

হইতে বাধ্য। কিন্তু নব যুবক-রত্নেরা আজ কাল এত আত্মহত্যা করেন কেন? আর বিকশিত বা অর্দ্ধ বিকশিতযৌবনা অবিবাহিতা বালারাই বা আত্মঘাতিনী হয়েন কেন? কুমারীর কৌমার্য্যেও কি 'বৌ-কটকী' বাদ প্রযুক্ত হইবে? অথবা তরুণ যুবকের আত্মহত্যায় ননদিনীর নির্যাতন অভিযুক্ত হইবে? পরন্তু এখনকার স্কুল-শিক্ষিতা বিবিআনা বধূরাও ত অনেক স্থলে এখন শাশুড়ী! ইহাঁদিগকে "বৌ-কটকী" অপবাদ দিবে ত? তা দাঁড়াইবে কোথায়?—বস্তুতঃ কিন্তু ইহাঁরা বৃহত্তরা "বৌ-কাটকী!"

তা যাউক। হস্তিমূর্খ প্রকৃত তথ্য বুঝিবে না। শঠ, একদেশদর্শী পেশাকর পুরীষ-জীবীদিগকে বুঝাইয়া বা ফল কি? তাহারা তাহাদিগের স্বভাবোচিত অসৎকার্য্য কিছুতেই ছাড়িবে না। হিন্দু গৃহস্থালীর আভ্যন্তরীক ব্যবস্থায় যে পরিমাণে বিশৃঙ্খল ঘটাইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। ইহাও কি অতঃপর বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে হইবে; দেখিয়া, ঠেকিয়া, ভুগিয়াও কি শিখিবে না? সংসারে কু, সু, সবই আছে। চিরকালই থাকিবে। বৌ-কটকী শাশুড়ীর ন্যায় শাশুড়ী-কটকী বধূও বরাবর ছিল; এখন বরং [illegible] বিস্তর বেশী হইয়াছে। কিন্তু এজন্য হিন্দুগৃহে শাশুড়ী-বধূর পারস্পরিক সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে চাও—এ কি উন্মত্ততা! যাহা রোগের ঔষধ, তাহাকেই রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ; বলিহারি বাছা বুদ্ধি!

কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে, অশাসনে, এবং অনুপযুক্ত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনে অনেক স্থলে হিন্দু গৃহস্থালীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; সংসারে শাসনের সেই সদা-স্বাস্থ্যকর সমীর আর প্রবাহিত হয় না; সিমন্তিনীরা সম্বন্ধনির্ব্বিশেষে স্ব-স্ব প্রধান, স্বেচ্ছাময়ী, অবাধ্য, স্বতন্ত্রা, আত্মমতাবলম্বিনী (অথচ আত্মমতেরও কিছু মাত্র স্থিরতা নাই;) সুতরাং সংসারে সতত সংক্ষোভ; নিত্য নূতন বিভ্রাটের উৎপত্তি। হিন্দুসংসারের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অহিন্দু ভাবের নূতন তরঙ্গ প্রবেশ করিয়া যে তুফান উৎপন্ন করিতেছে, তাহার বিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যা একটা অভিব্যক্তি মাত্র। কারণানুসন্ধানার্থ আরও একটু অগ্রসর হইবে কি? সাময়িক বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিবিধ বিদ্যা শিখেন; শিখেন না কেবল ধৈর্য্য, বিনয়, ক্ষমা, লজ্জাশীলতা, বিশ্বাস এবং বাধ্যতা। স্কুল পরিত্যাগের পর নববধূরূপে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তথায় দুই একজন বিবিয়ানি শাশুড়ী সত্ত্বেও হিন্দুয়ানির "জের" এখনও চলিতেছে; উন্মুক্তদ্বার স্কুলকক্ষের সচলা স্বাধীনতা তথায় নাই, উড্ডয়মানা বিহঙ্গিনী

পিঞ্জরাবদ্ধা; শিক্ষা ও অভ্যাসগুণে অধীরা একান্ত আত্মাভিমানিনী অবাধ্যা; স্বাস্থ্যকর শাসনের অঙ্কুশ মাত্রে উন্মত্তা, অবসন্না, তাহার উপর কুকাব্যের আবিল্যময়ী উত্তেজনা, বালিকাহৃদয় বিশ্বাস মাত্রে বঞ্চিত; দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন দূরের কথা, নিখিল কারণেও বালিকা বিশ্বাসহীনা, কখনও ব্রতনিয়ম করে নাই; বিশ্বাস ভক্তি করিতে শিখে নাই; বোধোদয়, ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ভূগোলে বাল্য কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে, এখন নব-যৌবনের প্রথম তরঙ্গে মনোবৃত্তি উদ্বেলিত; উদ্দাম ইন্দ্রিয়নিচয় উত্তেজিত; বালিকা আত্মরচিত অলীক আলোক আকাঙ্ক্ষায় অধীরা; স্বপ্নরাজ্যের সৌখিনতা বিজাতীয় বিলাসের পূর্ণ আস্বাদ হিন্দু বা আধ্ হিন্দু শ্বশুরালয়ে বা পিতৃ সংসারে মিলিল না; কবি প্রতিভার মাদকতাময়ী কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনী সতত সম্মুখে; আর কত সয়; পতঙ্গ আগুনে পড়িল; বালিকা আত্মঅস্তিত্ব বিনাশ করিয়া কুলে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিল। কারণ—কুশিক্ষা! কারণ—কুকাব্য! কারণ আর কিছু নয়!

"সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা।"

কি যে দারুণ দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, একটার পর একটা মহামারী দেশটাকে উজাড় করিয়া ফেলিতেছে। 'ম্যালেরিয়া' ত দেশের অস্থিমজ্জাগত; তাহার উপর প্লেগ, বেরিবেরি, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সমর-জ্বর প্রভৃতি নূতন নূতন ব্যাধি সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া ভারত বক্ষে জুড়িয়া বসিতেছে।

বর্ত্তমান দিনের আতঙ্ক-অবতার ইনফ্লুয়েঞ্জা সানুচর নিউমোনিয়া। ইহার অবাধগতি ভারতবর্ষের নগর পল্লী, স্বাস্থ্যাবাস-রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা-কুটির সর্ব্বত্রই; এবং এই দুর্বৎসরে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি কোন দেশই ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারে নাই। এই ব্যাধির কোনও প্রতিষেধক ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র। কিন্তু সকলেই এখন স্ব-জনকে একটু সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিতেছেন। এমন সঙ্কটের দিনে অভিজ্ঞের উপদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে নাই। সেই জন্য 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত গত আষাঢ় মাসের 'স্বাস্থ্য-সমাচার' হইতে "সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা" শীর্ষক প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা বিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সুতরাং আশা করা যায়, ইহাতে পাঠকের উপকার দর্শিবে।

সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলেও অনেক সময় তাহা হইতে বিশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রোগ আরম্ভের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষ্মা রোগীগণের মধ্যে অনেকে বলিবে—'প্রথমে ঠাণ্ডা লাগিয়া বক্ষে সর্দ্দি বসে। কিছুতেই তাহা দূর করিতে পারি নাই। ক্রমে সন্ধ্যায় অল্প করিয়া জ্বর হইতে আরম্ভ হইল। শরীরের ওজন কমিয়া গেল এবং রাত্রে ঘাম হইতে লাগিল।'

ঠাণ্ডা লাগা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার সামান্য আক্রমণ অধিকাংশ সময় ভবিষ্যৎ মারাত্মক ব্যাধির দূত স্বরূপ অগ্রে উপস্থিত হয়। মস্তকে ঠাণ্ডা লাগিয়া টন্‌সিলাইটিস্ এবং তাহা হইতে বিষ উৎপাদক বীজাণুর উৎপত্তি হইয়া গ্রন্থী সমূহে বিষম বাত বেদনা, এমন কি হৃদযন্ত্রের স্থায়ী অনিষ্টও হইতে পারে।

বীজাণুর প্রভাব বৃদ্ধি।

যে বীজাণুর দ্বারা ভয়ানক সর্দ্দি বা বিষম টন্‌সিলাইটিস্ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা সকল সময়েই আমাদের দেহে আছে। এই সকল বীজাণু অল্পাধিক পরিমাণে নাসিকা এবং গল নলির মধ্যে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হয় না।

যখন আমাদের শরীর তেজহীন হয় এবং রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যায়, সেই সময় ঐ সকল বীজাণুর সংখ্যা ও অনিষ্ট করার ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শরীরের তেজ হানির কারণ।

অত্যন্ত শোক দুঃখ বা ভাবনায় শরীর তেজহীন হইলেও অধিকাংশ স্থলে নিদ্রার অভাবেই আমাদের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পরিশ্রম ক্লান্ত শরীরে নিদ্রার সময়েই আমাদের নব শক্তি লাভ হয়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় শরীরের তেজ ক্ষয় করিয়া থাকি।

সমস্ত দিন ভিজা পায়ে থাকা বা অন্য কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগাইলে আমাদের শরীরের তেজহানি হয় এবং রোগপ্রতিষেধ শক্তি কমিয়া যায়, ফলে বীজাণুগণের মধ্যেও বিদ্রোহ ভাব জাগিয়া উঠে। তাহারা বিষ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে এবং এ কারণে ঠাণ্ডা লাগার নানারূপ খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অনেক নির্ব্বোধ লোকে ফ্যাসানের খাতিরে ঠাণ্ডার সময়েও উপযুক্ত ভাবে শরীর আবৃত হয়, এইরূপ পোষাক পরিধানে বিরত থাকে। অনাবৃত অঙ্গে ঠাণ্ডা লাগায় তথায় রক্ত চলাচলের হ্রাস এবং ফুস্‌ফুস্ ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তের আধিক্য হয়। এইরূপ অবস্থায় বীজাণু সমূহের কার্য্য বৃদ্ধিরও বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। অনেকে শীতের সময় গাত্র ও মস্তক গরম বস্ত্রে উত্তমরূপে আবৃত রাখিলেও পদদ্বয় একবারে আবরণহীন করিয়া বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়।

দূষিত বায়ু সেবন।

অনেকে বায়ু চলাচলহীন বদ্ধ ঘরে বাস করার জন্য সহজেই ঠাণ্ডার আক্রান্ত হয়। গ্লাসের জলে দু এক ফোঁটা অপরের ঘাম পড়িলে তাহা পান করিতে যাহারা আপত্তি করে, তাহাদের অনেকেই অপরের নিশ্বাস পরিত্যক্ত দূষিত বায়ু সেবন করিতে কোনই অসুবিধা ভোগ করে না।

উত্তরমেরু আবিষ্কারক লেফ্‌টনাণ্ট পিয়ারী অনেক দিন মেরু-প্রদেশে দারুণ শীতে সুস্থ ছিলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াই আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরের এক হোটেলের বায়ু চলাচলহীন ঘরে বাস করায় বিষম সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। শীতের ভয়ে কিছুতেই নিদ্রার সময় দূষিত বায়ু সেবন করা উচিত নয়। যাহাতে প্রচুর নির্ম্মল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতে পারে সে জন্য জানালা খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জোর বাতাসে বিশেষ অসোয়াস্তি বোধ হইলে জানালার সামনে পরদা ঝুলাইয়া তাহার জোর কমান যায়। আবশ্যক বোধ হইলে গাত্রের ন্যায় মস্তকও আবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। মোট কথা, সকল সময়েই ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিদ্রা এবং অক্সিজেন পূর্ণ বায়ুই স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে।

জ্বর-রোগীর ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। যতক্ষণ দেহের তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততক্ষণ ঠাণ্ডা লাগার কোনই ভয় নাই। এ সম্বন্ধে অনেকেরই অজ্ঞতা দেখা যায়, এমন কি, চিকিৎসকেরাও অনেক সময় ইহা ভুলিয়া যান।

আহারের দোষ।

অতিরিক্ত আহার, গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ ও আহারের অন্যান্য দোষে দেহ মধ্যে বিষ উৎপন্ন হইয়াও সর্দ্দি এবং এই ধরণের অন্য বীজাণুর সংক্রামণ হইয়া থাকে।

অধিক মাংস ও মৎস্য আহার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, ঐ সকল খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে সহজেই অন্নমধ্যে পচন আরম্ভ হয়। পচনোৎপন্ন বিষ শরীরকে তেজহীন করায় সর্দ্দি বীজাণু বৃদ্ধির সুবিধা হইয়া থাকে।

আহারের দোষে যখন শরীরের অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন ২।১ দিন কেবল ফলাহার করিলে অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অন্ননালী পরিষ্কার হয়। ফলের রসে অন্ত্রস্থিত বীজাণুর শক্তি হীন হয়, তাহার লবণ উপাদান দূষিত রক্তকে নির্দ্দোষ করিয়া থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা আবশ্যক।

কোষ্ঠবদ্ধতায় অধিক দিন স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না। যাহাতে সূচনার প্রারম্ভেই এই দোষ দূরীকৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কার্য্য সাধনের জন্য আহার্য্যের মধ্যে অধিক পরিমাণ শাক সব্জি তরকারী গ্রহণ করিতে বা আহারের ঘণ্টা খানেক পরে এক কি দুই চামচ করিয়া প্যারাফিন তৈল (Medicinal Paraffin) গ্রহণ করিতে হইবে। এই খনিজ তৈল জোলাপ নহে এবং শরীরে শোষিত হয় না, কেবল ইহাতে অন্ত্রস্থিত মল নিঃসরণের সুবিধা করিয়া থাকে।

ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা নিবারণ।

যাহাদের সহজেই মাথায় ঠাণ্ডা লাগে, তাহারা শয়নের পূর্ব্বে মুখ, ঘাড়, এবং বক্ষের উপরভাগে ঠাণ্ডা জল দিয়া গামছা দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া উপকার দর্শিয়া থাকে। এইরূপ করিলে পর যদি বেশী ঠাণ্ডা বোধ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে উপকারের স্থলে অনিষ্টই হইতেছে। এ স্থলে ঠাণ্ডা জলে গা মুছিবার সময় গরম জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

এক দিনে সর্দ্দি নিবারণ।

প্রারম্ভে উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এক দিনেই সর্দ্দি আরোগ্য করা যায়। সাধারণতঃ লোকে সর্দ্দিকে রোগ বলিয়াই গ্রাহ্য করে না। কোনরূপ আরোগ্য চেষ্টা না করায় অনেক সময় ইহা হইতে অন্য কঠিন পীড়ার উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক বার সর্দ্দির আক্রমণেই শরীরের তেজহানি হয় এবং ফলে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। যখন সর্দ্দি রোগকে অবহেলা করা হয় তখন যে পর্য্যন্ত না শরীর ইহার বিষকে বিনষ্ট না করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত আরোগ্য হয় না। অনেক সময় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে এক হইতে তিন সপ্তাহ বা আরও অধিক সময় লাগিয়া থাকে।

সর্দ্দি আরোগ্যের জন্য যে সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ ("Sure Cure") বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশতেই হয় এলকোহল, মরফিন, কোকেন বা অন্য বিষাক্ত দ্রব্য থাকে। এই সকল দ্রব্য রোগ আরোগ্য কল্পে প্রকৃতির সহায়তা করা অপেক্ষা শরীরের শক্তির অবসাদ ঘটাইয়া থাকে।

প্রথমে কি করা উচিত।

সর্দ্দির আক্রমণের প্রারম্ভে অধিকাংশ স্থলেই মাথা ভার এবং নাসিকা ও গলার মধ্যে শুষ্কতা অনুভূত হয়। এই সময়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে গরম পাদ-স্নান (Hot foot Bath) গ্রহণ করা উচিত। বক্ষে চাপ ভাব বোধ হইলে গরম সেক দেওয়ার আবশ্যক হয়।

সমপরিমাণ—অয়েল অফ্ মেনথল
অয়েল অফ্ থাইমল
অয়েল অফ্ ইউক্যালিপ্টস্

মিশাইয়া তাহার দু তিন ফোঁটা এক ঘটি ফুটন্ত জলে দিতে হইবে। কাগজের একটি ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ঔষধ মিশ্রিত ফুটন্ত জলের বাষ্প ১০।১৫ মিনিট কাল শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে। গলার মধ্যে বেদনা যুক্ত স্ফীতি থাকিলে 'Ten Percent Solution of Argyrol ঔষধ তুলি করিয়া লাগাইলে সত্বর আরাম বোধ হইবে। ইহাতে ভিতরস্থিত তন্তুর কোন ক্ষতি না হইয়া বীজাণু সমূহের শক্তির হানি ঘটে। মাথায় ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এই ঔষধ দু এক ফোটা দেওয়ায় উপকার পাওয়া যায়।

সুবিধা থাকিলে এনিমা দিয়া কিম্বা দু তিন চামচ Medicinal Paraffin তৈল গ্রহণ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া এই তৈল নাসিকা দিয়া টানিয়া লইতে হইবে। নাসিকার আভ্যন্তরিক আস্তরণে তৈল লাগিয়া থাকায় বীজাণুর শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। দুই তিন গ্লাস গরম জল বা ফলের রস গ্রহণ করিলে মূত্রগ্রন্থির সাহায্যে শরীরের বিষ বাহির হইবার সুবিধা হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন করার পর নিদ্রা যাইলে প্রভাতে উঠিয়া রোগের আর কোন চিহ্ন দেখা যাইবে না। তখন মনে হইবে যে পূর্ব্বেকার আক্রমণের সময় কেন এই উপায় অবলম্বন করি নাই।

বিপদজনক হাঁচি।

যিনি সর্দ্দিতে যে লোক যেখানে সেখানে হাঁচিতেছে বা কাসিতেছে তাহাদের নিকটে সাবধানে থাকিবে। প্রতি বারেই সে অসংখ্য বীজাণু ছড়াইতেছে। এইরূপ লোকের সম্মুখে কখনই থাকা উচিত নয়। রোগীরও নিজে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরের তেজ হানী হইলেই লোকের এইরূপ লোক হইতে সর্দ্দির আক্রমণ ঘটিবে।
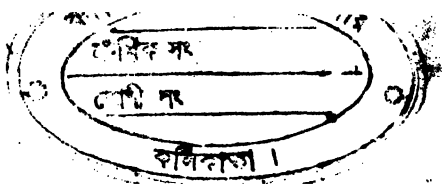
অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি ও অর্থ।

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ শাস্ত্রী এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

অভিধার প্রকার ভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৃত্তিবার্ত্তিককার অপ্যয়দীক্ষিত ও অভিধার তিন প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—রূঢ়ি, যোগ এবং যোগরূঢ়ি। "অখণ্ডশক্তিমাত্রেণ একার্থপ্রতিপাদকত্বং রূঢ়িঃ"। কেবল অখণ্ড শক্তি দ্বারা এক অর্থের বোধকতার নাম রূঢ়ি (expressiveness of an entire word)। তাহাও আবার দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) অবয়বার্থের একেবারে বোধই হইবে না, এবং (২) অবয়বার্থের বোধ হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহা খাটিবে না। যথা,

"যত্তে পদাম্বুরুহমম্বুরুহাসনেড্যং
ধন্যাঃ প্রপদ্য সকৃদীশ ভবন্তি মুক্তাঃ।
নিত্যং তদেব ভজতামতিমুক্তলক্ষ্মী-
র্যুক্তৈব দেব মণিনূপুরমৌক্তিকানাম্‌"॥

হে প্রভো! পদ্মাসন ব্রহ্মারও স্তুতির উপযুক্ত ত্বদীয় যে পাদপদ্মে একবারমাত্র শরণ লইয়া ধন্য ব্যক্তিরা মুক্ত হইয়া যান, সেই পাদপদ্মের নিত্যই ভজনা করিতেছে তোমার মণিময় নূপুরের মুক্তাগুলি; সুতরাং তাহারা যে অতিমুক্তশোভা (মাধবী ফুলের শোভা) ধারণ করিয়াছে তাহা উপযুক্তই বটে।

এই শ্লোকে মণি, নূপুর প্রভৃতি শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়রূপ অবয়বের অর্থের বোধ হইতেছে না। এবং অতিমুক্ত শব্দের "মুক্ত পুরুষের অপেক্ষাও অধিক" (মুক্তান্‌ অতিক্রান্তা) এই অবয়বার্থের যদিও বোধ হইতেছে, তথাপি তাহা বাসন্তীপুষ্পগত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে না। বাসন্তী পুষ্পই অতিমুক্ত শব্দের সমুদায়ার্থ এবং প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং অতিমুক্ত শব্দ এখানে রূঢ়িবিশিষ্ট।

"অবয়বশক্তিমাত্রসাপেক্ষং পদস্যৈকার্থপ্রতিপাদকত্বং যোগঃ"। কেবল অবয়বশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন পদ যদি এক অর্থের বোধ জন্মায়, তাহার অভিধার নাম যোগ (expressiveness of the parts of a word)

ইহাও দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) সমুদায়ের অর্থের বোধ একেবারেই হয় না। (২) এরূপ বোধ হইলেও অবয়বার্থে তাহার যোগ নাই।

(১) "উর্দ্ধং বিরিঞ্চিভবনাৎ তব নাভিপদ্মা-
দ্রোমাবলীপদজুষস্তমসঃ পরস্তাৎ।
মুক্তৌঘমণ্ডিতমুরঃ স্থলমুন্ময়ূখম্
পশ্যামি দেব পরমং পদমেব সাক্ষাৎ"॥

ব্রহ্মার বাসস্থানরূপ তোমার নাভিপদ্মের আরও উপরে, রোমরাজিরূপে বিদ্যমান তমোরাশিরও পরে মুক্তকলাপে ভূষিত উজ্জ্বল তোমার বক্ষঃস্থল সাক্ষাৎ পরম পদরূপে আমি দেখিতেছি।

এই শ্লোকে বিরিঞ্চিভবনের শুধু অবয়বার্থের (বিরিঞ্চি-ব্রহ্মা, ভবন আবাস) বোধ হইতেছে, ইহার কোনও সমুদায়ার্থ নাই। নাভিপদ্ম, রোমাবলী প্রভৃতি পদও শুধু অবয়বার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল পদ যোগবিশিষ্ট।

(২) "অস্তু ত্রয়ীময়তনুস্তব লম্বনালী-
রত্নৈস্তথাপি পরিভূয়ত এব ভানুঃ।
সোঢ়ঃ সতাং বত নিশান্তমুপাগতানা-
মেবং তিরস্কৃতিকৃদীশ্বর কঃ সুবৃত্তৈঃ"॥

হউক তাঁহার দেহ ত্রিবেদময় তথাপি সূর্য্যদেব তোমার লম্বমান পদ্মনালীস্থিত রত্নগুলির দ্বারা পরিভূত হইতেছেন। রাত্রি শেষে সমুদিত শোভন নক্ষত্রগুলিকে যে সূর্য্য দ্যুতিবিহীন করিয়া দেন, তাঁহাকে রত্নতুল্য সুবৃত্ত (গোলাকার) পদার্থ সহ্য করিতে পারে না। শেষ দুই চরণের অপর অর্থ গৃহে সমুপস্থিত সাধু ব্যক্তিগণকে যিনি তিরস্কৃত করেন, এরূপ কোন্ ব্যক্তিকে সুবৃত্ত (সচ্চরিত্র) পুরুষেরা ক্ষমা করিতে পারেন?

এই শ্লোকে নিশান্ত শব্দটীর প্রতিপাদ্য অর্থ রাত্রি শেষ। যদিও 'গৃহ' এই সমুদায়ার্থটীর বোধ হইতেছে, তাহার অবয়বার্থের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া এখানে নিশান্ত শব্দটী যোগবিশিষ্ট।

"অবয়বসমুদায়োভয়শক্তিসাপেক্ষমেকার্থপ্রতিপাদকত্বং যোগরূঢ়িঃ" অবয়ব এবং সমুদায় এই উভয়ের মিলিত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যদি পদ এক অর্থের বোধ জন্মায়, তাহা হইলে সেই পদের অভিধার নাম যোগরূঢ়ি (joint expressiveness of a word and its parts)।

"পঙ্কজবনক্রশিমপোষবিভাব্যমান-
চান্দ্রায়ণব্রতনিষেবণ এব নিত্যম্।

কুর্ব্বন্ প্রদক্ষিণমুপেন্দ্র সুরালয়ং তে
লিপ্সুর্মুখাব্জরুচিমেষ তপস্তনোতি" ॥

হে উপেন্দ্র, কৃষ্ণ এবং শুক্লপক্ষে যথাক্রমে কৃশতা ও পুষ্টির দ্বারা যাঁহার চান্দ্রায়ণ ব্রতচরণ অনুমিত হইতেছে, এতাদৃশ ঐ চন্দ্র নিত্যই সুরালয় (দেবতাদিগের আবাস সুমেরু পর্ব্বত) প্রদক্ষিণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন। তিনি তপস্যার দ্বারা তোমার মুখপদ্মের শোভা পাইতে ইচ্ছুক।

এই শ্লোকে সুরালয় শব্দ অবয়বের শক্তি (সুর=দেব, আলয়=আবাস) এবং সমুদায় শক্তি (রত্নসানুঃ সুরালয়!) মিলিত এই উভয়বিধ শক্তির বলে একই অর্থ সুমেরু পর্ব্বত বুঝাইতেছে। যদি বল, শুধু সমুদায় শক্তির দ্বারাই যদি সুমেরু পর্ব্বত বুঝায়, তাহা হইলে এখানে সমুদায় এবং অবয়ব এই উভয়বিধ মিলিত শক্তির প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই, দেবতার আবাস প্রদক্ষিণেই পুণ্য হয়, সুতরাং তপস্যার সার্থকতা অবয়বার্থের বোধ না হইলে হইবে না। যদি বল যোগরূঢ়ি বলিয়া অভিধার আর একটী ভেদ স্বীকার করিব কেন, পৃথক্ পৃথক্ যোগ এবং রূঢ়ির দ্বারাই যখন কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে? প্রথমে রূঢ়ি বা সমুদায় শক্তিবলে সুরালয় শব্দ কনকাচলকে বুঝাইল। তাহার পরে অবয়ব শক্তিবলে পৃথক্ ভাবে দেবতার আবাস বুঝাইল। তদনন্তর অভেদাধ্যবসায়ের দ্বারা (by means of identification) ঈপ্সিত অর্থের লাভ ত হইতেছেই। ইহার উত্তরে বৃত্তিবার্ত্তিককার বলিতেছেন, কাজ কি অভেদাধ্যসায়রূপ পরের মুখে তাকাইয়া, যখন একটা যোগরূঢ়ি নামক অভিধার স্বীকার করিলেই নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান যায়? এই জন্যই, অর্থাৎ যোগরূঢ়ি দ্বারা অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ উভয়েরই বোধ হওয়ার জন্য সমুদায়ার্থ বাচক আর একটী পদের প্রয়োগ হইলে পুনরুক্তি দোষ হয়—

"ভদ্রায় ভবতু ভবতাং ভগবান্ ভজমানদৈন্যতিমিররবিঃ।
দিবসারম্ভবিকশ্বর নীরজনলিনাভিরামতরনয়নঃ ॥"

ভক্তের দৈন্য তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ এবং প্রভাতে বিকশিত জলে জাত পদ্মের মত অতি সুন্দর নয়নবিশিষ্ট ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।

এই শ্লোকে নীরজ পদের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার জন্য সমুদায়ার্থ বাচক নলিন পদের প্রয়োগ হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে।

কিন্তু যেখানে যোগরূঢ়িযুক্ত পদের অবয়বার্থের বলে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাতেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, সেরূপ স্থলে সমুদায়ার্থ বাচক শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও পুনরুক্তি দোষ হয় না।

"উদ্যন্মৃগাঙ্করুচিকন্দলকোমলানাম্
উন্নিদ্রশোণনলিনোদরসোদরাণাম্।
প্রাপ্তুং তবাধররুচামবলোকনেন
নালং সহস্রনয়নঃ স বৃষাপি তৃপ্তিম্॥"

উদীয়মান চন্দ্রের সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট যে কন্দলী পুষ্প তাহার মত স্নিগ্ধ, এবং বিকশিত রক্ত পদ্মের উদর সদৃশ তোমার অধরসৌন্দর্য্যের অবলোকনে সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট সেই ইন্দ্রও তৃপ্তিলাভ করেন না।

এই শ্লোকে সহস্র নয়ন শব্দের অবয়বার্থ—সহস্রচক্ষুঃবিশিষ্ট (সহস্রং নয়নানি যস্য)। তাহার দ্বারা "অধিক মাত্রায় অবলোকনে সমর্থ" এই অর্থের প্রতীতি হইতেছে, এবং সেইখানেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যাইতেছে. সহস্র নয়ন শব্দের সমুদায়ার্থ 'ইন্দ্র' পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে না, সুতরাং এখানে ইন্দ্রবাচক 'বৃষা' এই পদের প্রয়োগেও দোষ হয় নাই।

কিন্তু এরূপ কোনও নিয়ম (hard and fast rule) নাই যে, যেখানে অবয়বার্থ বলে অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, সেখানে সমুদায়ার্থ বাচক শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে।

"মন্যে, নিজস্খলনদোষমনভীপ্সমানা
অন্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিবেশ্য বহিবুভূষুঃ।
আবিশ্য দেব রসনানি মহাকবীনাম্
দেবী গিরামপি তব স্তবমাতনোতি॥"

আমার মনে হয়, অপরিহার্য্য নিজস্খলন দোষ অপরের মস্তকে চাপাইয়া আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী ও মহাকবিগণের জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার স্তব করিতেছেন।

এই শ্লোকে বাগীশ্বরী পদের অবয়বার্থ বাক্যের ঈশ্বরী। ইহার দ্বারা "তিনি অপরের মত স্খলন দোষ সহ্য করিতে পারেন না" এই ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু এখানে সমুদায়ার্থ সরস্বতী বাচক পৃথক্ পদের প্রয়োগ নাই। সুতরাং অপ্যয়দীক্ষিতের মতে যেখানে পদের অবয়বার্থের দ্বারা ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হয়, সেরূপ স্থলে সমুদায়ার্থ বাচক পৃথক্ পদের প্রয়োগ করা যাইতেও পারে, নাও যাইতে পারে।

কোথাও কোথাও যোগরূঢ়িযুক্ত পদের কোনও বিষয়বিশেষে ব্যবহার করার জন্য কেবল সমুদায়ার্থেই বিশ্রান্তি হয়, সেখানে অবয়বার্থের সম্পর্কও নাই। যেমন অম্বুজ প্রভৃতি শব্দ যদি ভগবানের নাভিপদ্মের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়,

তাহা হইলে 'জলে জাত' এই অবয়বার্থের প্রতীতিই হইবে না, কারণ নাভিপদ্ম জলে জাত নহে। আবার কোথাও কোথাও যোগরূঢ়িযুক্ত পদের অবয়বার্থমাত্রেই বিশ্রান্তি, সমুদায়ার্থের সম্পর্কও নাই।

> "কহ্লারকৈরবমুখেষ্বপি পঙ্কজেষু
> লোকেশ যৎ কমলমেব তথা প্রসিদ্ধম্।
> মন্যেঽভিজাতভবদাস্যতুলাস্য নেতি
> মর্ম্মপ্রকাশনমিদং বিধিনৈব কৃপ্তম্॥"

হে লোকেশ! কহ্লার কৈরব প্রভৃতি পঙ্কজাত বহু পুষ্প সত্ত্বেও যে কমলই সেই নামে (অর্থাৎ পঙ্কজ নামে) প্রসিদ্ধ তাহার কারণ আমার এই মনে হয় যে, তোমার মুখ অভিজাত (high-born); তাহার সহিত পঙ্কজাত পদ্মের তুলনাই হইতে পারে না, এই উদ্দেশ্যে বিধি কেবল পদ্মকেই পঙ্কজ বলিবার ব্যবস্থা করিয়া পদ্মের মর্ম্মপ্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই শ্লোকে 'পঙ্কজেষু' এই পদ কুমুদ কহ্লার প্রভৃতির বিশেষণ হওয়ায় শুধু অবয়বার্থেই ব্যবহৃত হইতেছে।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, এরূপ স্থলে 'নাভিপদ্ম' শুধু এই সমুদায়ার্থ এবং 'পঙ্কেজাত' শুধু এই অবয়বার্থ বুঝাইতে অম্বুজপঙ্কজাদি পদের শক্তি নাই, এরূপ স্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষণা ও লাক্ষণিক অর্থ কাহাকে বলে, পর সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

মোসলেম সভ্যতার ইতিহাস

মোসলেম জগতে বিদ্যাচর্চ্চা।

[লেখক—মোহাম্মদ কে, চাঁদ।]

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'অর্চ্চনা'য় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় মল্লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। কারণ, আমাদিগের হিন্দু সাহিত্যিক ভ্রাতাগণের দৃষ্টি যে মৎসদৃশ মুসলমান লেখকের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আনন্দপ্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। তবে 'আলোচনা'র লেখক কয়েকটি প্রশ্ন ও প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিত হইল।

গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয় যে পূর্ণাবয়বসম্পন্ন নহে, তাহা শত বার স্বীকার্য্য। জানা সত্বেও অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। কারণ, গ্রন্থখানি ১৯১২ সালে প্রথমে একটী ছাপাখানায় দেওয়া হয়। এক বৎসর পরে ছাপাখানার কর্ত্তৃপক্ষ নানা ওজর করিয়া ফেরত দিলে, আর একটী প্রেসে দিয়া কয়েক ফর্ম্মা ছাপার পর নানা কারণবশতঃ ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য বন্ধ ছিল। অতঃপর ইউরোপের মহা সমর উপস্থিত হইল, এবং তদ্ধেতু কাগজ দুর্ম্মূল হওয়ায় সত্বর প্রকাশে বাধা পড়িল। যে সময় প্রথম প্রেসে দেওয়া হয়, তখন হইতে পুস্তক প্রকাশের সময় পর্য্যন্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় হস্তগত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যাগ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ শিল্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক পরিশেষে 'আল-এসলামে'ও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিল্পযন্ত্রের বা শিল্পকৌশলের উল্লেখ করা গ্রন্থের এ খণ্ডের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া জানিয়াও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। আলোচনাকারী মুসলমান আমলের অনেক শিল্পযন্ত্রের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এগুলি 'বিদ্যাচর্চ্চা' খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে বলিয়া আমার মনে হয়।

যাহা হউক, আর একটী কথা এই যে, যে বিষয় লইয়া গ্রন্থখানিতে আলোচনা করা হইয়াছে, এইরূপ বিষয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে লিখিত বাঙ্গালা ভাষায় কেন, এমন কি, ইংরাজী ভাষাতেও একখানিও গ্রন্থ নাই। তাই নিজের উপর নির্ভর করিয়া যতগুলি ইংরাজী গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই গুলির সাহায্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে সাহস করিয়াছি। এই আমার প্রথম উদ্যম। আরও এক কথা, মুসলমান সমাজ বাঙ্গালা গ্রন্থাদি প্রকাশে উৎসাহ দানে উদাসীন। তাই কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া, গ্রন্থখানির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছি।

যে সকল গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণ করিয়াছি, এই গ্রন্থের পুরঃভাগেই সেই গ্রন্থগুলির একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদান করিয়াছি বলিয়া, গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রমাণ-পঞ্জী উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি নাই।

আলোচনাকারী যে যে স্থলের উক্তি পরস্পর বিরোধী মনে করেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী নহে। মোসলেম বিদ্যাশিক্ষার ফলে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবিষ্কারকগণ তাহা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। কারণ, প্রতিপদে রাজকীয় বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি এক জাতির দ্বারা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের অঙ্কুর উৎপাদিত

হওয়ার পরে অন্য জাতির দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহাকে বৃক্ষরূপে পরিণত করা কি সম্ভব নহে? তাহাকে কি ঋণ বলা যায় না? হইতে পারে, তাহা তাঁহারা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, পরে পাশ্চাত্যগণ তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, এই প্রভেদ।

মুসলমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের অনেক তথ্য বিষয় আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রসম্মত। তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্বের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিয়া পরিপুষ্টি করিতে শত শত বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, মুসলমান নৃপতিগণ অতিশয় গোঁড়া ছিলেন বলিয়া, যখনই কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পণ্ডিত কোন বিজ্ঞান বা দর্শন-শাস্ত্র-মূলক তত্ত্ব প্রচার করিতেন, তখনই তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া মোসলেম ধর্ম্মাচার্য্যগণ শাসন-কর্ত্তৃবর্গের গোচরীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্য রাজাজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিতেন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেন। এই হেতু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব অঙ্কুরেই থাকিয়া যাইত, এবং ঐ সকল বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নিরাশ হইয়া প্রাণ ভয়ে তাহা অধিক পরিমাণে আলোচনা করিয়া অঙ্গপুষ্টি করিতেন না। তাঁহারা আধুনিক যুগের রাজপুরুষগণের ন্যায় রাজকীয় সাহায্য বা উৎসাহ পাওয়া ছাড়া বাধা ও যন্ত্রণাই বেশী পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহাদের বিজ্ঞান বা দর্শন তত্ত্ব ইউরোপের লোকেরা গ্রহণ করেন নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না।

আমি একটী দৃষ্টান্ত দিব। যখন গ্যালিলিও 'পৃথিবী ঘুরিতেছে' এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল?—কারাবাস। অতঃপর যখন ব্রুনো এই মতের প্রতিপাদন করিলেন, তখন তাঁহার কি ঘটিল?—তাঁহাকে জীবন্ত দাহ করা হইল। ইহা ঐতিহাসিক প্রমাণ-সিদ্ধ। তাহা হইলেও কি 'পৃথিবী ঘুরিতেছে' এ তত্ত্ব সত্য নহে? নিশ্চিত সত্য বলিয়া এক্ষণে বৈজ্ঞানিকেরা আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, ঐরূপ বিচার অতি অন্যায় হইয়াছে। উপরোক্ত দুই জন পণ্ডিতের কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান পণ্ডিতেরা আরও যে কিরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাই বলিয়া কি গ্যালিলিও ও ব্রুনোকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য হইবে না?

আমি আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মুসলমান বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা-শাস্ত্রবিশারদ রাসায়নিক পণ্ডিত অর্-রাজী একটী রাসায়নিক কল্পনা (theory) কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া, প্রথমে কৃতকার্য্য

হইতে পারিলেন না দেখিয়া, তৎসাময়িক মুসলমান নৃপতি চাবুক মারিয়া তাঁহার একটী চক্ষু কাণা করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে কি এরূপ ঘটে? না, আধুনিক রাজারা ঐরূপ একটী কল্পনা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া উৎসাহ দেন। তখন সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাই বিজ্ঞান দর্শন-চর্চ্চার ফলও উল্লেখ করিয়াছি, এবং যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাও দেখাইয়াছি। যদি তাঁহারা বাধা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের সমকক্ষ হইতে পারিতেন। তাই এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, 'যদি আরবদিগের মধ্যে অল-গজ্জালি, অল-আশ্বরী না জন্মাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিউটন, গ্যালিলিও ও কেপ্লারের জাতি হইতে পারিতেন।' ইহার কারণ এই যে, এই দুই জন ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনায় বিশেষরূপ প্রতিবন্ধক দিয়াছিলেন। অল-গজ্জালি দর্শনশাস্ত্রালোচনায় প্রতিবাদ করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিলেন, আর অল-আশ্বরী উদার সাম্প্রদায়িক মতের বিরোধী হইয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনায় প্রতিবন্ধক পড়ায় লোকেরা বিজ্ঞান ও দর্শনে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল।

কিন্তু মুসলমান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক আলোচিত ও প্রসূত অনেক তত্ত্ব, গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে প্রচারিত হওয়ায় জানা গিয়াছে যে সেগুলি প্রায় আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র-সম্মত। আমি বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে একটু আভাস দিব। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে ডারউইনের মত আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণের আলোচ্য বিষয়, বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট মত মুসলমান দার্শনিকেরা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এরূপ গোঁড়া ধর্ম্মাচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা সব ছিলেন যে, মোসলেম বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিতেন। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে যে সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইয়া কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে, তদনুরূপ তত্ত্বের আভাস মুসলমান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় বলিয়া, ঐরূপ মন্তব্য গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে।

মোসলেম সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত কি, তাহাই দেখাইবার জন্য রেভাঃ, মোশায়েমের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি দশম শতাব্দীর কথা বলিয়াছেন, আর এবে-অল-কিফ্‌তী ইখওয়ান্‌-স্‌-সাফা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ বলিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব কাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ। অতএব ইহাতে কিছু বিসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

আলোচনাকারীর আর একটী কথা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিব।

" 'মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সালার্ণোর মেডিকেল কলেজ ইউরোপের আদি ও প্রাচীনতম এবং আদর্শ চিকিৎসা বিদ্যালয়। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই।' " আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, গ্রন্থের প্রথমেই তাহার একটী তালিকা দিয়াছি। অতএব আর প্রমাণ দিই নাই। যদি আলোচনাকারী সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে যে গ্রন্থকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহার মূল বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The first Medical College established in Europe was that founded by the *Saracens* at Salerno, in Itali. The first astronomical observatory was that erected by them at Seville, in Spain."—*History of the Conflict between Religion and Science*, by John William Draper M. D., L. L. D. Nineteenth Edition 1885; Page 115.

শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি।

[মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।]

শ্রীচৈতন্যদেব ভগবদবতার কি না, ও এই বিষয়ে বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা আছে কি না, তাহা আজ বলিব না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। স্মার্ত্ত ও দার্শনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার ভগবদবতারত্বের বিরোধী, কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহার মহাপুরুষত্ব এবং অসাধারণ ভক্তত্ব বিষয়ে সন্দিহান নহেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। সুতরাং

তাঁহার মহনীয় চরিতের আলোচনা যে, আস্তিকমাত্রেরই প্রীতিসাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেম-ভক্তির আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় ধার্ম্মিক শিক্ষিত সমাজে বিশেষ হিতসাধন হইবার আশা আছে, ইহা আমার একান্ত বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আজি সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের চরিত ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব হয়। তাঁহার তিরোভাবের প্রায় ৩৮ বৎসর পরে কবি কর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে একখানি সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। এই কবি কর্ণপুর চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইঁহার নাম পরমানন্দ সেন। পরমানন্দ সেন বাল্যকালে চৈতন্যদেবের নিকটে বহুকাল অতিবাহিত করেন। এই বালক ভক্ত কবির উপর চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। পরমানন্দ সেন চৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, এবং তাহারই ফলে তিনি কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ কথা চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের শেষে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন।

যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মমপ্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী
বাগ্‌দেব্যা যঃ কৃতার্থীকৃত ইহসক্কয়োৎ কীর্ত্ত্যা তস্যাবতারম্।
যৎ কর্ত্তব্যং মমৈতৎকৃতমিহ সুধিয়োযেমুঃজ্যাস্তিতেহমী
শৃণ্বন্তস্যানুমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্ত।

যাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদে আমার এই কাব্য রচনা, বাগ্‌দেবী যাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই আমি তাঁহার অবতার বর্ণনা করিয়া, আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম। যাঁহারা চৈতন্যদেবের প্রতি অনুরক্ত, তাঁহারা এই কাব্য শ্রবণ করুন, অন্য পণ্ডিতগণকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু আমার বর্ণিত ইতিবৃত্ত কেহই যেন কল্পিত বলিয়া গ্রহণ না করেন।

কবিকর্ণপুর আরও বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয় মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষং গতে
কোজানাতু শৃণোতুকস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্।

যেমন নিজে দেখিয়াছি, এবং যেমন শুনিয়াছি, তেমনই নিজ মতির অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্তগণ

এখন স্মৃতিমাত্রেই পর্য্যবসিত, সুতরাং কেই বা ইহা শ্রবণ করিবে, আর কেই বা ইহা বুঝিতে পারিবে। ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা দ্বারা প্রসন্ন হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন—

শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজি যুক্তে
গৌরোহরির্ধরণিমঙ্গল আবিরাসীত্।
তস্মিংশ্চতুর্নবতি ভাজিতদীয়লীলা
গ্রন্থোয়মাবিরভবৎ কতমস্যবক্ত্রাৎ॥

চৌদ্দ শত সাত শকাব্দে ধরণীর মঙ্গলার্থ গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার লীলা প্রতিপাদক এই গ্রন্থ চৌদ্দ শত চুরান্নব্বই শকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয়টী শ্লোক দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কর্ণপূর যে সময় অন্ততঃ বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, সেই সময় তিনি চৈতন্যদেবের পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া, তাঁহার যে সকল লীলা নিজে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বচর ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের লীলা বিষয়ক যত গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই গ্রন্থখানি সুতরাং সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রাচীনতম, এবং যিনি বহুকাল চৈতন্যদেবের পার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার রচিত বলিয়া এই গ্রন্থের প্রামাণ্যও নিঃসন্দিগ্ধ। চৈতন্যদেবের লীলা বিষয়ে এখন যে তিনখানি বাঙ্গলা পদ্য গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তিনখানিই অর্থাৎ লোচন দাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের পরবর্ত্তী গ্রন্থ; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানির প্রামাণ্য যে তিনখানি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ অদ্বৈতাচার্য্য এবং স্বরূপ দামোদর দুইখানি কড়চা বা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অভাগ্যক্রমে সেই দুইখানি গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সেই দুই খানি গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতালোচনা এখন অসম্ভব। অল্প দিন হইল গোবিন্দদাসের কড়চা নামে একখানি কড়চা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গোবিন্দদাস জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন, এবং ইনি চৈতন্যদেবের প্রিয় ভৃত্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রচিত বলিয়া যে কড়চাখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রামাণিকত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এখন সন্দিহান। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই নব প্রকাশিত গ্রন্থখানির উপর একেবারেই আস্থাবান্ নহেন। তাঁহাদের এই অনাস্থা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। সুতরাং এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, এই কারণে আপাততঃ সেই বিচারে বিরত হইলাম। এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্। এই সকল কারণে চৈতন্যদেবের জীবনীর পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, চৈতন্যচন্দ্রোদয়ই যে এখন আমাদের একটী প্রধান অবলম্বন গ্রন্থ, এই বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমার সহিত এক মত হইবেন।

এই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিতপূর্ব্ব কালে বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের অবস্থা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

"যজ্ঞে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্নাদ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্র বিশেষিতাভুবিভুজো বৈশ্যাস্তবৌদ্ধাইব।
শূদ্রাপণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাংগতিরীদৃগেচ কলিনাহাহন্ত সম্পাদিতা॥"

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়। দ্বিতীয়াঙ্ক।

যজ্ঞোপবীত মাত্রই এখন ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক হইয়াছে। কিসে প্রতিগ্রহটী ভাল করিয়া চলে, তাহাই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণের নাম মাত্রই অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশ্যগণও বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক শূদ্রগণ পণ্ডিতম্মন্য ও গুরু হইয়া, ধর্ম্মোপদেশ করিতে উৎসুক, বড়ই খেদের বিষয়! বর্ণগণের এইরূপ দুরবস্থাই কলিযুগের প্রভাবে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আশ্রমধর্ম্মের অবস্থাও তখন কিরূপ হইয়াছিল, তাহাও শুনুন—

"বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণমাত্রব্যসনিনঃ।
অহো বানপ্রস্থাঃ শ্রবণপথমাত্র প্রণয়িনঃ
পরিব্রাজাবেশৈঃ পরমুপহরন্তেপরিচয়ম্॥"

বিবাহ জুটে না বলিয়া, কতকগুলি লোক ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচিত, নিজের স্ত্রী নিজের পুত্র এবং নিজের উদর ভরণ কার্য্যেই গৃহস্থগণ একান্ত আসক্ত, বানপ্রস্থাশ্রমের নামই শুনিতে পাওয়া যায় মাত্র, সন্ন্যাসীগণ নানাপ্রকার বেশ দ্বারা জনসমাজের নিকট নিজ পরিচয় দিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত।

যাঁহারা সমাজের ধর্ম্ম ও নীতির উপদেষ্টা, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিরূপে নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেন, তাহারও পরিচয় শুনুন—

"অভ্যাসাদ্‌বৈ উপাধি জাত্যনুমিতি ব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে
র্জন্মারভ্য সুদূর-দূর ভগবৎবার্ত্তাপ্রসঙ্গাত্মবী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনস্তেত্তত্রবিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতিযে জানন্তিতে তার্কিকাঃ॥"

অতি শৈশব হইতেই যাঁহারা উপাধি, জাতি, অনুমিতি ও ব্যাপ্তি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের অভ্যাস মাত্র করিয়া থাকেন, ভগবদ্‌বার্ত্তা প্রসঙ্গ হইতেও যাঁহারা সর্ব্বদা অতি দূরে থাকেন, যাঁহারা লোকবুদ্ধির অতীত কতকগুলি নিরর্থক কল্পনা করিতে বড়ই সমর্থ, তাঁহারাই বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া থাকেন, নিজে যাহা কল্পনা করেন তাহা শাস্ত্র, ইহাই যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারাই পণ্ডিত বা তার্কিক শিরোমণি।

উল্লিখিত শ্লোক কয়টী দ্বারা তৎকালীন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সে সময় বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ শম দম ও তিতিক্ষার সাধনায় একান্ত বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে ত্যাগের মহিমায় তাঁহারা এতকাল সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া নিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি মার্গের সৌষ্ঠব সম্পাদন দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা তখন ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া ঋষিপ্রকৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের কঠোর তপস্যায় অর্জ্জিত সম্মান ও ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজের ভিত্তিস্বরূপ আশ্রমধর্ম্মও বিধ্বস্ত প্রায় হইয়াছিল। ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের প্রভাবে লোকবিমোহন ও ধনার্জ্জনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে প্রয়োজন বোধ হইলেই লোকে ধর্ম্মের দোহাই দিত মাত্র। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি আস্থাসম্পন্ন ছিল। এইরূপ অবস্থায় সমাজে যে সকল অত্যাচার ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিতেছিল, প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল চারিদিকেই একান্ত প্রপীড়িত হইতেছিল, দস্যুতা, চৌর্য্য, প্রতারণা, শুষ্ক কলহ, দ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি সমাজবিপ্লবকর দোষনিবহ হিন্দুসমাজের প্রত্যেক অঙ্গে অশান্তির বিষজ্বালা তীব্রবেগে সঞ্চারিত করিতেছিল। এইরূপ দারুণ সমাজবিপ্লবের সময়ে এক জন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও মোহের তীব্রসন্তাপে দগ্ধ মরুভূমি-

প্রায় মানব হৃদয়ে প্রেমময়ী শান্তিধারার বর্ষণ করিবার জন্য নব নীরদের আবির্ভাব না হইলে, এরূপ অবস্থায় সমাজে পুনর্জীবন সঞ্চারের অন্য উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিবার জন্য বঙ্গের জ্ঞান বিজ্ঞানের পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য সেই নবীন নীরদরূপে দেখা দিয়াছিলেন, দেখা দিয়া কি ভাবে তিনি বঙ্গের ভীষণ বিপ্লবগ্রস্ত হিন্দুসমাজে প্রেমভক্তির প্রচারে আবার গৌরবোজ্জ্বলিত শান্তি সুখময় নব জীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, অগ্রিম প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

আশ্রম বিবেক।

[পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্তৃক লিখিত।]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারী।

এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

বক্তা। 'চর' ধাতুর উত্তর 'ষৎ' প্রত্যয় করিয়া 'চর্য্য' এবং 'ণিন্' প্রত্যয় করিয়া 'চারী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃহ' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া 'ব্রহ্ম' পদ সিদ্ধ হইয়াছে *। 'ব্রহ্ম' শব্দের কোষশাস্ত্রে 'বেদ', 'সত্য', 'তত্ত্ব', 'ব্রহ্মা', 'বিপ্র', সর্ব্বগুণাতীত, তুরীয় বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ ইত্যাদি অর্থ ধৃত হইয়াছে। 'ব্রহ্মচর্য্য' ও 'ব্রহ্মচারী' এই পদদ্বয়ে যে ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, শাস্ত্রপ্রমাণে অবগত হওয়া যায়, তাহার অর্থ বেদ। ব্রহ্মের (বেদের) জন্য বেদাধ্যয়ন ও বেদজ্ঞানার্থ আচরণীয়—(সমিদাধান, ভৈক্ষচর্য্য, ঊর্দ্ধরেতস্কত্বাদি ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান) কর্ম্মের বা উপনয়ন সংস্কারের পর বেদলাভার্থ আশ্রমের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য', এবং বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে, যে সকল নিয়ম অবশ্য পালনীয়, যিনি সেই সকল নিয়ম পালন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি ব্রহ্মচারী †।

---

* "সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্"। উণাদি সূত্র, ৫৮৪।

"বৃংহের্নোঽচ্চ"। ঐ, ৫৮৫।

† "ব্রহ্ম বেদঃ। তদধ্যয়নার্থং ব্রতমপি উপচারাদ্ব্রহ্ম। ব্রহ্ম চরিতুং শীলমস্য। 'ব্রতে' (পা০ ৩।২,৮০) ইতি 'ণিনি' (পা০ ৩,২।৭৮) ইতি বা ণিনিঃ"—অমরকোষ টীকা।

জিজ্ঞাসু। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের যে অর্থ বলিলেন, শাস্ত্রে সর্ব্বত্র তদর্থ বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হয় না। পাতঞ্জল যোগদর্শনে 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের বেদাধ্যয়নার্থ আচরণীয় কর্ম্ম বা আশ্রম বুঝাইতে প্রয়োগ হয় নাই। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, গুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া—চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে গুপ্ত (রক্ষা) করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গহেতু বিষয় সমূহ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া, উপস্থ সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য *। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, জাবালোপনিষৎ, ঈশ্বরগীতা প্রভৃতি গ্রন্থেও সর্ব্বদা কায়, মন ও বাক্য দ্বারা স্ত্রীসম্পর্ক বিসর্জ্জনকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মের জন্য যাহা আচরণীয়, ব্রহ্মজ্ঞানার্থ বা ব্রহ্মকে পাইবার নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্য" এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'তত্ত্ব', 'সত্য', বা 'পরমাত্মা' ইহাদের মধ্যে কোন একটী অর্থ গ্রহণ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না কি?

বক্তা। 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' এই অর্থ গ্রহণের আপত্তি কি?

জিজ্ঞাসু। যাঁহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, শাস্ত্রে তাঁহাদেরও ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তব্য, এবম্প্রকার বিধি আছে, বিধবাদিগের অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে। বেদাধ্যয়নার্থ আচরণীয় কর্ম্ম বা আশ্রমবিশেষ, ব্রহ্মচর্য্যের যদি কেবল ইহা অর্থ হয়, তাহা হইলে, বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়, এস্থলে 'ব্রহ্মচর্য্যে'র অর্থসঙ্গতি হইবে কিরূপে? শাস্ত্রে পুরুষের স্ত্রীস্মরণাদিশূন্যত্বকে এবং স্ত্রীর পুরুষস্মরণাদিরাহিত্যকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীর সাধারণ ব্রহ্মচর্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুপ্রবৃত্তির প্রথম দিবস হইতে ব্রহ্মচারিণী থাকিবেন ("ঋতৌ প্রথম দিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী * * * সুশ্রুতসংহিতা—শারীরস্থান), এস্থলে ব্রহ্মচারিণী শব্দ পুরুষস্মরণাদিরাহিত্যরূপ ব্রতধারিণী এই অর্থেরই বাচক, সন্দেহ নাই।

বক্তা। 'ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে'র তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, ব্রহ্ম বা বেদের জন্য চর্য্য—আচরণীয় আশ্রমবিশেষ ("ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং") ব্রহ্মচর্য্যের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দ যে, স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিবৃত্তি এই অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জনের বোধকরূপে শাস্ত্রে বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অবিসম্বাদিত। প্রশ্নোপনিষদে ঋতুকালে রাত্রিতে ভার্য্যাগমনকেও গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যরূপে পরিগণিত করা হইয়াছে; গৃহস্থের ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয় না ("ব্রহ্মচর্য্য-

* "ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্য উপস্থস্য সংযমঃ।"—পাতঞ্জলযোগসূত্র (২।৩০)-ভাষ্য।

দেব তত্ত্বাদ্যৌ যত্ত্বা সংযুজ্যতে।”—প্রশ্নোপনিষৎ)। কূর্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিবার ও সংক্রান্তি এই সকল পর্ব্ব ত্যাগ পূর্ব্বক পরদারবিমুখ গৃহস্থের ঋতুকালে ভার্য্যাগমন ব্রহ্মচর্য্য (“ঋতুকালাভিগামিত্বং স্বদারেষু ন চান্যতঃ। পর্ব্ববর্জ্জং গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যমুদাহৃতম্॥” কূর্মপুরাণ)। বেদের জন্য আচরণীয়—অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের মধ্যে ঊর্দ্ধরেতস্কত্বও যে অন্যতম তাহা তোমার মনে আছে, সন্দেহ নাই। বেদ, তত্ত্ব, সত্য, ব্রহ্ম, ইহারা (বেদ ও শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেখিলে উপলব্ধি হইবে) সমানার্থক। জ্ঞানবিজ্ঞাননিধি মহর্ষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভৃগুদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বা বেদ সত্য, বেদ দ্বারা সত্য বস্তুকে জানা যায়, সত্য বস্তুকে পাওয়া যায়, বেদ সত্য বস্তু স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপক; তপঃ—স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সত্য, তপঃ বা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (“সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং” * * * মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ১৯০। সত্যং সত্যবস্তুপ্রাপকং ব্রহ্ম বেদঃ, তপঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং—মহাভারত টীকা)। সত্যই (বেদ ও তপঃ) প্রজাগণকে সৃষ্টি করে, সত্য দ্বারাই সমস্ত লোক ধৃত হইয়া আছে, সত্য দ্বারাই সুখময় স্বর্গে গমন হইয়া থাকে। সত্যের বিপরীত—অবৈদিক—বেদাচারবহির্ভূত যথেষ্টাচরণকে অনৃত বলা হয়; অনৃত অজ্ঞান স্বরূপ। অজ্ঞান দ্বারাই তমোগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অধোগতি হয়, অজ্ঞানাবৃত জনসমূহ প্রকাশ বা সুখময় স্বর্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ; যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ, এবং যাহা অনৃত—সত্যস্বরূপ বেদবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই তমঃ, যাহা তমঃ তাহাই দুঃখ *। ‘ব্রহ্ম’ শব্দ যে কারণে সত্য, তপঃ, তত্ত্ব, বেদ, ইত্যাদির বাচক হইয়াছে, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি

---

* “ভৃগুরুবাচ। সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ। সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥ ১॥

অনৃতং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ। তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥ ২॥ স্বর্গঃ প্রকাশ ইত্যাহুর্নরকং তম এব চ। সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ॥ ৩॥ তত্রাপ্যেবংবিধা লোকে বৃত্তিঃ সত্যানৃতে ভবেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রকাশশ্চ তমো দুঃখং সুখং তথা॥ ৪॥ তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎসুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যো ধর্ম্মস্তমো যত্তমস্তদ্দুঃখমিতি” ॥ ৫॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯০ অঃ।

“সত্যং সত্যবস্তুপ্রাপকং ব্রহ্ম বেদঃ তপঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং সত্যেন ব্রহ্মতপোরূপেণ॥”

—ঐ, টীকা।

তোমাকে ভগবান্ ভৃগুদেবের এই সকল কথা শুনাইলাম। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, 'ব্রহ্ম' শব্দের বেদ এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া, তত্ত্ব, সত্য বা পরমাত্মা ইহাদের মধ্যে কোন একটী অর্থ গ্রহণ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না কি ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে 'ব্রহ্ম' শব্দ কেন বেদ, সত্য, পরমাত্মা ইত্যাদি অর্থের বাচক হইয়াছে, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক মনে হইল। বেদের স্বরূপ দর্শন না হইলে, বেদ, সত্য, তত্ত্ব, ব্রহ্ম ইহারা যে সমানার্থক তাহা কথন উপলব্ধি হইতে পারে কি ? বিধিপূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার না হইলে, ব্রহ্মচারী হইয়া, বেদনিষ্ঠ—পাঠতঃ ও অর্থতঃ বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারিগুরু সমীপে বাস না করিলে, বেদের স্বরূপ দর্শন হইতে পারে না। বেদপ্রাণ ঋষিরা বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তপোধন ঋষিগণকে যোগ্যজ্ঞানে বেদ নিজরূপ যে ভাবে দেখাইয়াছিলেন, বেদের যে রূপ দেখিয়া, ঋষিরা বেদকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থপরিগ্রহ ও বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকে সর্ব্বপ্রকার ইষ্টসিদ্ধির উপায় বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, ইহলোকে ও পরলোকে বেদকেই পরম বন্ধুজ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন, বেদেই ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, বেদ ভিন্ন আর কেহ যে, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহের স্বরূপাবধারণে সমর্থ নহেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং বেদের কৃপায় সর্ব্বভূতে আত্মবোধ লাভ পূর্ব্বক বিশ্বজনীনপ্রেমপূর্ণ হৃদয় হইয়া অন্যকে বেদের প্রকৃত রূপ দেখাইবার নিমিত্ত অবিরাম কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বেদের সে রূপ দেখিতে হইলে, বেদশাস্ত্রের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, ব্রহ্মচারি-গুরুর অন্তেবাসী হইয়া, তাঁহার সেবা করিতেই হইবে। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে ব্রহ্মচর্য্যের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, জাবালোপনিষৎ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ঈশ্বরগীতা ইত্যাদি পাঠপূর্ব্বক তুমি ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্ত্রীসম্পর্কত্যাগ বা অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জনকে কেন 'ব্রহ্মচর্য্য' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছ কি ? 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদের ব্যুৎপত্তি হইতে কি কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্ত্রীসম্পর্কত্যাগ এই অর্থ সমধিগত হয় ?

জিজ্ঞাসু। এতদিন এ প্রশ্ন একবারও মনে উঠে নাই, 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের অর্থ হইতে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্ত্রীসম্পর্কত্যাগ এই অর্থ পাওয়া যায় কি না, তাহা কথনও ভাবি নাই।

বক্তা। তাহা ভাবা উচিত নহে কি ?

জিজ্ঞাসু। আগে না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের অর্থ হইতে কিরূপে ইহার স্ত্রীবিষয়ক সম্পর্ক ত্যাগ এইরূপ অর্থের প্রতিপত্তি হয়, আমার বোধ হয়, কোথাও আমি তাহা পাই নাই। পতঞ্জলিদেব বা ভগবান্ বেদব্যাস 'ব্রহ্ম' শব্দ এখানে কোন্ অর্থের বাচক তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

বক্তা। পতঞ্জলিদেব বা ভগবান্ বেদব্যাস 'ব্রহ্মচর্য্যে' যে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে যখন কিছু বলেন নাই, বেদ ও তদাশ্রিত অন্যান্য শাস্ত্র যখন উক্ত স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 'ব্রহ্ম' শব্দ যে কারণে বেদ, সত্য, তপঃ, তত্ত্ব ইত্যাদি অর্থের বাচক হইয়াছে, মহর্ষিতিলক ভগবান্ ভৃগুদেবের কৃপায় তাহা যখন জানা গিয়াছে, তখন 'ব্রহ্ম' শব্দ উক্তস্থলে বেদেরই বাচক বুঝিতে হইবে, এবং বেদের বাচক বলিয়া বুঝিলে, কোনরূপ অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না, কারণ ব্রহ্ম, বেদ, সত্য ইত্যাদি ইহারা সমানার্থক।

জিজ্ঞাসু। এক্ষণে জানিতে হইবে, কায় মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্ত্রীসম্পর্কত্যাগের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য' হইল কেন ? আপনি বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা আত্ম-পরহিতার্থিমনুষ্য মাত্রের হওয়া উচিত, কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যবংশধরগণের নহে, আমার বিশ্বাস, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সমধিক সামর্থ্যের যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, স্বাস্থ্যসুখভোগে বঞ্চিত হইতে যাঁহাদের অনিচ্ছা হয়, নীরোগ, দীর্ঘজীবন সদ্‌গুণভূষিত, মাতা-পিতার আনন্দ-বর্দ্ধক, সর্ব্বজনের স্নেহাকর্ষক সন্তান লাভে যাঁহাদের তীব্র ইচ্ছা আছে, দেশের উন্নতি যাঁহাদের প্রার্থনীয়, অমোঘ অনিমাদিগুণার্জ্জনের প্রয়োজন যাঁহারা উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা এবং সর্ব্বদুঃখবীজ অব্রহ্মচর্য্য পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠার্থ যথাশক্তি চেষ্টা তাঁহাদের না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাঁহাদের বেদে অধিকার নাই, যাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় না, তাঁহাদের 'ব্রহ্মচর্য্য' বলিতে যাহা বুঝা যায়, ব্রহ্মচর্য্যের ব্যুৎপত্তি হইতে সেই অর্থ প্রাপ্তি হইতে পারে কি ?

কাশ্মীরের কথা।

[লেখক—ব্যাকরণোপাধ্যায় শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন।]

(১)

শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়।

কাশ্মীরে অনেকগুলি অতি সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থানের বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর; এই শ্রীনগর সমুদ্র হইতে ৫০০০ পাঁচ হাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। সমগ্র কাশ্মীরদেশ হিমালয়ের একটী উপত্যকা। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, এখন যেস্থানে কাশ্মীরদেশ অবস্থিত, অতি প্রাচীন কালে এক সময়ে সেই স্থানে প্রকাণ্ড একটী হ্রদ বিদ্যমান ছিল; কালক্রমে সেই হ্রদের জলরাশি নিঃসৃত হইয়া গেলে, তাহার স্থানে কাশ্মীরদেশ আবির্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কাশ্মীরদেশে 'বুলার লেক্' 'ডল' প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হ্রদ বর্ত্তমান, ঐগুলি সেই সুপ্রাচীন হ্রদের এক এক অংশ মাত্র। কাশ্মীরের চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; এই পর্ব্বতশ্রেণীর ক্রোড়ে প্রাকৃতিক শোভার লীলানিকেতন বিস্তৃত উপত্যকা দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতিদেবী তাঁহার অতুলনীয় শোভাসম্পদরাশিকে রক্ষা করিবার জন্যই চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য প্রস্তর প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিতস্তা নদীর উভয় তীরে শ্রীনগর সহর সুবিন্যস্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট। সহরের মধ্যেও বিতস্তার একটী বাঁক আছে। অধিবাসিগণের গতায়াতের সুবিধার জন্য নগরের মধ্যে বিতস্তার উপর সাতটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সাতটী সেতুর মধ্যে "আমীরা-কদল" বা "মীরাকদল" প্রথম ও প্রধান। এই সেতুর উপর দিয়া হাতী, ঘোড়া, গাড়ী এবং মোটরকার অনবরত যাতায়াত করে। অন্য সেতুগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত; সেগুলির উপর দিয়া কেবল মানুষ এবং গো মহিষ প্রভৃতি পশু যাতায়াত করিতে পারে। অন্তিম সেতুটীর নাম "সাফা কদল"। কাশ্মীরী ভাষায় "কদল" শব্দের অর্থ সেতু। এই "সাফা কদলে"র পরই শ্রীনগর সহর সমাপ্ত হইয়াছে।

"আমীরা কদল" পার হইয়া পূর্ব্বদিকে কিছু দূর গেলেই "রেসিডেন্সী" পাওয়া যায়। এই স্থানে শীতকালে রেসিডেন্ট্ সাহেব বাস করেন। এই রেসিডেন্সী অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইলে "গুপ্ কার" নামক স্থান

দৃষ্টিগোচর হয়। এই গুপ্‌কারে কাশ্মীরের মহারাজের সুবৃহৎ উদ্যান এবং ঐ উদ্যানে অনেকগুলি কাশ্মীরী ঢঙের বাড়ী আছে। এই স্থানই মহারাজের গেষ্ট্‌ হাউস বা অতিথিশালা। সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ মহারাজের গুপ্‌কারের বাগান-বাড়ীতেই অভ্যর্থিত হইয়া থাকেন। আমরা গত ১৩২৩ সালের শ্রাবণ মাসের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বরোদার মহারাজ এবং মহারাণী অনুচর-বর্গের সহিত কাশ্মীরনরেশের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া গুপ্‌কারে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। এই গুপ্‌কারে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্রসচিব ৺আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের কয়েকখানি উদ্যানশোভিত বাড়ী আছে।

এই গুপ্‌কার একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত। এই পর্ব্বতটী কাশ্মীরে "শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়" বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহাকে শ্রীনগরের "মনু-মেণ্ট্‌" বলা যাইতে পারে। ইহার পাদদেশ হইতে শিখর প্রায় দুই মাইল উচ্চ, শিখরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী বৃহৎ শিবমন্দির আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি এইরূপ যে, আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অন্যান্য দেশ জয় করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন; নিজের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাবে তিনি কাশ্মীরেও বিজয়মাল্য লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর কাশ্মীরে আসিয়া এই পর্ব্বতকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও নির্জ্জন মনে করিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের আদেশানুসারে অথবা তাঁহার স্মৃতিসম্মানার্থ এই পর্ব্বতশিখরে উক্ত শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশ্মীরে অবস্থান কালে শঙ্কর এখানে বাস করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই পাহাড় তাঁহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই পাহাড়ের সহিত সম্বদ্ধ আচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধীয় অন্য একটী কিংবদন্তীও শ্রীনগরে প্রচলিত আছে।

আচার্য্য শঙ্কর প্রথমে, এক অদ্বিতীয় চিদানন্দ পরমাত্ম-স্বরূপ শিবই মানিতেন, শক্তি মানিতেন না। একদিন আচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ আকস্মিক ব্যাধিতে পীড়িত হইলেন, তাঁহাদের উঠিবার সামর্থ্যও রহিল না। সকলেই অনাহারে রহিলেন; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পাক করিবার শক্তি ছিল না। এই পর্ব্বতটী সে সময়ে লোকালয় হইতে দূর ছিল; সশিষ্য আচার্য্যপাদের এই পীড়ার কথা কেহই জানিতে পারিল না। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জগজ্জননী আদ্যাশক্তি আচার্য্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া 'গুজ্জর' (১)

(১) যাহারা গরু ও মহিষের পাল লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে চরাইয়া বেড়ায়, এইরূপ এক জাতীয় লোককে কাশ্মীরে 'গুজ্জর' বলা হয়।

রমণীর বেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমরা শুইয়া আছ, দেখিতেছি; দিবা অবসানপ্রায়; তোমাদের আহার হইয়াছে ত?" আচার্য্য অতি কষ্টে উত্তর করিলেন, "মা, আজ আমাদের আহার হয় নাই। আমরা সকলেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি; পাক করা দূরের কথা, কাহারও অগ্নি প্রজ্বালনেরও শক্তি নাই।" ইহা শুনিয়া জগজ্জননী মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, 'বাবা, তুমি ত শক্তি মান না?'—এই কথা শুনিয়াই আচার্য্য অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেহই নাই, গুজ্জর-রমণী অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে তখনই রোগমুক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন, ইহা আদ্যাশক্তি মহামায়ার ছলনা। জগজ্জননী তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিভাবে আদ্যাশক্তির স্তুতি করিতে লাগিলেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন ভবতি পুনঃ স্পন্দিতুমপি।" ইত্যাদি।

'শিব যদি শক্তির সহিত যুক্ত হ'ন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ে সমর্থ হ'ন। শক্তি-বিযুক্ত হইলে শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সে অবস্থায় শুদ্ধচিদানন্দ-স্বরূপ শিব স্পন্দনেও সমর্থ হ'ন না; কারণ, কেবল চৈতন্যে ক্রিয়া-শক্তি থাকে না।' ইত্যাদি।

ইহার পরেই আচার্য্য আনন্দলহরী ও সৌন্দর্য্যলহরী নামক প্রসিদ্ধ গভীর-ভাবপূর্ণযুক্ত দুইটী মহামায়ার স্তোত্র রচনা করেন।

আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয় উপলক্ষ্য করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ আচার্য্যের সহিত বিচারে পরাজয় স্বীকার করিয়া, তাঁহার প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহা 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায়। আনন্দলহরী ও সৌন্দর্য্যলহরীর রচনাপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ দুইটী স্তোত্র কাশ্মীরে রচিত হইয়াছিল,—এরূপ সিদ্ধান্ত অসমীচীন মনে হয় না। আচার্য্যপাদের জীবন যেরূপ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, তাহাতে তাঁহার জীবনের কোন ঘটনাই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

এই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলে, সমগ্র শ্রীনগর সহর, পর্ব্বতের

অপর পার্শ্বে অবস্থিত 'ডল' নামক মনোরম কমল-কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সুবিশাল হ্রদ এবং কাশ্মীর উপত্যকার বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়; এই স্থান হইতে বহু-দূরবর্ত্তী 'বুলার লেক' নামক অতীব বিশাল হ্রদের শুভ্র জলরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, বক্রগতি বিতস্তা নদীর সুবক্র আবর্ত্তনগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ডল' হ্রদের জলের উপর ভাসমান শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রগুলি, সেই ক্ষেত্রগুলির অভ্যন্তরে মন্থরগতিতে সঞ্চরণশীল কৃষকগণের ক্ষুদ্র তরণীশ্রেণী এবং ডল হ্রদের বিশাল বক্ষে নৌবিহার-রত সৌখীন ইয়ুরোপীয় ও দেশীয়গণের সুসজ্জিত অসংখ্য ক্ষুদ্র তরী, —এই সকলই 'শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে'র শিখর হইতে অতীব সুন্দর দেখায়।

এই পাহাড়ের আরোহণ-পথ অতীব বন্ধুর—একেবারে সরলভাবে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ দুরারোহ পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি প্রাচীনকালে কিরূপে এত বড় প্রস্তর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পাহাড়ের শিখরদেশে মন্দির নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তরাদির কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। বর্ত্তমান যুগেও এইরূপ দুর্গম স্থানে দ্রব্যসামগ্রী একত্র করিয়া সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করা অতীব কঠিন কার্য্য, সন্দেহ নাই। এই শিখরদেশ বিস্তৃত নহে, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ গজ ও বিস্তারে তাহার অর্দ্ধেক হইবে। এই মন্দিরে একটী বৃহৎ বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। একটী বৃহৎ তাম্র-দীপাধারে নিরন্তর দীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে; দীপাধারটী এরূপ বৃহৎ যে, তাহাতে এক কালে অর্দ্ধ মণেরও অধিক তৈল দেওয়া যাইতে পারে। এই দীপের রশ্মিতে মন্দিরাভ্যন্তরে সঞ্চিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইতেছে। কাশ্মীরের মহারাজের ব্যয়ে শিবের সেবাপূজাদি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরটী অতীব মনোরম স্থানে অবস্থিত বলিয়া, ইহা মুসলমানগণেরও হৃদয় ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যতবার কাশ্মীর মুসলমান অধিকারে আসিয়াছিল, ততবার এই মন্দির মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছিল; আবার যখনই হিন্দু অধিকারে আসিয়াছে, তখনই সেই মস্‌জিদ শিবমন্দিরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিখ্‌ অধিকারেই এই মন্দির সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও মুসলমান সমাজ ইহার কথা বিস্মৃত হ'ন নাই, কাশ্মীরের মুসলমান সমাজে এই মন্দির অত্যাপি "তখ্‌ত সুলেমানী" নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতের পাদদেশে শঙ্করাচার্য্যের মঠ নামে সন্ন্যাসীদের একটী মঠ আছে; এই মঠে দণ্ডী সন্ন্যাসী কেহ নাই। গোঁসাই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক এই মঠ বর্ত্তমান সময়ে অধিকৃত।

(২)

হরিপর্ব্বত।

হরিপর্ব্বত শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে নগরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এই পর্ব্বত শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ নহে। ইহার উচ্চতা বোধ হয় আধ মাইলের বেশী হইবে না। এই পাহাড়ের উপরে একটী ক্ষুদ্র কিল্লা বর্ত্তমান। এই কিল্লার পৃষ্ঠদেশে 'শারিকা'-দেবীর স্থান। কাশ্মীরী পণ্ডিত ও পণ্ডিতাইনগণ এই শারিকাদেবীকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। প্রত্যহ প্রাতে বহুসংখ্যক নরনারী শারিকাদেবীর কৃপালাভের আশায় তাঁহার স্থানে সমবেত হ'ন ও পূজা পাঠ করিয়া থাকেন। সায়াহ্নেও ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে; এমন কি, সময়ে সময়ে স্বয়ং মহারাজও দেবীর পূজা এবং দর্শন করিবার অভিলাষে উপস্থিত হ'ন। আমরাও কাশ্মীরে অবস্থানকালে দেবীর দর্শনলাভ করিয়া, কৃতার্থ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম.

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, দেবীর স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। পর্ব্বতের নিতম্বদেশেই দেবীর অধিষ্ঠান। জগন্মাতা আদ্যাশক্তি মহামায়াই কাশ্মীরে শারিকাদেবী নামে পূজিতা হইতেছেন। কথিত আছে, অতি প্রাচীন সময়ে কাশ্মীর-ভূভাগ জলমগ্ন ছিল; সেই সময়ে ঐ স্থানে কেহই বাস করিতে পারিত না। জনৈক নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশে, অতি কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া মহামায়ার আরাধনা করেন; ভগবতী আদ্যাশক্তি তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইলেন, তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশের উদ্দেশে শারিকার রূপ ধারণ করিয়া, চঞ্চুপুটে এক খণ্ড মৃত্তিকা লইয়া,—এখন যেখানে হরিপর্ব্বত বিদ্যমান—সেই স্থানে সেই মৃত্তিকাখণ্ড রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পরে, প্রথমে সেই জলরাশির মধ্য হইতে হরিপর্ব্বত উত্থিত হইল; কালবশে ক্রমশঃ সেই জলরাশি অন্তর্হিত হইয়া হরি-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান কাশ্মীর দেশ প্রকাশিত হইল, যেস্থানে মহামায়া শারিকারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই স্থানই অদ্যাবধি শারিকাদেবীর স্থান বলিয়া পূজিত হইতেছে। জগন্মাতা আদ্যাশক্তি শারিকারূপ ধারণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া, তিনি কাশ্মীরে শারিকাদেবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই শারিকাদেবীর স্থানে কোন মূর্ত্তি নাই; সিন্দূর-লিপ্ত অতি বিশাল শিলাখণ্ড শারিকাদেবী নামে পূজিত হইতেছে। এই স্থানে উপস্থিত হইলেই

মনে এক প্রকার ভয়-মিশ্রিত ভক্তি-ভাবের সঞ্চার হয়। এই স্থানে পূজকদিগের থাকিবার জন্য পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নিকটে লোকালয় নাই। পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ইহা দেবীর পূজকেরই সম্পত্তি। পশ্চিমদিকে অল্প দূর ব্যবধানে শ্রীনগর সহরের আরম্ভ। এই শারিকাদেবীর স্থানের নিকটবর্ত্তী ভূমিসমূহেও দেবীর পূজকেরই অধিকার। এই স্থানে বাদামের বাগান আছে। দেবীর উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ পূজা ও বলিদান হইয়া থাকে। এই স্থানেও মহারাজের ব্যয়েই সেবা নির্ব্বাহিত হয়।

শারিকাদেবীর স্থান হইতে কিছু দূর পশ্চিমে হরিপর্ব্বতের পাদমূলে একটী বড় রকমের মস্‌জিদ্ আছে। এই মস্‌জিদ্ মোগল আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ জানা যায়। পর্ব্বতের শিখরে যে ক্ষুদ্র দুর্গ বর্ত্তমান, তাহাতে উঠিবার জন্য সোপান আছে। সেই সোপান অতিক্রম করিলে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে পারা যায়, শারিকাদেবীর স্থান হইতে কিছু উত্তরেও একটী দুর্গদ্বার আছে; এখানেও সোপান আছে, তবে এই দ্বারটী প্রধান নহে। এই হরিপর্ব্বতও সরল ভাবে উঠিয়াছে বলিয়া, সোপান ব্যতীত দুর্গে উপস্থিত হওয়া দুঃসাধ্য; প্রকৃতিদেবী নিজেই এই দুর্গকে দুরধিগম করিয়া দিয়াছেন। দুর্গ দেখিবার জন্য পাশ সংগ্রহ করিতে হয়। এই পাশ রেসিডেন্সীতে পাওয়া যায়। প্রধান দুর্গদ্বারের রক্ষীকে পাশ দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, প্রথমেই তোপখানা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ মহোদয়ের পিতা স্বর্গগত মহারাজ ৺রণবীর সিংহের সময়েও কাশ্মীরে অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। আমরা ৺রণবীর সিংহের সময়ে নির্ম্মিত দুইটি সুবৃহৎ পিতলের কামান, কতকগুলি লৌহের কামান, বন্দুক এবং তরবারী প্রভৃতি দেখিয়া দুর্গের অভ্যন্তর-স্থিত আর একটী দ্বার অতিক্রম করিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক সৈনিক এই খানে একটী স্থান দেখাইয়া বলিল, "এই স্থানে গিলগিটের রাজা বন্দী ছিলেন। ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন।" চিত্রল যুদ্ধের কথা এখনও বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকগণ ভুলিয়া যান নাই। এই যুদ্ধে কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজের ভ্রাতা রাজা রামসিংহ সম্মুখসমরে বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনগরের মিউজিয়মে রাজা রামসিংহের একখানি বৃহৎ তৈল-চিত্র রক্ষিত আছে। সেই চিত্রে রাজার মুখে ক্ষত্রিয়োচিত বীরভাবব্যঞ্জক দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং তেজস্বিতার

চিহ্ন দেখিয়া, চিত্তে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হয়। চিত্রলযুদ্ধেই গিলগিটের রাজা বন্দী হইয়াছিলেন।

দুর্গমধ্যে একটী মন্দিরে শারিকাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মুখ ব্যতীত দেবী-মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত; সুন্দর মুখখানি সিন্দূররাগে রঞ্জিত হইয়া প্রভাতের অরুণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এখানেও দেবীর পূজাদি যথাযথ নিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বলিদানের জন্য দেবীর সম্মুখে হাড়ী কাঠ পোঁতা আছে, অদূরে একটী তুলসীমঞ্চ।

এই দুর্গে এখন সৈন্য থাকে না। দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অল্প কয়েকজন সৈন্য আছে, দেখিলাম। দুর্গের বহুস্থানই চিরপরিত্যক্ত গৃহের ন্যায় আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। পথপ্রদর্শক সৈনিক পুরুষ একদিকের কতকগুলি ঘর দেখাইয়া বলিল, "এই সকল ঘরে গোলা গুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত আছে।" বাহিরের অবরোধকারী সেনাদলের উপর গুলি বর্ষণ করিবার জন্য দুর্গ-প্রাচীরের বহুসংখ্যক ছিদ্র আছে। এই প্রাচীরের শিখরদেশে দাঁড়াইলে, অদূরে শ্রীনগর সহর এবং শ্যামল শোভায় সুশোভিত দূরবর্ত্তী কাশ্মীর পল্লী ও প্রান্তর অতিশয় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। আমরা দুর্গের সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া, উত্তরদিকের দ্বার দিয়া দুর্গ হইতে অবতরণ করিলাম। যখন আমরা সমতলভূমিতে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার রাশি চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। আমরাও বাহিরের অন্ধকারের ন্যায়ই পুঞ্জীভূত চিন্তারাশি হৃদয়ে লইয়া আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শিল্পী।

[লেখক—শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।]

(১)

তাহার নাম রত্নেশ্বর। পিতা একজন নামজাদা শিল্পী। ছেলেবেলায় মা মারা গিয়াছিলেন বলিয়া, রত্নেশ্বর পিতার আদর-যত্নের মধ্যেই পালিত হইতেছিল। যথাসময়ে পিতা তাহাকে শিল্পশিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রত্নেশ্বরের ভাবপ্রবণ অবাধ্য মন, কাঠ কাটিয়া চাঁচিয়া তাহাতে প্রাণপাত

পরিশ্রম করিয়া সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলাকে সে মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিত না। সুবিধা পাইলেই সে পলাইয়া গিয়া নদীর ধারে বসিয়া প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইত, বিহঙ্গের মধুর কাকলীর মধ্যে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। রবির শেষ রশ্মিটুকু কখন যে মুছিয়া যাইত, তাহা সে জানিতেই পারিত না। যখন তাহার চমক ভাঙ্গিত, তখন সে ভাব-জগত ছাড়িয়া, বাস্তব-জগতে ফিরিত। পিতা ধমকাইয়া, বুঝাইয়া কোন প্রকারেই যখন তাহার মন শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন, রত্নেশ্বরও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন হইতে কখনও সে নদীর ধারে, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ বটগাছের তলায় শুইয়া-বসিয়া দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। অনেকগুলি বছর এই ভাবে কাটিয়া গেল।

সহসা একটা বাধা পাইয়া, তাহার জীবনের এই উদ্দাম গতিটার একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। একদিন বাসন্তী সন্ধ্যায় ভাববিহ্বল রত্নেশ্বর নদীর ধার হইতে ফিরিতেছিল, সহসা "রাস্তা ছোড় দেও" শব্দে সে সঙ্কুচিত হইয়া পথের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দুইটী বড় বড় অশ্ব-সংযোজিত একখানি বড় ও সুন্দর গাড়ী সশব্দে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত রত্নেশ্বর একদৃষ্টে গাড়ীখানির আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ী নিকটে আসিলে, সে বিহ্বল হইয়া দেখিল, গাড়ীর উপর দুইটী বালিকা। তাহাদের মধ্যে একজন যেন রত্নেশ্বরের চক্ষে অন্যটীর অপেক্ষা সুন্দর প্রতীতি হইল, তাহার পরিচ্ছদাদিও সঙ্গিনীর পরিচ্ছদ অপেক্ষা মূল্যবান। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী কিরণ মেয়েটীর মুখের উপর পড়িয়া, মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার হাসিভরা মুখ, চঞ্চল চাহনি, রত্নেশ্বরের বড় সুন্দর লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসক রত্নেশ্বর আজ সমস্ত সৌন্দর্য্য তুচ্ছ করিয়া এই বালিকার সৌন্দর্য্যটুকুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। ক্রমে রত্নেশ্বরকে ছাড়াইয়া গাড়ী দ্রুত অগ্রসর হইল। যতক্ষণ দেখা যায়, রত্নেশ্বর সেই গতিশীল গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী ঘন-পল্লব-বেষ্টিত বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইলে, সে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে চলিতে চলিতে একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ গাড়ীতে কে গেল?" সে উত্তর করিল, "রাজকন্যা আর তাঁ'র সখী!" রত্নেশ্বর আর কোনও কথা কহিল না, নীরবে চলিতে লাগিল।

বাড়ী আসিয়া রত্নেশ্বর দেখিল, তাহার পিতা এক মনে একটী কাষ্ঠ-মূর্ত্তির মুখ খোদাই করিতেছেন। মুগ্ধ রত্নেশ্বর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে পিতার কারু-কার্য্য দেখিতে লাগিল। কার্য্য শেষ করিয়া পশ্চাতে ফিরিতেই শিবদাস দেখিলেন, রত্নেশ্বর। কপালের ঘাম মুছিয়া ডাকিলেন, "রত্নেশ্বর!"

চমকিয়া রত্নেশ্বর উত্তর করিল; 'আজ্ঞে!'

"কি দেখছিলে?"

রত্নেশ্বর কোন উত্তর দিল না। শিবদাস আবার বলিলেন, "এখনও ভেবে দেখ রত্নেশ্বর! এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করিলে তুমি মগধের একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী হইতে পারিবে। আমি তোমায় যে শিক্ষা দিব, ভবিষ্যতে তাহাই তোমার জীবিকার্জ্জনের সহায়,—সুনামের বিজয়পতাকা হইয়া থাকিবে।"

রত্নেশ্বর যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পিতা বলিলেন, "তুমি ভাবিয়া দেখিও, তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি।" শিবদাস অগ্রসর হইলেন।

রত্নেশ্বর ডাকিল, "বাবা!"

শিবদাস দাঁড়াইলেন, মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "কি বলছ?"

রত্নেশ্বর কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমি শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিব!"

পিতা আনন্দের সহিত বলিলেন, "বেশ, কাল থেকেই আরম্ভ কর, মন দিয়া শিখিতে পারিলেই অল্পদিনের মধ্যে তুমি একজন প্রধান শিল্পী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে!"

রত্নেশ্বর কহিল, "আমার একটা কথা আছে।"

"শিবদাস বলিলেন—'বল।'

"আমি সমস্ত দিন কার্য্যশিক্ষা করিব, কিন্তু বৈকালে আমায় ছুটি দিতে হইবে।"

"বেশ, তাহাই হইবে।" পিতা চলিয়া গেলেন। রত্নেশ্বর সদ্যনির্ম্মিত মূর্ত্তিটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

পরদিন হইতে রত্নেশ্বর নিয়মিত তাহার পিতার শিক্ষাগারে যাইতে লাগিল, পিতা অতি যত্নে পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নয় মাস চলিয়া গেল, এই অল্প দিনের মধ্যে রত্নেশ্বর শিল্পকার্য্যে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, সে এখন কাষ্ঠের নানাপ্রকার মূর্ত্তি অল্প সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে প্রস্তুত করিতে পারে। পুত্রের এই অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে পিতা মনে মনে গর্ব্ব

অনুভব করিতেন। নবীন উৎসাহে পুত্রকে নূতন নূতন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মেধাবী রত্নেশ্বরও অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি আয়ত্ত করিতে লাগিল। এইরূপে আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল, রত্নেশ্বর এখন একজন পাকা শিল্পী।

(২)

রত্নেশ্বর প্রত্যহই নদীতীরস্থ পথে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যেন কাহার অনুসন্ধান করিয়া পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসে। সহসা দূরে একখানি গাড়ী দেখিলে তাহার প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠে, শরীর কণ্টকিত হয়, সে অপলক নেত্রে রাজকন্যার বেগবান গাড়ীর আগমন-প্রতীক্ষা করে। গাড়ী সম্মুখে আসিলে, উৎসুক চক্ষের চঞ্চল দৃষ্টি রাজকন্যার মুখের উপর স্থাপিত করিত, আবার চারি চক্ষে মিলিত হইলে, লজ্জিত রত্নেশ্বর চোখ নামাইয়া লইত। গাড়ী যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রত্নেশ্বর নদীর ধারে আসিয়া বসিত। অনেকক্ষণ বসিয়া রত্নেশ্বর অস্ফুট কণ্ঠে বলিত, "আমিও কি ঠিক নদীর তরঙ্গের মত উপেক্ষিত হয়ে বার বার ফিরে আস্‌ছি না? আমিও ত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে করে এনে দেবতার পায়ে ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মতই তাহার পদে ঢালিয়া দিই, —কিন্তু কৈ, কিছু পাই না কেন?"

এ আবার কি হইল! রাজকন্যা সে, সামান্য গৃহস্থের ছেলে আমি! অসম্ভব, হ'তেই পারে না, লোকে শুনিলে হাসিবে, বিদ্রূপ করিবে! মনকে এখন হইতে সংযত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার সুন্দর মুখ হৃদয়ের পটে যে গভীর ছাপ মারিয়া দিয়াছে, তাহা ত সহজে মুছিয়া ফেলিতে পারিব না।

রত্নেশ্বরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। অশান্ত উত্তেজিত কণ্ঠে রত্নেশ্বর বলিয়া উঠিত, "সে রাজকন্যা, আমি দরিদ্র! অসম্ভব আমাদের মিলন, তবু তাহার স্মৃতি আমি ছাড়িব না, তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে বসাইয়া দেবীর মত পূজা করিব।" এইরূপ ভালবাসায় বুকভরা ব্যথা লইয়া সে নিত্য বাটী ফিরিত।

(৩)

রত্নেশ্বরকে এখন আর নদীর পথে দেখা যায় না। পিতার শিল্পাগারেও সে যায় না। আপনার শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে একটী কাষ্ঠ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত। এই কার্য্যে সে এতই তন্ময় যে, কোন কোন দিন আহার করিতেও ভুলিয়া যায়। রত্নেশ্বর নদীর ধারে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে,

কিন্তু রাজকন্যার গাড়ী যথানিয়মে, প্রত্যহই সেই পথ দিয়া সশব্দে চলিয়া যায়। উৎসুক রাজকন্যা সমস্ত পথটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যান্, কিন্তু যাহার অনুসন্ধান করেন, তাহাকে দেখিতে পান্ না। বিরস, গম্ভীর বদনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। সখী রহস্য করিলে, রাজকন্যা জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করেন। এক-দুই করিয়া তিন দিন রাজকন্যার গাড়ী নদীর পথ দিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে সুন্দর যুবকটী প্রতিদিন তাঁহার চক্ষে পড়িত, এই তিনটী দিনের মধ্যে, একদিনও সে তাঁহার চক্ষে পড়িল না। রাজকন্যা উদ্বিগ্ন হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে কি একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল, ব্যথিত হৃদয় যেন কিসের অভাব অনুভব করিল। রত্নেশ্বরের ভাবনা তিনি মনে মনেই ভাবিতেন, তাঁহার প্রিয় সখী পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই।

আজ আবার রাজকন্যার গাড়ী নদীর পথ দিয়া চলিয়াছে। প্রত্যহ যেখানে রত্নেশ্বর দাঁড়াইয়া থাকিত, রাজকন্যা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, আজও তিনি বিফল-মনোরথ হইলেন, রত্নেশ্বর সেস্থানে নাই। উদ্বিগ্ন রাজকন্যা উত্তেজনাবশে সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মঞ্জরী, যে লোকটা এইখানে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহাকে চিনিস্?"

বিস্মিতা মঞ্জরী কহিল, "কোন্ লোকটা রাজকন্যা?"

রাজকন্যা কহিলেন, "সেই যে সেই লোকটা, রোজ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত, যাকে দেখে তুই ব'লেছিলি, কি সুন্দর চেহারা দেখ রাজকন্যা!"

"ওঃ বুঝ্তে পেরেছি, কিন্তু তা'কে ত চিনি না, তবে বোধ হয় সে এই সহরেই থাকে।"

"তাহার নাম কি, জানিস?"

"কিরূপে জানিব?" তারপর রাজকন্যার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, মঞ্জরী কি ভাবিয়া কহিল, "চিনি না যদিও, তবে সন্ধান করিয়া দেখিব।"

রাজকন্যা কোন উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মঞ্জরীও নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নদীর ধার দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরদিন মঞ্জরী কহিল, "রাজকন্যা, আজ আর নদীর ধারে বেড়াইতে না গিয়া, সহরের মধ্যে বেড়াইয়া আসি চল।" রাজকন্যা সম্মত হইলেন। দুইজনে গাড়ীতে বসিলেন, অশ্বযুগল দ্রুতবেগে ফটক পার হইয়া সহরের পথে ছুটিয়া

চলিল। রাজকন্যাকে দেখিয়া পথিপার্শ্বস্থ বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলে মস্তক নত করিয়া সম্মান-প্রদর্শন করিল। রাজপথ কাঁপাইয়া রাজকন্যার গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। একটা ক্ষুদ্র কাঠের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, রাজকন্যাকে লক্ষ্য করিয়া, মঞ্জরী কহিল, "এই সেই লোকটার বাড়ী, রাজকন্যা! তাহার নাম রত্নেশ্বর!" তখন কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বাটীখানি পশ্চাতে রাখিয়া, দ্রুতগামী অশ্বযান দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। মরালগ্রীবা বক্র করিয়া রাজকন্যা একবার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি দেখিয়া লইলেন, লজ্জায় তাঁহার গণ্ডস্থল রক্তাভ হইল, মৃদু কণ্ঠে কহিলেন "কি নাম বলিলি, মঞ্জরী?"

মৃদুহাস্যের সহিত মঞ্জরী আবার কহিল, "রত্নেশ্বর!"

রাজকন্যার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল! রাজকন্যা ঘাড় বাঁকাইয়া আবার রত্নেশ্বরের সেই ছোট কাঠের বাড়ীখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর দেখা গেল না, গাড়ী তখন বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

এখন হইতে রাজকন্যা আর নদীর ধারে বেড়াইতে যান না। তাঁহার যুগল অশ্ব চালিত গাড়ীখানি এখন প্রত্যহই রত্নেশ্বরের বাটীর সম্মুখ দিয়া সশব্দে চলিয়া যায়। রত্নেশ্বরের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী আসিলে, রাজকন্যার উৎসুক-দৃষ্টি একবার ছোট বাড়ীখানির আশে পাশে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু তাঁহার কাম্যবস্তুটিকে, তিনি একদিনও দেখিতে পান না।

(৪)

তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শিল্পী রত্নেশ্বর, তাহার মানসী-প্রতিমাখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। যে ছবি সে অন্তরের মধ্যে আঁকিয়াছিল, আজ বহির্জগতে সেখানিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কাষ্ঠ-প্রতিমাখানিকে সে নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, নিজের অন্তরস্থ ছবিখানির সহিত হুবহু মিলিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস্ ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আজ যেন এ সংসারের সব কাজ সে শেষ করিল। পৃথিবীর সহিত তাহার ত আর কোন প্রয়োজন নাই, সংসারের সব বন্ধন হইতে সে মুক্ত। এই তিনটী মাস সে কি আনন্দেই তাহার দয়িতার পদতলে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছে! কোন চিন্তা ছিল না; আশা, ভরসা, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা তখন কিছুই তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, আজ এই প্রতিমা-নির্ম্মাণ শেষ করিয়া, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, মুখে একটা অব্যক্ত বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। রত্নেশ্বর মনে মনে ভাবিল, "আমার

সাধনার ধন,—আমার হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত যে দেবীর মূর্ত্তি, আমার হস্তের সামান্য শিল্প-চাতুর্য্যে প্রাণময়ী মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই কাম্যবস্তুটীকে—তাহার পায়ে উপহার দিয়া আসিবে। এ যাহার দ্রব্য তাহাকেই ফিরাইয়া দিব, আমি শুধু তাহার মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়াই সুখী হইব।”

মন্থর গতিতে রত্নেশ্বর নদীর পথ দিয়া চলিয়াছে। যথাস্থানে আসিয়া সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তাহার উদাস দৃষ্টি-পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ছুটাইয়া দিল। ঐ বুঝি গাড়ী আসিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, রত্নেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তখনই তাহার মুখে নিরাশার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ভগ্নমনোরথ রত্নেশ্বর ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল। একটী মাস কাটিয়া গেল। রাজকন্যার দর্শন-আশায় রত্নেশ্বর যখন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে, ঠিক সেই সময় আর একটী ব্যথিত হৃদয়, তাহারই অনুসন্ধান করিতে করিতে, তাহাদেরই বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়।

(৫)

গ্রীষ্মকাল। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবী দগ্ধপ্রায় হইতেছে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া উদাস রত্নেশ্বর তাহাদের বাটীর নিকটস্থ পত্রবহুল বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায়, পরিধেয় বস্ত্র বিছাইয়া নিদ্রামগ্ন হইয়াছিল। রত্নেশ্বর কতক্ষণ যে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়াছিল, তাহা সে জানে না। সহসা শতকণ্ঠের ভয়াবহ বিকট চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া দেখিল, তাহাদের কাঠের বাড়ীর দেওয়াল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! সেই লেলিহান অগ্নি-শিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, রত্নেশ্বর চিত্রার্পিতের ন্যায় বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে ব্যস্ত। রত্নেশ্বর হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে এই অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল। সহসা তাহার মনে পড়িল,—তাহার সযত্ন-প্রস্তুত রাজকন্যার প্রতিমাখানি যে কক্ষে রহিয়াছে! মাথা ঘুরিয়া গেল, সে ছুটিল। দুই হাতে লোকের ভিড় ঠেলিয়া, কেহ বাধা দিবার পূর্ব্বেই, সে সেই বিশ্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। অগ্নি-রাশি ভেদ করিয়া রত্নেশ্বর ছুটিতে লাগিল। মাথার চুল পুড়িতেছে, গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে, বড় বড় ফোস্কা পড়িতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ছুটাছুটি করিয়া, তাহার কক্ষে উপস্থিত হইল। প্রথমটা সে ধূমাচ্ছন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সহসা কক্ষের এক দিকের দেওয়াল জ্বলিয়া উঠিল। উজ্জ্বল আলোকে রত্নেশ্বর দেখিল, তাহার বড় সাধের প্রতিমাটী তখনও

অদগ্ধ রহিয়াছে। রত্নেশ্বর এক লম্ফে গিয়া তাহার মানসীকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিল। প্রতিমাটীকে যথাসাধ্য বাঁচাইয়া লইয়া, সে উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে অর্দ্ধদগ্ধ রত্নেশ্বর বাহিরে আসিতেই. তাহার ক্লান্ত শিথিল সংজ্ঞাশূন্য দেহ সশব্দে ভূমিচুম্বন করিল।

* * *

সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। নগরের অশান্ত কোলাহল আর শুনা যাইতেছে না, রত্নেশ্বরদের বাড়ীর অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। এখন সকলে দগ্ধ রত্নেশ্বরের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। এমন সময়ে রাজকন্যার গাড়ী সেই স্থানে আসিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র বাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া, রাজকন্যার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল, তিনি গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন। অশান্ত চঞ্চল পদে অগ্রসর হইলেন। রাজকন্যাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

অর্দ্ধদগ্ধ রত্নেশ্বর মুদিত নেত্রে পালঙ্কে শুইয়াছিল, তাহার আশে পাশে তাহার আত্মীয়স্বজন বিষণ্ন বদনে বসিয়াছিলেন। রাজকন্যা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সখী মঞ্জরী। রাজকন্যাকে দেখিয়া নত মস্তকে, নিঃশব্দে সকলে সরিয়া গেল। রাজকন্যা পালঙ্কের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, পালঙ্কে শুইয়া অর্দ্ধদগ্ধ রত্নেশ্বর—পার্শ্বে তাহারই প্রতিমূর্ত্তি। অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "রত্নেশ্বর!" মুমূর্ষু রত্নেশ্বরের শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল, কোন সঞ্জীবনী সুধা স্পর্শে সে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল। রত্নেশ্বর ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি রাজকন্যার মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। অশ্রু ধারায় তাহার উপাধান সিক্ত হইল। পবিত্র প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ রাজকন্যারও অপলক নেত্র হইতে অজ্ঞাতসারে গোটাকত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কালিদাসের বহুদর্শিতা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।]

রাজগুণ

কি, তাহা মহাকবি অনেক রাজার চরিত্র গড়িয়া বুঝাইয়াছেন। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় ভূপতিবৃন্দের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, আদর্শ নৃপতি সম্বন্ধে মহাকবির কি ধারণা। সে বর্ণনা রঘুবংশের প্রথম সর্গেই বিদ্যমান, পরে আবার রঘু প্রভৃতির চরিত্র-বিশ্লেষণে জাজ্জ্বল্যমান। আমি সে কথার আলোচনা এস্থলে করিব না। "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"য় মহাকবি যে আদর্শ নরপতির চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

এ গল্পগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইতেছে, সর্ব্বনৃপগুণভূষিত রাজ-তিলকের শূন্য-সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন। বিক্রমার্কের পর সিংহাসন শূন্য ছিল। অশরীরি বাণী শুনিয়া মন্ত্রী সেই সিংহাসন ক্ষেত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কারণ সেকালে সেই ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র বিদ্যমান ছিলেন না। পরে ভোজরাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে, এক ব্রাহ্মণ তাহার ক্ষেত্রের মঞ্চের দৈব-শক্তির কথা রাজার নিকট বর্ণনা করিলেন। ভোজরাজ সেই ক্ষেত্র খনন করিয়া 'চন্দ্রকান্তশিলা-বিনির্ম্মিত নানারত্ন খচিত দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকাভিযুক্ত' অতি রমণীয় এক দিব্য সিংহাসন দেখিতে পাইলেন। 'পরমানন্দ লহরী পরিপূর্ণ হৃদয়ে' ভোজরাজ যখন দিব্য সিংহাসনটি গ্রামের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, সিংহাসন নড়িল না। তখন মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়া, ভোজরাজ সেই সিংহাসন রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন, বন্দীগণের প্রশংসা শুনিলেন, মহারাজ চতুর্বর্ণের সবিশেষ সম্মাননা করিলেন। দীন, বধির, কুব্জ, পঙ্গু প্রভৃতিকে বিবিধ বস্তু দানে পরিতুষ্ট করিলেন। কিন্তু যেমনি ছত্রচামর ভূষিত হইয়া তিনি সিংহাসনের পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্ম প্রদান করিলেন, অমনি পুত্তলিকা মনুষ্যের ভাষায় কথা কহিয়া বলিল,—"মহারাজ। যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের সদৃশ শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও সত্ত্বাদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।"

বিস্ময়াবিষ্ট ভোজরাজ বলিলেন—"পুত্তলিকে, আমার শৌর্য্যাদি সকল গুণই আছে।" সে পুত্তলিকাও সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল, "মহারাজ, এ কেমন কথা?"

"স্বগুণান পরদোষাণ বা বক্তুং শক্লোতি দুর্জ্জনো লোকে।"

জগতে কেবল যারা দুর্জ্জন হয়, তাহারাই আত্ম-প্রশংসা করিতে পারে, বা পরের নিন্দা করিতে পারে। আপনি ভোজরাজ, আপনার নিকট এ নীতিও গোপন নাই যে—

"আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৌষধসঙ্গমে
দানমানাপমানঞ্চ নবগোপ্যানি সর্ব্বদা।"

মহারাজ! সর্ব্বদা এই নয়টি গোপন রাখা কর্ত্তব্য—আয়ু, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান।

ভোজরাজ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তা বটে! আচ্ছা পুত্তলিকে, যে বিক্রমাদিত্য মহারাজের এই সিংহাসন ছিল, তাঁর গুণ বল দেখি।"

তখন এক একটি পুত্তলিকা এক একটী গল্পের দ্বারা মহারাজ বিক্রমার্কের চরিত-কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, সেই চরিত-কথার গুণগুলিই আদর্শ রাজ-গুণ, ইহাই এই উপাখ্যানগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। একস্থলে এক কথায় আছে—"রাজ্ঞা মহতাং সেবা কর্ত্তব্যা আপ্তানাং বচঃ শ্রোতব্যং দেবব্রাহ্মণাঃ প্রতিপালনীয়াঃ ন্যায়মার্গেণ বর্ত্তিতব্যম।" মোটের উপর দ্বাত্রিংশ গল্পের দ্বারা মহাকবি রাজা বিক্রমার্কের এই সকল গুণেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম আখ্যায়িকার দ্বারা পুত্তলিকা বুঝাইয়াছে যে, আত্ম-প্রশংসা বর্জ্জনীয়। অনেকগুলি গল্পে পুত্তলিকারা এই নীতির সমর্থন করিয়াছেন যে,

পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ
পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ
পরোপকারায় শরীরমেতৎ।

কিন্তু এই পরোপকার নীতির অনুসরণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমার্ক যেরূপ সামান্য লোকের প্রাণের জন্য আপনার প্রাণ-বিনিময় করিতে উদ্যত হইতেন, তাহাতে মহাকবি কালিদাসের সিংহের ভাষায় বলিতে হয়—

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং
কান্তং বয়ঃ রূপঃ মনোহারি চ

একস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্
বিচারমূঢ় প্রতিভাসি মেত্বং।

হিন্দু আদর্শবাদী—তাহার মতি চিরকাল আদর্শের দিকে। আদর্শ নীতি যাহাতে রাষ্ট্রমধ্যে বিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা শাস্ত্রকার কবি, লেখক, সকলেই করিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রাণ মহীপতিগণও আদর্শের জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করিতেন না, এ কথা বলিতে পারি না। তাই সাধারণ বুদ্ধিতে দিলীপ বা বিক্রমাদিত্যের মত সসাগরা পৃথিবীপতিদিগের কথায় কথায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার কথা একটু "গোঁয়ারতুমি" বলিয়া মনে হইলেও যে শিক্ষার জন্য এরূপ গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা সে শিক্ষার পরিপন্থী, এ কথা বলিবার উপায় নাই।

রাজাকে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার জন্য তাহার প্রাণের যে কিছু মূল্য নাই, এ নীতি কথাচ্ছলে বলিবার আরও একটা কারণ ছিল। আমি বার বৎসর পূর্ব্বে "প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি" নামক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ভারতের রাজশক্তি অসীম ও যথেচ্ছাচার ছিল না। তখন পার্লামেণ্টের মত কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারা রাজশক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, গণ্ডীর মধ্যে রাখা হইত না বটে, তবে অনেকগুলা নিগড় রাজশক্তির চরণের ভূষণ ছিল, এবং তাহাদের ছিন্ন করিয়া রাজা উন্মার্গগামী হইতে পারিতেন না। মন্ত্রীর প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, সগোত্রের অন্য রাজকুমারদের প্রতিযোগিতা ভিন্ন মন্বত্রি, হরিত প্রভৃতি স্মৃতিকারদের অনুশাসন রাজার গর্ব্ব খর্ব্ব করিত, রাজা শাসক ছিলেন মাত্র. আইনের কর্ত্তা ছিলেন মনুসংহিতা প্রভৃতি। আর সুরেন্দ্রের মাত্রায় নির্ম্মিত নৃপ-ধর্ম্মের দাস এই নীতি বুঝাইবার জন্যই, আমার বোধ হয় বহুদর্শী চতুর মহাকবি কথাচ্ছলে রাজাদের এই নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এস্থলে সকল গল্পের উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। একটি মাত্র গল্পের আলোচনা করিব। রাজা বিক্রমার্ক শীকারান্বেষণে গহন বনে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়াছিলেন। একটি ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহাকে পথ দেখাইয়া, শ্বাপদ-সঙ্কুল অটবী হইতে তাঁহাকে নগরে লইয়া আসেন। বিক্রমার্ক কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাকে ধন বস্ত্র উপঢৌকনে প্রীত করিলেন। রাজার কৃতজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-তনয় দেবদত্ত রাজকুমারকে চুরী করিয়া নিজ গৃহে রাখিলেন, এবং কুমারের ভূষণালঙ্কার নগরে বিক্রয় করিতে পাঠাইলেন। রাজ্যে হাহাকার

পড়িল, তস্কর ধৃত হইল। পুত্রঘাতকের মুখ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। সর্ব্বনাশ! এ যে দেবদত্ত! এ যে তাঁহার নিজের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। অমাত্যেরা বলিলেন, এ ব্যক্তি বধ্য; কেহ শূলের ব্যবস্থা করিলেন, কেহ বলিলেন, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গৃধ্রগণের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করা হউক।

রাজা স্থির হইয়া বিচার করিলেন,—"মম পুত্র বলয়সা প্রাকৃতেন কর্ম্মণা মারিতঃ"—প্রাকৃত কর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে কে পারে?

মাতা লক্ষ্মীঃ পিতা বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধম্
তথাপি শম্ভুনা দগ্ধঃ প্রাকৃতং কেন লঙ্ঘ্যতে।

যাহার মাতা লক্ষ্মী, পিতা বিষ্ণু, যে স্বয়ং বিষমায়ুধঃ, সে কামদেবও মহাদেবের দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতি কে লঙ্ঘন করিতে পারে?"

মহানুভব বিক্রমার্ক কৃতজ্ঞতার কথা ভাবিলেন। তিনি জানিতেন—

প্রথমবয়সি তোয়ং পীতমল্পং স্মরন্তঃ
শিরসি নিহিতভারা নারিকেলা ফলানাম্
উদকমমৃতকল্পং দদ্যুরাজীবনান্তং
নহি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি॥

সাধুগণ কৃত-উপকার বিস্মৃত হন না। নারিকেল বৃক্ষ প্রথম বয়সে সে স্বল্পমাত্র জল পান করে তাহা স্মরণ করিয়া, শিরে নারিকেলের ফলে জলভার বহন করিয়া, আজীবন অমৃত কল্প জল দান করে। শ্লোকটি বোধ হয় মহাকবির নিজের রচনা। রাজা ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করিলেন। সকলে চমৎকৃত হইল। ব্রাহ্মণ রাজপুত্রকে লইয়া আসিলেন। মহারাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ধর্ম্মের জয় হইল।

শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি।

[লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।]

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে দেশে ধর্ম্মবিপ্লব ও তন্মূলক সামাজিক নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি, এই ধর্ম্মবিপ্লব ও সামাজিক অশান্তির একমাত্র নিদান অভিমান বা অবিদ্যা—সে অবিদ্যার স্বরূপ কি? জীবমাত্রেরই এই অভিমান আছে, এবং এই অভিমানই সকলের সকল প্রকার অনর্থের মূল, এই কারণে মনুষ্য মাত্রেরই ইহার স্বরূপ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অবিদ্যা বলিলে সামান্যতঃ বিপরীত জ্ঞানই বুঝা যায়, অভিমান সেই বিপরীত জ্ঞান বা অবিদ্যার প্রকার বিশেষ, আত্মবিষয়ক কতকগুলি বিপরীত জ্ঞানই অভিমান বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের সকলেরই আত্মা চৈতন্যময়, তাহার জন্ম বা মরণ নাই, সুতরাং তাহা অবিনাশী, সুখ বা আনন্দ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ইহাই হইল আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা সকল আচার্য্যই আত্মার এই প্রকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি এবং সেই আত্মা যাহা নয়, তাহাকে সেইরূপে বুঝাই হইল আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বা অভিমান। আমি মনুষ্য, আমি গৌর, আমি কৃশ, আমি পণ্ডিত, আমি ধনী, আমি কুলীন, আমি প্রভু, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি আত্মবিষয়ক জ্ঞানমাত্রই এই অভিমানপদবাচ্য হইয়া থাকে, বেদান্ত দর্শনে এই আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিকে অবিদ্যার আবরণ কহে, এবং মনুষ্যত্ব গৌরত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া, আত্মাকে বুঝাই অবিদ্যার বিক্ষেপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাক্ সে কথা, প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক।

এই অভিমানকে উন্মূলিত না করিতে পারিলে, জীবের শাশ্বত শান্তি নাই, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বা উপাসনাকাণ্ড এই কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত সমগ্র বেদশাস্ত্র এই মানব মাত্রেরই সর্ব্বানর্থহেতু এই অভিমান নিবৃত্তির উপায়কেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই অভিমান নিবৃত্তির দিকে ঐকান্তিক লক্ষ্য রাখিয়াই হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, ইহাই হিন্দুর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু, এই ভিত্তির উপরই স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা হিন্দু সভ্যতা অবস্থিত রহিয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন

ভিন্ন দেশবাসী মানবগণের সভ্যতা হইতে হিন্দু সভ্যতার ইহাই হইল বিশেষত্ব, এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা জাতীয় অভ্যুদয়ের কামনায় যে কোন পথই অবলম্বন করি না কেন, তাহার কোনটীই ভারতীয় সভ্যতার অনুকূল হইবে না, প্রত্যুত প্রতি পদেই জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে প্রতিকূলই হইবে, ইহা সমাজের নেতৃবৃন্দ যেন কখনও বিস্মৃত না হন।

এই অভিমান নিবৃত্তির উপায় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি। দ্বিতীয়, আত্মতত্ত্বজ্ঞান। তৃতীয়, ভক্তি। অতি প্রাচীন কালে প্রথম উপায় অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জনই এই অভিমান নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি হয় এবং পরকালে সকল প্রকার দুঃখসম্বন্ধবর্জ্জিত নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বরূপ স্বর্গ ভোগ করিতে পারা যায়, সেই স্বর্গ সুখ একবার লাভ করিতে পারিলে, আর তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে হয় না। এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীনতম যুগে ভারতে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে জনসমূহ প্রবৃত্ত হইত।

"অক্ষয্যবৈ স্বর্গ লোকা ভবন্তি"

স্বর্গলোক সমূহের ক্ষয় নাই।

"অপাম সোমমমৃতা অভূম"।

আমরা যজ্ঞে সোম পান করিয়া অমর হইব।

এইরূপ শ্রৌত বচনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অতি প্রাচীন যুগের ভারতীয় মনীষিবৃন্দের বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার আধিক্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। কত শত বা সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের যুগ ভারতে স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু কালবশে এই ঐকান্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানপরতার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয় ও শান্তি লাভের উপায়ান্তর আবিষ্কার করিবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা যে বহুকাল ব্যাপী আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা উপনিষদের মধ্যেই দেখিতে পাই—

"যে প্রজামীষিরে ধীরাস্তেশ্মশানানি ভেজিরে"

"কিং প্রজয়া করিষ্যাম যেষাং নোঽয়মাত্মালোকঃ"।

"যাঁহারা প্রজা অর্থাৎ সন্ততি কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশেষে শ্মশান-গামীই হইয়াছেন—"

"আমরা সন্ততি লাভ করিয়া কি করিব? যে আমাদিগের এই আত্মাই দর্শনীয়।"

"ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"

সন্তানের দ্বারা বা ধনের সাহায্যে লোক অমর হইতে পারে না, কিন্তু যাহারা এই সকলের ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে ও করিয়াছে।

হিংসাবহুল, বিপুল আয়োজন এবং প্রভূত অর্থ ব্যয়সাপেক্ষ অথচ ঐহিক ফলবর্জ্জিত যাগ হোম প্রভৃতির প্রতি এইরূপ বিতৃষ্ণা যখন পূর্ণমাত্রায় ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামনার নিত্যসহচর রাগ ও দ্বেষের প্রাবল্যে সামাজিক নানা প্রকার অশান্তি আসিয়া অশান্ত ও অতৃপ্ত সমাজ হৃদয়ে ত্রিতাপের তীব্র জ্বালা বর্ষণ করিতেছিল, সেই সময়ই শ্রৌত কর্ম্ম বিরোধী সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই ভগবান্ বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া অহিংসাপ্রবণ বৈরাগ্য ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রবৃত্তিধর্ম্মের সহিত নিবৃত্তিধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম লাগিয়া গেল। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সঙ্ঘারাম ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। মৈত্রী-করুণা মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন প্রভাবে কর্ম্মচিন্তাবসাদগ্রস্ত ভারতীয় হৃদয়ে শম দম ও তিতিক্ষার শান্ত জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। পৃথিবীর সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং তাহাতে স্থিরতা জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, আত্মা বলিয়া কোন স্থির বস্তু নাই, তবে কাহার পারলৌকিক সুখের জন্য আবার যাগ যজ্ঞ? নৈরাত্ম্যই এই কল্পিত সংসারের একমাত্র ভিত্তি, প্রপঞ্চের অগ্রে মধ্যে শেষে বাহিরে ভিতরে উপরে নীচে আগে পাশে কেবল ধ্বংসময়ী করাল রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করিয়া বিশ্বগ্রাস কার্য্যে ব্যাপৃত। এই সকল ভাবনাই মানবের হৃদয় রাজ্যের সমগ্র প্রদেশ ব্যাপ্ত করিল। এই নৈরাত্ম্যবাদের উত্তাল তরঙ্গে কেবল যে হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ভাসিল, তাহা নহে; ইহা হিমাদ্রির তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী শিখর ও বীচিমালা সঙ্কুল জলধি অতিক্রম করিয়া, চীন জাপান ব্রহ্মদেশ লঙ্কা সুমাত্রা যবদ্বীপ পর্য্যন্ত আলোড়িত ও প্লাবিত করিল। কর্ম্মবাসনা বিশুষ্ক হৃদয়ে এই নৈরাত্ম্যবাদ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শীতল সলিল ধারা

বর্ষণ করিয়া মানবের অভিমান বা অহমিকা রূপ জ্বালাময়ী অগ্নিশিখাকে প্রশমিত করিল, আবার মানব পরের দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিতে লাগিল। অহিংসা ও জীবদয়ার অমৃতধারায় বিশ্বমানবের বিরাট আত্মায় শান্তিদেবী অভিষিক্ত হইয়া সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করিলেন। এইরূপে বিশ্বজনীন মঙ্গল বিধান করিয়া ভগবান্ অমিতাভ নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর ৫।৬ শত বর্ষ ব্যাপিয়া ভারত এই নবধর্ম্মের ও নূতন দার্শনিকতার শান্ত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত ছিল। কালের কুটিল গতিতে এই বৈরাগ্যপ্রবণ নৈরাত্ম্যবাদে নানা কারণে নানা প্রকার আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিতে লাগিল। স্বাভাবিক অহমিকতার প্রভাব নবধর্ম্মের নায়কবৃন্দের হৃদয় রাজ্য অধিকার করায় নিম্নস্তরের অধিকারিবর্গ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া, ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। নৈরাত্ম্যবাদের আবরণে অহংবাদ আবার জনসমাজের মজ্জাগত হইয়া উঠিল। এইবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নেতৃবর্গও অবসর প্রাপ্ত হইয়া পৌরাণিক আকারে শ্রৌত কর্ম্মগুলির সংস্কার সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেবল কর্ম্মের প্রতি লোকের পূর্ব্ববৎ আস্থা উৎপাদন অসম্ভব বোধ হওয়ায় তাঁহারা নৈরাত্ম্যবাদের বিরোধী, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম, উপাসনা ও ভক্তির বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে লুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই নবভাবে জাগরণোন্মুখ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী সিন্ধুসৈকত হইতে আরম্ভ করিয়া, তুঙ্গ হিমাদ্রি শৃঙ্গোপরি সকল প্রদেশে উড়াইয়া দিলেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় মহিমায় আবার ভারতে ধর্ম্মময় নবজীবনের সঞ্চার হইল, শূন্যের পরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে আত্মরূপে পাইয়া ভারত নব উৎসাহে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল, এই নবভাবে জাগরিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহা হীনবীর্য্য হইয়া ভারতবর্ষ হইতে অপসৃতপ্রায় হইল। এই ভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বিরাট ভিত্তির উপর সম্মিলিত কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী, কি উপাসক, সকল প্রকার অধিকারীই দেহাত্মবাদের সংকীর্ণতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অভ্যুদয় বা অপবর্গের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতে লাগিল। শাক্ত বৈষ্ণব, সৌর শৈব ও গাণপত্যগণের বিরোধ প্রশমিত হইল। আমরা সকলেই এক অনন্ত অনাদি সর্ব্বব্যাপক আত্মার উপর অধিষ্ঠিত। বাহ্য আকারে বা উপাধিতে তোমাতে আমাতে ভেদ থাকিলেও

তোমাতে ও আমাতে বাস্তব আত্মগত কোন পার্থক্যই নাই। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তোমারও আত্মা আমারও আত্মা, তুমি বা আমি তাহারই কল্পিত উপাধি, ফলতঃ তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই, এই প্রকার অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রভাবে মানবের সংকীর্ণ আত্মাভিমান বিলয় পাইতে লাগিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার এমন উদার ভিত্তি পাইয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই উৎসাহ সহকারে বিশ্বহিতকর কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আত্মাভিমান ও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার এই জ্ঞান সূর্য্যের নূতন অভ্যুদয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। নিষ্কাম হইয়া চিত্তশুদ্ধি হেতু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজে নূতন উৎসাহ আসিয়া দেখা দিল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চেষ্টা সুফল হইল, সমগ্র ভারতে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, ভারতে শান্তিময় ধর্ম্মযুগের আবির্ভাব হইল। নানা সংস্কারবশতঃ নানা বিরুদ্ধ ভারাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মী ও উপাসক সম্প্রদায়ের ভেদ ও বৈষম্য এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ সর্ব্বংসহ বিরাট ভিত্তির উপর স্থিতিলাভ বশতঃ নিজ নিজ ব্যষ্টিভাব রক্ষা করিয়া সমষ্টি ভাবের একতায় এক হইয়া উঠিল, বিশাল ভারতের বিরাট হিন্দু সমাজ এক হইয়া সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ঔদার্য্য মণ্ডিত মহিমার, মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া কৃতার্থ হইল, ইহাই হইল আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়, ইহারই নাম হিন্দু সভ্যতার অপূর্ব্ব বিভূতি বিকাশ!

কিছুকাল এই ভাবে বেশ কাটিয়া গেল, দুই তিন শত বৎসর পরে ভারতের ভাগ্য-গগনে আবার কাল মেঘের উদয় হইল, নবোদিত ইসলামের বিজয় বাহিনী ভারতে উত্তরপশ্চিম তোরণ দ্বারে মুহুর্মুহুঃ প্রচণ্ড আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, নানা কারণে এই প্রচণ্ড আঘাতের বেগ অসহ্য হইল, রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্ন প্রাকারে সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইল, স্বাধীনতার সুবর্ণ সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পরিণাম কি হইল, তাহা ভারতেতিহাসের পাঠকবর্গের নিকট সুবিদিত, অধিক বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। এই বিপৎসাগরে পড়িয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ মহাতরণী প্রতিকূল বায়ু বিতাড়নে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। তরণীর পরিচালকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন, ফলে তুচ্ছ স্বার্থপরতামূলক পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ ও হিংসার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা বিশ্বতোমুখ ধ্বংসের অতলস্পর্শ বিরাট গহ্বরের দিকে তীব্র বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে দেহাত্মবাদের বিকট হুতাশন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিল, ব্রহ্মজ্ঞান

গর্ব্বে পরিণত হইল, কর্ম্ম দাম্ভিকতার নামান্তর হইল, যোগ লোকবঞ্চনার অসাধারণ উপায় হইল, উপাসনা ধনার্জ্জনের সহজ উপায় হইল, দার্শনিকতা অহমিকার আকার ধারণ করিল, ত্যাগ সংযম ও বৈরাগ্য মূর্খবশীকরণের বিশিষ্ট উপকরণ হইয়া উঠিল, চারিদিকে অবিশ্বাস, ক্রূরতা ও অহমিকার বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব ধর্ম্মভ্রংশ মূলক এই ভয়ঙ্কর সমাজ বিপ্লবের বিকট চিত্র চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে অতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পবিত্র যোগ মার্গের দুরন্ত অবনতির বর্ণন প্রসঙ্গে কবি কর্ণপূর বলিতেছেন—

"জিহ্বাগ্রেণ ললাট চন্দ্রজসুধাস্যন্দাধ্বরোধে মহদ্
দাক্ষ্যং বাঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ।
অস্যোপান্তনদীতটস্য কিময়ংভঙ্গঃ সমাধের্ভূৎ" ॥

"এই যে যোগী সাধনার জন্য নদী তট আশ্রয় করিয়াছেন ইনি জিহ্বাগ্রদ্বারা অন্তর্ললাটস্থ চন্দ্র হইতে বিগলিত সুধানিস্যন্দের আস্বাদে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার সকল কেমন করিয়া নিরুদ্ধ হয় সে বিষয়ে বিলক্ষণ দক্ষতাও প্রদর্শন করিতেছেন, আবার নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া বদ্ধ পদ্মাসনে বিলক্ষণ ধ্যানও জুড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু একি? হঠাৎ ইঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল কেন?"

"সবিস্ময়ং বিচিন্ত্য অহো জ্ঞাতং"—

বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিয়াও! বুঝিয়াছি—

"পানীয়াহরণ প্রবৃত্ত তরুণী শঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ" ॥

ঐ যে নদীর জল লইবার জন্য আগত যুবতীর হাতের শাঁখার শব্দ ইঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে (তাই ইঁহার সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে!)

মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণাম বর্ণন করিতে যাইয়া কবি কি বলিতেছেন শুনা যাক্—

"সন্মাত্রা নির্ব্বিশেষা চিদুপধিরহিতা নির্বিকল্পা নিরীহা
ব্রহ্মৈ বাস্মীতি বাচা শিব শিবভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ।
যেঽমী শ্রৌতপ্রসিদ্ধানহহ ভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদ্যশেষান্
প্রত্যাখ্যান্তো বিশেষান্ ইহ জহতি রতিং হন্ত তেভ্যো নমোবঃ ॥

এই যে দলে দলে তত্ত্বজ্ঞানীগণ কেবল মুখে বলিয়া বেড়াইতেছেন সন্মাত্র নির্ব্বিশেষ সর্ব্ববিধ উপাধিরহিত চৈতন্যই ব্রহ্ম তাহাতে কোন বিকল্প নাই, কোন ক্রিয়া নাই, আমিই সেই ব্রহ্ম, শিব শিব! ইঁহারা সকলেই অনন্ত আকারে

সর্ব্বত্র স্ফুরণশীল ভগবদ্ বিগ্রহের নাম শুনিলেই চটিয়া উঠেন। উপনিষদে প্রসিদ্ধ ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি নিরবধি জীবদয়া প্রভৃতি অনন্ত গুণনিচয় না মানিয়া না বুঝিয়া কেবল তাহার খণ্ডন করিয়া বেড়ান, তোমাদিগকে নমস্কার।

এই ত হইয়াছিল যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গের পরিণতি, কর্ম্মমার্গের পরিণতি কিরূপ তাহাও দেখা যাক—

হুং হুং হুং ইতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাহপ্যতিক্রুরয়া
দূরোৎসারিত লোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্।
মৃৎস্নালিপ্ত ললাটদোস্থলগলগ্রীবোদরোরাঃ কুশৈ
দীব্যৎপাণিতলঃ সমেতিতনুমান্ দম্ভঃ কিমাহোস্ময়ঃ॥

এ আবার কে? হুং হুং হুং এইরূপ তীব্র ও নিষ্ঠুর শব্দোচ্চারণে ও তীব্র দৃষ্টি দ্বারা দূর হইতেই পথের সকল লোককে সরাইতেছেন (পাছে কাহারও গাত্র-স্পর্শে তাঁহার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত হয়) কোন অপবিত্র বস্তু পাছে মাড়াইয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় ডিঙ্গি মারিয়া প্রায় লাফাইতে লাফাইতে চলিতেছেন। ললাটে, বাহুমূলে, গলদেশে, গ্রীবাতে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে মাটীর লেপ দিয়াছেন, হাত দুখানি কুশগুচ্ছে শোভিত, তাইত ইনি কি মূর্ত্তিমান্ দম্ভ অথবা অহঙ্কার?

আর কত উদ্ধৃত করিব? বাহ্য আড়ম্বর ছাড়া ধর্ম্মের বাস্তব আন্তর তত্ত্ব সমাজে বিলুপ্তপ্রায়। জ্ঞান কর্ম্ম ও যোগ প্রাণহীন, কেবল বাহিরের আকার মাত্র অবশিষ্ট, অহমিকা ও অজ্ঞানের সমুদ্রে পড়িয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিড়ম্বিত হইতেছিল। যুগ বৈষম্যের বিষম পরীক্ষা ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান যখন এই ভাবে অকৃতকার্য্য, তখন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট কলির মানব সমাজকে রক্ষা করিবার উপায় কি, অশক্ত অলস ও অবিশ্বাসী মানবের তাপিত আত্মাকে শীতল করিতে পারে, এরূপ অনায়াসলভ্য ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ই ফলপ্রদ হইতে পারে না, সে ধর্ম্ম কি? ইহাই জানিবার জন্য তখন বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়েই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের বা ভক্তির প্রচারলীলা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যুগ যুগান্তব্যাপী নিদাঘের তীব্র তাপদগ্ধ মানব সমাজে শ্রাবণের বারিধারার বর্ষণ আরম্ভ হইল। মানব যাহা চাহিয়া থাকে, এবং যাহা পাইলে মানব আর কিছুই চাহে না, তাহাই অযাচিত্র ভাবে দ্বারে দ্বারে বিলাইবার জন্য তিনি জননী স্নেহ, পত্নীর প্রণয়রঞ্জন, সহচরবৃন্দের মৈত্রী, জন্মভূমির অনুরাগ দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, গার্হস্থ্যের সকল প্রকার মধুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্বপ্রেমের বন্যায়

নিজে ভাসিয়া জগৎকে ভাসাইবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রচারিত প্রেমভক্তির অনুপম মধুর আস্বাদন পাইয়া দলে দলে পাপী ও তাপী কলির জীব তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিল। ভারতে বিশ্বমানবের বিরাট আত্মার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রেমভক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহা দ্বারা মানবের কি ফল লাভ হইল, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয়কার ও তৎপরবর্ত্তী ও সমসাময়িক বৈষ্ণব সাধুগণ যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন, এবং আপামর সাধারণকে বুঝাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

মরণের পারে।

[লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।]

মৃত্যুর পর প্রত্যেক জীবকেই জন্মিতে হয়। কেহ মৃত্যুর পরক্ষণেই, কেহ বৎসর মধ্যে বা বৎসর শেষে, কেহ বা স্বর্গ-নরক ভোগান্তে জন্মে, এইমাত্র বিশেষ। কোটি কোটি মানবের মধ্যে কদাচিৎ কাহার ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ জীবাত্মায় আর জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় পায়, তিনিই মুক্ত। কদাচিৎ কেহ ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, ভগবানকে দর্শন করিয়া, ভবের লীলা শেষ করেন, তিনিও মুক্ত।

দুই তিন বৎসরের শিশুদের দাহ নাই, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই। কারণ উহাদের লিঙ্গদেহ ধারণ হয় না, নূতন দেহ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না, বা পরলোকে স্বর্গ নরক ভোগও করিয়া যাইতে হয় না। জলুকা যেমন এক তৃণ হইতে অন্য তৃণে গমন করে, তদ্রূপ শিশুরা দেহ ত্যাগ করিয়াই অপর দেহ আশ্রয় করে। দেহের উপর মায়া মমতা জন্মে নাই বলিয়া, মনঃশক্তি প্রখরতা লাভ করে নাই বলিয়া শিশুরা লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিতে পারে না। বর্ত্তমান দেহে কোন প্রকার পাপ-পুণ্য অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহাদের মৃত্যুর পর কোনরূপ পাপ-পুণ্য ভোগ সম্ভব হয় না, নানা কর্ম্মফলের বৈচিত্র্য না থাকায় শরীর লাভ সেই ক্ষণেই ঘটিয়া থাকে।

মানব শিশুরা সাধারণতঃ মরণের পর আবার মানব শিশুই হইয়া থাকে। কেহ কেহ সেই গৃহেই জন্ম লয়। উহাদের মনের ইচ্ছা প্রবল না হইলেও

প্রায়শঃ নানা কর্ম্মবাহুল্য অভাবে বিঘ্নপ্রাপ্ত হয় না। কোন কোন মহাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হইবার পূর্ব্বে একবার প্রাক্তন অদৃষ্টচক্রে হয়তঃ দেহ ধারণ করিতে হয়। তিনিই শেষবার শিশুরূপে গর্ভবাস ক্লেশ ভোগ করিয়া মুক্ত হইয়া যান। কোন কোন মানব উৎকট পাপের ফলে অল্পদিনের মধ্যে অনেকবার জন্ম-মরণ ক্লেশ ভুগিয়া থাকেন। তাহারা তিন চারি বার কি আট দশ বার শিশু হইয়া একই বয়সে মৃত্যু লাভ করে।

আমার দিদিমার পিতা একবার তাঁহার একটী শিশুপুত্রকে লইয়া গোন্দল-পাড়ায় কুক্কুর দংশনের ঔষধ আনিতে যান। ফিরিবার পথে নৌকায় শিশু পুত্রটি পিতাকে বলে, "বাবা, ঐ বাড়ীর পাশের বাড়াতে আমি পেয়ারা খাইতে যাই। ঐ পেয়ারা গাছটি হইতে ছোট বেলায় আমি অনেকবার পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়াছি। ঐ বাড়ীতে আমি ছিলাম, ঐ বাড়ীতে আমার এক মা আছে। সে মা আমাকে দেখিয়া কতই কাঁদিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসিবি?" আমি বলিয়া আসিয়াছি "শীঘ্রই যাইব।"

ছোট বেলাই এখানে পূর্ব্বজন্ম। কিছুদিন পরে রোগে পুত্রটির মৃত্যু হইল। পাঁচ বৎসর পরে দিদিমার পিতা আবার গোন্দলপাড়ায় যাইয়া দেখেন, তাঁহারই যেন সেই ছেলেটি খেলা করিতেছে, পেয়ারা গাছ হইতে পেয়ারা খাইতেছে। কিছুদিন পরে উক্ত শিশুটিও একই বয়সে মারা গেল।

শিশুরা বর্ত্তমান দেহে পাপ পুণ্য করে না বটে, কিন্তু সকল সময়ে পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম নিঃশেষে ভোগ করিয়া যায় না। একই প্রারব্ধ কত জন্মের কারণ হয়। আর প্রারব্ধ ভুক্ত হইলেও সঞ্চিত কর্ম্মবশে আবার তাহাদের জন্মলাভ ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনা, সংস্কার এবং কামকর্ম্মকারণীভূতা অবিদ্যা সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া মুক্তির সম্ভাবনা নাই। শিশুরা শিশুজন্মে ক্রিয়মান কর্ম্ম করে না বলিয়া সেই জন্মে কিছু লইয়া যায় না।

কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান। যে পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে এই দেহ, যাহা এই দেহে ফলভোগ করিতেই হইবে, যাহা ফলভোগ বিনা কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না, তাহাই প্রারব্ধ। প্রারব্ধের নামই নিয়তি, দৈব বা অদৃষ্ট। আর যে পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফল এই দেহের আরম্ভক নহে, এই দেহেই ফলভোগ হইবে তার নিশ্চয়তা নাই, যাহার সত্বর বা বিলম্বে ফলভোগ মানবের আয়ত্তে, যাহা নাশপ্রাপ্ত হইয়াও থাকে—তাহাই সঞ্চিত। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে তখন সঞ্চিত আসিয়া কখন কখন প্রারব্ধের স্থান অধিকার করে।

আর যাহা নূতন করা যায়, তাহাই ক্রিয়মান। ক্রিয়মান কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা আছে। মানব প্রারব্ধের ফলভোগ ত করেই, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মের ফলভোগও কখন কখন এ জন্মে করিয়া থাকে।

ক্রিয়মান কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা মানিতেই হয়। প্রারব্ধও ত এক জন্মের ক্রিয়মান; নচেৎ প্রারব্ধ জন্মিল কিরূপে? এক জন্মে যখন "ক্রিয়মান" করিয়াছিল পাওয়া গেল, তখন এ জন্মেও ক্রিয়মান কর্ম্মের স্বাধীনতা না মানিয়া গত্যন্তর নাই। এই জন্মের বড় সাধনার ফল যখন এই জন্মে পাওয়া যাইতেছে, এই জন্মের পাপের ফলও এই জন্মে লাভ হইতেছে দেখা যায়, তখন ক্রিয়মান কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা আছে।

সাধারণ পাপপুণ্যকারী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তবে নূতন জন্ম লাভ করে। এই অপেক্ষা এক বৎসরের অল্প বা অধিক। ইহারা লিঙ্গদেহে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া থাকে মাত্র; সে সময়ে কৃত পাপ-পুণ্যের কোনরূপ ফলভোগ করিতে হয় না। ফলভোগ লিঙ্গদেহে হয় না, ভোগ দেহে হয়। পরলোকে লিঙ্গদেহের পর কাহারা কাহারা উহারই প্রকারভেদ স্বরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ-নরক ভোগ করে। কাহারা কাহারা ভোগদেহ প্রাপ্ত না হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবের আত্মা বাহির হইবার জন্য লালায়িত হয়। দেহে আর থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেহ হইতে বাহিরে আসিয়া বড়ই স্বস্তি লাভ করে। দেহ ছাড়িবামাত্র জীব উক্ত স্থূলদেহের ছায়ামাত্র লইয়া একেবারে উধাও হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে "তাই ত আমার এ দেহ ত ঠিক সে দেহ নহে" এই ভাবিয়া মৃত্যুর স্থানে কেহ কেহ ফিরিয়া আইসে। কথায় বলে মৃত আত্মা শবের অনুগমন করে। দাহ হইয়া গেলে যখন আর স্থূলদেহ দেখিতে না পায়, কাজেই তখন সেই স্থূল দেহের উপর মৃতের আসক্তি তেমন থাকে না। টাকা শুদ্ধ মণিব্যাগ যদি গঙ্গার মাঝখানে পড়িয়া যায়, তখন কাজেই তাহার মায়া তখন ছাড়িতে হয়। কবর দিলেও অবশ্য সে মায়া কাটে, তবে দাহের পর যেমন নিশ্চিহ্ন হয়, কবরে তেমন হয় না। "ঐ ভূমির মধ্যে আমার দেহ আছে"—এ সংস্কারে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। দেহ ভস্ম করিয়া উক্ত ভস্মগুলি পর্য্যন্ত জলে ধুইয়া ফেলা আমাদের শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা। মৃতদেহ যদি ঔষধগুণে অবিকৃত রাখিয়া কাচের পাত্রে ছাদের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে মৃত আত্মা সহজে সেই দেহের উপর প্রবল

আসক্তি লোপ করিতে পারে না। বর্ত্তমান দেহের উপর প্রবল আসক্তি পারলৌকিক পথে বা নূতন দেহ ধারণের বাধা উৎপাদন করে।

দেহের ফটো পর্য্যন্ত মৃত আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য সাধারণ ব্যক্তির ফটো না রাখাই ভাল, প্রতিমূর্ত্তি রাখাও বিধেয় নহে। এক সময়ে খ্যাতনামা শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার মৃত পুত্রের ফটো তুলিবার জন্য আমেরিকায় লিখিয়া পাঠান। তাঁহারা ঐ বালকের বালককালের কোন ফটো আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। বালক কালের কোন ফটো নাই শুনিয়া তাঁহারা বালকের কোন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাঠাইতে বলেন। তাহার জোরেই সেই আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার ফটো তুলিয়া লন। নিত্য ব্যবহার্য্য প্রিয় দ্রব্য পর্য্যন্ত মৃতের সঙ্গে দগ্ধ করাই সমীচীন।

বর্ত্তমান দেহের উপর যেমন প্রবল আসক্তি কমিয়া যায়, অমনই নূতন দেহের লালসাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নূতন দেহ গ্রহণের ইচ্ছার বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব্ব দেহের ছায়ামূর্ত্তিও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, ক্রমে সূক্ষ্মতম হইয়া আইসে। তৎপরে যখন স্থাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ শস্যের আশ্রয় করিয়া জন্মলাভের আশায় সংমূর্চ্ছিতবৎ অবস্থিতি করে, তখন পূর্ব্ব দেহের ছায়ামূর্ত্তি আর থাকে না। সপ্তদশলিঙ্গোপেত জীব তৎপরে শস্যের ভিতর দিয়া রক্তের ভিতর সূক্ষ্মতম হইয়া ক্রমে স্ত্রী গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। এই যে অসংখ্য জীবাণু সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে, উহাদের মধ্যে কত মানবের জীবাত্মা রহিয়াছে। শস্যে আশ্রয় করিয়া থাকা অবস্থায় জীবের জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রসুপ্ত থাকে, সে সময়ে শস্যের ছেদন ভেদনে জীবের কোন কষ্টই হয় না। শস্য সংশ্লেষ ব্যতীত জন্মিবার আর উপায় নাই। উহাই জন্মের দ্বার।

নূতন দেহ গ্রহণ যত দিন করিতে না পারে, তত দিন জীবের স্বস্তি নাই। শস্যে আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে জীব অন্তরীক্ষে ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। সে সময়ে জীবদ্দশার অভ্যস্ত সংস্কার বশতঃ জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণার দোষ জন্মে, ক্লান্তি ও আসক্তি জনিত দুঃখ বোধও হয়। ঐ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তি বোধ অবশ্য তাহার মানসিক কল্পনা মাত্র। তথাপি সে সময়ে উক্ত কল্পনা সত্যরূপেই প্রতীত হয়। জাগরণের দুঃখ আর স্বপ্নের দুঃখে অনুভবাংশে কোন তারতম্যই নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণাদি বোধ আপনা আপনি জন্মে, আপনা আপনি তাহা দূর হয়। তবে মৃত আত্মার যদি তাহা আপনা আপনি না দূর হয়, তজ্জন্য আমরা যতটুকু পারি সাহায্য করিয়া থাকি মাত্র। রোগের চিকিৎসার মত আধ্যাত্মিক

চিকিৎসা অবলম্বন করি। শ্রাদ্ধ তর্পণ, মৃতের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা, গয়াধামে পিণ্ডদান সমস্তই ঐ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। অপরের চিন্তাশক্তি যখন অন্যে সংক্রান্ত হইতে পারে, মাতার প্রার্থনায় সন্তানের রোগ সারিয়া থাকে, প্রকৃত সতী স্বামীকে নরক হইতে টানিয়া আপনার কাছে লইয়া থাকে, তখন আর আমরা ঐ মানসিক ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীকরণের উপায় করিতে পারিবই বা না কেন?

পারলৌকিক পুণ্যকারী ব্যক্তি স্বর্গে, উৎকট পাপকারী ব্যক্তি নরকে গমন করে। লিঙ্গদেহে যখন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হয়, তখন ঐ দেহের নাম ভোগ-দেহ। "মনোময়ানি হি স্বর্গ লোকে শরীরাণি" স্বর্গে শরীর মনোময়। "সংকল্পজা ভোগাঃ।" সেখানে ভোগ সংকল্পজ। স্থূল দেহ নাই, স্থূল ইন্দ্রিয় নাই, কাজেই মন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সাহায্যে স্বপ্নের মত কেবল মানস সুখই ভোগ করে। সংকল্প মাত্র ভোগ্য বস্তু যেন উপস্থিত হইয়া তাহাকে সুখ দেয়। "পরলোকে সুখ হউক" এইরূপ বিশ্বাসে কৃত পুণ্যের পরলোকেই ফল লাভ হইবে। পরলোকার্থে অনুষ্ঠিত পুণ্যই পারলৌকিকার্থ পুণ্য। পারলৌকিকার্থ পুণ্য স্বর্গে প্রক্ষীণ হইলে পর জীব ঐহিকার্থ পুণ্যের ফলভোগের জন্য স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়, পশ্চাৎ স্থাবর সংশ্লেষ লাভ করিয়া জন্ম লয়।

সাধারণতঃ মানব ভোগে আসক্ত। ভোগাসক্ত মানব ভোগের যে আদর্শ কল্পনা করিয়া পুণ্য করিয়া যাইবে, সেই আদর্শানুযায়ী ভোগই তাহার লাভ হইবে। ভোগাসক্ত মানবের ভোগের মূর্ত্তি কিরূপ, তাহা ভাবিলে স্বর্গ বর্ণনাই মনে পড়ে। পরম রূপবতী অপ্সরা, তাহে চিরযৌবনা, অবসাদহীন ভোগ, অটুট যৌবন, নিত্য জ্যোৎস্না, চির বসন্ত, সংকল্পমাত্রোপনীত ভোগ্য বস্তু, ইহা অপেক্ষা ভোগের আদর্শ কি হইতে পারে? এই ভাবে পুণ্যকারী ব্যক্তির পরলোক ব্যতীত অন্যত্র কোথায় জাতীয় ভোগের স্পৃহা চরিতার্থ হইবে? যে যে ইচ্ছা পোষণ করিয়া যথোচিত সাধনা করিয়া যাইবে, যেমন অনুরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিবে, সে সেই মত ফল পাইবে।

উৎকট পাপের ফলভোগ ইহলোকেও হয়, পরলোকেও হয়, আবার জন্মান্তরেও হয়। পরলোকে দুঃখ ভোগের বেলায়ও উক্ত ভোগ নিরবচ্ছিন্ন, কাজেই অত্যধিক কষ্টকর। মানসিক দুঃখভোগ তাই নিরবচ্ছিন্ন। নরক ভোগান্তে কাহারা বৃক্ষ প্রস্তরাদি, কাহারা পশুপক্ষী আদি জন্ম লাভ করিয়া কত কালে আবার মানব হইতে পায়। কাহারা বা নরক ভোগান্তে একেবারেই

মানব জন্ম লাভ করে। কেবল পাপের অবশেষচিহ্ন স্বরূপ কুষ্ঠাদি রোগ লইয়া আইসে। মানব জন্মই দুর্লভ জন্ম। কারণ এই জন্মেই উপযুক্ত সাধনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায়, হওয়া যায়; এমন কি ভগবৎ লাভ পর্য্যন্ত হয়।

প্রারব্ধ ত এই জন্মেই শেষ হইবে। তবে যাহাতে এই জন্মে ভাল কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারা যায়, মরণের পারের সম্বল লইয়া মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। মানব হইতে পাইয়াছি, আবার হয়ত কত কাল মানব হইতে পাইব না কে জানে?

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং ॥

(কঠোপনিষৎ)

শরীরজৈঃ পাপদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈর্ম্মৃগপক্ষিতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং ॥

(মনু)

উৎকট পাপের ফলে বৃক্ষ প্রস্তরাদি যোনি লাভ হয়। তাহার নাম স্থাবর যোনি। স্থাবর সংশ্লেষ আর স্থাবর যোনি এক জিনিস নহে। স্থাবর সংশ্লেষ মাত্র জন্মার্থ। স্থাবর যোনি দুঃখ ভোগার্থ। স্থাবর যোনিতে স্থাবরের দেহই জীবের দেহ। জীবের আত্মা স্থাবরের আত্মা। স্থাবর যোনিতে বহু কাল ব্যর্থ হইয়া যায় বলিয়া বড়ই কষ্টতম অবস্থা, স্থাবর সংশ্লেষে জীব কেবল স্থাবরে আশ্রয় করিয়াই থাকে। স্থাবর সংশ্লেষ আর স্থাবর যোনি যেমন পৃথক্, লিঙ্গ দেহ আর ভৌতিক যোনিও তদ্রূপ পৃথক্। লিঙ্গদেহ নূতন দেহ ধারণার্থ সকলের পক্ষেই আশ্রয়নীয়। আর ভৌতিক যোনি এক প্রকার পাপ যোনি। অত্যুৎকট পাপকারী ব্যক্তি মৃত্যু কালে যদি কোন ভয়ানক উৎকট পাপাকাঙ্ক্ষা লইয়া যায়, আর সেই সঙ্গে মুহূর্ত্তক্ষণের দোষ থাকে, তবে ভৌতিক যোনি লাভ হয়। ভৌতিক যোনি কষ্টকর যোনি। উৎকট আকাঙ্ক্ষার শেষ হইলে ভৌতিক যোনি বিমুক্তি ঘটে। যদি না ঘটে, তবে আমরা চেষ্টা করিয়া তাহার উপায় করিতে পারি।

সারাজীবন যাঁরা সৎপথে থাকিয়া যান, পুণ্যানুষ্ঠানে মন দিয়া, পাপ কার্য্য না করিয়া প্রস্থান করেন, অবশ্য মরণের পারে তাঁহাদের ভালই হয়। ভগবানে যাঁরা নির্ভর করিয়া আপনাদের অহঙ্কার, অভিমান এবং স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, মরণ কালে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া, মরণের পারে গমন

করেন, তাঁহাদেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে জীবের পাপ তাপ, যোগ ক্ষেম, সমস্তই ভগবান গ্রহণ করেন।

গোবধ জন্য পাপ একদিন এক ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিতে যায়। ব্রাহ্মণ বলেন, 'কার গরু, কার সংসার? সবই ত ভগবানের। আমি কে? ভগবানই করান তাই জীব করে। জীবের কি? যাও, ভগবানে আশ্রয় কর"। পাপ ভগবানের নিকট গেলে ভগবান বলিলেন হাঁ, যদি ব্রাহ্মণ যথার্থ আমাতে এই বিশ্বাস রাখে, আমাতে সম্পূর্ণ নির্ভর রহে, তবে আমি উহার পাপ অবশ্যই গ্রহণ করিব।

ভগবান সুরূপ সুবেশ যুবাপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে যাইলেন। ব্রাহ্মণের পত্নীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে আকর্ষণ করত বলিলেন—"কে কার? সবই ত ভগবানের জিনিস, সকলকার অধিকার সমান। অতএব তুমি এক ব্রাহ্মণের কেন? এস।" ব্রাহ্মণ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দণ্ড হস্তে ছুটিয়া আসিল। তখন ভগবান্ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন "পাপের বেলায় ভগবান, কেমন? গরু ভগবানের, আর স্ত্রী বুঝি আপনার?" পাপের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণের পাপ ব্রাহ্মণেরই হইবে", ভগবান অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ঊরু-ভঙ্গ।

[লেখক— শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।]

ভাস-রচিত 'ঊরুভঙ্গ' একখানি অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক। নাটক, প্রহসন, প্রকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত রূপকের দশ প্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বা অঙ্ক এক প্রকার। কিন্তু নাটক, প্রহসন প্রভৃতি নাম ও গ্রন্থ আমাদের সুপরিচিত হইলেও অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক-সংজ্ঞক রূপকের নাম ও লক্ষণমাত্র আমরা অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাইয়াছি। এক্ষণে ভাসের ঊরুভঙ্গ প্রকাশিত হওয়াতে উৎসৃষ্টিকাঙ্কের একটী উদাহরণ প্রাপ্ত হইলাম।

ভরত নিজ নাট্যশাস্ত্রে উৎসৃষ্টিকাঙ্কের নিম্নপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন:—

"বক্ষ্যাম্যতঃপরমহং লক্ষণমুৎসৃষ্টিকাঙ্কস্য ॥
প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ন্ত্বপ্রখ্যাতঃ কদাচিদেব স্যাৎ।
দিব্যাপুরুষৈর্বিযুক্তঃ শেষৈরন্যৈর্ভবেৎ পুংভিঃ ॥
করুণরসপ্রায়কৃতো নিবৃত্তযুদ্ধোদ্ধতপ্রহারশ্চ।
স্ত্রীপরিদেবিতবহুলো নির্বেদিতভাষিতশ্চৈব ॥
নানাব্যাকুলচেষ্টঃ সাত্বত্যারভটি-কৈশিকীহীনঃ।
কার্য্যঃ কাব্য বিধিজ্ঞৈঃ সততং হ্যুৎসৃষ্টিকাঙ্কস্তু ॥"

[নাট্যশাস্ত্র, ১৮শ অধ্যায়।

অর্থাৎ, "আমি ইহার পর উৎসৃষ্টিকাঙ্কের লক্ষণ বলিব। ইহার উপাখ্যান বিখ্যাত ঘটনাবিষয়ক হইবে। কখনও অপ্রসিদ্ধ ঘটনাবিষয়কও হইতে পারে। ইহাতে দিব্যপুরুষ থাকিবে না। অন্যান্য সাধারণ পুরুষ থাকিবে। অধিকাংশই করুণরসবিশিষ্ট হইবে। যুদ্ধ বা উদ্ধত প্রহারাদির পর ইহার ঘটনা আরম্ভ হইবে। ইহাতে রমণীগণের বহু বিলাপ, খেদ ও ব্যাকুল চেষ্টা থাকিবে। সাত্বতী, আরভটি ও কৈশিকী বৃত্তি ইহাতে থাকিবে না। কাব্য-বিধিজ্ঞ জনগণ সর্ব্বদা এই প্রকারে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক রচনা করিবেন।"

ধনঞ্জয় দশরূপকে উৎসৃষ্টিকাঙ্কের নিম্নপ্রকার লক্ষণ করিয়াছেনঃ—

"উৎসৃষ্টিকাঙ্কে প্রখ্যাতং বৃত্তং বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ।
রসস্তু করুণঃ স্থায়ী নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ
ভাণবৎ সন্ধিবৃত্ত্যঙ্গৈর্যুক্তঃ স্ত্রীপরিদেবিতৈঃ।
বাচা যুদ্ধং বিধাতব্যং তথা জয়পরাজয়ৌ ॥"

[দশরূপক। ৩।৭০—৭২।

অর্থাৎ "উৎসৃষ্টিকাঙ্কে বিখ্যাত ঘটনা বুদ্ধি দ্বারা বিস্তৃতরূপে বর্ণনীয়। ইহার স্থায়ী রস, করুণ। সাধারণ নরগণ ইহার নায়ক। ভাণের ন্যায় ইহা সন্ধি ও বৃত্তির অঙ্গবিশিষ্ট হইবে। ইহাতে স্ত্রীগণের খেদ থাকিবে. জয়-পরাজয় ও বাক্যে যুদ্ধ থাকিবে।"

নাটক প্রভৃতির অন্তর্গত অঙ্কের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য, শুধু অঙ্ক না বলিয়া ইহাকে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বলা হয়। ধনিক এই কথা বলিয়াছেন, ("উৎসৃষ্টিকাঙ্ক ইতি নাটকান্তর্গতাঙ্কব্যবচ্ছেদার্থম্।" দশরূপাবলোক) ধনঞ্জয় উৎসৃষ্টিকাঙ্কে সন্ধি ও বৃত্তি ভাণের ন্যায় হইবে লিখিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভাণের লক্ষণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভাণে মুখ ও নির্ব্বহণ নামক সন্ধি ও ভারতী বৃত্তি হইবে, বলিয়াছেন। যথা—

"ভূয়সা ভারতী বৃত্তিরেকাঙ্কং বস্তু কল্পিতম্ ।
মুখনির্বহণে সাঙ্গে লাস্যাঙ্গানি দশাপি চ ॥"

[দশরূপক। ৩।৫১।

বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে উৎসৃষ্টিকাঙ্কের এই লক্ষণ দিয়াছেন :—

"উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্কো নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ ॥
রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী বহুস্ত্রীপরিদেবিতম্ ।
প্রখ্যাতমিতিবৃত্তঞ্চ কবির্বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ ॥
ভাণবৎসন্ধিবৃত্ত্যঙ্গান্যস্মিঞ্জয়পরাজয়ৌ ।
যুদ্ধঞ্চ বাচা কর্ত্তব্যং নির্বেদবচনং বহু ॥"

[সাহিত্যদর্পণ। ৬।২৫০—২৫২।

অর্থাৎ, "উৎসৃষ্টিকাঙ্ক এক অঙ্কে সমাপ্ত হইবে। সাধারণ নর ইহার নায়ক। ইহার স্থায়ী রস করুণ। স্ত্রীগণের বহু বিলাপ ইহাতে থাকিবে। ইহার ইতিবৃত্ত বিখ্যাত হইবে, কবি নিজবুদ্ধি দ্বারা তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিবেন। ভাণের ন্যায় ইহার সন্ধি ও বৃত্তির অঙ্গ হইবে। ইহাতে জয়, পরাজয় ও যুদ্ধ বাক্যের দ্বারাই কর্ত্তব্য। ইহাতে বহু বিলাপ থাকিবে।"

ধনিক উৎসৃষ্টিকাঙ্কের সংজ্ঞায় যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশ্বনাথ তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, "যাহাতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ বিলোমরূপ সৃষ্টি তাহাই উৎসৃষ্টিকাঙ্ক।" ("ইমঞ্চ কেচিৎ নাটকাদ্যন্তঃপাত্যঙ্কপরিচ্ছেদার্থমুৎসৃষ্টিকাঙ্কনামানম্ ইত্যাহুঃ। অন্যে তু, উৎক্রান্তা বিলোমরূপা সৃষ্টির্যত্রেত্যুৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ।")

বিশ্বনাথ "শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি" নামক একখানি গ্রন্থ উৎসৃষ্টিকাঙ্কের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই নাম ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের বিষয় আর কিছু অবগত হওয়া যায় না।

বিশ্বনাথও ভাণে ভারতী বৃত্তিই প্রধান ও ইহাতে মুখ ও নির্বহণ নামক সন্ধি আছে বলিয়াছেন।

বৃত্তি চার প্রকার—কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটী ও ভারতী। শৃঙ্গার রসে কৈশিকী, বীররসে সাত্বতী, রৌদ্র ও বীভৎস রসে আরভটী ও অন্যান্য সর্ব্বত্র ভারতী বৃত্তি প্রযুক্ত হয়। * উৎসৃষ্টিকাঙ্কে যখন করুণই স্থায়ী রস, তখন

---

* "শৃঙ্গারে কৈশিকী বীরে সাত্বত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ভারতী ॥"
সাহিত্যদর্পণ। ৬।১২২।

কৈশিকী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তি তাহাতে থাকিতে পারে না। ভারতী বৃত্তিই থাকিবে।

রাম তর্কবাগীশ সাহিত্য-দর্পণের টীকায় লিখিয়াছেন,—উৎসৃষ্টিকাঙ্কে কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তি থাকিবে। এ কথায় আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। ভাণে কৈশিকী বৃত্তি থাকিতে পারে, এবং 'উৎসৃষ্টি-কাঙ্কে ভাণবৎ বৃত্তি থাকিবে, এই বচন ধরিয়া বোধ হয় রাম তর্কবাগীশ এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথ ভাণের লক্ষণে কৈশিকী বৃত্তির নাম করেন নাই। প্রধানতঃ ভারতী বৃত্তি ভাণে থাকিবে এই কথা বলিয়াছেন। যথা—

"তত্রেতিবৃত্তমুৎপাদ্যং বৃত্তিঃ প্রায়েণ ভারতী।
মুখনির্বহণে সন্ধী লাস্যাঙ্গানি দশাপি চ॥"

কাজেই ইহা হইতে কৈশিকী বৃত্তি উৎসৃষ্টিকাঙ্কে থাকিবে, ইহা কল্পনা করা অসঙ্গত। বিলাপসঙ্কুল উৎসৃষ্টিকাঙ্কে শৃঙ্গার রসের অবতারণা হইতে পারে না। এই জন্যই ভরত স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, উৎসৃষ্টিকাঙ্কে সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী বৃত্তি থাকিবে না। ("সাত্বত্যার-ভটি-কৈশিকীহীনঃ।")

এক বিষয়ে বিশ্বনাথ, ধনঞ্জয়ের সহিত ভরতের প্রভেদ লক্ষিত হইবে। বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় বলেন যে, উৎসৃষ্টিকাঙ্কের বিষয় বিখ্যাত বস্তু হইবে, ভরত বলেন, সর্ব্বদাই যে তাহা হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কখনও কখনও অবিখ্যাত বিষয়ও উৎসৃষ্টিকাঙ্কে স্থান পাইতে পারে।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে পাঁচটি সন্ধি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে উৎসৃষ্টি-কাঙ্কে দুইটিমাত্র সন্ধি (মুখ ও নির্বহণ) প্রযুক্ত হইবে। মুখসন্ধিতে কেবল ঘটনার সূচনামাত্র হয়, নির্বহণে ঘটনা সমাপ্তি হইয়া থাকে। অন্যান্য সন্ধির বিষয় অর্থাৎ ঘটনার ঈষদ্‌বিকাশ, অন্যান্য অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার সহিত সঙ্ঘর্ষ প্রভৃতি উৎসৃষ্টিকাঙ্কে থাকিতে পারে না। উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্কে সমাপ্ত, কাজেই এত অল্প পরিসরের মধ্যে একটি ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি ভিন্ন বিশেষ বিকাশ অসম্ভব।

এখন দেখা যাক্, উরুভঙ্গ নামক রূপকে পূর্ব্বোদ্ধৃত লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে কি না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানের ঘটনা লইয়া উরুভঙ্গ রচিত। কাজেই ইহার ঘটনা বিখ্যাতবস্তুবিষয়ক। সমন্তপঞ্চক কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের শত শত

বীরের দেহে সমাচ্ছন্ন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি গতায়ু। সূত্রধার নাট্যারম্ভে তাহাই সূচনা করিল। ভরতের 'নিবৃত্তযুদ্ধোদ্ধতপ্রহার' এই লক্ষণটি এই বিষয়ে খাটে। দুর্য্যোধন ও ভীমের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে সূত্রধার এই কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন তিনজন ভট রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। ইহারা হতাহত নর, গজ ও বাজীসঙ্কুল রণক্ষেত্রের বর্ণনা করিতে লাগিল। ভগ্ন রথ, অস্ত্রশস্ত্রাদি বিক্ষিপ্ত; শৃগাল, শকুনি মহোল্লাসে নিজ নিজ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত। এই বর্ণনাগুলিও যুদ্ধাবসান নামক ভরতোক্ত লক্ষণসূচক।

ভটগণ তাহার পর ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিত লাগিল। তাহাদের কথোপকথনে ঐ যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম শেষে দুর্য্যোধনের উরুতে গদাঘাত করিলে, দুর্য্যোধন পতিত হইলেন। ভটগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বাক্যের দ্বারা যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের বর্ণনা থাকিবে, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথের এই লক্ষণটি পূর্ব্বোক্ত ভটদিগের কথোপকথনে খাটিতেছে।

তাহার পর অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ বলদেব প্রবেশ করিলেন। ভগ্ন-উরু দুর্য্যোধনও বহু ক্লেশে তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য কোন প্রকারে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। পরে গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনের পত্নীদ্বয় ও পুত্র দুর্জ্জয় প্রবেশ করিলেন। ইহাদের খেদ ও কথোপকথন অতি করুণরসাবহ। এই করুণরসই নাট্যখানিতে স্থায়ী। গান্ধারী ও দুর্য্যোধন পত্নীদ্বয়ের বিলাপই ইহার মূল। শেষে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা প্রবেশ করিয়া প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর নাট্য শেষ হইল।

এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উরুভঙ্গে উৎসৃষ্টি-কাঙ্কের সকল লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান। কৌতূহলী পাঠক সমগ্র উরুভঙ্গের সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। *

উরুভঙ্গ নাট্যের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বধ বা মৃত্যু প্রকাশ্যে অভিনীত হইবে না। †

---

* ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৪।

† "দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা॥
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।

ধনিক দশরূপাবলোকে বলিয়াছেন,—নাট্যে অধিকৃত নায়ক-বধ প্রত্যক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, প্রবেশক প্রভৃতি দ্বারাও সূচিত হইবে না। কিন্তু এই স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও উরুভঙ্গের শেষে আছে :—

দুর্য্যোধন। আমার প্রাণ আমায় পরিত্যাগ করছে। এই যে শান্তনু প্রভৃতি আমার পিতৃপিতামহগণ। এই যে কর্ণকে অগ্রে করে শত ভাই উঠে দাঁড়িয়েছে। এই যে কাকপক্ষধর ক্রুদ্ধ অভিমন্যু ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ে ইন্দ্রের হাত ধরে আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। এই যে উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরা আমার নিকট এসেছেন। এই যে মূর্ত্তিমান মহাসাগরসমূহ। এই যে গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল! এই যে যম বীরবহনযোগ্য সহস্রহংসযুক্ত রথ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন।' এই যে—এই যে যাই।

(স্বর্গে গেলেন)

(যবনিকা আস্তরণ করিল) *

এখানে প্রকাশ্যেই নায়কের মৃত্যু প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল এই স্থলে নহে, ভাস নিজরচিত অন্যান্য নাটকেও প্রকাশ্যে মৃত্যু দেখাইয়াছেন। প্রতিমানাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আছে :—

দশরথ। এই যে ইন্দ্রের সখা দিলীপ, এই যে রঘু, এই যে আমার পূজনীয় পিতা অজ। আপনাদের এখানে আসবার কারণ কি? আপনাদের

শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্॥
স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জ্জিতো নাতিবিস্তরঃ।'

[সাহিত্যদর্পণ। ৬।১৬—১৮।

"দূরাধ্বানং বধং যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবম্।
সংরোধং ভোজনং স্নানং সুরতং চানুলেপনম্॥
অম্বরগ্রহণাদীনি প্রত্যক্ষাণি ন নির্দ্দিশেৎ।
নাধিকারিবধং ক্বাপি, ত্যাজ্যমাবশ্যকং ন চ॥"

[দশরূপক, ৩।৩৪—৩৬।

* "পরিত্যজন্তি মে প্রাণাঃ। ইমেঽত্রভবন্তঃ শন্তনুপ্রভৃতয়ো মে পিতৃপিতামহাঃ। এতৎ কর্ণমগ্রতঃ কৃত্বা সমুত্থিতং ভ্রাতৃশতম্। অয়মপ্যৈরাবতশিরোবিষক্তঃ কাকপক্ষধরো মহেন্দ্রক-রতলমবলম্ব্য ক্রুদ্ধোঽভিভাষতে মামভিমন্যুঃ। ইমা উর্ব্বশ্যাদয়োঽপ্সরসো মামভিগতাঃ। ইমে মূর্ত্তিমন্তো মহার্ণবাঃ। এতা গঙ্গাপ্রভৃতয়ো মহানদ্যঃ। এষ সহস্রহংসযুক্তো মাং নেতুং বীর-বাহী বিমানঃ কালেন প্রেষিতঃ। অয়ময়মাগচ্ছামি।" (স্বর্গং গতঃ)

[যবনিকাস্তরণং করোতি]

সঙ্গে বাস করবার সময় এসেছে কি? রাম! বৈদেহি! লক্ষ্মণ! আমি এখান থেকে পিতৃগণের নিকট যাচ্ছি। পিতৃগণ! এই যে—এই যে আমি এলাম।

(মূর্চ্ছাগত হইলেন)

(কাঞ্চুকীয় যবনিকা টানিয়া দিল) *

এখানে মৃত্যুর কথা স্পষ্ট লেখা নাই। কিন্তু উহাই দশরথের শেষ মুহূর্ত্ত।

মৃত্যুও যেমন দেখাইতে নাই, বধ দেখানও তেমনি নিষিদ্ধ। কিন্তু অভিষেক নাটকে বালিবধ প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিষেক নাটকের প্রথমাঙ্কে আছে:—

বালী। আমার প্রাণ যেন আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই যে গঙ্গা প্রভৃতি নদী ও উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরা আমার নিকট এসেছে। এই যে যম কর্ত্তৃক আমায় লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত বীরবাহনযোগ্য সহস্রহংসযুক্ত রথ। আচ্ছা, এই যে, এই যে আমি এলাম!

(স্বর্গ গমন করিলেন) †

এখানেও স্পষ্ট স্বর্গ গমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বালচরিতের পঞ্চমাঙ্কে কৃষ্ণ কংসের কেশ ধরিয়া প্রহার করিয়া, প্রাসাদ হইতে ফেলিয়া দিলেন। এই কংসবধও প্রকাশ্যে অভিনয়ার্থই রচিত হইয়াছে। চানূরমুষ্টিক বধও এইখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দশরূপক রচয়িতা ধনঞ্জয় বা সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ না হয়, বেশী দিনের

---

* "অয়মমরপতেঃ সখা দিলীপো
রঘুরয়মত্রভবানজঃ পিতা মে।
কিমভিগমনকারণং ভবদ্ভিঃ
সহ বসনে সময়ো মমাপি তত্র।

রাম! বৈদেহি! লক্ষ্মণ! অহমিতঃ পিতৄণাং সকাশং গচ্ছামি। হে পিতরঃ! অয়মহমাগচ্ছামি।

(মূর্চ্ছয়া পরামৃষ্টঃ)

[কাঞ্চুকীয়ো যবনিকাস্তরণং করোতি]

† "পরিত্যজন্তীব মাং প্রাণাঃ। ইমা গঙ্গাপ্রভৃতয়ো মহানদ্য এতা উর্ব্বশ্যাদয়োঽপ্সরসো মামভিগতাঃ। এষ সহস্রহংসপ্রযুক্তো বীরবাহী বিমানঃ কালেন প্রেষিতো মাং নেতুমাগতঃ। ভবতু। অয়মহমাগচ্ছামি।" (স্বর্যাতঃ)

লোক নহেন। নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরত অতি প্রাচীন। কিন্তু তিনিও নিজকৃত নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন :—

"যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগরোপরোধনঞ্চৈব।
প্রত্যক্ষাণি তু নাঙ্কে প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি॥
অঙ্কে প্রবেশকৈর্বা প্রকরণমাশ্রিত্য নাটকে বাপি।
ন বধঃ কর্ত্তব্যঃ স্যাদ্ যস্তত্র স নায়কঃ খ্যাতঃ॥"

[নাট্যশাস্ত্র। ১৮। ১৯, ২০।

অর্থাৎ, "যুদ্ধ, রাজ্যনাশ, মৃত্যু, নগর অবরোধ প্রভৃতি অঙ্কমধ্যে প্রত্যক্ষ বিহিত হইবে না। প্রবেশকদ্বারা এগুলি সূচনা করিবে। কিন্তু প্রকরণ বা নাটকের নায়কের বধ প্রবেশকদ্বারাও সূচনা করিবে না।"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভাস যখন নাট্যরচনা করিয়াছিলেন, তখন ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র রচিত হয় নাই। কাজেই ভরত যে লক্ষণের নিগড় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাসের লেখনীকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভাসের কালনির্ণয় করিবার সময় এ কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য।

পঞ্চভূত।

[লেখক—অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

(৭)

এই ভাবে শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশ নামক নবম দ্রব্য সিদ্ধ হয়। নৈয়ায়িক-মতে আকাশ নিত্য, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। বৈদান্তিকেরা আকাশের অনিত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। আকাশ যে নিত্য, তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানচলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসো রাশীন্ কালষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥
আপশ্চৈবান্তরীক্ষঞ্চ পৃথিবী বায়ুপাবকৌ।" (২৭৪ অঃ, ৬ শ্লোঃ)

আকাশের যে উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাহার প্রমাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥"

(১৩শ অঃ, ৩২ শ্লোঃ)

আকাশ যে সর্ব্বগত, তাহা ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন, "আকাশকালদিগাত্মনাং সর্ব্বগতত্বং—" (২২ পৃঃ) সর্ব্বগতত্বের অর্থ, সমস্ত মূর্ত্তের অর্থাৎ সক্রিয় বস্তুর সহিত সংযোগ। সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার সংযোগ আছে, এই জন্য এই চারিটী দ্রব্যকে সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী বলা হয়। আকাশাদি এই চারিটী দ্রব্য নিষ্ক্রিয়, কাজেই তাহার সর্ব্বত্র গমন, সম্ভবপর নহে, তাই 'সর্ব্বগতত্ব' শব্দের ঈদৃশ অর্থেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীধরাচার্য্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বৈর্মূর্ত্তৈঃ সহ সংযোগঃ আকাশাদীনাং
ন তু সর্ব্বত্র গমনং তেষাং নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ।"

(ন্যায়কন্দলী, ২২ পৃঃ)

সর্ব্বগত আকাশ যেরূপ সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার সত্তা, অপর বস্তুর সত্তার প্রতিরোধক নহে, আত্মাও সেইরূপ সকল দেহে অবস্থিত হইয়াও অলিপ্ত—ইহাই পূর্ব্বোক্ত গীতাশ্লোকের মোটামুটি অর্থ। এখানে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ নিরবয়ব অথবা বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সূক্ষ্ম শব্দের শেষোক্ত অর্থ, উদয়নাচার্য্যের সম্মত (১)। এখন এই সর্ব্বগতত্ব হেতুর দ্বারা আকাশে অনুমান-প্রমাণ বলে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। অনুমানের আকার এই,—'আকাশঃ নিত্যঃ সর্ব্বগতত্বাৎ ব্রহ্মবৎ'। আকাশ নিত্য, যেহেতু, তাহা সর্ব্বগত, দৃষ্টান্ত—ব্রহ্ম। এই সর্ব্বগতত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধ অর্থাৎ আকাশরূপ 'পক্ষে' নাই, এ কথা বলা যায় না। কারণ, আকাশ যে সর্ব্বগত, তাহা ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—আকাশের সর্ব্বগতত্ব, নৈয়ায়িকের স্বকপোলকল্পিত নহে। তারপর, সর্ব্বগত শব্দের অর্থ যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা শঙ্করাচার্য্য নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

লাঘবরূপ যুক্তি-অনুসারেও আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশ অনিত্য বলিলে তাহার ধ্বংস ও প্রাগভাব, আবার সেই ধ্বংসের প্রাগভাব—প্রাগ-

---

(১) "সৌক্ষ্ম্যম্ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যতা বিরহঃ"—

—কিরণাবলী, ১২৭ পৃঃ।

ভাবের ধ্বংস, এই ভাবে অনাবশ্যক কোটি কোটি পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। আকাশের নিত্যতা অঙ্গীকার করিলে এইরূপ গৌরবের আর কোনও অবকাশ থাকে না। আকাশ যে নিত্য, তাহার আরও প্রমাণ আছে,—

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।"

আকাশ যে উৎপন্ন দ্রব্য নহে, এ পক্ষে আমরা তর্ককেও সহায়করূপে পাই। অনেক উপাদানের সহিত সংযোগ না হইলে কোনও দ্রব্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। দ্ব্যণুক হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। উভয় পরমাণুর সংযোগেই দ্ব্যণুকের উৎপত্তি। উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রেরই উপাদান অনেক। যে দ্রব্যের অনেক উপাদান নাই, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, তাহা নিত্য। সুতরাং—'আকাশং যদি জন্যদ্রব্যং স্যাৎ তর্হি অনেকাবয়বজন্যং স্যাৎ' এইরূপ তর্কের সহায়তায় আকাশের অজন্যত্বের নিশ্চয় হয়।

আকাশ যে নিত্য নহে, জন্যদ্রব্য, এ পক্ষে বৈদান্তিকেরা কোনও যুক্তি তর্ক দেখাইতে না পারিলেও "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" (তৈত্তিরীয়, ১।২।১) এই শ্রুতি প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন। শ্রুতির অর্থ, ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই শ্রুতিও ন্যায় মতের বিরোধী নহে। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষণের উৎপত্তি-অনুসারে বিশেষ্যের উৎপত্তি-ব্যবহার হয়। যেমন, আত্মা নিত্য হইলেও শরীরের উৎপত্তি হয় বলিয়া "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ", "তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এস্থলেও সেইরূপ কর্ণবিবরের উৎপত্তি-অনুসারে আকাশের উৎপত্তি-ব্যবহার হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। তা'রপর, আকাশপর্য্যায় শব্দে পৃথিবীর সহিত অসংযুক্ত, পৃথিবীর উপরিস্থিত স্থির বায়ুরও বোধ হয়। এই জন্যই 'খেচর', 'ভূমিচর' 'খগ' ইত্যাদি প্রামাণিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক চূড়ামণি শ্রীহর্ষও তদীয় মহাকাব্য "নৈষধ-চরিতে" হংসের মুখ দিয়া দময়ন্তীকে বলাইয়াছেন,—

"ধার্য্যঃ কথঙ্কারমহং ভবত্যা
বিয়দ্বিহারী বসুধৈকগত্যা।"

যদি আকাশপর্য্যায় বিয়ৎ শব্দে তাদৃশ স্থির বায়ুকে না বুঝাইত, তাহা হইলে দময়ন্তীই বা কেন বিয়দ্বিহারিণী না হইবে? আকাশের সহিত ত দময়ন্তীরও সম্বন্ধ আছে; কারণ, আকাশ সর্ব্বব্যাপী। কাজেই বলিতে হইবে, আকাশ-পর্য্যায় শব্দে বিশ্বব্যাপী শব্দাধিকরণ নিত্য দ্রব্যের ন্যায় তাদৃশ স্থির বায়ুরও বোধ

হয়। "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিতে ঐরূপ স্থির বায়ুর উৎপত্তির কথাই বলা হইয়াছে। সেই স্থির বায়ুর সৃষ্টির পর অন্য বায়ুর সৃষ্টি। তা'ই, শ্রুতির পরবর্ত্তী অংশে আছে, "আকাশাদ্ বায়ুঃ।" এই শ্রুতিতেই এক জাতীয় বস্তুর বিবিধ সৃষ্টির কথা পৃথিবীর সৃষ্টি প্রসঙ্গেও অভিহিত হইয়াছে ; যথা,—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।" ওষধি, অন্ন, পুরুষ (শরীর) সমস্তই পৃথিবী। সামান্য ভাবে "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"র সৃষ্টির কথা বলিয়া আবার বিশেষ ভাবে ওষধি প্রভৃতি সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। অতএব "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি, ন্যায়-মতের বিরুদ্ধ নহে। "ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।" এই মন্ত্রেও চকারের পর 'আন্তরীক্ষ' পদ আছে, অন্তরীক্ষ নহে। এখানে 'আন্তরীক্ষ' পদের অর্থ শব্দ। 'অন্তরীক্ষস্য ইদং' এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত 'আন্তরীক্ষ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিধাতা যথাপূর্ব্ব বেদ সৃষ্টি করিলেন, ইহাই "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ···আন্তরীক্ষং"—এই মন্ত্রাংশের অর্থ। সুতরাং দেখা গেল যে, বৈদান্তিকেরা শব্দ বা অনুমান কোনও প্রমাণের দ্বারাই আকাশের জন্যত্ব সিদ্ধ করিতে পারেন না।

"তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়ে যদি আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও আকাশের যে বিনাশ হয়, এ সম্বন্ধে বৈদান্তিকেরা কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। যে যে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশও হয়, এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে আকাশে বিনাশিত্বের অনুমিতি হইবে (১), এ কথাও বলা চলে না। কারণ, এস্থলে 'উপাধি' আছে। সোপাধিক হেতু যে অসদ্ধেতু—সেই হেতু দ্বারা যে যথার্থ অনুমিতি হইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। [অর্চনা, ১৪ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] "আকাশঃ বিনাশী জন্যভাবত্বাৎ"—এস্থলে "স্বায়মুপাদানকদ্রব্যভিন্নত্ব"ই উপাধি। সাধারণ পাঠক পাঠিকার পক্ষে কঠিন হইবে বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক বিচারের অবতারণা করিব না। যাঁহারা এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা জগদ্গুরু মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" গ্রন্থ দৃষ্টি করিবেন।

বিশ্ববিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক, রঘুনাথ শিরোমণি, অতিরিক্ত আকাশ স্বীকার

---

(১) অনুমানের আকার ;—"আকাশঃ বিনাশী, জন্যভাবত্বাৎ, ঘটবৎ।"

করেন না,—তিনি ঈশ্বরকেই শব্দের আশ্রয় বলেন (১)। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। তিনি বলেন, তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ হয়। কারণ, শ্রুতি আছে,—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

—কঠ, ১।৩।১৫।

এই শ্রুতিতে ঈশ্বরকে শব্দরহিত বলা হইয়াছে। কাজেই ঈশ্বরকে শব্দের আশ্রয় বলা যায় না, অতিরিক্ত আকাশ স্বীকার করিতেই হইবে।

কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। আকাশ এক হইলেও কর্ণবিবরের ভেদে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভেদ হইয়া থাকে। মীমাংসক-মতে শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্,—আকাশ নহে। কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন,—

"যদি ত্ববশ্যং বক্তব্যাস্তার্কিকোক্তিবিপর্যায়ঃ।
ততো বেদানুসারেণ কার্য্যা দিক্‌শ্রোত্রতামতিঃ॥"

(শ্লোকবার্ত্তিক, শব্দাধিকরণ, ১৫১ শ্লোঃ)

জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট, এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে সেই সকল বিচার-প্রণালী প্রদর্শিত হইল না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক, "ন্যায়মঞ্জরী"র ২২৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিবেন।

"পঞ্চভূত" প্রবন্ধ, এই খানেই সমাপ্ত হইল। ইহার পর, "দিক্ ও কাল", "জীবাত্মা ও পরমাত্মা" এবং "মনঃ" এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

---

(১) "শব্দনিমিত্তকারণত্বেন কৢপ্তস্যেশ্বরস্যৈব শব্দসমবায়িকারণত্বম্। শব্দস্যজন্যস্যাদৃষ্টজন্যত্বাৎ সুখাদিবদিতি পুনরপ্রয়োজকম্। অদৃষ্টস্য শব্দজনকত্বেঽপি তদাশ্রয়স্য তথাত্বে মানাভাবাৎ অস্মদাদেস্ত শব্দসমবায়িকারণত্বে অহং সুখাদিমানিতিবদহং শব্দবানিতিপ্রতীত্যাপত্তিঃ। শ্রোত্রমপি চ কর্ণশষ্কুলীবিবরাবচ্ছিন্ন ঈশ্বর এব, যথা পরেষাং তথাবিধমাকাশম্।"

—পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, ৬—১০ পৃঃ।

গৃহস্থের কুটির।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

সুশীতল সুনিবিড় শান্ত বায়ু বহে ধীর
গৃহস্থের কুটির-প্রাঙ্গণে
দিবসে সূর্য্যের রেখা রাতে চন্দ্র দেয় দেখা
লক্ষ লক্ষ গ্রহতারা সনে।

পুকুরের তীরে তীরে পক্ষী বসি বৃক্ষ-নীড়ে
বর্ষে সদা করুণার সুর
নব-শ্যাম দুর্ব্বাদলে শেফালিকা পড়ে ঢ'লে
গন্ধে চিত্ত করে ভরপুর।

গৃহস্বামী সদাচারী— নিষ্ঠাবান মন্ত্রধারী—
সদা তা'র সরল অন্তর—
পরিশ্রমে রত মন আনন্দিত সর্ব্বক্ষণ
স্বাস্থ্য তার অতীব সুন্দর।

আছে তা'র গোলাভরা মোটা ধান্য জড় করা
নানাবিধ শস্যের সঞ্চয়
গাভীদুগ্ধ গৃহে তা'র পুকুরে মাছের চায়
ক্ষেতে শাক্ সকল সময়।

মান মর্য্যাদার আশে যায় না সে কারো পাশে
নয় কারো দয়ার ভিখারী
'গর্ব্বী' কাছে নত হ'তে চায় না সে কোনমতে
বিনয়ের মহামান্যকারী।

দরিদ্র স্বজনবাসী যদি কেহ দ্বারে আসি
কোন দুঃখে ফেলে আঁখিজল
বিরাট সে বক্ষমাঝে বেদনার বজ্র বাজে
স্থির চিত্ত নিমিষে চঞ্চল।

অতিথি আসিলে দ্বারে সেবে তাঁ'রে সমাদরে
দেবদ্বিজে ভকতি অপার
ত্রিসন্ধ্যা-আহ্নিক-ব্রত পালে নিত্য অবিরত
নিরন্তর মানে শুদ্ধাচার।

লক্ষ্মীরূপা পত্নী তা'র পুত্র কন্যা জানে সার
পতি তা'র পরম দেবতা
প্রতিদিন ধৌত করি শ্রীপদারবিন্দুবারি
আচমনে হয় শুচিস্মিতা।

সিঁদুরের রক্ত আভা শিরে তা'র পায় শোভা
হাতে শাঁখা—লোহার কাঁকণ
বড় বেশী কিছু আর নাই তা'র প্রত্যাশার
বেশভূষা অতি সাধারণ।

প্রত্যহ ঈশ্বরে স্মরি' শয্যা ত্যজি সেই নারী
সূর্য্যদেব না হ'তে উদয়
স্বহস্তে পবিত্র করি পথ-ঘাট-ঘর-বাড়ী
গৃহকর্ম্মে সদাব্রতা হয়।

সায়াহ্নে তুলসীতলে নিত্য দীপ দেয় জ্বেলে
মন্দিরেতে করে সে প্রণাম
ঐকান্তিক ভক্তিভরে গৃহের মঙ্গল তরে
মনে মনে জপে ইষ্টনাম।

গৃহস্থের গৃহমাঝে আনন্দ উৎসব রাজে
প্রফুল্লতা রহে বারোমাস
কলহ-বিবাদ-মুক্ত হাস্য-পরিহাসযুক্ত
কমলার সুদীর্ঘ নিবাস।

কবিরাজ।

[লেখক—অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

(১)

কিরণবাবু হাইকোর্টের বড় উকীল। কিন্তু তাঁহার ওকালতীর পসার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। আজ প্রায় মাসাবধি হইল, তাঁহার এমন কর্ণরোগ হইয়াছে যে, কাণের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা শব্দ হইতেছে। উকীলের কর্ণই সর্ব্বস্ব, সেই কর্ণেই যদি এইরূপ দারুণ পীড়ার সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে আর ব্যবসা কি করিয়া বজায় থাকে? অনেক ডাক্তার দেখাইয়াছেন, ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, কিছুতেই কোনও ফল হইল না।

একদিন ষোল টাকা ভিজিট দিয়া এক বড় ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার আসিয়া অনেকক্ষণ কাণ ধরিয়া টানিয়া ভিতরে দেখিয়া বলিলেন, "আপনার কাণ অস্ত্র করিতে হইবে।" নিকটে কিরণবাবুর খুড় সম্পর্কের একটী বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ওহে, তোমরা ত ইংরাজী-বায়ুগ্রস্ত; কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি ত তোমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। কিন্তু এই সকাল বেলা যে তোমার কাণটা মলিয়া ষোল টাকা লইয়া গেল, আর কাণ কাটিবার পরামর্শ দিল; তা কাণই কাটাইবে, না কুমারটুলীর বুড়া কবিরাজটাকে একবার দেখাইবে?" কিরণবাবু অপ্রসন্ন-মুখে বলিলেন, "একবার শেষ মেডিকেল কলেজের বড় সাহেবকে দেখাই, তা'রপর যাহা হয়, হইবে।" বৃদ্ধ বলিলেন, "যাহাই কর, কাণটা কাটিবার পূর্ব্বে কবিরাজ দেখাইও।"

বড় সাহেবও বলিলেন, কাণ কাটিতেই হইবে। নতুবা কাণের ভিতর যে কি রোগ হইয়াছে, বুঝা যাইবে না। অগত্যা কিরণবাবু, কুমারটুলীর বুড়া কবিরাজকেই ডাকাইলেন। কবিরাজ মহাশয় আসিয়া নাড়ী দেখিলেন, কাণের ভিতর কিরূপ শব্দ হয়, জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"দেখুন কিরণবাবু, ইহার নাম 'কর্ণনিনাদ' রোগ। অভুক্ত অবস্থায় যদি বহুক্ষণ একটা ভীষণ শব্দ শুনা যায়, তাহা হইলে এইরূপ কর্ণরোগ উৎপন্ন হয়। তা' আপনার ভয় নাই—আমি একটা তেল দিব, তাহা কাণে দিন, কাণে দিলেই আপনি নির্দ্দোষ ভাবে আরোগ্য লাভ করিবেন।"

কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনিয়া কিরণবাবু যেন লাফাইয়া উঠিলেন।

তিনি বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, আপনি আমার রোগ সারান, আর না সারান; কিন্তু আপনি রোগোৎপত্তির যে হেতু বলিয়াছেন, এই জন্যই আমি আপনাকে এই গিনিটী পুরস্কার দিলাম। শুনুন বলি, রোগটা কি ভাবে উৎপন্ন হইল। বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, স্নান করিয়া খাইতে যাইব। অন্ন প্রস্তুত, আসনে পা দিয়াছি মাত্র, এমন সময়ে কাশী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, মা'র কলেরা হইয়াছে—খারাপ অবস্থা। আর খাওয়া হইল না, সেই অবস্থাতেই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত দিন রাত্রি ইঞ্জিনের গাড়ীর চাকার ভীষণ শব্দ কাণে গেল। তাহার পর হইতেই এই রোগের সূচনা হইয়াছে।"

কিরণবাবু কবিরাজী তৈল ৭ দিন ব্যবহার করিয়াই উপকার লাভ করিলেন; দিন পোনের ঔষধ ব্যবহারে তাঁহার সেই কাণ-কাটার রোগ একেবারে ভাল হইয়া গেল।

(২)

কবিরাজ মহাশয় প্রাতঃকালে ঔষধালয়ে বসিয়া রোগী দেখিতেছেন। দুই জন ছাত্র দুই পার্শ্বে থাকিয়া কবিরাজ মহাশয়ের কথা-মত ব্যবস্থা লিখিতেছে। একটী দরিদ্র বিধবা ৭।৮ বৎসর বয়সের ছেলে লইয়া দেখাইতে আসিয়াছে। কবিরাজ ছেলেটীর হাত দেখিলেন। ছাত্রকে বলিলেন "লেখ, —কস্তূরীভৈরব ৭ বটী, বৃহৎ বাতচিন্তামণি ৭ বটী, অনুপান দশমূল পাচন।" যে ছাত্রটী ঔষধ দিতেছিল, সে কবিরাজ মহাশয়ের খুব নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "কস্তূরীভৈরব ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রস্তুত নাই, খলে মাড়া হইতেছে, কাল মধ্যাহ্নে বড়ী প্রস্তুত হইবে।" কবিরাজ মহাশয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "একেবারেই কি শিশি খালি হইয়াছে?" ছাত্রটী বলিল, "না, গোটাদশেক করিয়া বড়ী আছে, কিন্তু আর একটু পরেই রাজাবাবুর বাড়ী হইতে ঔষধ লইতে আসিবে, তাহাকে কি দিব?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "ওঃ, তোমার আর সঞ্চয় করিতে হইবে না; যা' ঔষধ আছে, এই বিধবাটীকে দাও, রাজা বাবুরা বড় লোক, তাহারা আমার কাছে ঔষধ না পায়, অন্যত্র কিনিয়া লইবে। তুমি কি জান না,—

"গুরুবিপ্রতপস্বিদুর্গতেভ্যঃ প্রতিকুর্ব্বীত ভিষক্ স্বভেষজৈঃ"

গরীব বিধবা বিপন্ন হইয়া রুগ্ন পুত্রের জন্য ঔষধ লইতে আসিয়াছে, রাজাবাবুর কাছে দাম পাইব বলিয়া তাহার জন্য ঔষধ রাখিয়া স্ত্রীলোকটীকে ফিরাইয়া দিব?"

ছাত্র। 'আমি স্ত্রীলোকটীকে ঔষধ না দিবার কথা বলিতেছি না, ইহাকে সৌভাগ্যবটী ও বায়ুচিন্তামণি দেই।"

কবিরাজ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) তুমি বল কি হে? যে ঔষধ ব্যবস্থা হইল, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ দিবে! তুমি এখন হইতেই এইরূপ প্রতারণা শিখিতে আরম্ভ করিলে। তোমাদের মতন চিকিৎসককে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় এই শ্লোকটী লিখিত হইয়াছিল;—

"বৈদ্যরাজ নমস্তভ্যং ত্বং যমজ্যেষ্ঠ সোদরঃ।
যমস্তু হরতে প্রাণান্ ত্বন্তু প্রাণান্ ধনানি চ॥"

ছি ছি, এমন বুদ্ধি করিও না।"

ছাত্রটী মহা অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় বিধবাটীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা, তোমার বাসা কোথায়?"

বিধবা। "বাবা, আমি বড় গরীব, ভবানীপুরে চৌধুরী বাবুদের বাড়ীতে রাঁধি, সেই খানেই ছেলেটীকে লইয়া থাকি। এই ছেলেটীই বিধবার অন্ধের যষ্টি। বাছার জ্বর হইতেই বাবুরা বলিলেন, 'তোমার ছেলেকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দাও।' তা' বাবা, আমি কি এই বুক-চেরা ধনকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া থাকিতে পারি? তাই বাবা একখানা গাড়ী করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।"

কবিরাজ। গাড়ী ভাড়া কত দিতে হইবে মা?

বিধবা। ১৷৷০ টাকা। তা' আমি দরওয়ানের কাছ থেকে ধার ক'রে এনেছি।

কবিরাজ ডাকিলেন, 'অনাথ—অনাথ।' একটী সুন্দর ছেলে কাছে আসিল। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীকে দুইটা টাকা দাও; আর রামদাসকে দিয়া শীঘ্র সাত পুরিয়া দশমূল পাচন আনাইয়া ইহাকে দিও। (স্ত্রীলোকটীর দিকে ফিরিয়া) মা, তুমি একটু অপেক্ষা করিয়া পাচন লইয়া যাও। কি ভাবে জাল দিতে হইবে, ছাত্রেরা বলিয়া দিবে। ছেলেটীকে খুব সাবধানে রাখিও। রোগ সহজ নহে। কাল ভবানীপুরে আমার ডাক আছে, তোমার ঠিকানা লিখাইয়া দিয়া যাইও, ছেলেটীকে দেখিয়া আসিব। কোনও ভয় করিও না, ভাল হইয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটীর চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু প্রবাহিত হইল। বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, কবিরাজ মহাশয় বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

"আপনি না হয় ৩২৲ টাকাই লইবেন, একবার চলুন, ছেলেটাকে দেখে আসবেন।"

"কেন, আমাকে আর কেন? সাহেব ডাক্তার দেখাচ্ছ, তা'রাই জ্বর ভাল করুক; আমরা অশিক্ষিত—অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসক। আমার হাতে তিন দিনের দেরী সইল না, এখন যে ২২ দিন ভুগ্‌ছে।"

"কবিরাজ মহাশয় যা' হবার হ'য়ে গেছে, একটীবার চলুন। কাল সারা রাত তিন জন বড় ডাক্তার ছিলেন, জ্বর ছাড়াবার জন্য কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই গা যেন আগুন, আবার পেট ব্যথায় ছটফট্ করছে।"

"দেখ বাপু, তোমার বাবুকে গিয়ে বল, আমি জ্বর আজই ছাড়িয়ে দেব, কিন্তু দু'শো টাকা আমাকে অগ্রিম দিতে হবে। তুমি বাড়ীতে গিয়ে জেনে এস, পরে আমি যাব।"

লোকটী ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া গেল। তখনও রোগীর ঘরে ৪।৫ জন বড় বড় ডাক্তার বসিয়া আছেন, এক জন সাহেবও ছিলেন। কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, "ডাক্তার বাবুরা, আপনারা যাইবেন না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন, আমি জ্বর এখনই কমাইয়া দিব।"

কবিরাজ মহাশয় একটী ফর্দ্দ করিয়া দিয়া বলিলেন, "বেনের দোকান হইতে এই জিনিষগুলি নিয়ে এস, আর এক পো' আদাও আনতে হবে।" তাঁহার কথানুযায়ী জিনিষ আসিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "এই মসলাগুলি বেশ করিয়া বাট, আর এই আদার রস করিয়া আন। এক খানা লোহার হাতা উনুনে দিয়া লাল করিয়া তপ্ত কর।"

ছেলেটীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কবিরাজ মহাশয় নিজের হাতেই সেই বাটা মসলাগুলি ছেলেটীর পেটে নাভির চারিদিকে দুই আঙ্গুল উঁচু করিয়া দিলেন। তা'রপর সেই যে গর্ত্তের মতন হইল, তাহাতে আদার রস ঢালিলেন, আর সেই আগুনের মত লাল তপ্ত হাতা লইয়া ধীরে ধীরে সেই রসে ঠেকাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটীর বাহের বেগ হইল। এ দিকে মল নিঃসৃত হইতে লাগিল, আর জ্বরের বেগও কমিতে আরম্ভ করিল। শেষে একেবারে জ্বরের উত্তাপ কমিয়া গেল; যে ছেলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, সে খাইতে চাহিল। ডাক্তারেরা অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিল।

(৪)

সন্ধ্যা হয় হয়। কবিরাজ মহাশয় তাকিয়া ঠেশ দিয়া আরাম করিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছেন। ভাটপাড়া, কোটালিপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য কয়েকটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। ভাটপাড়ার বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "কবিরাজ, তুমি যে আমার খুড়ীমার রক্তামাশয়ের জন্য দুইটী বড়ী দিয়ে ব'লে দিয়েছিলে, আধ খানি করিয়া খাওয়াইবেন, দেড়টী বড়ীতেই কাজ হইবে। আশ্চর্য্য, দেড়টী বড়িতেই তাঁহার তিন মাসের রোগ সারিয়া গিয়াছে। পাচনটা কি এখনও খাওয়াব ?"

কবিরাজ। পাচনটা আরও ৭ দিন খাইতে দিবেন। ওষুধের ফলের কথা বল্‌ছেন, সে ছিল বাবার আমলে। তাঁর আর্থিক অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ ছিল; তাঁর ভিজিট ছিল ২৲ টাকা, আর আমার ভিজিট ৮৲ টাকা। তিনি বেশী দামের জন্য অনেক ওষুধে আসল জিনিষ না দিতে পেরে প্রতিনিধি দিতেন। কিন্তু তাঁর ওষুধে যে ফল হ'ত দেখেছি, আমি আসল জিনিষ দিয়েও সে ফল পাই না। জানি না, এর কারণ কি ? দ্রব্যশক্তি কি কমে গেল ?

কোটালিপাড়ার শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "দেখ কবিরাজ, তোমার পিতা নিজের সম্মুখে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করাইতেন। যেটীর যতক্ষণ পাক, যতক্ষণ মর্দ্দন, সব যথানিয়মে হইত। তোমার সময় কম, তুমি পরিচারকদের উপর বা ছাত্রদের প্রতি ভার দিয়া যাও, তা'রা কি আর তেমন যত্ন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে ? তবু তোমাদের ঘরের ঔষধে যেমন ফল হয়, এমন আর অন্যত্র হয় না। ওহে ছোক্‌রা, আমাকে কিছু মকরধ্বজ দিও ত।"

ভাটপাড়ার বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উঠিতে চাহিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "অনাথ, পণ্ডিত মহাশয়ের পাথেয় দাও।"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "ওহে, একটু চ্যবণপ্রাস দিও ত, বড় কাশী হইয়াছে।"

কবিরাজ মহাশয়, শিরোমণি মহাশয় ও স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বলিলেন, "আপনারা এবারে বার্ষিক নিয়েছিলেন ত ?"

দুই জন পণ্ডিতই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার এখানে সে সব ত্রুটী হ'বার যো নাই। যদিও তুমি সে সময়ে জয়পুরে গিয়েছিলে, কিন্তু আমরা যথাসময়েই বার্ষিক পেয়েছি।"

তিন জন পণ্ডিতই এক সঙ্গে উঠিলেন। কবিরাজ মহাশয়, প্রত্যেকের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যাইতে যাইতে বলিলেন, স্মৃতিরত্ন, 'নৈষধে'র সেই শ্লোকটা কি হে—"ত্বোয়রাশিরসি তে খলু কৃপাঃ।"

(৫)

যে কয়েকটী বিষয়ী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক জন বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, আমার এক তোলা মকরধ্বজ চাই, তা' আমি ১৬৲ টাকা দিচ্চি, কিন্তু আপনার ছাত্রেরা বল্‌ছেন, ২৫৲ টাকার এক পয়সা কমে দেবেন না। আপনি একটু বলে দিন্ না।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "মহাশয়ের কি করা হয়?"

লোকটী কহিলেন, "আমি হাওড়া জজ্ কোর্টে পেস্কারী করি।"

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আপনারাও যদি ঠিক ঠিক দাম না দিবেন, তা' হ'লে আমাদের চলে কি করিয়া? এই যে ভারতের বিদ্যারক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সম্মান রক্ষা, দুঃখী দরিদ্রগণকে ঔষধ বিতরণ—এ সকল কাজ আমি নির্ব্বাহ করি কিরূপে? আমার ত আর জমীদারী নাই।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তা বলে কি আপনি আমার কাছে চারিগুণ দাম লইবেন? মকরধ্বজে আর খরচ কি?"

কবিরাজ মহাশয় এবারে একটু রাগিয়াই বলিলেন "তা' আপনি সেইস্থান হইতেই মকরধ্বজ লইবেন। আমার কাছে কেন এসেছেন? আমি ত আর বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া খরিদ্দার ডাকিতেছি না। আমি ২৫৲ টাকাতেও দিতে পারি না। মকরধ্বজে কি খরচ হয় না হয়, সে সম্বন্ধে আমাকে অনুযোগ দিবার আপনার কি অধিকার? তবে যদি আপনি চান, এক সপ্তাহের মকরধ্বজ আপনাকে অমনি দিতে পারি; দাম লইলে কম লইব না।"

ভদ্রলোকটী আস্তে আস্তে বলিলেন, "তবে তাই দিন।"

[নবীন লেখকের পৃষ্ঠা]

জন্ম।

[লেখক—উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।]

কবে কোন্ অজ্ঞাত প্রভাতে
জীবনের হইল সূচনা—
অচেতন জড়পিণ্ড মাঝে
প্রকৃতির জাগিল চেতনা।
কবে এই মায়ার সংসার
মুগ্ধ নেত্রে উঠিল ফুটিয়া;
বিস্ময় বিহ্বল কারাগৃহে
ক্ষুব্ধ আত্মা উঠিল কাঁদিয়া!

মৃত্যু।

কবে কোন্ অজ্ঞাত সন্ধ্যায়
অলক্ষিতে আসিবে সে ঘুম;
করি চির নীরবতা দান
পাণ্ডুর অধরে দিবে চুম।
সাস্ত ঘট ঘ্নণ্য রবে পড়ে,
অনন্তে মিশিবে মুক্তপ্রাণ;
পরিহরি বিশ্ব কোলাহল
সে যেন গো নীরব প্রয়াণ!

মনুষ্যত্ব।

[লেখক—শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।]

বাহিরের চাক্-চিক্য চারু আভরণ,
মানবের 'মনুষ্যত্ব' করে না জ্ঞাপন।
দয়া আর ধর্ম্ম যা'র হৃদয় ভূষণ,
ক্ষমা পর-হিত-ব্রত যা'র নিত্য ধন,
শত্রুও আসিলে পাশে যেই মহাজন,
মিত্রজ্ঞানে বক্ষে ধরি' দেয় আলিঙ্গন,
হীন-বেশে শোভা পায় হেন সাধুজন,
মেঘাচ্ছন্ন-রবি যথা প্রকাশে কিরণ।

যুবক ও যুবতী।

[৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।]

"The unsexed woman pleases the unsexed man."

—*Mrs. Lynn Linton.*

যুবতী চাহেন, যুবক হইতে; যুবকের বাসনা, যুবতী হন। যুবতীর "বাক্স-টেড়ি," যুবকের "চেরা-সিঁথি";—কলিকাতার রাজ-পথে বাহির হইয়া এবং সভা-সমিতিতে যাইয়া, প্রথম দৃষ্টিতে অজাতশ্মশ্রু যুবককে যুবতী বলিয়াই ভ্রম

হয়। ফুটফুটে রঙ, টুকটুকে চিবুক, "কিনারাদার" কুঞ্চিত ওড়নার বেড়নে বক্ষঃস্থল বাঁধা, বিনোদিনীবৎ বিন্যস্ত কুন্তল,—সে কুন্তলে, মস্তকমধ্যস্থলে, সুদীর্ঘ সীমন্ত সযত্নে রচিত। তথায় সিন্দুর রেখার বিরহে বালককে এ কালের বয়ঃস্থা কুমারী কন্যা বলিয়াই ভ্রম হয়। পূর্ণবয়স্ক বাবু পুরুষও আধ নারী-রূপী,—যেন গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত সুন্দরী;—সে-গৌরী-রূপে গুম্ফশ্মশ্রু প্রাকৃতিক "যৌন নির্ব্বাচনে" বিচিত্র সূচীপত্র বটে; কিন্তু অতীব বিদ্রূপকর; যেহেতু জাতশ্মশ্রু যুবতী, সৌন্দর্য্যকল্পে, শোভার ভাণ্ডার নহেন। পক্ষান্তরে পায়ে জুতো, গায়ে "মেরজাই"—চটুল, চিমসে গড়ন, চক্ষু তেজোময় অতি-বুদ্ধি-ব্যঞ্জক, কিন্তু কোঠরস্থ; বক্ষ বিস্ফারণমাত্র বিরহিত, ছাতা-মাথায়, শেলেট-হাতে, "অ্যাল-জাবরা"-অধ্যায়ী এ কালীয় স্কুল-বালিকা, সর্ব্বাংশে অতি-অধ্যয়নশীল বালকবৎ প্রতিভাত!

শিক্ষিতা মহিলাদিগের অনেকেরই প্রতি অন্ততঃ আমি শ্রদ্ধাবান্। তাঁরা গুণবতী, সুমার্জ্জিতা এবং স্ব স্ব আলোকানুসারে সাধারণতঃ সদভিপ্রায়-শালিনী। পরন্তু তাঁহারা সাবেক আমলের সেই কলহ-প্রবণা, বাঁকমল-মনসা-পেড়ে-পরিহিতা, তুঙ্গশৃঙ্গবৎ 'মূর্দ্ধন্য' কবরীধারিণী,—সম্মার্জ্জনী-হস্তা সুন্দরীদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতেও আমি কুণ্ঠিত নহি। পুনশ্চ ইহাও আমি বলিতে সাহসী যে, তাঁহারা হাল আমলের গ্রাবু-পরায়ণা, গহনালোলুপা, গৃহকার্য্যসমর্থা, আলস্যপরতন্ত্রা গৃহ-লক্ষ্মীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। শিক্ষিতা মহিলা পরুষভাষিণীও নহেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বাংশে পুরুষ প্রকৃতি। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, মহিলার সহিত আলাপ করিলাম বলিয়া বোধ হয় না;—তাঁহার ভাব, চিন্তা, বচন-চাতুর্য্য, হাস্য-ভঙ্গি, সবই পুরুষোচিত। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহাদিগকে অসম্ভ্রম অনাদর করা অন্যায়।

"Ye learned ladies"
"You read" your books, "I read your features
I have no dislike to learned natures"

এ কালেরই ইহা কেমন একটা রীতি যে, অস্বাভাবিক সাজে সাজিতে সকলেরই ঝোঁক। এ ঝোঁক কেবল এখানে নয়, এখানকার সভ্য সংসারের সর্ব্বত্র। ঝোঁক কেবল অস্বাভাবিক সাজে সাজার নয়; অস্বাভাবিকভাবে ভোর হওয়ার অস্বাভাবিকত্বে আত্মসমর্পণ করার এখন রেওয়াজ। কাজেই সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উদ্ভট অর্থ-হীন দৃশ্য অসংখ্য। এ কালটাই যেন

কেমন একটা কিম্ভূতকিমাকারের। জানি না, যুবতী যুবকত্বে এবং যুবক যুবতীবৎ ব্যবহারে, কি উচ্চতর আরাম পান, কি অভিপ্রায়ে, যুবক ও যুবতী পরস্পরে আত্মস্বভাব-বিনিময় করেন; তবে এটা দেখা এবং শুনা যাইতেছে যে, যুবকবৎ যুবতী এবং যুবতীবৎ যুবক এখন অত্র সৌর জগতের প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

পুরুষ রমণীভূত, স্ত্রী পুরুষীকৃত, ইহাও কি অভিব্যক্তিবাদের 'ক্রমবিকাশ' নাকি? যাহাই হউক, আমাদিগের চক্ষে এটা একান্ত অর্থহীন পদার্থ; 'জন' 'জুলিয়া' হওয়া এবং 'জুলিয়া' 'জন' হওয়ার কোন মানেই হয় না; অন্ততঃ পুরাতন সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-অনুসারে; তবে সুরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী ও সৌদামিনী সুরেন্দ্রনাথ হইয়া, যদি সৃষ্টি প্রক্রিয়াপরিবর্ত্তন করা উদ্দেশ্য হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তর্ক উঠিতে পারে যে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া কালে সজ্জা ও চিন্তা ভাবাদির বিপর্য্যয়ে স্ত্রী ও পুং-স্বভাব বিনষ্ট হয় না। অবশ্য একথা সত্য, আত্ম স্বভাব ওল্টান যায় না! কিন্তু ইংরেজী-নবিশের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সে কালে একজন অতি নিম্ন নীতিক পুরুষ প্রেমাভিসারে, রমণীবেশে প্রেরিত হইয়া, অনুরাগিণী রাজকুমারীকে কহিয়াছিলেন;—

—I love not thee
In this vile garb, the distaff's web and woof.

আসল কথাটা হোচ্ছে এই যে, 'সৃষ্টি' এবং 'সোহাগ' দুইটা খুব স্বতন্ত্র দ্রব্য। কথাটা এখানে ইঙ্গিতেই বুঝা উচিত।

"তখন তখন" এক মুহূর্ত্তের জন্যও সাজ সজ্জাদি (unsexed) অলিঙ্গীকরণ করা সাতিশয় নিন্দনীয়, যারপর নাই গর্হিত ছিল। এখন হৃদয় মন সহ গোটা শরীরটাই "অলিঙ্গীকরণ" করার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চলিয়াছে। শিক্ষা, উৎসাহ, প্রশংসা ও পারিতোষিক দ্বারা 'অলিঙ্গীকরণ' কার্য্য অগ্রসর করা হইতেছে। ইহার জন্য স্কুল, কলেজ আছে; পাবলিক ও প্রাইভেট শিক্ষক আছে; প্রচারক ও সংবাদপত্র আছে। বিলাতে ত আছেই আছে, আমাদের বঙ্গদেশেও এখন হইয়াছে। রমণী-রত্ন সদর বাজারে দাঁড়াইয়া, সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়া, 'শিশ' দিতে দিতে সিগারেট খাইলেন, অমনি অলিঙ্গীকরণ ব্যবসায়ী সংবাদপত্রসমূহে প্রশংসার ধীশব্দ পড়িয়া গেল। সীমন্তিনী সাহেবার নৈতিক সাহসের জন্য হয়ত স্বর্ণপদক প্রদানের প্রস্তাব হইল। বিবিজান গাউনের গঙ্গাযাত্রা করিয়া পেন্টুলান পরিলেন,—অমনি বাহবা-বাহবা ধ্বনি উঠিল। "মিশি

বাবা" "ফ্রক" ছাড়িয়া "নিকার বোকার" শোভিতা—ছুকরী ছোকরা সাজিয়া, ছড়ি হাতে করিয়া ইয়ারকি দিতে বাহির হইলেন ; অমনি "ক্যাক্সুবির" করতালি পড়িয়া গেল। আমাদের এখানেও প্রায় ঠিক এইরূপ। যুবতী মহিলা মেডিকেল কলেজে যুবকদের সঙ্গে যুবকবৎ বসিয়া জীব-ব্যবচ্ছেদ ও যৌন তত্ত্বাদি-বিজ্ঞান শিখিতে গেলেন,—অমনি নারীভূত নাগরেরা নাগরা পিটিয়া নাচিতে লাগিলেন,—ধামা-ধরারা পশ্চাৎ হইতে সারঙ বাজাইয়া "সাবাস" গাইতে লাগিল। লিঙ্গ-পরিবর্ত্তিনী সংবাদ-পত্রিকায় "পুণ্য পুণ্য" "ধন্য ধন্য" পড়িয়া গেল। পৃথিবী স্বর্গের পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়াছে—আর পায় কে ? এখনি কোনও বঙ্গমহিলা বিজ্ঞাপন দিউন না যে, তিনি টাউনহলে "বায়োলজি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন অথবা আগামী "ঘোড়দৌড়ে" ঘোড়সোয়ার হইবেন,—অমনি দেখিবে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, পূজার প্রস্তাব করিবার জন্য পুরুষসিংহেরা সভা করিয়াছেন।

বিবি লিন লিনটনের বিবেচনায়, এই সকল ব্যাপারের কেবল একটী অর্থ আছে ; তাহা এই যে,পুরুষীকৃত নারী রমণীভূত পুরুষকেই পছন্দ করেন, তাই মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের মত হইতেছে।

বিদায়।

পঞ্চদশ বৎসর মাতৃ-'অর্চ্চনা'য় আত্মনিবেদন করিয়াছিলাম। উদরান্নের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু অন্তর্য্যামিনী জননী জানেন, প্রাণ সঁপিয়াছিলাম অর্চ্চনায়। অর্চ্চনার সম্ভারে আর এ দীনের পুষ্পাঞ্জলীর স্থান নাই—যোগ্যতর ব্যক্তির পুষ্পে ও অর্ঘ্যে "অর্চ্চনা"র পূজার ডালি পূর্ণ হউক—আরও নিষ্ঠাবান পূজারির আহুতিতে অর্চ্চনার হোম-অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক। "অর্চ্চনা"র ডালিতে আমার শেষ উপচার দিলাম একটী শুভ প্রার্থনা—আমার কর্ম্মত্যাগে "অর্চ্চনা"র মঙ্গল হউক। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।